বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

দাখিল

নবম-দশম শ্রেণি

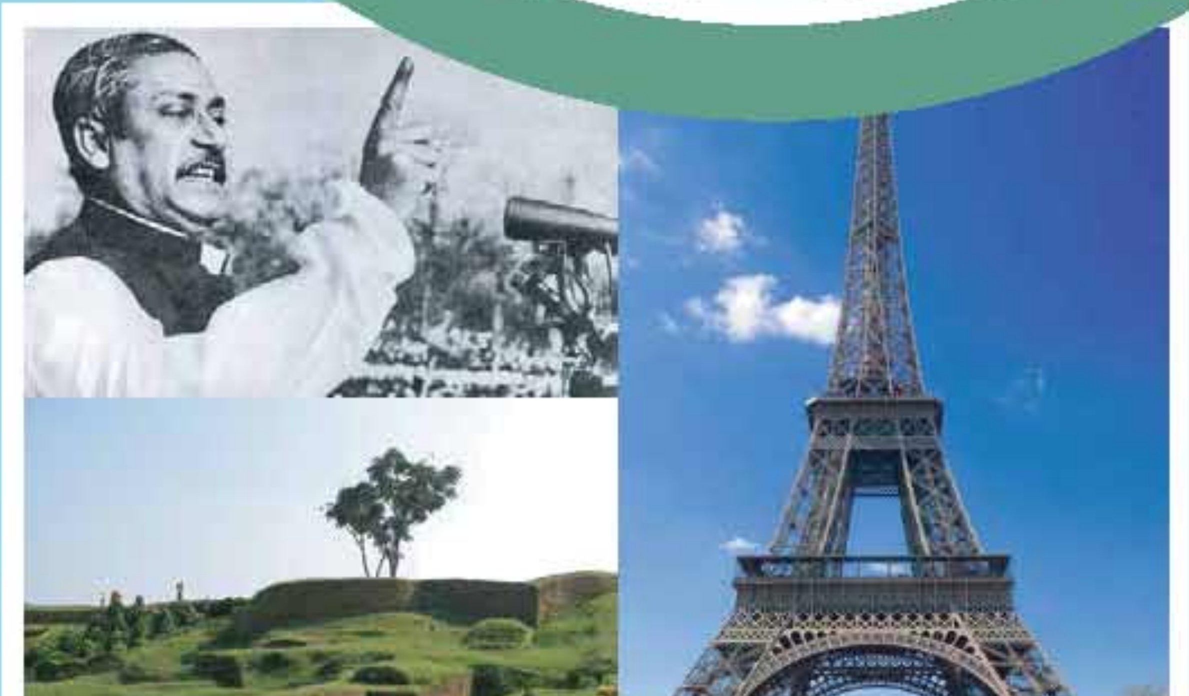

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে
দাখিল নবম–দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

দাখিল

নবম–দশম শ্রেণি

সহজপাঠ্য, আকর্ষণীয় ও সহজবোধ্য করার জন্য পরিমার্জিত সংস্করণে
প্রয়োজনীয় সংযোজন, পরিবর্ধন, পুনর্লিখন ও সম্পাদনা

প্রফেসর ড. মো. আখতারুজ্জামান

প্রথম সংস্করণ রচনা
প্রফেসর ড. মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী
প্রফেসর ড. শওকত আরা হোসেন
প্রফেসর ড. এস. এম. আনোয়ারা বেগম
প্রফেসর রুহি জাকিয়া দেওয়ান
ড. উত্তম কুমার দাশ

প্রথম সংস্করণ সম্পাদনা
প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ২০১৩
প্রথম পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৪
দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৭
পুনর্মুদ্রণ : ২০১৮

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ-কথা

ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষায় যোগ্য করে তোলা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলাও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তক । পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমমর্যাদাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

রূপকল্প ২০২১ বর্তমান সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকারকে সামনে রেখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করার প্রত্যয় ঘোষণা করে ২০০৯ সালে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর হাতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন। তাঁরই নির্দেশনা মোতাবেক ২০১০ সাল থেকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ শুরু করেছে।

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় শীর্ষক পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, পৌরনীতি, অর্থনীতি, ভূগোল ও জনসংখ্যার বিষয়গুলো স্বতন্ত্রভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এতে শিক্ষার্থী বাংলাদেশের সমাজ ও পরিবেশ, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থা এবং বৈশ্বিক বিষয় সম্পর্কে সম্যক ধারনা লাভ করবে। আশা করা যায় এসব বিষয়বস্তু অনুশীলনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী বাংলাদেশের ইতিহাস-ঐতিহ্যে লালিত মূল্যবোধসম্পন্ন নাগরিকে পরিণত হবে। নিজেকে সচেতন নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার সুযোগ পাবে। সমাজের বিভিন্ন সমস্যা মোকাবিলায় প্রত্যাশিত জীবন দক্ষতার অধিকারী হয়ে উঠবে। বিষয়টি শিক্ষার্থীদের কাছে সহজপাঠ্য, আকর্ষণীয় ও সহজবোধ্য করার জন্য ২০১৭ সালে পাঠ্যপুস্তকটিতে পরিমার্জন, সংযোজন ও পরিবর্ধন করা হয়েছে।

২০১৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে মাধ্যমিক স্তরে প্রবর্তিত পাঠ্যপুস্তক মাদ্রাসা শিক্ষার বৈশিষ্ট্য উপযোগী করে দাখিল স্তরের পাঠ্যপুস্তকরূপে প্রবর্তন করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন, নমুনা প্রশ্নাদি প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
প্রথম	পূর্ব বাংলার আন্দোলন ও জাতীয়তাবাদের উত্থান (১৯৪৭–১৯৭০)	১–১৩
দ্বিতীয়	স্বাধীন বাংলাদেশ	১৪–৩৮
তৃতীয়	সৌরজগৎ ও ভূমণ্ডল	৩৯–৫৭
চতুর্থ	বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি ও জলবায়ু	৫৮–৭৩
পঞ্চম	বাংলাদেশের নদ–নদী ও প্রাকৃতিক সম্পদ	৭৪–৮৬
ষষ্ঠ	রাষ্ট্র, নাগরিকতা ও আইন	৮৭–৯৯
সপ্তম	বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন অঙ্গ ও প্রশাসন ব্যবস্থা	১০০–১১৬
অষ্টম	বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও নির্বাচন	১১৭–১২৮
নবম	জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ	১২৯–১৩৫
দশম	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)	১৩৬–১৪৩
একাদশ	জাতীয় সম্পদ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা	১৪৪ –১৫৫
দ্বাদশ	অর্থনৈতিক নির্দেশকসমূহ ও বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রকৃতি	১৫৬ –১৮২
ত্রয়োদশ	বাংলাদেশ সরকারের অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থা	১৮৩ –১৯৩
চতুর্দশ	বাংলাদেশের পরিবার কাঠামো ও সামাজিকীকরণ	১৯৪ –২০৮
পঞ্চদশ	বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তন	২০৯ –২১৬
ষোড়শ	বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা ও এর প্রতিকার	২১৭ –২৩৯

প্রথম অধ্যায়

পূর্ব বাংলার আন্দোলন ও জাতীয়তাবাদের উত্থান (১৯৪৭খ্রি.–১৯৭০খ্রি.)

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হয় ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট। জন্ম নেয় ভারত এবং পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র। পাকিস্তানের ছিল দুটি অংশ। পূর্ববাংলা পাকিস্তানের একটি প্রদেশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এ অংশের নাম হয় পূর্ব পাকিস্তান। অপর অংশটি পশ্চিম পাকিস্তান হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। শুরু থেকেই পাকিস্তানের শাসনভার পশ্চিম পাকিস্তানের ধনিকগোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রীভূত ছিল। পূর্ববাংলার ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি ও সমাজ ব্যবস্থা পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী নিজেদের করায়ত্ত করতে শুরু করে এবং বৈষম্য সৃষ্টি করে। এর বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার জনগণ প্রতিবাদ ও আন্দোলন–সংগ্রাম গড়ে তোলে। মাতৃভাষা বাংলাকে রক্ষা করার জন্যে ভাষা আন্দোলন শুরু হয়। এর মাধ্যমে পূর্ব বাংলার বাংলাভাষী বাঙালি জনগোষ্ঠী ঐক্যবদ্ধ হয়। মাতৃভাষা রক্ষার চেতনা থেকে পূর্ব বাংলার জনগণ ক্রমান্বয়ে পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আন্দোলন–সংগ্রাম ও গণঅভ্যুত্থান গড়ে তোলে। ঐতিহাসিক ছয় দফার ভিত্তিতে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে বাঙালি জাতীয়তাবাদের পক্ষে ভোট প্রদানের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার জনগণ অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করে। বাংলা ভাষা, ইতিহাস–ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও বাঙালি জাতিগত পরিচয়ে জাতীয় ঐক্য গঠিত হয়। এই জাতীয় ঐক্যই বাঙালি জাতীয়তাবাদ। এ বাঙালি জাতীয়তাবাদই অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠনে জনগণকে অনুপ্রাণিত করে। এরই ধারাবাহিকতায় নয় মাস রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালে অর্জিত হয় আমাদের প্রাণপ্রিয় স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। এ অধ্যায়ে আমরা পূর্ব বাংলার আন্দোলন ও জাতীয়তাবাদের উত্থান সম্পর্কে জানতে পারব।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

- ভাষা আন্দোলনের পটভূমি ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারব;
- জাতীয়তাবাদের উন্মেষে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব;
- জাতিসংঘ কর্তৃক ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- নিজ ও অপরের মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে পারব;
- আওয়ামী মুসলিম লীগ ও যুক্তফ্রন্ট গঠনের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব;
- ১৯৫৫ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে আওয়ামী লীগে রূপান্তরের কারণ এবং ১৯৫৮-পরবর্তী রাজনৈতিক ঘটনাবলি ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে পারব;
- ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলনের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা করতে পারব;
- বিভিন্ন ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্যের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে পারব;
- ঐতিহাসিক ছয় দফার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব;
- ঐতিহাসিক আগরতলা মামলার ('রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য') ঘটনা বর্ণনা করতে পারব;
- ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের পটভূমি বর্ণনা করতে পারব;
- স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রেরণাদায়ক শক্তি হিসেবে গণ আন্দোলনের ভূমিকা মূল্যায়ন করতে পারব;
- ১৯৭০ সালের নির্বাচনের বর্ণনা করতে পারব এবং পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহে এর প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব;
- দেশের স্বার্থ রক্ষায় সচেতন হব।

পরিচ্ছেদ ১.১ : বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশে ভাষা আন্দোলন

ভাষা আন্দোলনের পটভূমি

পাকিস্তান সৃষ্টির আগেই এই রাষ্ট্রের ভাষা কী হবে তা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। ১৯৩৭ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মুসলিম লীগের দাপ্তরিক ভাষা উর্দু করার প্রস্তাব করলে বাঙালিদের নেতা শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক এর

বিরোধিতা করেন। ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে পাকিস্তান নামক একটি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা যখন প্রায় নিশ্চিত হয়ে যায়, তখনই বিতর্কটি পুনরায় শুরু হয়। ১৯৪৭ সালের ১৭ই মে চৌধুরী খলীকুজ্জামান এবং জুলাই মাসে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জিয়াউদ্দিন আহমদ উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব দেন। তাদের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার ভাষাবিজ্ঞানী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এবং ড. মুহাম্মদ এনামুল হকসহ বেশ ক'জন বুদ্ধিজীবী প্রবন্ধ লিখে প্রতিবাদ জানান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবুল কাশেমের নেতৃত্বে ২রা সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ তমদ্দুন মজলিস নামক একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। ৬–৭ই সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত উক্ত সংগঠনের যুবকর্মী সম্মেলনে 'বাংলাকে শিক্ষা ও আইন আদালতের বাহন' করার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে করাচিতে অনুষ্ঠিত এক শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে পূর্ব বাংলায় তীব্র প্রতিবাদ শুরু হয়। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি ওঠে, লেখালেখি শুরু হয়। ডিসেম্বর মাসেই 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সচিবালয়সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে মিছিল, সভা–সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। পাকিস্তান সরকার ১৪৪ ধারা জারিসহ সভা–সমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ১৯৪৮ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদ সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত গণপরিষদের ভাষা হিসেবে উর্দু ও ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা ব্যবহারের দাবি জানান। তাঁর দাবি অগ্রাহ্য হলে ২৬ ও ২৯শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ধর্মঘট পালিত হয়। ২রা মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' পুনর্গঠিত হয়। এ সংগঠন ১১ই মার্চ 'বাংলা ভাষা দাবি দিবস' পালনের ঘোষণা দেয়। ঐ দিন সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়। ১৯৪৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারি প্রতিষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ এ কর্মসূচি পালনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' স্লোগানসহ মিছিল ও পিকেটিং করা অবস্থায় শেখ মুজিব, শামসুল হক ও অলি আহাদসহ উনসত্তর জনকে গ্রেফতার করা হয়। নব প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাংলা ভাষার জন্য প্রথম রাজবন্দিদের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন তৎকালীন ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান। গ্রেফতার নির্যাতনের প্রতিবাদে ঢাকায় ১২–১৫ই মার্চ ধর্মঘট পালিত হয়। বাধ্য হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন ১৫ই মার্চ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে ৮ দফা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। দফাগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

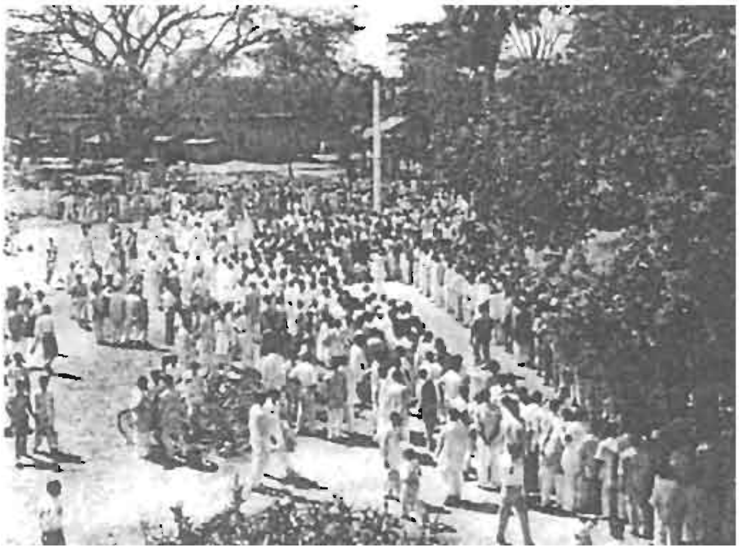
চিত্র ১.১ : ভাষা আন্দোলনের মিছিল

১. বাংলা ভাষার প্রশ্নে গ্রেপ্তারকৃত সকলকে অবিলম্বে মুক্তি দান করা হবে।
২. পুলিশি অত্যাচারের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং তদন্ত করে একটি বিবৃতি প্রদান করবেন।
৩. বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য পূর্ব বাংলার আইন পরিষদে একটি বিশেষ প্রস্তাব উত্থাপন করা হবে।
৪. পূর্ববাংলার সরকারি ভাষা হিসেবে ইংরেজি উঠে যাওয়ার পর বাংলাকে সরকারি ভাষা হিসেবে প্রবর্তন করা হবে। শিক্ষার মাধ্যমও হবে বাংলা।
৫. সংবাদপত্রের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হবে।
৬. আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না।

৭. ২৯শে ফেব্রুয়ারি হতে জারিকৃত ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করা হবে।

৮. রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ‘রাষ্ট্রের দুশমনদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় নাই’–এ মর্মে মুখ্যমন্ত্রী ভুল স্বীকার করে বক্তব্য দেবেন।

১৯৪৮ সালের ১৯শে মার্চ পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকায় আসেন। ২১শে মার্চ রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) অনুষ্ঠিত জনসভায় তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন, ‘উর্দু এবং উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা’। ২৪শে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তনেও তিনি অনুরূপ ঘোষণা দিলে ছাত্র সমাজ প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে এবং ‘না, না’ বলে তাঁর উক্তির প্রতিবাদ জানায়। জিন্নাহর রেসকোর্স ময়দানের ঘোষণারও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ জানিয়েছিল। একপর্যায়ে পাকিস্তান সরকার আরবি হরফে বাংলা প্রচলনের উদ্যোগ নিয়েছিল। বাঙালিরা এ অপপ্রয়াসের তীব্র ক্ষোভ ও প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই পূর্ব বাংলায় ভাষাকেন্দ্রিক যে আন্দোলন শুরু হয়, তা ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রতি আস্থার বহিঃপ্রকাশ। মাতৃভাষা বাংলাকে রক্ষার মাধ্যমে পূর্ব বাংলার জনগণ জাতীয়ভাবে নিজেদের বিকাশের গুরুত্ব উপলব্ধি করে। এ ভূখণ্ডে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলো রাষ্ট্রভাষা উর্দু নয় বরং বাংলাকেই সমর্থন করে।

কাজ

দলীয় : ভাষা আন্দোলনের ধারাবাহিক প্রেক্ষাপটের একটি চার্ট তৈরি কর।

১৯৫২ সালের ২৬শে জানুয়ারি ঢাকার পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভায় পাকিস্তানের নতুন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন জিন্নাহর অনুকরণে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার নতুন ঘোষণা প্রদান করেন। এর প্রতিবাদে ছাত্র সমাজ ৩০শে জানুয়ারি ধর্মঘট পালন করে। আবদুল মতিনকে আহ্বায়ক করে ‘রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ’ নতুনভাবে গঠিত হয়। নতুনভাবে আন্দোলন সংগঠিত হতে থাকে। এর সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোও যুক্ত হয়। ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ছাত্র বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়। ২১শে ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট এবং ঐদিন রাষ্ট্রভাষা দিবস পালন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

আব্দুস সালাম আবুল বরকত আবদুল জব্বার শফিউর রহমান রফিকউদ্দিন আহমেদ

চিত্র : ১.২ ভাষাশহিদ

ভাষার দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার সংকল্প ঘোষণা করা হয়। কারাবন্দি নেতা শেখ মুজিব ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় ২১শে ফেব্রুয়ারির কর্মসূচি পালনে ছাত্র ও আওয়ামী মুসলিম লীগের নেতা–কর্মীদের ডেকে পরামর্শ দেন। ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদানের জন্য শেখ মুজিব ও সহবন্দি মহিউদ্দিন আহমেদকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে ফরিদপুর জেলে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে মহিউদ্দিন আহমেদকে সঙ্গে নিয়ে শেখ মুজিব রাজবন্দিদের মুক্তি ও রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে আমরণ অনশন শুরু করলে আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে। দেশব্যাপী জনমত গড়ে উঠতে থাকে। ২০শে ফেব্রুয়ারি সরকারি এক ঘোষণায় ২১শে ফেব্রুয়ারি থেকে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। সভা সমাবেশ, মিছিল এক মাসের জন্যে নিষিদ্ধ করা হয়। আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ২১শে ফেব্রুয়ারি সকাল ১১টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় (বর্তমান ঢাকা মেডিকেল কলেজের জরুরি বিভাগের পাশে) একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ১০ জন করে মিছিল বের করার সিদ্ধান্ত হয়। ঢাকা মেডিকেল কলেজের দিক থেকে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল এগিয়ে চলে। পুলিশ প্রথমে কয়েকজনকে গ্রেফতার করে, মিছিলে

লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে। একপর্যায়ে পুলিশ গুলি বর্ষণ করলে আবুল বরকত, জব্বার, রফিক, সালামসহ, আরও অনেকে শহিদ হন। অনেকে আহত হন। ঢাকায় ছাত্রহত্যার খবর দ্রুত সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ২২শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় বিশাল শোক র‍্যালি বের হয়। সেখানে পুলিশের হামলায় শফিউর রহমান শহিদ হন।

শহিদদের স্মৃতি অমর করে রাখার জন্য ঢাকায় ২২শে ফেব্রুয়ারি ছাত্র-জনতা মেডিকেল কলেজের সামনে একটি শহিদ মিনার নির্মাণ করে। ২৩শে ফেব্রুয়ারি শফিউরের পিতাকে দিয়ে প্রথম শহিদ মিনার উদ্বোধন করা হয়। ২৪ তারিখ পুলিশ উক্ত শহিদ মিনার ভেঙ্গে ফেলে। ঢাকায় ২১শে ফেব্রুয়ারি ছাত্রহত্যার প্রতিবাদে চট্টগ্রামে কবি মাহবুব–উল–আলম চৌধুরী 'কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি' শীর্ষক প্রথম কবিতা রচনা করেন। তরুণ কবি আলাউদ্দিন আল আজাদ 'স্মৃতির মিনার' কবিতাটি রচনা করেন। ঢাকার বাইরে চট্টগ্রাম, রাজশাহী, রংপুর, খুলনা, বরিশাল, কুমিল্লাসহ বিভিন্ন শহরে ছাত্র, যুবকসহ সাধারণ মানুষ ভাষার দাবিতে আন্দোলনের প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করে। পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতি ঘৃণা পোষণ শুরু করে। এসব হত্যাকান্ড পূর্ব বাংলার জনগণের মনের ওপর বড় ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী রচনা করেন 'আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি'। সঙ্গীতশিল্পী আবদুল লতিফ রচনা ও সুর করেন 'ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়', এবং 'তোরা ঢাকা শহর রক্তে ভাসাইলি'র মতো সঙ্গীত। ড. মুনীর চৌধুরী জেলে বসে রচনা করেন 'কবর' নাটক। জহির রায়হান রচনা করেন 'আরেক ফাল্গুন' উপন্যাসটি। ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলায় শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চায় পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। বাঙালি জাতীয়তবাদের ধারা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে।

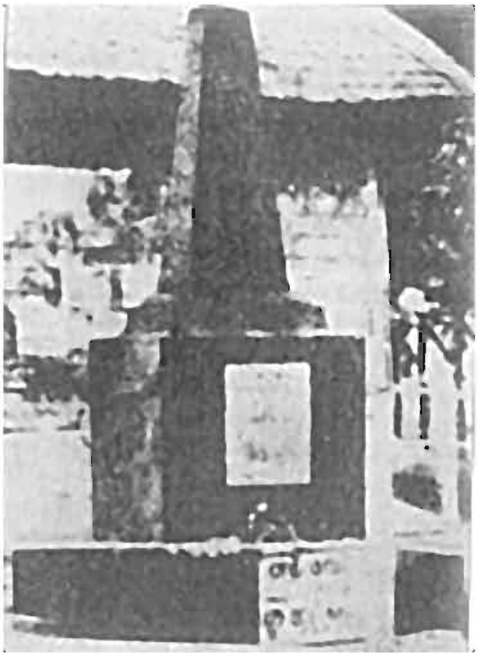
চিত্র ১.৩ বাংলাদেশের প্রথম শহিদ মিনার

১৯৪৭ সালে সূচিত রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ সালে প্রতিবাদ ও রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে রূপ লাভ করে। ফলে পাকিস্তান সরকার বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের সংবিধানে বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। নিজের ইতিহাস, ঐতিহ্য, ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে পূর্ব বাংলার বাঙালি এবং অন্যান্য জনগোষ্ঠী মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর সাহস ও আত্মপ্রত্যয় খুঁজে পায়। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পর পঞ্চাশের দশকব্যাপী ছিল বাঙালিদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতিকাল। ভাষা আন্দোলন পরবর্তীকালে সকল রাজনৈতিক আন্দোলনের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। এ আন্দোলন এ দেশের মানুষকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। বাঙালিদের মধ্যে ঐক্য ও স্বাধীনতার চেতনা জাগিয়ে তোলে। পাকিস্তানি শাসনপর্বে এটি বাঙালিদের জাতীয় মুক্তির প্রথম আন্দোলন।

জাতীয়তাবাদের উন্মেষ

বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশে ভাষা আন্দোলন সকলকে ঐক্যবদ্ধ করে। পাকিস্তানের প্রতি আগে যে মোহ ছিল তা দ্রুত কেটে যেতে থাকে। নিজস্ব জাতিসত্তা সৃষ্টিতে ভাষা ও সংস্কৃতির সম্পর্ক এবং গুরুত্ব পূর্ব বাংলার মানুষের কাছে অধিকতর স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাঙালি হিসেবে নিজেদের আত্মপরিচয়ে রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি গড়ে তোলার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে থাকে। ভাষাকেন্দ্রিক এই ঐক্যই জাতীয়তাবাদের মূল ভিত্তি রচনা করে, যা পরবর্তী সময়ে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

২০১৫

শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

১৯৫৩ সাল থেকে ২১শে ফেব্রুয়ারি 'শহিদ দিবস' হিসেবে দেশব্যাপী পালিত হয়ে আসছে। প্রতি বছর ২১শে ফেব্রুয়ারি খালি পায়ে হেঁটে শহিদ মিনারে ফুল অর্পণ করে আমরা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। বাঙালি জাতির কাছে দিনটি গভীর শোকের চেতনায় উজ্জীবিত হওয়ার দিন। কানাডা প্রবাসী কয়েকজন বাঙালির উদ্যোগ ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকারের কূটনৈতিক তৎপরতার ফলে ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ইউনেস্কো বাংলাদেশের ২১ শে ফেব্রুয়ারির শহিদ দিবসকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। পৃথিবীতে ৬০০০ এর বেশি ভাষা রয়েছে। এসব ভাষার মানুষ সেই থেকে বাংলাদেশের শহিদ দিবসের গুরুত্ব উপলব্ধি করে নিজেদের ভাষার মর্ম নতুনভাবে বুঝতে শিখেছে। আমাদের দেশে বাংলাভাষীদের পাশাপাশি বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির নৃগোষ্ঠী রয়েছে। আমরা ঐসব নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ এবং উন্নয়নে সচেষ্ট হব।

পরিচ্ছেদ ১.২ : বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশে রাজনৈতিক আন্দোলনের ভূমিকা

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব বাংলার জনগণ পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাজনৈতিক চরিত্র এবং একই সঙ্গে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভুলগুলো বুঝতে পারে। পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৬ শতাংশ বাঙালি হওয়ার পরও রাষ্ট্র পরিচালনা, প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার ভোগসহ সর্বক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী কর্তৃত্ব শুরু করে। বাঙালি তথা পূর্ব বাংলার সাধারণ মানুষ সকল ক্ষেত্রে বঞ্চিত হতে থাকে। তখন রাজনৈতিক দল ও নেতৃত্বের মধ্যে তিনটি ধারা লক্ষ করা যায়। এগুলো হচ্ছে: ১. পাকিস্তানের প্রতি অনুগত ইসলামি নামধারী রাজনৈতিক দল, যেমন– মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামি ও নেজামে ইসলাম ; ২. পূর্ব বাংলার স্বার্থ রক্ষার জন্যে সোচ্চার রাজনৈতিক দল, যেমন– আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফ্ফর) এবং ৩. সাম্যবাদী আদর্শের বাম রাজনৈতিক ধারা।

আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কয়েক মাসের ব্যবধানে পাকিস্তান রাষ্ট্রে মুসলিম লীগের দ্বিজাতিতত্ত্বের ধ্যান–ধারণা থেকে বের হয়ে অসাম্প্রদায়িক প্রগতিশীল বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনায় উজ্জীবিত আওয়ামী মুসলিম লীগ জন্মলাভ করে। ১৯৪৯ সালের ২৩শে জুন ঢাকার রোজ গার্ডেনে এক সম্মেলনের মাধ্যমে 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ' গঠন করা হয়। এ সংগঠনের প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, সাধারণ সম্পাদক টাঙ্গাইলের শামসুল হক এবং যুগ্ম সম্পাদক হন শেখ মুজিবুর রহমান। শুরুতেই দলটি বাঙালিদের স্বার্থে একটি বিস্তৃত কর্মসূচি গ্রহণ করে। এর মধ্যে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, জনগণের সার্বভৌমত্ব, বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দান, পাট ও চা শিল্প জাতীয়করণ, বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি ব্যবস্থা উচ্ছেদ, কৃষকদের মধ্যে ভূমি বণ্টন, সমবায় ভিত্তিক চাষাবাদ ইত্যাদির দাবি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসব দাবি উত্থাপনের কারণে দলটি দ্রুত পূর্ব বাংলার জনগণের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠে। বিশেষ করে শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানি শাসকের রোষানলে পড়েন। তাই ১৯৪৯ সালে তাঁকে কারাগারে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু কারাগারে বসেই ভাষার দাবিসহ রাজনৈতিক আন্দোলন সংগ্রামের নেতৃত্ব দিতে থাকেন। ফলে ১৯৫২ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তাঁকে বন্দিজীবন কাটাতে হয়। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট গঠনের মূল উদ্যোগ ছিল আওয়ামী লীগের। ১৯৫৫ সালে অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক আদর্শের অধিকতর প্রতিফলন ঘটানোর জন্য 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ'এর নাম 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ' করা হয়। ফলে ধর্ম পরিচয় নির্বিশেষে সকল বাঙালি ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহ জাতীয়তাবাদের ধারায় অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। এ সময়ে দলটি পূর্ব বাংলার জনগণের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিকসহ সকল স্বার্থরক্ষায় একদিকে আন্দোলন–সংগ্রাম অব্যাহত রাখে, অন্যদিকে সংসদ ও প্রাদেশিক সরকারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সোচ্চার হতে থাকে।

যুক্তফ্রন্ট গঠন, প্রাদেশিক নির্বাচন ও সরকার গঠন

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর শাসক দল মুসলিম লীগ দীর্ঘদিন নির্বাচনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার গঠনের কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। এছাড়া প্রাদেশিক সরকার নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের টালবাহানা পূর্ব বাংলার জনগণের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয় ঘটানোর লক্ষ্যে ১৯৫৩ সালের ১৪ই নভেম্বর আওয়ামী লীগ যুক্তফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। চারটি দল নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। দল চারটি হলো : আওয়ামী লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, নেজামে ইসলাম এবং গণতন্ত্রী দল। ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে জনগণ যুক্তফ্রন্টের ২১ দফাকে তাদের স্বার্থরক্ষার সনদ বলে বিবেচনা করে। পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদের ২৩৭টি মুসলিম আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট ২২৩টি আর মুসলিম লীগ মাত্র ৯টি আসন লাভ করে। বাকি আসন অন্যরা পায়। নির্বাচনে পূর্ববাংলার জনগণ পাকিস্তানের রাষ্ট্র ক্ষমতায় পশ্চিম পাকিস্তানিদের কর্তৃত্ব ও প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার রায় প্রদান করে। পূর্ব বাংলায় বাঙালিদের শাসন দেখতে জনগণ যে আগ্রহী, তা স্পষ্ট হয়। যুক্তফ্রন্ট প্রাদেশিক সরকার গঠনের রায় লাভ করে। জনগণই যে 'সকল ক্ষমতার উৎস'–এই নির্বাচন তা প্রমাণ করে। জনগণ এ নির্বাচনে মুসলিম লীগকে প্রত্যাখ্যান করে এবং পূর্ব বাংলায় এর শাসনের অবসান ঘটায়।

১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা

১. বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হবে।
২. বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ, সকল প্রকার মধ্যস্বত্ব ও সার্টিফিকেট প্রথা বাতিল করা হবে।
৩. পাট ব্যবসাকে জাতীয়করণ, পাটের ন্যায্যমূল্য প্রদান এবং পাট কেলেঙ্কারির সাথে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে।
৪. সমবায় কৃষি ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং কুটির ও হস্তশিল্পের উন্নতি সাধন করা হবে।
৫. পূর্ব বাংলার লবণ শিল্পের সম্প্রসারণ ও লবণ কেলেঙ্কারির সাথে জড়িত ব্যক্তিদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে।
৬. শিল্প ও কারিগরি শ্রেণির বাস্তুহারাদের পুনর্বাসন করা হবে।
৭. খাল খনন, সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন, বন্যানিয়ন্ত্রণ, কৃষিকে যুগোপযোগী করে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা হবে।
৮. পূর্ব বাংলাকে শিল্পায়িত ও শ্রমিকের ন্যায় সঙ্গত অধিকার রক্ষা করা হবে।
৯. অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা হবে। শিক্ষকদের ন্যায় সঙ্গত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা হবে।
১০. শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল সংস্কার করে কেবল মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হবে।
১১. ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রদান, সকল প্রকার কালাকানুন বাতিল ও উচ্চশিক্ষাকে সহজলভ্য করা হবে।
১২. প্রশাসনিক ব্যয় সংকোচন, উচ্চ ও নিম্নবেতনভুক্ত কর্মচারীদের মধ্যে বেতন বৈষম্য হ্রাস করা হবে।
১৩. সকল প্রকার দুর্নীতি নির্মূল করা হবে।
১৪. রাজবন্দিদের মুক্তিদান, বাকস্বাধীনতা, সভা-সমিতি ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হবে।
১৫. শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক করা হবে।
১৬. 'বর্ধমান হাউস'কে আপাতত ছাত্রাবাস ও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণাগার করা হবে।
১৭. বাংলা ভাষার শহিদদের স্মরণে শহিদ মিনার নির্মাণ করা হবে।
১৮. একুশে ফেব্রুয়ারিকে শহিদ দিবস ও সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করা হবে।
১৯. ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী পূর্ব বাংলার পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হবে।
২০. নিয়মিত ও অবাধ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হবে।
২১. পরপর তিনটি উপনির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট পরাজিত হলে মন্ত্রিসভা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করবে।

যুক্তফ্রন্ট সরকার

১৯৫৪ সালের ৩রা এপ্রিল যুক্তফ্রন্টভুক্ত কৃষক শ্রমিক পার্টির নেতা এ.কে. ফজলুল হক মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। যুক্তফ্রন্ট সরকার মাত্র ৫৬ দিন ক্ষমতায় ছিল। পাকিস্তান সরকার পূর্ব বাংলার যুক্তফ্রন্ট সরকারকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারেনি। তারা ষড়যন্ত্রের পথ বেছে নেয়। আদমজী পাটকল ও কর্ণফুলি কাগজের কলে বাঙালি–অবাঙালি দাঙ্গাকে অজুহাত হিসেবে দাঁড় করিয়ে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ ১৯৫৪ সালের ৩০ মে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বরখাস্ত করে। উল্লেখ্য, পাকিস্তান সরকারের ইন্ধনে ঐ দাঙ্গা হয়েছিল। শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হককে গৃহবন্দি করা হয়। শেখ মুজিবসহ তিন হাজার নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। এর মাধ্যমে পূর্ব বাংলার প্রতি পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর চরম বৈরী মনোভাব প্রকাশ পায়। পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানের অরাজক শাসন পর্ব শুরু হয়। কেন্দ্র এবং প্রদেশে ঘন ঘন সরকার পরিবর্তন হতে থাকে। দেশ সামরিক শাসনের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়।

কাজ

দলীয় : যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার ব্যর্থতার জন্য দায়ী ছিল শাসকগোষ্ঠীর সৃষ্ট অরাজকতা- আলোচনার মাধ্যমে পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন কর।

পরিচ্ছেদ ১.৩ : সামরিক শাসন ও পরবর্তী রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ

পশ্চিম পাকিস্তানভিত্তিক সামরিক–বেসামরিক শাসকগোষ্ঠীর অশুভ তৎপরতার ফলে সংসদ ও সরকার কার্যকর ভূমিকায় থাকেনি। ষড়যন্ত্রকারী গোষ্ঠী ক্ষমতা দখলের সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদে পরস্পরবিরোধী এমএলএদের মধ্যে মারামারির মতো এক অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটে। এতে ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলী গুরুতর আহত হয়ে পরে হাসপাতালে মারা যান। এরই সুযোগ নিয়ে ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা সামরিক আইন জারি করেন। তিনি দায়িত্ব নিয়ে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : ১. ১৯৫৬ সালের সংবিধান বাতিল, ২. কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ ভেঙ্গে দেওয়া, ৩. রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা, ৪. শেখ মুজিবসহ বেশ ক'জন রাজনৈতিক নেতাকে জেলে প্রেরণ ও ৫. সকল মৌলিক অধিকার কেড়ে নেওয়া।

আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখল

১৯৫৮ সালের ২৭শে অক্টোবর জেনারেল আইয়ুব খান ইস্কান্দার মীর্জাকে উৎখাত ও দেশত্যাগে বাধ্য করে ক্ষমতা দখল করেন। তিনি নিজেকে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত করে যেসব পদক্ষেপ নেন তা হলো: ১. নিজেকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ঘোষণা, ২. পূর্ব ঘোষিত ১৯৫৯ সালে অনুষ্ঠিতব্য সাধারণ নির্বাচন স্থগিত করা, ৩. দুর্নীতি ও চোরাচালান দূর করার অঙ্গীকার ব্যক্ত ও ৪. রাজনৈতিক দলের ওপর নিষেধাজ্ঞা বহাল রাখা।

সামরিক শাসনকে দীর্ঘস্থায়ী করার লক্ষ্যে আইয়ুব খান মৌলিক গণতন্ত্র নামে একটি ব্যবস্থা চালু করেন। এ ব্যবস্থায় পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে মোট ৮০ হাজার নির্বাচিত ইউনিয়ন কাউন্সিল সদস্য নিয়ে নির্বাচকমণ্ডলী গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তাদের ভোটেই রাষ্ট্রপতি, জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হওয়ার বিধান রাখা হয়। এটি ছিল পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি। ১৯৬৫ সালে ৮০ হাজার কাউন্সিল সদস্যের ভোটে তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। সামরিক শাসনের ফলে সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয় পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের হাতে। পূর্ব পাকিস্তানের সকল ক্ষেত্রে বৈষম্য চরম আকার ধারণ করতে থাকে।

পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈষম্যসমূহ

পাকিস্তান সৃষ্টির আগে পূর্ববাংলা অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে অগ্রসর ছিল। কিন্তু ১৯৪৭ সালে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসনশোষণ প্রতিষ্ঠার ফলে পূর্ব পাকিস্তান দ্রুত পিছিয়ে যেতে থাকে। বৃদ্ধি পেতে থাকে দুই অঞ্চলের মধ্যকার বৈষম্য।

কাজ
দলীয় : পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্যের ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত কর।

অর্থনৈতিক বৈষম্য : পাকিস্তান সরকারের বৈষম্যমূলক নীতির কারণে পূর্ব বাংলার চেয়ে পশ্চিম পাকিস্তান অনেক বেশি অর্থনৈতিক সুবিধা লাভ করেছিল। ১৯৫৫–১৯৫৬ থেকে ১৯৫৯–১৯৬০ অর্থবছর পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান লাভ করেছিল মোট বাজেট বরাদ্দের মাত্র ১১৩ কোটি ৩ লাখ ৮০ হাজার টাকা, অপরদিকে পশ্চিম পাকিস্তান পেয়েছিল ৫০০ কোটি টাকা। একইভাবে ১৯৬০–৬১ থেকে ১৯৬৪–১৯৬৫ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ ছিল ৬৪৮ কোটি টাকা আর পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষেত্রে তা ছিল ২২,২৩০ কোটি টাকা। পূর্ব বাংলার পাট, চা, চামড়া প্রভৃতি বিদেশে রপ্তানি করে যে বৈদেশি মুদ্রা অর্জিত হতো, তার সিংহভাগ পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নে ব্যয় হতো। ফলে ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিল্প উৎপাদন, কৃষিসহ অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের চাইতে কয়েকগুণ পিছিয়ে পড়ে।

প্রশাসনিক বৈষম্য : পাকিস্তানের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় পূর্ব পাকিস্তানের ভূমিকা ছিল অতি নগণ্য। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বৈষম্য ছিল ব্যাপক। ১৯৬৬ সালে পাকিস্তান প্রশাসনের চিত্র ছিল নিম্নরূপ :

নং	খাত	বাঙালি	পশ্চিম পাকিস্তানি
১.	প্রেসিডেন্টের সচিবালয়	১৯%	৮১%
২.	দেশরক্ষা	৮.১%	৯১.৯%
৩.	শিল্প	২৫.৭%	৭৪.৩%
৪.	স্বরাষ্ট্র	২২.৭%	৭৭.৩%
৫.	তথ্য	২০.১%	৭৯.৯%
৬.	শিক্ষা	২৭.৩%	৭২.৭%
৭.	স্বাস্থ্য	১৯%	৮১%
৮.	আইন	৩৫%	৬৫%
৯.	কৃষি	২১%	৭৯%

১৯৬৬ সালে পাকিস্তান প্রশাসনের চিত্র

প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্য : পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনীতে বাঙালিদের নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে চরম বৈষম্য বিরাজ করেছিল। মোট অফিসারের মাত্র ৫%, সাধারণ সৈনিকদের মাত্র ৪%, নৌবাহিনীর উচ্চপদে ১৯%, নিম্নপদে ৯%, বিমানবাহিনীর পাইলটদের ১১% এবং টেকনিশিয়ানদের ১.৭% ছিল বাঙালি।

শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্য : পাকিস্তান সৃষ্টির আগে পূর্ব বাংলা পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় এগিয়ে ছিল। পাকিস্তান সৃষ্টির পর শিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দে পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানের দ্বিগুণেরও বেশি বরাদ্দ লাভ করতে থাকে। ফলে পশ্চিম পাকিস্তানে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার জন্য নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে।

সামাজিক বৈষম্য : পাকিস্তানের বৈষম্যমূলক নীতির কারণে পূর্ব পাকিস্তানে মধ্যবিত্তের বিকাশ মন্থর হয়ে পড়ে। বাঙালিরা অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হতে থাকে। উভয় অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য বৃদ্ধি পায়। মানুষ প্রতিবাদ করে। আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে।

সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন : আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ১৯৬১ সাল থেকেই পূর্ব পাকিস্তানে আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৬২ সালের জানুয়ারি মাসে বাঙালিদের প্রিয় নেতা ও পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতার করা হলে আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে। এরপর একই বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হলে রাজবন্দিদের মুক্তির দাবিতে আন্দোলন আরও বেগবান হয়। ১৯৬২ সালে আইয়ুবের প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে ছাত্র সমাজ প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। ছাত্র সমাজ ১৫ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে। শিক্ষানীতি বিষয়ক ছাত্রদের আন্দোলনে বিভিন্ন পেশাজীবীও অংশগ্রহণ করেন। এই সঙ্গে সাংবিধানিক শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট (এনডিএফ) গঠিত হয়। এই সংগঠন আইয়ুব খানের সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলে। ১৯৬৫ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন উপলক্ষে রাজনৈতিক দলগুলো সামরিক শাসনবিরোধী বক্তব্য নিয়ে জনগণের কাছে যাওয়ার সুযোগ পায়।

ভারত–পাকিস্তান যুদ্ধ

১৯৬৫ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধ ১৭ দিন ধরে অব্যাহত ছিল। তখন পূর্ব পাকিস্তান সম্পূর্ণরূপে অরক্ষিত ছিল। বিষয়টি পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের কাছে অত্যন্ত বেদনাদায়ক এবং বৈষম্যমূলক মনে হয়েছিল। এ সময় 'ইসলাম বিপন্ন', রবীন্দ্রসঙ্গীতকে 'হিন্দু সংস্কৃতি' ও নজরুল ইসলামের গানে 'হিন্দুয়ানি'র অভিযোগ তুলে এসবের চর্চা বন্ধ করার চেষ্টা করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ নিজেদের সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং রাজনৈতিক অধিকার রক্ষার জন্য স্বায়ত্তশাসনের গুরুত্ব নতুনভাবে উপলব্ধি করে। অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদী রাজনীতির প্রতি মানুষ অধিকমাত্রায় আকৃষ্ট হতে থাকে।

৬ দফা : পূর্ব বাংলার মুক্তিসনদ

ঐতিহাসিক ৬ দফার প্রবক্তা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। পূর্ব বাংলার জনগণের প্রতি পাকিস্তান রাষ্ট্রের চরম বৈষম্যমূলক আচরণ ও অবহেলার বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগ্রাম গভীর ও সুস্পষ্ট রূপ লাভ করে ৬ দফার স্বায়ত্তশাসনের দাবিনামায়। ১৯৬৬ সালের ৫–৬ই ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী দলসমূহের এক সম্মেলনে যোগদান করেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান। সেখানে তিনি সাংবাদ সম্মেলন করে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের অধিকার রক্ষার জন্যে ৬ দফা দাবি তুলে ধরেন। দফাগুলো হলো :

১. পাকিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাধীনে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার হবে। সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে নির্বাচন অনুষ্ঠান।

২. কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে মাত্র দুটি বিষয় থাকবে, প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। অন্যান্য সকল বিষয়ে অঙ্গরাজ্যগুলোর পূর্ণ ক্ষমতা থাকবে।

৩. সারাদেশে হয় অবাধে বিনিয়োগযোগ্য দু'ধরনের মুদ্রা, না হয় বিশেষ শর্ত সাপেক্ষে একই ধরনের মুদ্রা প্রচলন করা।

৪. সকল প্রকার কর ধার্য করার ক্ষমতা থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। আঞ্চলিক সরকারের আদায়কৃত রাজস্বের একটা নির্দিষ্ট অংশ কেন্দ্রীয় সরকারকে দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে।

৫. অঙ্গরাজ্যগুলো নিজেদের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার মালিক হবে, এর নির্ধারিত অংশ তারা কেন্দ্রকে দেবে।

৬. অঙ্গরাজ্যগুলোকে আঞ্চলিক নিরাপত্তার জন্য আধা সামরিক বাহিনী গঠন করার ক্ষমতা দেওয়া।

চিত্র ১.৪: ৬ দফাভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের প্রবক্তা শেখ মুজিবের আহ্বান

গুরুত্ব : ৬ দফা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিকসহ সকল অধিকারের কথা তুলে ধরে। আইয়ুব সরকার একে 'বিচ্ছিন্নতাবাদী কর্মসূচি' হিসেবে আখ্যায়িত করে। এ কর্মসূচি বাঙালির জাতীয় চেতনামূলে বিস্ফোরণ ঘটায়। এতে প্রত্যক্ষভাবে স্বাধীনতার কথা বলা না হলেও এ ৬ দফা কর্মসূচি বাঙালিদের স্বাধীনতার মন্ত্রে গভীরভাবে উজ্জীবিত করে। এটি ছিল বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ। ৬ দফা কর্মসূচি ঘোষণার জন্য পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বিচ্ছিন্নতাবাদী এবং পাকিস্তানের এক নম্বর শত্রু বলে চিহ্নিত করে। পাকিস্তান সরকার ৬ দফা গ্রহণ না করে দমন-পীড়ন শুরু করলে আন্দোলন অনিবার্য হয়ে ওঠে।

ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা ('রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য')

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনীতির চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা। তাঁর বিশ্বাস ছিল শেষ পর্যন্ত সশস্ত্র সংগ্রাম ব্যতীত বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব হবে না। তাই তিনি সে সময়ে গোপনে গঠিত বিপ্লবী পরিষদের সদস্যদের তাঁদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সম্মতি দিয়েছিলেন। বিপ্লবী পরিষদের পরিকল্পনা ছিল একটি নির্দিষ্ট রাতে এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ে বাঙালিরা বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সবগুলো ক্যান্টনমেন্টে কমান্ডো স্টাইলে হামলা চালিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানিদের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে তাদের বন্দি করবে এবং শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করবে। পরিকল্পনাটির ব্যাপারে একবার শেখ মুজিব ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় গিয়েছিলেন। পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত হওয়ার পূর্বেই তা ফাঁস হয়ে যায়। এরপর পাকিস্তান সরকার ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা ('রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য') দায়ের করে। শাসকগোষ্ঠী এটিকে ষড়যন্ত্র মামলা হিসেবে আখ্যায়িত করে। এ মামলায় রাজনীতিবিদ, বেসামরিক সরকারি কর্মকর্তা, সামরিক ও প্রাক্তন সামরিক কর্মকর্তা এবং অন্যান্য বেসামরিক ব্যক্তিবর্গসহ মোট ৩৫ জনকে আসামি করা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে করা হয় এক নম্বর আসামি। তাঁদের বিরুদ্ধে পাকিস্তান দণ্ডবিধির ১২১ ও ১৩১ ধারায় তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানকে সশস্ত্র পন্থায় স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করার অভিযোগ আনা হয়। বিচারের উদ্দেশ্যে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে প্রতিষ্ঠিত বিশেষ ট্রাইব্যুনালে ১৯৬৮ সালের ১৯শে জুন এ মামলার শুনানি শুরু হয়।

মামলা শুরু হওয়ার পর তা প্রত্যাহারের জন্য আন্দোলন শুরু হয়। ছাত্র সমাজের ১১ দফার ভিত্তিতে কৃষক–শ্রমিক–ছাত্র–জনতার ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গণআন্দোলনে রূপ লাভ করে। ৬ দফা ও ১১ দফা আন্দোলনের ফলে যে গণজাগরণ সৃষ্টি হয়, তারই ধরাবাহিকতায় 'ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা' বাঙালিদের স্বাধীনতার দিকে ধাবিত করতে অনুপ্রেরণা জোগায়।

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান

পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে ১৯৬৯ সালে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন সংঘটিত হয়। ইতিহাসে এটি উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান নামে পরিচিত। এটি বিপ্লবাত্মক রূপ পরিগ্রহ করে। সকল গণতান্ত্রিক দল, পেশাজীবী সংগঠন ও মানুষ যার যার অবস্থান থেকে এই আন্দোলনে যুক্ত হয়। আন্দোলনে যুক্ত হতে গিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আসাদুজ্জামান আসাদ ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. শামসুজ্জোহা শহিদ হন। প্রদেশব্যাপী ছাত্র, শিক্ষক, কৃষক, শ্রমিকসহ সকল শ্রেণি–পেশার মানুষ তখন রাস্তায় নেমে আসে। অবশেষে ১৯৬৯ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খান শেখ মুজিবুর রহমানকে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। অন্য নেতৃবৃন্দকেও মুক্তি দেওয়া হয়। আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। ২৩শে ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে শেখ মুজিবকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সেখানে তাঁকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তদানীন্তন ডাকসুর ভিপি ছাত্রনেতা জনাব তোফায়েল আহমেদ এ প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

চিত্র ১.৫ : শহিদ আসাদ

গণঅভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক প্রভাব : ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের ফলে পাকিস্তানের সামরিক শাসক আইয়ুব খান

চিত্র ১.৬ : উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানকালে বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের মিছিলের একটি দৃশ্য

পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। এর পূর্বে তিনি 'ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা' তুলে নেন। জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নতুন সামরিক সরকার বাধ্য হয় ১৯৭০ সালে পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন দিতে। গণঅভ্যুত্থানের ফলে পূর্ব বাংলার জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক চিন্তা–ভাবনার বিকাশ ঘটে। বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রয়োজনীয়তা তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১৯৭০ এর নির্বাচন এবং ১৯৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধে ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের ব্যাপক প্রভাব ছিল। মূলত বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভাবাদর্শে এসব অর্জন সম্ভব হয়।

১৯৭০ সালের নির্বাচন ও পরবর্তী ঘটনা

১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চ আইয়ুব খান প্রেসিডেন্ট পদ থেকে ইস্তফা দেন। ইয়াহিয়া খান উক্ত পদে আসীন হন। তিনি ২৮শে মার্চ এক ঘোষণায় পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। তবে পাকিস্তানে ইতোপূর্বে কোনো সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়ায় এই নির্বাচন নিয়েও নানা আশংকা ছিল। নির্বাচন বিষয়ে কোনো নিয়ম–কানুনও ছিল না। অবশেষে ১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর সর্বপ্রথম 'এক ব্যক্তির এক ভোটের ভিত্তিতে' সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ, ন্যাপ (ওয়ালী), মুসলিম লীগ (কাইয়ুম), মুসলিম লীগ (কনভেনশন), পাকিস্তান পিপলস্ পার্টি, ডেমোক্রেটিক পার্টি, জামায়াতে ইসলামী প্রভৃতি দল অংশগ্রহণ করে। আওয়ামী লীগ নির্বাচনকে ৬ দফার পক্ষে গণভোট হিসেবে অভিহিত করে। নির্বাচনে ৫ কোটি ৬৪ লাখ ভোটারের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে ছিল ৩ কোটি ২২ লাখ। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদের ১৬২টি আসনের মধ্যে ১৬০টি আসন লাভ করে। সংরক্ষিত মহিলা আসন ৭টিসহ আওয়ামী লীগ মোট ১৬৭টি আসন লাভ করে জাতীয় পরিষদে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। আবার পূর্ব পাকিস্তানে প্রাদেশিক পরিষদের সংরক্ষিত ১০টি মহিলা আসনসহ মোট ৩১০টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ২৯৮টি আসন পেয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের এ বিজয় ছিল নজিরবিহীন। আওয়ামী লীগ এককভাবে সরকার গঠন ও ৬ দফার পক্ষে গণরায় লাভ করে।

নির্বাচনের গুরুত্ব : ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত জাতীয় এবং প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। ফলে ৬ দফা ও ১১ দফার প্রতি জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থনের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়। বাঙালি জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক বিজয় ঘটে। অন্যদিকে, পাকিস্তানের সরকার ও স্বার্থান্বেষী মহলের জন্য এটি ছিল বিরাট পরাজয়। তারা বাঙালির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিরোধিতা ও ষড়যন্ত্র করতে থাকে। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ পশ্চিম পাকিস্তানের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে অবস্থান গ্রহণ করে। ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের পিছনে নির্বাচনের অপরিসীম গুরুত্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই নির্বাচন বাঙালি জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক অগ্রযাত্রাকে মুক্তিযুদ্ধের চরিত্র দানে বিশাল ভূমিকা রাখে। পরিণতিতে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে।

কাজ

একক : বাঙালি জাতীয়তাবাদের উত্থানে রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের একটি তালিকা তৈরি কর।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. কীভাবে পূর্ববাংলা পাকিস্তানের একটি প্রদেশে পরিণত হয়?

২. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস কী?

৩. ঐতিহাসিক ৬ দফাকে পূর্ব বাংলার 'মুক্তির সনদ' বলার কারণসমূহ চিহ্নিত কর।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন :

১. কোন প্রেক্ষাপটে ছয় দফার মধ্যে আধা সামরিক বাহিনী গঠনের দাবি তোলা হয়?

২. 'পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক বৈষম্যই পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে ছয় দফা দাবির আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে বাধ্য করেছিল।'– তোমার বক্তব্যের সমর্থনে যুক্তি দাও।

৩. '১৯৭০ এর নির্বাচনের ফলাফলের প্রভাবই মুক্তিযুদ্ধের অনিবার্য কারণ।'– বিশ্লেষণ কর।

৪. ঐতিহাসিক আগরতলা মামলাকে তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক ষড়যন্ত্র মামলা বলার কারণ ব্যাখ্যা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. ভাষা আন্দোলন পূর্ববাংলায় কোন ভাবাদর্শ ছড়িয়ে দেয়?

ক. বাঙালি জাতীয়তাবাদ
খ. অসাম্প্রদায়িক মনোভাব
গ. দ্বিজাতিতত্ত্ব
ঘ. স্বজাত্যবোধ

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ২ ও ৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

রিফাত প্রতি বছর ২১শে ফেব্রুয়ারি ঘরে বসে টিভির পর্দায় কার্টুন ছবি দেখে। কিন্তু সে এ বছর ২১শে ফেব্রুয়ারি প্রভাতফেরিতে অংশ নিতে স্কুলে আসে এবং প্রতিজ্ঞা করে যে, সে প্রতিবছর শহিদ মিনারে ফুল দেবে এবং ইংরেজি অক্ষরে আর বাংলা লিখবে না।

২. প্রতিবছর শহিদ মিনারে ফুলদানের প্রতিজ্ঞা, রিফাতের আচরণে প্রকাশ পেয়েছে–

i. ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা
ii. বাহবা পাওয়ার প্রত্যাশা
iii. শহিদদের স্মৃতি হৃদয়ে লালন করা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

৩. রিফাতের মানসিক পরিবর্তনের পিছনে যে মূল্যবোধ প্রতিফলিত হয়েছে, তা হলো–

ক. বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রতি শ্রদ্ধা
খ. অনুকরণ করার মানসিকতা
গ. নিজ ভাষার প্রতি মমত্ববোধ
ঘ. ইংরেজি ভাষা লেখার প্রতি অনীহা

সৃজনশীল প্রশ্ন :

১.

সারণি–ক

তুলনার বিষয়	পশ্চিম পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তান
সেনা কর্মকর্তা	৯৫%	৫%
সাধারণ সৈনিক	৯৬%	৪%
নৌবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা	৮১%	১৯%
নৌবাহিনীর অন্যান্য পদ	৯১%	৯%

সারণি–খ

সাল	পশ্চিম পাকিস্তান পায়	পূর্ব পাকিস্তান পায়
১৯৫৫–১৯৬০ সাল পর্যন্ত	৫০০ কোটি টাকা	১১৩ কোটি টাকা
১৯৬০–১৯৬৫ সাল পর্যন্ত	২২,২৩০ মিলিয়ন টাকা	৬৪৮০ মিলিয়ন টাকা

ক. পাকিস্তানি শাসন আমলে বাঙালিদের জাতীয় মুক্তির প্রথম আন্দোলনের নাম কী ছিল?

খ. 'ছয় দফা' কে কেন বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ বলা হয়?

গ. সারণি–ক থেকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর যে বৈষম্য ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সারণি–খ এ প্রদর্শিত বৈষম্যের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রকৃত অবস্থা মূল্যায়ন কর।

২.

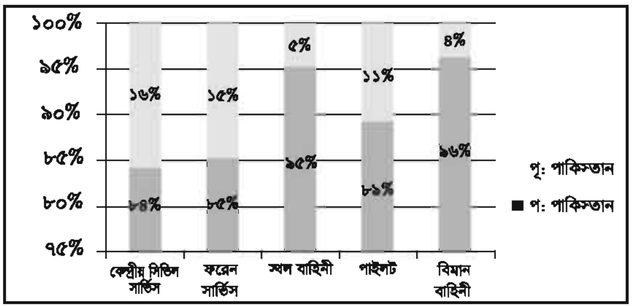

সারণি : ক

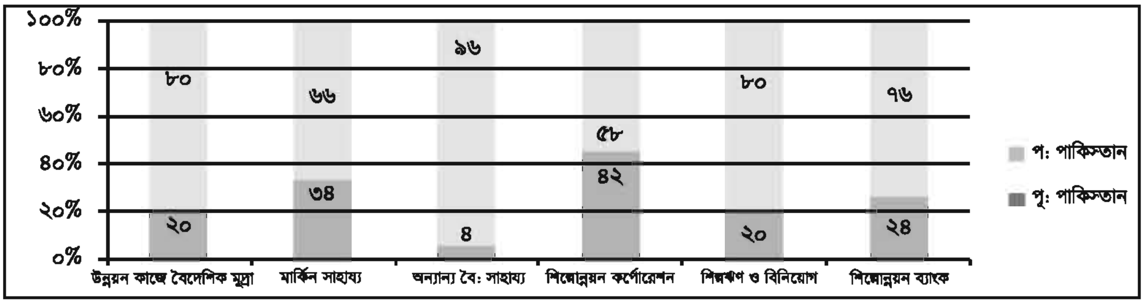

সারণি : খ

ক. কত সালে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়?

খ. বাঙালি জাতীয়তাবাদ বলতে কী বোঝায়?

গ. ছয় দফার কোন দাবি চিত্র ক–এ প্রদর্শিত তথ্যের আলোকে উত্থাপিত হয়েছিল তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'চিত্র খ এ প্রদর্শিত বৈষম্যের কারণেই ছয় দফা দাবি তোলা হয়েছিল।'– তুমি কি এ বক্তব্যের সাথে একমত? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্বাধীন বাংলাদেশ

১৯৭১ সালে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতা লাভের জন্য বাঙালিরা অনেক দুঃখকষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করেছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭০ সালে তৎকালীন পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। পাকিস্তানি শাসকদের শোষণের হাত থেকে মুক্তি লাভের আশায় পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ আওয়ামী লীগকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দেয়। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা প্রদানের ক্ষেত্রে নানারকম ষড়যন্ত্র শুরু করে। ১৯৭১ সালের ১ লা মার্চ পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন। এর প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২রা মার্চ অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক ভাষণে জনগণকে মুক্তি ও স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সর্বাত্মক যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানান। ২৫শে মার্চ নিরস্ত্র জনগণের ওপর পাকিস্তান সেনাবাহিনী আক্রমণ চালায়। ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। ১০ই এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠন এবং স্বাধীনতার সাংবিধানিক ঘোষণাপত্র গ্রহণের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। দীর্ঘ নয় মাস এক রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ৯৩ হাজার সদস্য ঐ দিন আত্মসমর্পণ করে। বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন-সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' নামক রাষ্ট্রটির অভ্যুদয় ঘটে। স্বাধীনতা লাভের পর যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশ গড়ার কঠিন চ্যালেঞ্জ বঙ্গবন্ধু সরকারকে মোকাবিলা করতে হয়। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা ও রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে সামরিক শাসনের সূত্রপাত ঘটে। বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৯০ সালে স্বৈরাচারী শাসনের পতন ঘটিয়ে গণতন্ত্রের পুনর্যাত্রা শুরু হয়। দেশ আর্থ–সামাজিক উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যায়। এ অধ্যায়ে আমরা স্বাধীন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট, অভ্যুদয়, পুনর্গঠন, সামরিক শাসনামল, গণতন্ত্রের পুনর্যাত্রা ও আর্থ–সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রযাত্রা সম্পর্কে অবহিত হব।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা –

- বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে ৭ই মার্চের ভাষণের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব;
- স্বাধীনতাযুদ্ধ পরিচালনায় মুজিবনগর সরকারের ভূমিকা মূল্যায়ন করতে পারব;
- মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, ছাত্র, পেশাজীবী, নারী, গণমাধ্যম, সাংস্কৃতিক কর্মী ও সাধারণ মানুষের ভূমিকা মূল্যায়ন করতে পারব;
- স্বাধীনতা অর্জনের ঘটনাপ্রবাহে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের অবদান মূল্যায়ন করতে পারব;
- স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে বিশ্বজনমত সৃষ্টি ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ভূমিকা মূল্যায়ন করতে পারব;
- মহান মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারব;
- স্বাধীনতার স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শের প্রতি উদ্বুদ্ধ হব;
- যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার বর্ণনা দিতে পারব;
- ১৯৭২ সালের সংবিধান প্রণয়নের পটভূমি ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ১৯৭৫ সালে জাতির জনক ও চার জাতীয় নেতার হত্যা এবং রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের বর্ণনা করতে পারব;
- ১৯৭৫–এর ১৫ই আগস্ট পরবর্তী সামরিক শাসনের উত্থান সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব;
- ১৯৮১ সালে জিয়াউর রহমানের হত্যা এবং পরবর্তী নির্বাচন বর্ণনা করতে পারব;
- ১৯৮২ সালের এরশাদের সামরিক শাসন ও তার প্রভাব মূল্যায়ন করতে পারব;
- ১৯৯০ সালের গণঅভ্যুত্থান এবং গণতন্ত্রের পুনর্যাত্রার বর্ণনা করতে পারব;
- বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য আর্থ–সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রযাত্রা বর্ণনা করতে পারব;
- দেশের প্রতি ভালোবাসা, গণতন্ত্র এবং মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করব।

২০১৫

পরিচ্ছেদ ২.১ : মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি, সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। পাকিস্তানি সামরিক শাসকচক্র আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা হস্তান্তরে নানা চক্রান্ত শুরু করে। ১৯৭১ সালের ৩রা মার্চ ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেন। পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো ঢাকায় অধিবেশনে যোগদান করতে অস্বীকার করেন। অন্যান্য সদস্যকেও তিনি হুমকি দেন। এসবই ছিল ভুট্টো–ইয়াহিয়ার ষড়যন্ত্রের ফল। ইয়াহিয়া খান ১লা মার্চ ভুট্টোর ঘোষণাকে অজুহাত দেখিয়ে ৩রা মার্চের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে কোনো প্রকার আলোচনা না করে অধিবেশন স্থগিত করার পূর্ব বাংলার জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। অধিবেশন স্থগিত করার প্রতিবাদে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে ২রা মার্চ ঢাকায় এবং৩রা মার্চ সারা দেশে হরতাল পালিত হয়। ফলে সকল সরকারি কার্যক্রম অচল হয়ে পড়ে। হরতাল চলাকালে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর গুলিতে বহুলোক হতাহত হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। এমন পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যান) বিশাল এক জনসভায় ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। এ ভাষণে তিনি স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে সকল বাঙালিকে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে আহ্বান জানান। দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পৃথিবীর মানচিত্রে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ ও স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক যাত্রা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে(বর্তমান সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যান) এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। এ ভাষণে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণ–শাসন, বঞ্চনার ইতিহাস, নির্বাচনে জয়ের পর বাঙালির সাথে প্রতারণা ও বাঙালির রাজনৈতিক ইতিহাসের পটভূমি তুলে ধরেন। বিশ্ব ইতিহাসে বিশেষ করে বাঙালি জাতির ইতিহাসে এ ভাষণ এক স্মরণীয় দলিল। পৃথিবীর ইতিহাসে যেসব ঐতিহাসিক ভাষণের নজির আছে ৭ই মার্চের ভাষণ তার অন্যতম; পৃথিবীর স্বাধীনতাকামী মানুষের নিকট এ ভাষণ অমর হয়ে থাকবে।

চিত্র ২.১ : ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রমনা রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ দান

৭ই মার্চের ভাষণ থেকে বাঙালি ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রেরণা ও মুক্তিযুদ্ধের নির্দেশনা পায়। এ ভাষণের পরেই বাঙালি জাতির সামনে একটি মাত্র গন্তব্য নির্ধারণ হয়ে যায়, তা হলো 'স্বাধীনতা'। ৭ই মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু যে স্বাধীনতার ডাক দেন, সে ডাকেই বাঙালি জাতি মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকে। বঙ্গবন্ধুর ভাষণে পরবর্তী করণীয় ও স্বাধীনতা লাভের দিকনির্দেশনা ছিল–'প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে।' তিনি আরও বলেন, "রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেবো, এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব, ইনশাল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয়বাংলা।" এ ভাষণে তিনি প্রতিরোধ সংগ্রাম, যুদ্ধের কলা–কৌশল ও শত্রু মোকাবিলার উপায় সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দেন। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের স্বাধীনতার ডাকে সাড়া দিয়ে জনগণ মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ২৫শে মার্চ পাকিস্তানি বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির ওপর আক্রমণ চালায় এবং নৃশংস গণহত্যা শুরু করে। বাঙালিরা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়।

কাজ

দলীয় : ৭ই মার্চের ভাষণের কী কী বিষয় মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্বুদ্ধ করেছে? তা উল্লেখ কর।

স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক যাত্রা

৭ই মার্চের বঙ্গবন্ধুর ঘোষিত কর্মসূচি এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের আহ্বানের প্রতি সাড়া দিয়ে সকল স্তরের জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়। পূর্ব বাংলার সকল অফিস, আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কলকারখানা বন্ধ হয়ে যায়। পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা বেগতিক দেখে ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আলোচনা করতে। এ সময় ভুট্টোও ঢাকায় আসেন। অপরদিকে গোপন আলোচনার নামে কালক্ষেপণ করে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য ও গোলাবারুদ এনে পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। ১৭ই মার্চ টিক্কা খান ও রাও ফরমান আলী 'অপারেশন সার্চলাইট' নামক কর্মসূচির মাধ্যমে বাঙালির ওপর নৃশংস হত্যাকাণ্ড পরিচালনার নীলনক্সা তৈরি করে। ২৫শে মার্চ রাতে পৃথিবীর ইতিহাসে বর্বরতম গণহত্যা,'অপারেশন সার্চলাইট' শুরু হয়। ইয়াহিয়া ও ভুট্টো ২৫শে মার্চ গোপনে ঢাকা ত্যাগ করেন। ইয়াহিয়া খানের নির্দেশে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। হত্যা করে বহু মানুষকে। পাকিস্তানি বাহিনী ঢাকার রাজারবাগ পুলিশ ক্যাম্প, পিলখানা ইপিআর ক্যাম্প ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় আক্রমণ চালায় ও নৃশংসভাবে গণহত্যা ঘটায়। বাংলাদেশের ইতিহাসে ২৫শে মার্চের রাত 'কালরাত্রি' নামে পরিচিত। এ দিবসটি এখন 'জাতীয় গণহত্যা দিবস' হিসেবে স্বীকৃত। ২৫শে মার্চের কালরাত্রিতেই অর্থাৎ ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেন এবং ওয়্যারলেসযোগে তা চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন জায়গায় পাঠিয়ে দেন। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা শোনামাত্রই চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় জনগণ প্রতিরোধ গড়ে তোলে। শুরু হয় পাকিস্তানি সশস্ত্র সেনাদের সঙ্গে বাঙালি, আনসার ও নিরস্ত্র সাধারণ মানুষের এক অসম লড়াই, যা বাংলাদেশের ইতিহাসে মহান মুক্তিযুদ্ধ নামে পরিচিত। স্বাধীনতা ঘোষণার পরপরই ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে আনুমানিক রাত ১টা ৩০ মিনিটে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে গোপনে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়।

চিত্র ২.২ : ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের গণহত্যা

স্বাধীনতার ঘোষণা

গ্রেফতার হওয়ার পূর্বমুহূর্তে অর্থাৎ ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে (অর্থাৎ ২৫শে মার্চ রাত ১২টার পর) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। ঘোষণাটি ছিল ইংরেজিতে, যাতে বিশ্ববাসী ঘোষণাটি বুঝতে পারেন। স্বাধীনতা ঘোষণার বাংলা অনুবাদ: "ইহাই হয়ত আমার শেষ বার্তা, আজ হইতে বাংলাদেশ স্বাধীন। আমি বাংলাদেশের

জনগণকে আহ্বান জানাইতেছি যে, যে যেখানে আছে, যাহার যা কিছু আছে, তাই নিয়ে রুখে দাঁড়াও, সর্বশক্তি দিয়ে হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধ কর। পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে বাংলার মাটি হইতে বিতাড়িত না করা পর্যন্ত এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জন না করা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাও।” (বাংলাদেশ গেজেট, সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী, ৩রা জুলাই, ২০১১)। স্বাধীনতার এ ঘোষণা বাংলাদেশের সকল স্থানে তদানিন্তন ইপিআর এর ট্রান্সমিটার, টেলিগ্রাম ও টেলিপ্রিন্টারের মাধ্যমে প্রচার করা হয়। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা ২৬শে মার্চ দুপুরে চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা এম. এ. হান্নান চট্টগ্রামের বেতার কেন্দ্র থেকে একবার এবং সন্ধ্যায় কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে দ্বিতীয়বার প্রচার করেন। ২৭শে মার্চ সন্ধ্যায় একই বেতার কেন্দ্র হতে সামরিক অফিসার মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার সমর্থনে বক্তব্য প্রদান করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণা এবং এর প্রতি বাঙালি সামরিক, আধা সামরিক ও বেসামরিক বাহিনীর সমর্থন ও অংশগ্রহণের খবরে স্বাধীনতাকামী জনগণ উজ্জীবিত হয়।

কাজ

দলীয় : স্বাধীনতা ঘোষণার মূল কথা কী? এর বিষয়বস্তু তৈরি কর।

দলীয় : বাঙালিরা কেন স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু করে, তা বর্ণনা কর।

মুক্তিযুদ্ধের সূচনা এবং মুজিবনগর সরকারের কার্যক্রম

১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ অপারেশন সার্চলাইট শুরুর পূর্বে বঙ্গবন্ধু তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের সাথে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। পাকিস্তানি বাহিনী আক্রমণ করলে তা প্রতিহত করার নির্দেশ দেন। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে সরকার গঠন ও মুক্তিযুদ্ধের সময়ে করণীয় বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দেন।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে মুজিবনগর সরকার গঠন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননকে নামকরণ করা হয় মুজিবনগর। মুক্তিযুদ্ধকে সঠিকভাবে পরিচালনা, সুসংহত করা এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্বজনমত গঠনের লক্ষ্যে ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের প্রতিনিধিদের নিয়ে ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল ‘মুজিবনগর সরকার’ গঠন করা হয়। এটি ছিল প্রথম বাংলাদেশ সরকার। ঐ দিনই আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত হয় ‘বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা আদেশ’। মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করে ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল। শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

মুজিবনগর স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের কাঠামো ছিল নিম্নরূপ :

১. রাষ্ট্রপতি ও মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

২. উপ–রাষ্ট্রপতি : সৈয়দ নজরুল ইসলাম (বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি)

৩. প্রধানমন্ত্রী : তাজউদ্দীন আহমদ

৪. অর্থমন্ত্রী : এম. মনসুর আলী

৫. স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী : এ.এইচ.এম. কামারুজ্জামান

৬. পররাষ্ট্র ও আইনমন্ত্রী : খন্দকার মোশতাক আহমেদ

স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারকে উপদেশ ও পরামর্শ প্রদানের জন্য একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ভাসানী ন্যাপ) মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (মোজাফ্ফর ন্যাপ) অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমেদ, কমিউনিস্ট পার্টির কমরেড মণি সিং, জাতীয় কংগ্রেসের শ্রী মনোরঞ্জন ধর, তাজউদ্দীন আহমদ (বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী) ও খন্দকার মোশতাক আহমেদ (বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র ও আইনমন্ত্রী)-কে নিয়ে মোট ৬ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হয়। মুক্তিযুদ্ধে প্রধান সেনাপতি ছিলেন কর্নেল (অব.) এম.এ.জি ওসমানী।

মুজিবনগর সরকারের কার্যক্রম

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ী জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য দ্বারা মুজিবনগর সরকার গঠন করা হয়।

বাঙালি কর্মকর্তাদের নিয়ে এ সরকার প্রশাসনিক কাজ পরিচালনা করেছিল। এতে মোট ১২টি মন্ত্রণালয় বা বিভাগ ছিল। এগুলো হলো–প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র, অর্থ, শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, মন্ত্রিপরিষদ সচিবালয়, সাধারণ প্রশাসন, স্বাস্থ্য ও কল্যাণ বিভাগ, ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগ, প্রকৌশল বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন ও যুব ও অভ্যর্থনা শিবির নিয়ন্ত্রণ বোর্ড। মুজিবনগর সরকার বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গুরুত্বপূর্ণ শহর– কলকাতা, দিল্লি, লন্ডন, ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক, স্টকহোম প্রভৃতিতে বাংলাদেশ সরকারের মিশন স্থাপন করেন। এসব মিশন বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে প্রচারণা ও আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করে। সরকার বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে বিশেষ দূত হিসেবে নিয়োগ দেয়। তিনি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্ব নেতৃত্ব ও জনমতের সমর্থন আদায়ের জন্য কাজ করেন। ১০ই এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠিত হওয়ার পর মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য সামরিক, বেসামরিক জনগণকে নিয়ে একটি মুক্তিযোদ্ধা বাহিনী গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সরকার বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করে ১১ জন সেক্টর কমান্ডার নিয়োগ করেছিল। এ ছাড়া বেশ কিছু সাব–সেক্টর এবং তিনটি ব্রিগেড ফোর্স গঠিত হয়। এসব বাহিনীতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কর্মরত বাঙালি সেনা কর্মকর্তা, সেনা সদস্য, পুলিশ, ইপিআর, নৌ ও বিমানবাহিনীর সদস্যগণ যোগদান করেন। প্রতিটি সেক্টরেই নিয়মিত সেনা, গেরিলা ও সাধারণ যোদ্ধা ছিল। এরা মুক্তিযোদ্ধা বা মুক্তিফৌজ নামে পরিচিত ছিল। এসব বাহিনীতে দেশের ছাত্র, যুবক, নারী, কৃষক, রাজনৈতিক দলের কর্মী–সমর্থক, শ্রমিকসহ বিভিন্ন পেশার মানুষ অংশ নিয়েছিল। বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ শেষে যোদ্ধাগণ দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে পাকিস্তানি সামরিক ছাউনি বা আস্তানায় হামলা চালায়। মুক্তিযুদ্ধে সরকারের অধীন বিভিন্ন বাহিনী ছাড়াও বেশ কয়েকটি বাহিনী দেশের অভ্যন্তরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে উঠেছিল। এসব সংগঠন স্থানীয়ভাবে পাকিস্তানি বাহিনী ও রাজাকার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল। এক্ষেত্রে টাংগাইলের কাদেরিয়া বাহিনীর কথা উল্লেখ করা যায়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযোদ্ধাগণ মুজিবনগর সরকারের নেতৃত্বে দেশকে পাকিস্তানিদের দখলমুক্ত করার জন্য রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করেছেন, দেশের জন্যে প্রাণ দিয়েছেন, অনেকে আহত হয়েছেন।

কাজ

দলীয় : মুজিবনগর অস্থায়ী সরকারের কার্যক্রম চিহ্নিত কর।

মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ জনগণ ও পেশাজীবীদের ভূমিকা

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ নিরস্ত্র জনগণের ওপর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আক্রমণ চালালে বাঙালি ছাত্র, জনতা, পুলিশ, ইপিআর (ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস) সাহসিকতার সাথে তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। বিনা প্রতিরোধে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে বাঙালিরা ছাড় দেয়নি। দেশের জন্য যুদ্ধ করতে গিয়ে বহু মুক্তিযোদ্ধা বিভিন্ন রণাঙ্গনে শহিদ হন। আবার অনেকে মারাত্মকভাবে আহত হন। তাই মুক্তিযোদ্ধাদের এ ঋণ কোনোদিন শোধ হবে না। জাতি চিরকাল মুক্তিযোদ্ধাদের সূর্যসন্তান হিসেবে মনে করবে। মুক্তিযোদ্ধারা দেশকে শত্রুমুক্ত করার লক্ষ্যে মৃত্যুকে তুচ্ছ মনে করে যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। তাঁরা ছিলেন দেশপ্রেমিক, অসীম সাহসী এবং আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ যোদ্ধা। মুক্তিযুদ্ধে বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিক, ইপিআর, পুলিশ, আনসার, কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র–ছাত্রীসহ বিভিন্ন পেশার মানুষ অংশগ্রহণ

কাজ

দলীয় : জাতি কেন মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মান করবে, সূর্যসন্তান মনে করবে– এটি ব্যাখ্যা কর।

দলীয় : মুক্তিযুদ্ধকে গণযুদ্ধ বা জনযুদ্ধ বলার কারণ ব্যাখ্যা কর।

করে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সর্বস্তরের বাঙালি অংশগ্রহণ করে। তাই এ যুদ্ধকে 'গণযুদ্ধ' বা 'জনযুদ্ধ'ও বলা যায়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মূল নিয়ামক শক্তি ছিল জনগণ। তাই মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, ছাত্র-ছাত্রী, পেশাজীবী, নারী, সাংস্কৃতিক কর্মীসহ সর্বস্তরের জনসাধারণ নিজ নিজ অবস্থান থেকে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। জীবনের মায়া ত্যাগ করে দেশকে শত্রুমুক্ত করে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করে।

রাজনৈতিক দল

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী প্রধান রাজনৈতিক দল হলো বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। রাজনৈতিক নেতৃত্বই মুক্তিযুদ্ধের গতি–প্রকৃতি নির্ধারণ করে। আওয়ামী লীগ প্রথমে পূর্ববাংলার জনগণকে স্বাধিকার আন্দোলনে সংগঠিত করে। এরপর ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয় লাভের পর জনগণকে স্বাধীনতা অর্জনে উদ্বুদ্ধ করে। ফলে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা যুদ্ধের ডাকে সাড়া দিয়ে জনগণ মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে রাজনৈতিক নেতৃত্ব বাংলাদেশ সরকার (মুজিবনগর সরকার) গঠন করে বঙ্গবন্ধুর ২৬শে মার্চের স্বাধীনতার ঘোষণাকে ১০ই এপ্রিল ১৯৭১ আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করে। এতে মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট, অপরিহার্যতা এবং এর ভবিষ্যৎ রূপরেখা প্রণীত হয়। ২৫শে মার্চের পর রাজনৈতিক নেতৃত্ব সংগঠিত হয়ে সরকার গঠন, মুক্তিবাহিনী গঠন, বিদেশে জনমত সৃষ্টি ও সমর্থন আদায়, যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ এবং জনগণের মনোবল অটুট রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রাজনৈতিক নেতৃত্ব মুক্তিযুদ্ধকে সফল করার ক্ষেত্রে সকল শক্তি, মেধা ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় দিতে সক্ষম হয়। মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদান, ভারতে ১ কোটি শরণার্থীর ত্রাণ ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা, মুক্তিযোদ্ধা ও গেরিলা যোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র পরিচালনা এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রতি বিশ্ব জনমত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল সরকার ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব।

কাজ

দলীয় : মুক্তিযুদ্ধে রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব উল্লেখ কর।

দলীয় : মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারীদের বাঙালিরা ঘৃণা করবে কেন?

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় আওয়ামী লীগ ছাড়াও প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে– ন্যাপ (ভাসানী), ন্যাপ (মোজাফ্‌ফর), কমিউনিস্ট পার্টি, জাতীয় কংগ্রেস ইত্যাদি। এসব দলের নেতা ও কর্মীরা অনেকেই সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাকবাহিনীর সমর্থনে মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী, পিডিপিসহ কতিপয় দল মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে। দলগুলো শান্তি কমিটি, রাজাকার, আলবদর ও আলশামস নামক বিশেষ বাহিনী গঠন করে। এসব বাহিনী হত্যা, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ, নারীর সম্ভ্রমহানির মতো মানবতাবিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ছিল। স্বাধীনতাবিরোধী এ বাহিনীগুলো মুক্তিযোদ্ধা ছাড়াও বাঙালিদের মেধাশূন্য করার উদ্দেশ্যে ১৯৭১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর পরিকল্পিতভাবে এদেশের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে।

ছাত্র সমাজ

পাকিস্তানের চব্বিশ বছরে বাঙালি জাতির স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট সকল আন্দোলনে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেছে এদেশের ছাত্র সমাজ। ১৯৪৮–১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৬২ ও ১৯৬৪ সালের শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন, ১৯৬৬ সালে ছয় দফার আন্দোলন, ১৯৬৮ সালে ১১ দফার আন্দোলন, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০-এর নির্বাচন ও ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলনসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে ছাত্রসমাজ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র–ছাত্রীদের বিরাট অংশ সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়। অনেকে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে পাকিস্তান হানাদার

বাহিনীকে প্রতিরোধ করে। মুক্তিবাহিনীতে একক গোষ্ঠী হিসেবে ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি। মুক্তিবাহিনীর অনিয়মিত শাখার এক বিরাট অংশ ছিল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। মুক্তিযুদ্ধের একপর্যায়ে মুজিব বাহিনী গঠিত হয়েছিল মূলত ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে। ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীরা বিভিন্ন এলাকায় সংগঠিত হয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। মুক্তিযুদ্ধে ছাত্র সমাজের মহান আত্মত্যাগ ব্যতীত স্বাধীনতা অর্জন কঠিন হতো।

কাজ
দলীয়: মুক্তিযুদ্ধে ছাত্র-ছাত্রীদের আত্মত্যাগ ও অবদান চিহ্নিত কর।

পেশাজীবী

সাধারণ অর্থে যারা বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত তারাই হলেন পেশাজীবী। পেশাজীবীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন-শিক্ষক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, শিল্পী, সাহিত্যিক, প্রযুক্তিবিদ, আইনজীবী, সাংবাদিক ও বিজ্ঞানীসহ বিভিন্ন সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে এদের ভূমিকা ছিল অনন্য ও গৌরবদীপ্ত। পেশাজীবীদের বড় অংশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। পেশাজীবীরা মুজিবনগর সরকারের অধীনে পরিকল্পনা সেল গঠন করে বিশ্ববাসীর কাছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের তথ্য সরবরাহ, সাহায্যের আবেদন, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে বক্তব্য প্রদান, শরণার্থীদের উৎসাহ প্রদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। পেশাজীবীদের মধ্যে অনেকে মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হন।

মুক্তিযুদ্ধে নারী

মুক্তিযুদ্ধে নারীদের ভূমিকা ছিল গৌরবোজ্জ্বল। ১৯৭১ সালের মার্চের প্রথম থেকেই দেশের প্রতিটি অঞ্চলে যে সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়, তাতে নারীদের বিশেষ করে ছাত্রীদের অংশগ্রহণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। মুক্তিযোদ্ধা শিবিরে পুরুষের পাশাপাশি নারীরা অস্ত্রচালনা ও গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। অপরদিকে সহযোদ্ধা হিসেবে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা-শুশ্রূষা, মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়দান ও তথ্য সরবরাহ করে যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এদেশের অগণিত নারী মুক্তিসেনা। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক ধর্ষিত হন প্রায় তিন লাখ মা-বোন। তাঁরাও মুক্তিযোদ্ধাদের সহযাত্রী। তাদের ত্যাগের স্বীকৃতি হিসেবে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সরকারিভাবে তাঁদের 'বীরাঙ্গনা' উপাধিতে ভূষিত করেন। আওয়ামী লীগ সরকার ২০১৬ সালে তাঁদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

চিত্র ২.৩ : যুদ্ধ প্রশিক্ষণে নারী

কাজ
দলীয়: মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবদান মূল্যায়ন কর।

গণমাধ্যম

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে গণমাধ্যমের ভূমিকা অপরিসীম। সংবাদপত্র ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ২৬শে মার্চ চট্টগ্রাম বেতারের শিল্পী ও সংস্কৃতি কর্মীরা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র চালু করেন। পরে এটি মুজিবনগর সরকারের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র সংবাদ, দেশাত্মবোধক গান, মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাথা, রণাঙ্গনের নানা ঘটনা দেশ ও জাতির সামনে তুলে ধরে সাধারণ মানুষকে যুদ্ধের প্রতি অনুপ্রাণিত করে। মুক্তিযোদ্ধাদের সাহস জুগিয়ে বিজয়ের পথ সুগম করে। এছাড়া, মুজিবনগর সরকারের প্রচার সেলের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত 'জয়বাংলা' পত্রিকা মুক্তিযুদ্ধে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে।

জনসাধারণ

সাধারণ জনগণের সাহায্য-সহযোগিতা ও স্বাধীনতার প্রতি ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষার ফলেই মাত্র নয় মাসের যুদ্ধে বাঙালির

স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব হয়েছে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর মুষ্টিমেয় এদেশীয় দোসর ব্যতীত সবাই কোনো না কোনোভাবে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। সাধারণ মানুষ মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়েছে, শত্রুর অবস্থান ও চলাচলের তথ্য দিয়েছে, খাবার ও ঔষধ সরবরাহ করেছে, সেবা দিয়েছে ও খবরাখবর সরবরাহ করেছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ জনগণের পাশাপাশি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জনগণও অংশগ্রহণ করে। তাঁদের অনেকে মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হন। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লাখ শহিদের মধ্যে সাধারণ মানুষের সংখ্যা ছিল অধিক। তাদের রক্তের বিনিময়েই আমাদের আজকের স্বাধীন মানচিত্র, লাল–সবুজ পতাকা।

প্রবাসী বাঙালি

প্রবাসী বাঙালিরা মুক্তিযুদ্ধে নানাভাবে সাহায্য–সহযোগিতা করেন। বিভিন্ন দেশে তারা মুক্তিযুদ্ধের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছেন। বাংলাদেশের পক্ষে সমর্থন আদায়ে বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্ট সদস্যদের নিকট ছুটে গিয়েছেন। তাঁরা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেছেন। পাকিস্তানকে অস্ত্র–গোলাবারুদ সরবরাহ না করতে বিশ্বের বিভিন্ন সরকারের নিকট প্রবাসী বাঙালিরা আবেদন করেছেন। এক্ষেত্রে ব্রিটেনের প্রবাসী বাঙালিদের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখ্যযোগ্য। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠনে তাঁরা নিরলস কাজ করেছেন।

শিল্পী–সাহিত্যিক–বুদ্ধিজীবী

মুক্তিযুদ্ধের মূল নিয়ামক শক্তি ছিল জনগণ। তথাপি যুদ্ধে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী ও বিভিন্ন সংস্কৃতি কর্মীর অবদান ছিল খুবই প্রশংসনীয়। পত্র-পত্রিকায় লেখা, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে খবর পাঠ, দেশাত্মবোধক ও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গান, কবিতা পাঠ, নাটক, কথিকা ও অত্যন্ত জনপ্রিয় অনুষ্ঠান– 'চরমপত্র' ও 'জল্লাদের দরবার' ইত্যাদি মুক্তিযুদ্ধকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করেছে। রণক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধাদের মানসিক ও নৈতিক বল ধরে রাখতে উল্লিখিত সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড সহায়তা করেছে, সাহস জুগিয়েছে, জনগণকে শত্রুর বিরুদ্ধে দুর্দমনীয় করে তুলেছে।

স্বাধীনতা অর্জনে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের অবদান

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের অবদান অপরিসীম। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবর্গ বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন। নানা অত্যাচার–নিপীড়ন সহ্য করেছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জীবন বাজি রেখে রাজনৈতিক তৎপরতা চালিয়ে গেছেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্ব

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল নেতৃত্ব দেন স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর সারাজীবনের কর্মকাণ্ড, আন্দোলন–সংগ্রাম নির্দেশিত হয়েছে বাঙালি জাতির মুক্তির লক্ষ্যে। এই লক্ষ্য নিয়ে তিনি ১৯৪৮ সালে ছাত্রলীগ এবং ১৯৪৯ সালে আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন। ১৯৪৮ –১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। তিনি ছিলেন ভাষা আন্দোলনের প্রথম কারাবন্দিদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। কী সংসদ, কী রাজপথ, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির পক্ষে তাঁর কণ্ঠ ছিল সর্বদা সোচ্চার। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৫৬ সালের সংবিধানে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতিদান, ১৯৫৮ সালে জেনারেল আইয়ুব খানের সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন, ১৯৬৬ সালে 'আমাদের বাঁচার দাবি ৬ দফা' কর্মসূচি পেশ ও ৬ দফা ভিত্তিক আন্দোলন, '৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নজিরবিহীন বিজয়, ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা ও স্বাধীনতা অর্জনে একচ্ছত্র ভূমিকা পালন করেন স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

চিত্র ২.৪ : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

পাকিস্তানের চব্বিশ বছরের শাসনের মধ্যে ১২ বছর বঙ্গবন্ধুকে কারাগারে কাটাতে হয়েছিল। সংগ্রামের পথ ধরে ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে তিনি স্বাধীনতার লক্ষ্যে মহান মুক্তিযুদ্ধের ডাক দিয়েছেন। ২৫শে মার্চ নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী সশস্ত্র আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়লে ২৬শে মার্চ ১৯৭১ প্রথম প্রহরে তিনি সরাসরি আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তাঁর নামেই আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়। তিনি ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক ও স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার মুজিবনগর সরকারের রাষ্ট্রপতি। তাঁর বলিষ্ঠ ও আপোসহীন নেতৃত্বে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলেন জাতির পিতা, স্বাধীনতার মহানায়ক ও স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি।

সৈয়দ নজরুল ইসলাম

চিত্র ২.৫ : সৈয়দ নজরুল ইসলাম

সৈয়দ নজরুল ইসলাম ছিলেন আওয়ামী লীগের অন্যতম শীর্ষ নেতা। তিনি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন মুজিবনগর সরকারের উপ-রাষ্ট্রপতি ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে সৈয়দ নজরুল ইসলাম ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকে বেগবান ও সফল করার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান। সৈয়দ নজরুল ইসলাম মুক্তিযুদ্ধের একজন অন্যতম সংগঠক ও পরিচালক ছিলেন।

তাজউদ্দীন আহমদ

চিত্র ২.৬ : তাজউদ্দীন আহমদ

মুক্তিযুদ্ধের সময় তাজউদ্দীন আহমদ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তিনি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিশ্বস্ত ও ঘনিষ্ঠ সহচর। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য গঠিত মুজিবনগর সরকারের (১০ই এপ্রিল ১৯৭১) প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন এই মহান নেতা। ১৯৭১ সালের ১১ই এপ্রিল তিনি বেতার ভাষণে মুজিবনগর সরকার গঠনের কথা প্রচার করেন। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় তিনি সফল নেতৃত্ব প্রদান করেন। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য গঠিত উপদেষ্টা কমিটির তিনি আহ্বায়ক ছিলেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের সঙ্গে তাঁর নাম গভীরভাবে যুক্ত।

ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী

চিত্র ২.৭ : ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী

ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী আওয়ামী লীগের একজন শীর্ষ নেতা এবং বঙ্গবন্ধুর খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি মুজিবনগর সরকারের অর্থমন্ত্রী ছিলেন। সে সময়ে খাদ্য, বস্ত্র ও অস্ত্র প্রশিক্ষণের জন্য অর্থের সংস্থান খুবই গুরুদায়িত্ব ছিল। তিনি সফলভাবে সে দায়িত্ব পালন করেন।

এ.এইচ. এম. কামারুজ্জামান

চিত্র ২.৮ : এ.এইচ. এম. কামারুজ্জামান

কামারুজ্জামান আওয়ামী লীগের একজন শীর্ষ নেতা। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি মুজিবনগর

সরকারের স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী ছিলেন। সে সময়ে তিনি ভারতে আশ্রয় নেওয়া লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর জন্য ত্রাণ সংগ্রহ ও ত্রাণশিবিরে তা বিতরণ, পরবর্তীসময়ে শরণার্থীদের পুনর্বাসন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে পালন করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে তাঁর অবদান অপরিসীম।

অন্য নেতৃবৃন্দ

অন্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে স্বাধীনতা অর্জনে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। তিনি ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা (১৯৬৮–১৯৬৯) থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির ব্যাপারে গড়ে ওঠা আন্দোলন ও '৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে অবস্থান করে বিভিন্ন দেশের প্রতি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন দান ও পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান। এছাড়া অধ্যাপক মোজাফ্‌ফার আহমেদ (ন্যাপ–মোজাফ্‌ফার) ও কমিউনিস্ট পার্টির কমরেড মণি সিংও মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মুক্তিযুদ্ধ সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য গঠিত মুজিবনগর সরকারের 'উপদেষ্টা কমিটি'তে এ তিন নেতা সদস্য ছিলেন। বাঙালি জাতি তাদের শ্রদ্ধার সাথে স্মরণে রাখবে।

মুক্তিযুদ্ধে বিশ্বজনমত ও বিভিন্ন দেশের ভূমিকা

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নারকীয় তাণ্ডব বিশ্ব বিবেককে নাড়া দেয়। পাকিস্তানি বাহিনী ও স্বাধীনতাবিরোধী তাদের এদেশীয় দোসরদের দ্বারা সংঘটিত লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ ও হত্যাযজ্ঞের বিরুদ্ধে বিশ্ব বিবেক জাগ্রত হয়। বিভিন্ন দেশ নিন্দা ও প্রতিবাদ জানায় এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে। ২৫শে মার্চের কালরাত্রি তথা জাতীয় গণহত্যা দিবস এবং পরবর্তী সময়ের নারকীয় হত্যাযজ্ঞের বিরুদ্ধে বিশ্বজনমত সোচ্চার হয়ে ওঠে। গোটা বিশ্বের জনগণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে সমর্থন জানায়।

ভারতের ভূমিকা : বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সরাসরি সমর্থন জানায় প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের কালরাত্রির বীভৎস হত্যাকাণ্ড ও পরবর্তী নয়মাস ধরে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী যে নারকীয় গণহত্যা, লুণ্ঠন ও ধ্বংসযজ্ঞ চালায়, ভারত তা বিশ্ববাসীর নিকট সার্থকভাবে তুলে ধরে। এর ফলে বিশ্ববিবেক জাগ্রত হয়। লাখ লাখ শরণার্থীকে আশ্রয়, মুক্তিযোদ্ধাদের খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, অস্ত্র সরঞ্জাম ও প্রশিক্ষণ দিয়ে সাহায্য করে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে পাকিস্তান ভারতে বিমান হামলা চালায়। ভারত ৬ ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনী 'যৌথ কমান্ড' গড়ে তোলে। যৌথ বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণের ফলে ৯৩ হাজার পাকিস্তানি সেনাসহ জেনারেল এ কে নিয়াজী নিঃশর্তে যৌথ কমান্ডের নিকট আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। ভারতের বহু সৈন্য বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ হারান।

চিত্র ২.৯ : পাকিস্তানি বাহিনীর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভূমিকা : বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতের পর সর্বাধিক অবদান রাখে অধুনা বিলুপ্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন, বর্তমান রাশিয়া। পাকিস্তানি বাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশে গণহত্যা, অগ্নিসংযোগ, নারী–ধর্ষণসহ যাবতীয় মানবতাবিরোধী অপরাধ বন্ধ করার জন্য সোভিয়েত রাষ্ট্রপ্রধান পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল

ইয়াহিয়া খানকে আহ্বান জানান। তিনি ইয়াহিয়াকে জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্যও বলেন। সোভিয়েত পত্র–পত্রিকা, প্রচার মাধ্যমগুলো বাংলাদেশে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নির্যাতনের কাহিনী ও মুক্তিযুদ্ধের অগ্রগতি প্রচার করে বিশ্ব জনমত সৃষ্টিতে সহায়তা করে। জাতিসংঘে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের পক্ষে যুদ্ধবন্ধের প্রস্তাব দিয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন 'ভেটো' (বিরোধিতা করা) প্রদান করে তা বাতিল করে দেয়। কিউবা, যুগোশ্লাভিয়া, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, বুলগেরিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, পূর্ব জার্মানি প্রভৃতি তৎকালীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে সমর্থন জানায়।

গ্রেট ব্রিটেনের ভূমিকা : ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোতে ব্রিটেনের প্রচার মাধ্যম বিশেষ করে বিবিসি এবং লন্ডন থেকে প্রকাশিত পত্র–পত্রিকা বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানি বাহিনীর নির্মম নির্যাতন এবং বাঙালিদের সংগ্রাম ও প্রতিরোধ, ভারতে আশ্রয় নেওয়া শরণার্থীদের করুণ অবস্থা, পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যা এবং মুক্তিযুদ্ধের অগ্রগতি সম্পর্কে বিশ্ব জনমতকে জাগ্রত করে তোলে। ব্রিটিশ সরকারও আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে খুবই সহানুভূতিশীল ছিল। উল্লেখ্য, লন্ডন ছিল বহির্বিশ্বে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচারের প্রধান কেন্দ্র। তাছাড়া লন্ডনে জন্মগ্রহণকারী বিখ্যাত সংগীত শিল্পী জর্জ হ্যারিসন মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে বিশ্ব জনমত সৃষ্টি ও দানসহায়তা কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে ৪০,০০০ লোকের সমাগমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মানবতাবিরোধী কর্মকাণ্ডভিত্তিক গান পরিবেশন করেন। ব্রিটেন ছাড়াও অস্ট্রেলিয়া, পশ্চিম জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, জাপান ও কানাডার প্রচারমাধ্যমগুলো পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে বিশ্বজনমত সৃষ্টিতে সাহায্য করে। ইরাক বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সমর্থন জানায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ, প্রচার মাধ্যম, কংগ্রেসের অনেক সদস্য এদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সোচ্চার ছিল। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য, বিশ্বের কোনো কোনো দেশ এদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিল।

জাতিসংঘের ভূমিকা : বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা জাতিসংঘের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। বাংলাদেশের নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা না দিয়ে সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান যখন বাঙালি নিধনে তৎপর, তখন জাতিসংঘ বলতে গেলে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। নারকীয় হত্যাযজ্ঞ, মৌলিক মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে জাতিসংঘ কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি। প্রকৃতপক্ষে 'ভেটো' ক্ষমতাসম্পন্ন পাঁচটি বৃহৎ শক্তিধর রাষ্ট্রের বাইরে জাতিসংঘের নিজস্ব উদ্যোগে ভেটো দেওয়ার ক্ষমতা নেই।

মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক তাৎপর্য

বিশ্বইতিহাসে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের প্রথম দেশ, যে দেশ সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছে। ১৯৪৭ সাল থেকেই পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী দ্বারা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ সর্বপ্রকার অত্যাচার, শোষণ, বৈষম্য ও নিপীড়নের শিকার হয়েছে। কিন্তু এ ভূখণ্ডের সংগ্রামী মানুষ এসব অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় অর্জনের মধ্য দিয়ে এর পরিসমাপ্তি ঘটে। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার যে ডাক দেন এবং ২৬শে মার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার যে ঘোষণা প্রদান করেন, ১৬ই ডিসেম্বর তা বাস্তবে পূর্ণতা পায়। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বপ্রকার সহযোগিতা করে। ফলে মুক্তিযুদ্ধ হয়ে দাঁড়ায় বাঙালির শক্তিশালী জাতীয়তাবাদী চেতনার বহিঃপ্রকাশ। মুক্তিযুদ্ধ এ অঞ্চলের বাঙালি এবং এ ভূখণ্ডে বসবাসকারী অন্যান্য নৃগোষ্ঠীর জনগণের মধ্যে নতুন যে দেশপ্রেমের জন্ম দেয়, তা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে যুদ্ধ শেষে জনগণ বিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠন ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করে।

২০১৫

মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা পেয়েছি একটি স্বাধীন রাষ্ট্র, যা বিশ্বের মানচিত্রে স্থান করে নিয়েছে। এর মাধ্যমে বাঙালির হাজার বছরের স্বপ্ন পূরণ হলো। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিশ্বের নিপীড়িত, স্বাধীনতাকামী জনগণকে অনুপ্রাণিত করে।

পরিচ্ছেদ ২.২ : স্বাধীন বাংলাদেশ পুনর্গঠনে বঙ্গবন্ধুর শাসন আমল ও পরবর্তী ঘটনাবলি

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়। ২২শে ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার (মুজিবনগর সরকার) শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করে। ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিলের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র অনুযায়ী দেশ পরিচালিত হতে থাকে। ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসেন এবং সরকার প্রধানের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের সামগ্রিক পুনর্গঠন, ভারতে অবস্থানরত এক কোটি শরণার্থীর পুনর্বাসন, সংবিধান প্রণয়ন, নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠান, ভারতের মিত্রবাহিনীর সদস্যদের ফেরত পাঠানো, বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি আদায় ইত্যাদি তাঁর শাসন আমলের উল্লেখযোগ্য অর্জন। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তির চক্রান্তে কতিপয় বিপথগামী সামরিক কর্মকর্তার অভ্যুত্থানে বিদেশে অবস্থানরত দুই কন্যা– শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা ব্যতীত পরিবারের সকল সদস্যসহ স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নৃশংস হত্যাকাণ্ডের শিকার হন।

যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গঠন প্রক্রিয়া

বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হয় তখন চারদিকে ছিল স্বজন হারানোর বেদনা, কান্না, হাহাকার আর ধ্বংসযজ্ঞ। অসংখ্য রাস্তাঘাট, পুল, কালভার্ট, কলকারখানা, নৌবন্দর ও সমুদ্রবন্দর ছিল বিধ্বস্ত। রাষ্ট্রীয় কোষাগার ছিল অর্থশূন্য। স্বাধীন বাংলাদেশের ছিল না কোনো সামরিক–বেসামরিক বিমান। ত্রিশ লাখ শহিদের প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশে এক কোটি শরণার্থীর পুনর্বাসন, গ্রাম–গঞ্জের লাখ লাখ ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িঘর পুনর্নির্মাণ, সর্বোপরি সাড়ে সাত কোটি মানুষের অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসা ও বাসস্থানের চাহিদা পূরণ ও আইনশৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা ছিল সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ।

চিত্র ২.১০ : দেশ পুনর্গঠনে বঙ্গবন্ধু

যুদ্ধবিধ্বস্ত স্বাধীন বাংলাদেশ পুনর্গঠনের দায়িত্ব নিয়েই শুরু হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাসন আমল।

যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনের মতো কঠিন দায়িত্ব পালন ছাড়াও ১৯৭২–১৯৭৫ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর শাসন আমলের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ নিম্নরূপ :

নতুন সংবিধান প্রণয়ন ও কার্যকর করা : ১৯৭২ সালের ১১ই জানুয়ারি রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অস্থায়ী সংবিধান আদেশ জারি করেন। ১০ই এপ্রিল গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে ৩৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি 'খসড়া সংবিধান প্রণয়ন' কমিটি গঠিত হয়। এ কমিটি ১২ই অক্টোবর খসড়া সংবিধান বিল আকারে গণপরিষদে পেশ করে। ৪ঠা নভেম্বর উক্ত সংবিধান গণপরিষদে গৃহীত ও ১৬ই ডিসেম্বর থেকে তা বলবত হয়। এই সংবিধানের মূলনীতি হলো– গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ। সংবিধানে সার্বজনীন ভোটাধিকার, মৌলিক অধিকার, ন্যায় বিচারসহ জনগণের সকল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার স্বীকৃত হয়।

গণপরিষদ : ১৯৭২ সালের ২৩শে মার্চ বঙ্গবন্ধু 'বাংলাদেশ গণপরিষদ' নামে একটি আদেশ জারি করেন। এই আদেশবলে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণ গণপরিষদের সদস্য বলে পরিগণিত হন। ১৯৭২ সালের ১০ই এপ্রিল গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে দেশের জন্যে প্রয়োজনীয় আইন-কানুন পাস ও কার্যকর করা সম্ভব হয়। বাংলাদেশে গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রায় এটি অতীব তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।

পরিত্যক্ত কারখানা জাতীয়করণ : স্বাধীনতার পর আদমজীসহ বিভিন্ন কলকারখানার পাকিস্তানি অবাঙালি শিল্পপতিরা বাংলাদেশ ত্যাগ করলে বঙ্গবন্ধু সরকার ১৯৭২ সালে সেগুলো রাষ্ট্রীয় মালিকানায় এনে বাংলাদেশের সম্পদে পরিণত করেন। কারখানা জাতীয়করণের ফলে শ্রমিকরা রাষ্ট্রীয় সম্মানজনক অবস্থানে চলে আসেন ।

প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ: পাকিস্তান আমলে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে কর্মরত শিক্ষকগণ সরকারের কাছ থেকে যৎসামান্য বেতন–ভাতা পেতেন। বঙ্গবন্ধু প্রায় ৩৮ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করেন। এর মাধ্যমে রাষ্ট্র প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে।

নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি : বঙ্গবন্ধু সরকার ১৯৭২ সালে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. কুদরাত–এ–খুদাকে প্রধান করে একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করে। এই কমিটি ১৯৭৪ সালে একটি গণমুখী বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষানীতির রূপরেখা উপস্থাপন করে। এভাবে বঙ্গবন্ধু সরকার দেশের জন্য একটি যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল ।

রিলিফ প্রদান ও রেশনিং প্রথা : ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার এবং মানুষজনকে বিদেশ থেকে প্রাপ্ত কম্বল, খাদ্যদ্রব্য ও অর্থ সাহায্য বণ্টন করেন। এছাড়া শহর ও গ্রাম পর্যায়ে ব্যাপকভাবে ন্যায্যমূল্যে খাদ্যদ্রব্যসহ বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী ক্রয় করার জন্যে রেশনিং ব্যবস্থা চালু করেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে সহায়-সম্বলহীন মানুষকে সাহায্যের জন্যে এটা ছিল এক অসাধারণ মানবিক পদক্ষেপ।

১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচন : ১৯৭৩ সালের ৭ই মার্চ বাংলাদেশে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দ্বিতীয় মেয়াদে সরকার গঠিত হয়। বাংলাদেশে গণতন্ত্রের ইতিহাসে এ নির্বাচনের গুরুত্ব অনেক।

নতুন অর্থনৈতিক পাঁচসালা পরিকল্পনা : বঙ্গবন্ধুর সরকার দেশকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করার জন্যে একটি পরিকল্পনা কমিশন গঠন করে এবং প্রণীত হয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা। কমিশনের সুপারিশ মোতাবেক বঙ্গবন্ধু যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে নতুনভাবে গড়ে তোলার জন্য ব্যবসায়–বাণিজ্য, শিল্প, কৃষিসহ বিভিন্ন খাতকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯৭২ সাল পর্যন্ত বকেয়া সুদসহ কৃষি জমির খাজনা মওকুফ করে দেওয়া হয়।

শোষণহীন সমাজ গঠনের লক্ষ্যে 'দ্বিতীয় বিপ্লবের' কর্মসূচি : মুক্তিযুদ্ধের সীমাহীন ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে বাংলাদেশ যখন ব্যস্ত, তখন আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্য ও তেলের মূল্যবৃদ্ধি পায়। ১৯৭৩–১৯৭৪ সালে বন্যায় দেশে খাদ্যোৎপাদন দারুণভাবে ব্যাহত হয়। এসবের ফলে দেশে খাদ্য সংকট সৃষ্টি হয়। সর্বোপরি দেশের অভ্যন্তরে মজুদদার, দুর্নীতিবাজ এবং ষড়যন্ত্রকারী গোষ্ঠী তৎপর হতে থাকে। বঙ্গবন্ধুর সরকার জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি

এবং শোষণহীন সমাজ গঠনের লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টিসহ বিভিন্ন দল নিয়ে বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) গঠন করে। গণমানুষের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু নতুন একটি ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্যোগ নেন। এটিকে জাতির জনক ‘দ্বিতীয় বিপ্লব’ বলে অভিহিত করেন।

পররাষ্ট্রনীতি : পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি ঢাকায় পদার্পণ করে বঙ্গবন্ধু বলেন, ‘বাংলাদেশ শান্তিতে বিশ্বাস করে, কারও প্রতি বৈরী আচরণ সমর্থন করবে না।’ তিনি স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন, ‘সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারও সাথে শত্রুতা নয়’ -এ নীতির ভিত্তিতে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারিত হবে। তিনি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান এবং পুনর্গঠনে সহযোগিতা প্রদানের জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে অনুরোধ করেন। ফলে স্বল্প সময়ের মধ্যে ১৪০টি দেশ বাংলাদেশকে স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন চট্টগ্রাম বন্দরকে মাইনমুক্ত করাসহ নানাভাবে সহযোগিতার হাত সম্প্রসারণ করে। অন্যান্য বন্ধুভাবাপন্ন দেশও খাদ্যদ্রব্য ও ত্রাণসামগ্রী নিয়ে এগিয়ে আসতে থাকে।

ভারতীয় মিত্রবাহিনীর ফেরত যাওয়া : বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সেনাবাহিনী মিত্রবাহিনী হিসেবে অংশগ্রহণ করেছিল। পাকিস্তানি বাহিনীকে পরাজিত করার ক্ষেত্রে তাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান অবিস্মরণীয়। ভারতীয় বাহিনীর উপস্থিতি নিয়ে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন মহলকে অপপ্রচারের সুযোগ না দিয়ে বঙ্গবন্ধু ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর সরকারকে মিত্রবাহিনীর সদস্যদের ফিরিয়ে নেওয়ার অনুরোধ করেন। ১৯৭২ সালের মার্চ মাসেই মিত্রবাহিনী বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে ফিরে যায়। বিশ্ব ইতিহাসে বিদেশি সৈন্যদের এত দ্রুত স্বদেশে ফিরে যাবার নজির বিরল। এতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়।

আন্তর্জাতিক বিশ্বে বাংলাদেশ : ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ ব্রিটিশ কমনওয়েলথের এবং ১৯৭৪ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে। বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বাংলায় প্রথম ভাষণ প্রদান করেন। এছাড়া বাংলাদেশ জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনেরও সদস্যপদ লাভ করে। বিশ্বশান্তি পরিষদ বঙ্গবন্ধুকে ‘জুলিও কুরি’ শান্তি পদকে ভূষিত করে। বঙ্গবন্ধুর সময়ে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সম্মানের মর্যাদা লাভ করে।

যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রের হাল ধরতে গিয়ে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারকে দেশি-বিদেশি নানা ষড়যন্ত্র ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করতে হয়। এর মধ্যেও স্বল্প সময়ে সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়।

১৯৭২ সালের সংবিধান প্রণয়ন পটভূমি

সংবিধান হচ্ছে একটি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ দলিল। সংবিধানের মাধ্যমেই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য, আদর্শ ও লক্ষ্য প্রতিফলিত হয়। ১৯৭২ সালের ১১ই জানুয়ারি রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অস্থায়ী সংবিধান আদেশ জারি করেন। এতে রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। অস্থায়ী সংবিধান আদেশের বিভিন্ন দিক হলো: এই আদেশ বাংলাদেশের অস্থায়ী সংবিধান আদেশ। এটি অবিলম্বে বলবৎ হবে। এটি সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হবে। বাংলাদেশের জন্য একটি সংবিধান রচনার উদ্দেশ্যে একটি গণপরিষদ গঠিত হবে। দেশে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার থাকবে। প্রধানমন্ত্রী হবেন এর প্রধান। রাষ্ট্রপতি হবেন রাষ্ট্রপ্রধান।

কাজ

দলীয় : অস্থায়ী সংবিধান আদেশের বিভিন্ন দিক ও এর উদ্দেশ্য বর্ণনা কর।

একটি সংবিধান প্রণয়ন করে জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ২৩শে মার্চ ‘বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ’ নামে একটি আদেশ জারি করেন। এ আদেশ অনুসারে ১৯৭০ সালের

নির্বাচনে প্রাদেশিক ও জাতীয় পরিষদে নির্বাচিত সদস্যগণ গণপরিষদের সদস্য হবেন। সংবিধান প্রণয়ন করাই হবে গণপরিষদের মূল লক্ষ্য। ১৯৭২ সালের ১০ই এপ্রিল গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে ৩৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি 'খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি' গঠন করা হয়। একজন নারী সদস্য এ কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হন। ন্যাপ (মোজাফ্‌ফর)-এর সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত (পরবর্তী সময় আওয়ামী লীগ নেতা) সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সদস্য ছিলেন। খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি দেশের বিভিন্ন সংগঠন ও আগ্রহী ব্যক্তিগণের কাছ থেকে সংবিধান সম্পর্কে প্রস্তাব আহ্বান করে।

১৯৭২ সালের ১২ই অক্টোবর গণপরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশনে খসড়া সংবিধান বিল আকারে পেশ করা হয়। ৪ঠা নভেম্বর বাংলাদেশের সংবিধান গৃহীত হয় এবং ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবস থেকে তা কার্যকর হয়। গণপরিষদে সংবিধানের উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেন, "এই সংবিধান শহিদের রক্তে লিখিত, এ সংবিধান সমগ্র জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক হয়ে বেঁচে থাকবে।" এখানে উল্লেখ্য যে, পাকিস্তানে সংবিধান প্রণয়ন করতে সময় লেগেছিল প্রায় নয় বছর (১৯৪৭-১৯৫৬) আর ভারতের লেগেছিল প্রায় তিন বছর (১৯৪৭-১৯৪৯)। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর সরকার মাত্র দশ মাসে বাংলাদেশকে একটি সংবিধান উপহার দিতে সক্ষম হয়। গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় জাতির জনকের এটা এক অসাধারণ অবদান।

১৯৭২ সালের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য

১৯৭২ সালের মূল সংবিধানটি স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে মহিমান্বিত। এ সংবিধানের বৈশিষ্ট্যাবলি নিম্নরূপ :

১৯৭২ সালের সংবিধান একটি লিখিত সংবিধান। সংবিধানটি দুষ্পরিবর্তনীয়। এ-সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার চারটি মূলনীতি — জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ লিপিবদ্ধ রয়েছে। এগুলোকে রাষ্ট্রের মূল স্তম্ভ হিসেবে ঘোষণা করা হয়। মানুষের মৌলিক প্রয়োজন, যেমন-অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি মেটানোর দায়িত্ব রাষ্ট্রের ওপর অর্পিত হয়। সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ এ সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্য। জীবন ধারণের অধিকার, চলাফেরার অধিকার, বাক-স্বাধীনতার অধিকার, চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা, ধর্মচর্চার অধিকার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভোগের অধিকার ইত্যাদি সংবিধানে সন্নিবেশিত রয়েছে। সংবিধানে বাংলাদেশকে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়। জাতীয় সংসদ সার্বভৌম আইন প্রণয়নকারী সংস্থা। এ সংবিধানে বাংলাদেশকে প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়, যা 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' নামে পরিচিত।'জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস'- সংবিধানের এ ঘোষণা দ্বারা জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সংবিধানকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইনের মর্যাদা প্রদান করা হয়। সংবিধান পরিপন্থী কোনো আইনকে অসাংবিধানিক বলে সুপ্রিম কোর্ট বাতিল করে সংবিধানের মর্যাদা ও প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবে। এ সংবিধানে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা বলা হয়েছে। সংবিধানের ৭৭ নং অনুচ্ছেদে 'ন্যায়পাল' পদ সৃষ্টির কথা উল্লেখ রয়েছে। বাংলাদেশ সংবিধানে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে ১৮ বছর বয়স্ক যে কোনো নাগরিক 'এক ব্যক্তি এক ভোট'-এ নীতির ভিত্তিতে সর্বজনীন ভোটাধিকার মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। এ সংবিধানে রাষ্ট্রীয়, সমবায় এবং ব্যক্তিগত মালিকানা নীতি স্বীকৃত। বাংলাদেশের আইনসভা এক কক্ষ বিশিষ্ট হবে। ১৯৭২ সালের সংবিধান বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সরকার এ পর্যন্ত ষোলবার সংশোধন করেছে। তন্মধ্যে জেনারেল জিয়াউর রহমানের পঞ্চম সংশোধনী এবং জেনারেল এরশাদের সপ্তম সংশোধনী ও ত্রয়োদশ সংশোধনী সুপ্রিম কোর্ট বাতিল করে দিয়েছে।

১৫ই আগস্টের নির্মম হত্যাকাণ্ড

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বাঙালির জাতীয় জীবনে ঘটে এক নির্মম, নিষ্ঠুর পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড। সেনাবাহিনীর কতিপয় উচ্চাভিলাষী ও উচ্ছৃঙ্খল সেনাসদস্য স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তির মদদে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা স্বাধীনতার

মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কের নিজ বাসভবনে নৃশংসভাবে হত্যা করে। বঙ্গবন্ধু পরিবারের উপস্থিত কোনো সদস্যই ঘাতকদের হাত থেকে রক্ষা পাননি। এমনকি ঘাতকের নিষ্ঠুর বুলেটের হাত থেকে রক্ষা পায়নি ১০ বছরের নিষ্পাপ শিশু রাসেলও। একটি আধুনিক ও শোষণ–দুর্নীতিমুক্ত রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে 'দ্বিতীয় বিপ্লবে'র কর্মসূচি নিয়ে বঙ্গবন্ধু যখন সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিলেন, ঠিক তখন দেশি–বিদেশি প্রতিক্রিয়াশীল অপশক্তি মহলের সহযোগিতায় দেশের অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকা ষড়যন্ত্রকারী গোষ্ঠী ১৫ই আগস্টের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করে। তারা বুঝতে পেরেছিল যে, বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধের মতো 'দ্বিতীয় বিপ্লবের' কর্মসূচি বাস্তবায়নেও সফল হবেন। তাই বাংলাদেশের রাজনৈতিক গতিপথকে উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্যেই ১৫ই আগস্টের নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছিল। এ হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে দেশে পাকিস্তানি সাম্প্রদায়িক ভাবাদর্শ পুনঃপ্রতিষ্ঠা পায়। এই হত্যাকাণ্ড ছিল একটি নৃশংস ও মানবতাবিরোধী অপরাধ। এটি ঘটেছিল গোপন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে। এ হত্যাকাণ্ডের পর বাংলাদেশ গভীর রাজনৈতিক সংকটে পড়ে। ১৫ই আগস্ট আমাদের জাতীয় শোক দিবস।

কাজ
দলীয় : (ক) ১৫ই আগস্টের হত্যাকাণ্ডের নির্মমতাকে উপস্থাপন কর।
(খ) জাতির পিতাকে হত্যার উদ্দেশ্য বর্ণনা কর।

বাংলাদেশের ইতিহাসে কতিপয় কলঙ্কময় অধ্যায় (১৫ই আগস্ট–৩রা নভেম্বর ১৯৭৫)

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার পর তৎকালীন বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমেদ রাষ্ট্রপতির পদে আসীন হয়ে সামরিক শাসন জারি করে এবং ২২শে আগস্ট মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী জাতীয় চার নেতাকে গ্রেফতার করে। ২৪শে আগস্ট জেনারেল কে. এম. সফিউল্লাহকে সরিয়ে জেনারেল জিয়াউর রহমানকে সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ নিযুক্ত করা হয়। ৩১শে আগস্ট এক অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ১৫ই আগস্টের হত্যাকারীদের বিচারের হাত থেকে রেহাই দেওয়ার জন্য ১৯৭৫ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর খন্দকার মোশতাক 'ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স' নামে সংবিধান ও আইনের শাসনবিরোধী একটি অধ্যাদেশ জারি করে। ১৫ই আগস্টের হত্যার সঙ্গে জড়িত জুনিয়র সেনা অফিসাররা ব্যারাকে ফিরে না গিয়ে প্রেসিডেন্ট ভবনে বসে দেশ পরিচালনায় হস্তক্ষেপ করতে থাকে। এতে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ সেনাবাহিনীর মধ্যে শৃঙ্খলা (চেইন অব কমাণ্ড) ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগী হন। ৩রা নভেম্বর তাঁর নেতৃত্বে এক সেনা অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। ৫ই নভেম্বর খন্দকার মোশতাক পদত্যাগের ঘোষণা দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ৬ই নভেম্বর সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এ.এস.এম. সায়েম নতুন রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

জেলখানায় পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড (৩রা নভেম্বর ১৯৭৫)

১৯৭৫ সালের ৩রা নভেম্বর গভীর রাতে ১৫ই আগস্ট হত্যাকাণ্ডের খুনিচক্র সেনাসদস্যরা দেশত্যাগের পূর্বে খন্দকার মোশতাকের অনুমতি নিয়ে ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে বেআইনিভাবে প্রবেশ করে সেখানে বন্দি অবস্থায় থাকা মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী জাতীয় চার নেতা– সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী ও এ. এইচ. এম. কামারুজ্জামানকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। শুরু হয় বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে আর একটি কলঙ্কময় অধ্যায়ের। এ পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড দেশের জনগণ এবং সেনাবাহিনীর মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এ ঘটনা মোশতাকের পতন ত্বরান্বিত করে। খুনিরা দেশত্যাগে বাধ্য হয়। এ হত্যাকাণ্ড ছিল ৭১–এর মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত, স্বাধীনতাবিরোধী দেশীয় ও আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীর সম্মিলিত ষড়যন্ত্র ও নীলনক্সার বাস্তবায়ন। ১৫ই আগস্ট ও ৩রা

কাজ
একক : ৩ নভেম্বর জেল হত্যার উদ্দেশ্যগুলো চিহ্নিত কর।

নভেম্বরের হত্যাকাণ্ড একই গোষ্ঠী সংঘটিত করে। উভয় হত্যাকাণ্ডের মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের অর্জনসমূহ ধ্বংস ও দেশকে নেতৃত্বশূন্য করে পাকিস্তানি ভাবাদর্শ প্রতিষ্ঠা করা।

পরিচ্ছেদ ২.৩ : সেনা শাসন আমল (১৯৭৫–১৯৯০)

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের পর থেকে ১৯৯০ সালের ৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশে সেনা শাসন বহাল ছিল। দেশের সংবিধানকে উপেক্ষা করে খন্দকার মোশতাক, বিচারপতি সায়েম, জেনারেল জিয়াউর রহমান, বিচারপতি আহসান উদ্দিন এবং জেনারেল এরশাদ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। দেশে সেনা শাসন বহাল রেখে সুবিধামতো সময়ে জেনারেল জিয়াউর রহমান (১৯৭৫–১৯৮১) এবং জেনারেল এরশাদ (১৯৮২–১৯৯০) নির্বাচন সম্পন্ন করে বেসামরিক শাসন চালু করেন। তাদের অগণতান্ত্রিক শাসন, জনগণের ভোটাধিকার হরণ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী কার্যকলাপ দেশের জনগণকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। ফলে সেনা শাসনের বিরুদ্ধে দীর্ঘ আন্দোলন–সংগ্রামের পর অবশেষে ১৯৯১ সালে পুনরায় গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু হয়।

জেনারেল জিয়াউর রহমানের শাসন আমল (১৯৭৫–১৯৮১)

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় জেনারেল জিয়াউর রহমান সামরিক বাহিনীর মেজর ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর ২৬শে মার্চের স্বাধীনতা ঘোষণা তিনি ২৭শে মার্চ কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে জাতির মহান নেতা বঙ্গবন্ধুর নামে পাঠ করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় মুজিবনগর সরকারের অধীনে তিনি ২ নম্বর সেক্টর কমান্ডার ছিলেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হওয়ার পর খন্দকার মোশতাক সংবিধান লঙ্ঘন করে নিজেকে রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত করেন। এরপর ২৪শে আগস্ট তিনি সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ পদে জেনারেল জিয়াউর রহমানকে নিযুক্ত করেন। ৩ রা নভেম্বরের সেনা অভ্যুত্থানে খন্দকার মোশতাকের পতন ঘটে এবং জেনারেল জিয়াউর রহমান গৃহবন্দি হন। ৭ই নভেম্বর পাল্টা সেনা অভ্যুত্থান ঘটে এবং জেনারেল জিয়াউর রহমান মুক্ত হয়ে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসেন। রাষ্ট্রপতি বিচারপতি এ. এস. এম. সায়েম প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হন। কিন্তু ১৯৭৬ সালের ৩০ শে নভেম্বর জেনারেল জিয়াউর রহমান নিজেকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এবং ১৯৭৭ সালের ২১শে এপ্রিল রাষ্ট্রপতির পদে অধিষ্ঠিত করেন। জেনারেল জিয়াউর রহমানের শাসন আমলে সামরিক বাহিনীর মধ্যে বেশ কিছু ব্যর্থ অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। এতে বিচারের নামে অনেক নিরপরাধ সামরিক কর্মকর্তা ও সেনা সদস্যের সাজা, চাকরিচ্যুতি এমনকি মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। জেনারেল জিয়ার শাসন আমলে বাংলাদেশের রাজনীতি ও পররাষ্ট্রনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং ১৯৭২–এর সংবিধানের যেসব মৌলিক নীতি ও চেতনার ভিত্তিতে বাংলাদেশ পরিচালিত হয়ে আসছিল, তার বেশিরভাগই এ সময়ে বাতিল করে দেওয়া হয়। স্বাধীনতাবিরোধী পাকিস্তানপন্থি প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিবর্গকে তিনি সমাজ ও রাজনীতিতে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন। ৭ই নভেম্বর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে বন্দি অবস্থা থেকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি মুখ্য ভূমিকা পালন করেন সেই বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সেক্টর কমান্ডার কর্নেল (অব.) আবু তাহেরকে ১৯৭৬ সালে সামরিক আদালতে প্রহসনের বিচার শেষে তারই আদেশে ফাঁসি দেওয়া হয়। ১৫ই আগস্টসহ বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের বিচার করা যাবে না মর্মে যে কুখ্যাত ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ প্রণীত হয়েছিল তার মূল হোতাও ছিলেন জেনারেল জিয়াউর রহমান।

কাজ
দলীয় : জেনারেল জিয়াউর রহমানের ক্ষমতা সুসংহত করণের পদক্ষেপগুলো চিহ্নিত কর।

নির্বাচন ও দল গঠন

১৯৭৬ সালে কিছু শর্ত সাপেক্ষে রাজনৈতিক দলগুলোকে 'ঘরোয়া রাজনীতি' করার অনুমতি দেওয়া হয়। ১৯৭৭ সালের ৩০শে মে জেনারেল জিয়াউর রহমান তার ক্ষমতা বৈধকরণের লক্ষ্যে হ্যাঁ/না ভোটের আয়োজন করেন। এরপর তিনি নিজস্ব পরিকল্পনা মতো বিভিন্ন দল থেকে নেতাকর্মীদের নিয়ে জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল (জাগদল) গঠন করেন।

এ সময়ে রাজনৈতিক দল ভাঙ্গা–গড়ার কাজও চলে। পরিশেষে চাপের মধ্যে ১৯৭৮ সালের ৩ রা জুন দেশে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচন উপলক্ষে দুটি জোট গঠিত হয়। একটি ছিল জেনারেল জিয়া প্রতিষ্ঠিত 'জাগদল'–এর নেতৃত্বাধীন জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট আর অপরটি হলো বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে 'গণতান্ত্রিক ঐক্য জোট'। জেনারেল জিয়া ছিলেন জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের প্রার্থী। মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি এম.এ.জি ওসমানী ছিলেন গণতান্ত্রিক ঐক্যজোটের প্রার্থী। নির্বাচনে জেনারেল জিয়াউর রহমান সহজে বিজয় অর্জন করেন। সামরিক শাসনাধীনে অনুষ্ঠিত এসব নির্বাচনে প্রধানত শাসকের ইচ্ছারই বাস্তবায়ন ঘটে। ১৯৭৮ সালের ১লা সেপ্টেম্বর জেনারেল জিয়াউর রহমান ইতোপূর্বে গঠিত জাগদল বিলুপ্ত ঘোষণা করে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) গঠন করেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে বিএনপির নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৭৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে ২০৭টি আসন পেয়ে বিএনপি জয়লাভ করে। উক্ত সংসদে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট থেকে ১৯৭৯ সালের ৬ই এপ্রিল পর্যন্ত যে সকল সামরিক বিধি, সংবিধান সংশোধনসহ বিভিন্ন অধ্যাদেশ জারি করা হয়, সেগুলো সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী হিসেবে পাস করা হয়। অবশ্য সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীকে দেশের সর্বোচ্চ আদালত ২০০৮ সালে এক রায়ে অবৈধ হিসেবে ঘোষণা করে। ১৯৭৯ সালের ৬ই এপ্রিল অনুষ্ঠিত সংসদ অধিবেশনে সামরিক শাসন প্রত্যাহার করা হয়। বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়া চালু করে রাজনীতিতে জেনারেল জিয়াউর রহমান মুক্তিযুদ্ধ বিরোধিতাকারীদের পুনর্বাসন করেন। তিনি সংবিধানের মূলনীতি পরিবর্তন করেন। রাজনীতিতে ধর্মের অপব্যবহারের পথ তৈরি করেন। জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্রের নিজস্ব ব্যাখ্যা প্রদান করেন। রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াউর রহমান তাঁর দলের ১৯ দফা কর্মসূচি এবং বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ ধারণার প্রবক্তা। তিনি খালকাটা কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী চীন ও সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের বেশ কিছু দেশ বাংলাদেশকে এই সময়ে স্বীকৃতি প্রদান করে। পাকিস্তান বাংলাদেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলে। ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নসহ পূর্ব ইউরোপীয় দেশসমূহের সঙ্গে সম্পর্ক শীতল হয়ে পড়ে। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি হয়। ধর্মকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করার লক্ষ্যে এ সময় বাংলাদেশ মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের নীতি অনুসরণ করে। জিয়াউর রহমান দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (সার্ক) গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন।

কাজ
দলীয় : জেনারেল জিয়াউর রহমানের সামরিক শাসন বৈধকরণের পদক্ষেপগুলো কী ছিল, তার তালিকা তৈরি কর।

১৯৮১ সালের ৩০শে মে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াউর রহমান একদল সামরিক কর্মকর্তার হাতে নির্মমভাবে নিহত হন। ফলে জেনারেল জিয়াউর রহমানের সাড়ে পাঁচ বছরের সেনা শাসনের অবসান ঘটে।

জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের শাসন আমল (১৯৮২–১৯৯০)

১৯৮১ সালের ৩০শে মে জেনারেল জিয়াউর রহমান নিহত হওয়ার পর সংবিধান অনুযায়ী উপ–রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবদুস সাত্তার অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ সময় সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ ছিলেন জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। ১৯৮১ সালের ১৫ই নভেম্বর অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিচারপতি আবদুস সাত্তার জয়লাভ করেন। কিন্তু বিচারপতি সাত্তারের দুর্বল নেতৃত্ব, রাজনৈতিক অস্থিরতা, দুর্নীতি, দলীয় কোন্দল, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ও অর্থনৈতিক সংকটের কারণ দেখিয়ে ১৯৮২ সালের ২৪ শে মার্চ জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ সামরিক আইন জারি করে রক্তপাতহীন এক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সাত্তার সরকারকে সরিয়ে ক্ষমতা দখল করেন। ক্ষমতায় এসেই তিনি সংবিধান স্থগিত করেন এবং জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেন। সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি আহসান উদ্দিনকে রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করা হয়। সামরিক বাহিনীর প্রধান জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হন। ১৯৮৩ সালের ১১ই ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি আহসান উদ্দিনকে অপসারণ করে জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ নিজেই রাষ্ট্রপতি পদে আসীন হন।

কাজ
দলীয় : জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ কীভাবে ক্ষমতায় আসেন তা চিহ্নিত কর।

১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চ সামরিক শাসন জারির পর দেশে রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হয়। পত্র-পত্রিকা স্বাধীনভাবে সংবাদ পরিবেশন করার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। শেখ হাসিনা, ড. কামাল হোসেন, মোহাম্মদ ফরহাদসহ বেশ কয়েকজন নেতাকে গ্রেফতার বা অন্তরীণ করা হয়। ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন, জাসদ ছাত্রলীগসহ কয়েকটি ছাত্র সংগঠন ১৯৮৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম বিক্ষোভ করে। শুরু হয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে এরশাদ বিরোধী আন্দোলন। এ আন্দোলনে পুলিশি হামলায় ও সরকার সমর্থক সন্ত্রাসীদের কর্মকাণ্ডে সেলিম, দেলোয়ার, শাহজাহান সিরাজ, জয়নাল, দিপালী সাহা ও রাউফুন বসুনিয়াসহ বেশ কয়েকজন ছাত্র নিহত হন। এরপর আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১৫ দলীয় এবং বিএনপির নেতৃত্বে ৭ দলীয় জোটগঠিত হয়। এ জোটসমূহের আন্দোলনই ১৯৯০-এ এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে গণআন্দোলনে পরিণত হয়। অবশেষে ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর জেনারেল এরশাদ পদত্যাগে বাধ্য হন।

জেনারেল এরশাদ সরকার পূর্ববর্তী জেনারেল জিয়াউর রহমান সরকারের অধিকাংশ নীতি অনুসরণ করে।

দল গঠন ও নির্বাচন

জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ক্ষমতা গ্রহণের শুরু থেকেই ব্যাপক রাজনৈতিক বিরোধিতার মুখে পড়েন। ব্যাপক ছাত্র আন্দোলন ও রাজনৈতিক দলসমূহের দাবির মুখে দ্রুত রাজনৈতিক কার্যক্রম শুরু করতে বাধ্য হন। ১৯৮৩ সালের ১লা এপ্রিল ঘরোয়া রাজনীতি এবং ১৪ই নভেম্বর প্রকাশ্য রাজনীতির অনুমতি প্রদান করেন। ১৯৮৩ সালের ১৭ই মার্চ ১৮ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে এরশাদ নিজেই জনদল নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯৮৩ সালে দেশে ইউনিয়ন পরিষদ এবং ১৯৮৪ সালে পৌরসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৮৫ সালের ২১শে মার্চ এরশাদ গণভোটের আয়োজন করেন। এ গণভোটে জনগন 'হ্যাঁ'/'না'র মাধ্যমে মতামত ব্যক্ত করে।

জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ প্রশাসনিক বিকেন্দ্রী করণের লক্ষ্যে উপজেলা পদ্ধতি চালু করেন। ১৯৮৫ সালের ১৬ ও ২০শে মে নতুন প্রবর্তিত উপজেলা পরিষদের নির্বাচন রাজনৈতিক দলগুলোর বিরোধিতা সত্ত্বেও অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৮৫ সালের ১৬ই আগস্ট জনদলসহ ৫টি ছোট দল নিয়ে জাতীয় ফ্রন্ট গঠিত হয়। এই ফ্রন্টই ১৯৮৬ সালের ১লা জানুয়ারি জাতীয় পার্টি নামে আত্মপ্রকাশ করে। জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ সামরিক বাহিনী থেকে অবসর নিয়ে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান পদ গ্রহণ করেন।

১৯৮৬ সালের ৭ই মে তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের জাতীয় পার্টি, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ৮ দলীয় জোট এবং জামায়াতে ইসলামীসহ মোট ২৮টি দল অংশগ্রহণ করে। বিএনপির নেতৃত্বাধীন ৭ দলীয় জোট নির্বাচন বর্জন করে। নির্বাচনে জাতীয় পার্টি মোট ৩০০ আসনের মধ্যে ১৫৩টি আসন পেয়ে জয়লাভ করে। আওয়ামী লীগ এককভাবে ৭৬টি আসন লাভ করে দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হিসেবে আবির্ভূত হয়। নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য দল জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের বিরুদ্ধে মিডিয়া ক্যু র মাধ্যমে বিজয় ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উত্থাপন করে। পর্যবেক্ষকগণও এ অভিযোগের যথার্থতাকে সমর্থন করেন। ১৯৮৬ সালের ১৫ই অক্টোবর রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বিরোধী দলগুলো নির্বাচন বয়কট করে। প্রহসনমূলক এ নির্বাচনে জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদকে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করা হয়।

১৯৮৬ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পর থেকেই এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে সকল রাজনৈতিক দল, সাধারণ জনগণ এবং নাগরিক সমাজ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। জেনারেল এরশাদের পদত্যাগ ও একটি অর্থবহ নির্বাচনের দাবিতে বিরোধী দল গণআন্দোলন শুরু করে। ১৯৮৭ সালে সংসদ থেকে একযোগে বিরোধী দল পদত্যাগ করলে ডিসেম্বরে জাতীয় সংসদ ভেঙে দেওয়া হয়। ১৯৮৮ সালের ৩রা মার্চ চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আয়োজন করা হয়। আওয়ামী লীগ, বিএনপিসহ দেশের প্রধান দলগুলো নির্বাচন বর্জন করে। ভোটারবিহীন, দলবিহীন এ নির্বাচনে জাতীয় পার্টিকে ২৫১টি আসনে বিজয়ী দেখানো হয়। সরকার অনুগত আ.স.ম. রবের নেতৃত্বাধীন সম্মিলিত বিরোধী জোটকে ১৯টি আসন দেওয়া হয়। বাকি আসনের ৩টি জাসদ (সিরাজ), ২টি ফ্রিডম পার্টি এবং ২৫টি স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মাঝে বণ্টন করা হয়।

জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের ৯ বছরের দীর্ঘ শাসনকালে রাস্তাঘাট নির্মাণসহ দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়।

পরিচ্ছেদ ২.৪ : গণতন্ত্রের পুনর্যাত্রা

স্বাধীনতাবিরোধী ঘাতকচক্রের হাতে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাত বরণের পর বাংলাদেশের গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। দেশে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত সামরিক, বেসামরিক আদলে সেনা শাসন অব্যাহত ছিল।

১৯৯০ সালে ৬ই ডিসেম্বর জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের পদত্যাগের মধ্য দিয়ে সামরিক শাসনের অবসান ঘটে; গণতন্ত্রের পুনর্যাত্রা শুরু হয়। সকল দলের অংশগ্রহণে ১৯৯১ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশে সরকার পরিবর্তনের গণতান্ত্রিক ধারা চালু হয়। সামরিক সরকারসমূহের দুঃশাসনের কবল থেকে মুক্ত হয়ে জনগণ দেশে একটি স্থায়ী গণতান্ত্রিক ধারা এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অগ্রসর হয়। এ অগ্রযাত্রায় সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ এক বীরত্বপূর্ণ অবদান রাখে। একটি প্রকৃত জনপ্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে মানুষ জেল-জুলুম-নির্যাতন এমনকি মৃত্যুকে তুচ্ছজ্ঞান করে অকাতরে প্রাণ দেয়। জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধি কর্তৃক শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার পথ উন্মুক্ত হয়। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার থেকে সংসদীয় সরকার পদ্ধতি দেশে পুনঃপ্রবর্তন ও সংবিধানে তা অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৯৯০-এর গণঅভ্যুত্থান ও গণতন্ত্রের পুনর্যাত্রা

১৯৮২ সালের শেষ দিকে জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের শিক্ষানীতি বাতিলের দাবিতে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটায় ছাত্র সমাজ। ১৯৭২ সালের মূল সংবিধান অক্ষুণ্ন রেখে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৮৩ সালে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১৫ দলীয় ঐক্যজোট এবং বিএনপির নেতৃত্বে ৭ দলীয় জোট গঠিত হয়। ১৫ দল ও ৭ দল সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনকে সফল করার লক্ষ্যে ৫ দফা দাবি ঘোষণা করে। ৫ দফা কর্মসূচির মূল দাবি ছিল অবিলম্বে সামরিক শাসন প্রত্যাহার, সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নেওয়া এবং যে কোনো নির্বাচনের আগে সার্বভৌম জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠান।

সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বেসামরিক সরকারকে উৎখাত করে ক্ষমতা দখল বাংলাদেশের জনগণ ভালো চোখে দেখেনি। ফলে জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ দীর্ঘ প্রায় নয় বছরের শাসনকালে প্রবল গণআন্দোলনের সম্মুখীন হন। এ আন্দোলনে রাজনৈতিক দল ছাড়াও ছাত্র, শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইনজীবী, সাংবাদিক, কৃষিবিদ, কৃষক-শ্রমিকসহ সকল শ্রেণি ও পেশার জনগণ অংশ গ্রহণ করে। তাই এ আন্দোলন গণআন্দোলন থেকে ক্রমান্বয়ে গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়। উল্লিখিত ১৫ দল, ৭ দল, শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদসহ বিভিন্ন জোটের আন্দোলনের চাপে জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ প্রকাশ্য রাজনৈতিক কর্মসূচি পালনের অনুমতি দেন।

কাজ

দলীয় : ১৯৯০-এর গণঅভ্যুত্থানে জোটের রাজনীতির গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

১৯৮৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন, প্রেসিডেন্ট নির্বাচন এবং ১৯৮৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের অভিজ্ঞতা থেকে রাজনৈতিক দলগুলোর বদ্ধমূল ধারণা জন্মে যে, জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের শাসন আমলে কোনো সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব নয়। তাই ১৯৮৭ সালে ৮ দল, ৭ দল ও ৫ দল জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের পদত্যাগের এক দফা দাবিতে একমত পোষণ করে এবং সকল জোট ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন শুরু করে। তিন জোটের হরতাল

কাজ

দলীয় : জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদবিরোধী আন্দোলনের বিভিন্ন জোটগুলোর নাম উল্লেখ করে তাদের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর ।

এবং 'ঢাকা অবরোধ' কর্মসূচির ফলে এরশাদবিরোধী আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। আন্দোলনের একপর্যায়ে ১৯৮৭ সালের ১০ই নভেম্বর নুর হোসেন বুকে ও পিঠে 'গণতন্ত্র মুক্তি পাক, স্বৈরাচার নিপাত যাক' শ্লোগান লিখে ঢাকার জিপিও (জেনারেল পোস্ট অফিস)-এর নিকট জিরো পয়েন্টে পুলিশের গুলিতে নিহত হন। এতে আন্দোলনকারী জনগণ ক্ষুব্ধ হয়। ১৯৮৭ সালের ১২ই নভেম্বর শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়াকে গ্রেফতার করা হয়। ২৭শে নভেম্বর এরশাদ সরকার দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন। ১৯৮৮ সালের ২৪শে জানুয়ারি চট্টগ্রামে শেখ হাসিনার এক সমাবেশে সরকারের মদদপুষ্ট সন্ত্রাসীরা নির্বিচারে জনতার ওপর গুলি চালায়। অল্পের জন্য শেখ হাসিনা প্রাণে রক্ষা পান। এর বিরুদ্ধে সমগ্র দেশ প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। ১৯৯০ সালের ১০ই অক্টোবর বিরোধী জোট ও দলগুলোর সচিবালয় ঘেরাও কর্মসূচি রাজনৈতিক অঙ্গনকে উত্তপ্ত করে তোলে। ঐ দিন মিছিলে গুলিবর্ষণে ৫ জন নিহত এবং তিন শতাধিক আহত হয়। ১০ই অক্টোবর ২২টি ছাত্র সংগঠন 'সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য' গঠন করে এবং এরশাদের পতন না হওয়া পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেয়। বিরোধী দলের একের পর এক আন্দোলন ও কর্মসূচির কারণে জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ পিছু হটতে থাকেন। আন্দোলন থামানোর জন্য বিভিন্ন কর্মসূচির কথা ঘোষণা করেও এরশাদ সরকার আবার তা প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়। তিন জোট কর্তৃক জেনারেল এরশাদ ও তার সরকারের পদত্যাগ এবং নির্দলীয় নিরপেক্ষ ব্যক্তির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ফর্মুলাসহ একটি যৌথ ঘোষণা জাতির সমক্ষে উপস্থাপন করা হয়, যা 'তিন জোটের রূপরেখা' নামে খ্যাত। ২৭শে নভেম্বর বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন (বিএমএ) নেতা ডা. সামসুল আলম মিলনের গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ এরশাদবিরোধী আন্দোলনকে চরম রূপ দেয়। ২৯শে নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ একযোগে পদত্যাগ করেন। পাশাপাশি অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দও পদত্যাগের ঘোষণা দেন। সংগঠিত হয় এরশাদবিরোধী ৯০-এর গণঅভ্যুত্থান। এ সময়ে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ৮ দলীয় জোট, বিএনপির নেতৃত্বাধীন ৭ দলীয় জোট এবং ৫ দলীয় বাম জোট একটি অভিন্ন কর্মসূচিতে ঐক্যবদ্ধ হলে ১৯৯০-এর ৪ঠা ডিসেম্বর জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা থেকে পদত্যাগের ঘোষণা দেন। ৬ই ডিসেম্বর তিন জোটের রূপরেখা অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমেদের নেতৃত্বে গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের হাতে জেনারেল এরশাদ আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। নতুন ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমেদ গণতন্ত্রের অভিযাত্রায় জাতিকে নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

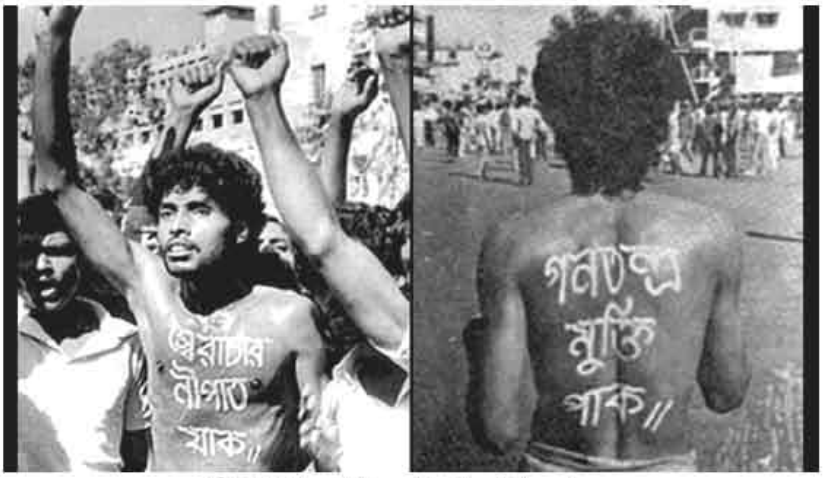

চিত্র ২.১২ : গণ অভ্যুত্থানে নুর হোসেন

১৯৯০ সালের গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে সামরিক শাসনের অবসান ঘটে এবং গণতন্ত্রের পুনর্যাত্রা শুরু হয়। সকল রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণে ১৯৯১ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশে সরকার পরিবর্তনের গণতান্ত্রিক ধারা চালু হয়। সংসদীয় সরকার পদ্ধতি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হয়। দেশে অবাধ তথ্যপ্রবাহ সৃষ্টি, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, পত্র-পত্রিকার ওপর থেকে বিধিনিষেধ প্রত্যাহার ইত্যাদির ব্যবস্থা হয়। বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে পৃথিবীতে পরিচিতি পায়।

১৯৯১ সালের সাধারণ নির্বাচনে বিএনপি ১৪০টি আসন লাভ করে। কিন্তু সরকার গঠনের জন্য ১৫১টি আসন প্রয়োজন হয়। এ অবস্থায় বিএনপি জামায়াতে ইসলামীর সমর্থন নিয়ে সরকার গঠন করে এবং বেগম খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। বিএনপি সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত বেশ কয়েকটি উপ–নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ ওঠে। দলীয় সরকারের অধীনে অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠান আদৌ সম্ভব নয় বলে রাজনৈতিক মহলে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়। ফলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে সকল দল ঐক্যবদ্ধ হয়। বিএনপি তা অগ্রাহ্য করে ১৯৯৬ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি এককভাবে দলবিহীন নির্বাচন করে। উক্ত নির্বাচন জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্যতা না পাওয়ায় ২৬শে মার্চ ১৯৯৬ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিল সংসদে পাস হয় এবং ৩০শে মার্চ বিএনপি সরকার পদত্যাগ করে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হন বিচারপতি হাবিবুর রহমান। এ সরকারের অধীনে ১২ই জুন ১৯৯৬ সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ১৪৬টি আসন লাভ করে। জাতীয় পার্টি আওয়ামী লীগকে সরকার গঠনে সমর্থন প্রদান করে এবং বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। মেয়াদ শেষে আওয়ামী লীগ ২০০১ সালে দ্বিতীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে। এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ২০০১ সালের ১লা অক্টোবর অনুষ্ঠিত অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির নেতৃত্বাধীন ৪ দলীয় জোট ২১৯টি আসন লাভ করে সরকার গঠন করে। নির্ধারিত মেয়াদ শেষে ২০০৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ নিয়ে সংকট তৈরি হয়। রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গঠনবিধি উপেক্ষা করে প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব নিজের ওপর নেন। এর ফলে সংকট আরও ঘনীভূত হয়। বিরোধী দল বিধান অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন ও সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবিতে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। এরূপ অবস্থায় ২০০৭ সালের ১১ই জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ প্রধান উপদেষ্টার পদ থেকে সরে দাঁড়ান এবং দেশে জরুরি অবস্থা জারি করেন। ১২ই জানুয়ারি সেনাবাহিনীর সমর্থন নিয়ে ড. ফখরুদ্দীন আহমদ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হন। এ সময়ে কার্যত সেনাবাহিনী দেশ পরিচালনা করতে থাকে। দেশের দুটি প্রধান দলের দুই নেত্রীকে গ্রেফতার করা হয়। রাজনৈতিক সংস্কারের নামে বিরাজনীতিকীকরণ এবং সেনাশাসন দীর্ঘস্থায়ী করার নীলনকশা নিয়ে তারা অগ্রসর হয়। কিন্তু সেনাশাসনের অতীত তিক্ত অভিজ্ঞতা থাকায় জনগণের প্রতিবাদ ও বিরোধিতায় তা সফল হয়নি। অতঃপর নির্বাচন কমিশন ছবিযুক্ত নতুন ভোটার তালিকা ও আচরণবিধি প্রণয়ন শেষে ২০০৮ সালের ২৯শে ডিসেম্বর নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করে। উক্ত নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট ২৬২টি আসন পেয়ে সরকার গঠন করে এবং শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। মহাজোট সরকার দেশের আর্থ–সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের লক্ষণীয় অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখে শাসনকার্য পরিচালনা করেছে। সাংবিধানিক ধারাবাহিকতায় ৫ই জানুয়ারি ২০১৪ দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনেও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বিজয়ী হয়ে সরকার পরিচালনা করছে।

কাজ

দলীয় : কীভাবে বাংলাদেশে গণতন্ত্র পুনর্যাত্রা করে তা বর্ণনা কর।

বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য আর্থ–সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রযাত্রা

বাংলাদেশ দারিদ্র্যপীড়িত দেশ হিসেবে পরিচিত। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার ছিল ৭০ শতাংশ। সরকারি বিভিন্ন নীতি ও কৃষক–শ্রমিকসহ জনগণের সম্মিলিত চেষ্টায় বাংলাদেশে গত ৪৬ বছরে দারিদ্র্যের হার ২৪ শতাংশে নেমে এসেছে। ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত পাঁচটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও একটি দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য ছিল দারিদ্র্য বিমোচন। সরকারের গৃহীত বিভিন্ন নীতি দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষকে দারিদ্র্য জয়ে সহযোগিতা করেছে। দারিদ্র্য হ্রাসের মাধ্যমে বাংলাদেশের মানব উন্নয়ন সূচকে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটেছে। বাংলাদেশের মানব উন্নয়ন সূচক দক্ষিণ এশিয়ার পাকিস্তান, নেপাল ও আফগানিস্তানের তুলনায় ভালো। উন্নয়ন সহযোগীদের পরামর্শক্রমে প্রণীত 'জাতীয় দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্র' ও 'জাতীয় দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্র–২: দিন বদলের

পদক্ষেপ' বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। বাংলাদেশকে ২০২১ সাল নাগাদ একটি শক্তিশালী মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরিত করার লক্ষ্য নিয়ে বর্তমান সরকার কাজ করে যাচ্ছে। গত তিন দশকে বাংলাদেশের খাদ্য উৎপাদন বেড়েছে তিন গুণ। তৈরি পোশাক খাতে সারা বিশ্বে রপ্তানি বাণিজ্যে বাংলাদেশ এখন তৃতীয় অবস্থানে।

দারিদ্র্য বিমোচন ছাড়াও সামাজিক বিভিন্ন খাতে বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা অব্যাহত রয়েছে। বিশেষত শিক্ষার প্রসার, শিশু মৃত্যুহার হ্রাস ও নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ বিশ্বে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছে বলে মত প্রকাশ করেছেন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. অমর্ত্য সেন। গত চার দশকে বাংলাদেশে শিশু মৃত্যুহার প্রতি এক হাজারে ১৮৫ থেকে কমে ৪৮ জনে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষার হার পাকিস্তান আমলের ১৭ ভাগ থেকে বেড়ে ৬৫ ভাগে উন্নীত হয়েছে। বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়নের ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন এসেছে। সৃজনশীল পদ্ধতির মূল্যায়ন ব্যবস্থা, শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্য–প্রযুক্তির ব্যবহার, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও নতুন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রভৃতি বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে। স্কুলে শিক্ষার্থী ভর্তি ও বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষার পাসের হার অনেক বেড়েছে, শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার কমেছে ও শ্রেণিতে নারী শিক্ষার্থীর উপস্থিতির হার বেড়েছে। এছাড়া একীভূত শিক্ষা গ্রহণ করার ফলে 'সবার জন্য শিক্ষা' কার্যক্রম সফলতা পেয়েছে। যার ফলে ভিশন–২০২১ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরকার এগিয়ে যাচ্ছে।

কাজ
একক : সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির তালিকা তৈরি কর।

নারীর ক্ষমতায়ন ও স্বাস্থ্য রক্ষায় বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত কিছু গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো– মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান, টিকা দান, দুস্থ নারীদের সহায়তা প্রকল্প, নারী শিক্ষা বিস্তারে উপবৃত্তি প্রদান ইত্যাদি। এসব পদক্ষেপ নারীর সার্বিক উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব রেখেছে। ২০১১–২০১২ অর্থবছরে ১ লাখ ১২ হাজার প্রসূতি নারীকে অনুদান দেওয়া হয়। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনির আওতায় ২০১০–২০১১ অর্থবছর থেকে শহর অঞ্চলের কর্মজীবী মায়েরা 'ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল' থেকে অর্থ সাহায্য পাচ্ছেন। নারীর প্রতি পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধে ২০১০ সালে প্রণীত হয়েছে 'পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন'। নারীর ক্ষমতায়ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় এ আইনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে বিশেষত দরিদ্র মানুষের খাদ্য প্রাপ্তি ও পুষ্টির জন্য প্রণীত হয় 'খাদ্য নীতি ২০০৬'। প্রান্তিক ও গ্রামীণ জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা দিতে সরকার বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি, যেমন–কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা), ভিজিএফ, ভিজিডি, টিআর প্রভৃতি পরিচালনা করছে। এসব কর্মসূচির মাধ্যমে সরকার বছরে প্রায় ২০ লাখ টন চাল দুস্থ, নিরন্ন, প্রতিবন্ধী, শ্রমিকদের সরবরাহ করে। এছাড়া পরিবেশ ও দুর্যোগ মোকাবিলা বিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রম ও পদক্ষেপ গ্রহণ করার ফলে সরকার ইতোমধ্যে প্রশংসা অর্জন করেছে।

কাজ
একক : বাংলাদেশ সরকারের উল্লেখযোগ্য আর্থ–সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সাথে ভিশন–২০২১ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের যোগসূত্র স্থাপন কর।

শিশুদের সুরক্ষা ও তাদের জীবন–বিকাশে সরকার ২০১১ সালে প্রণয়ন করেছে 'জাতীয় শিশু নীতি ২০১১'। ১৮ বছরের কম বয়সী সকল ব্যক্তিই এ নীতি অনুযায়ী শিশু। জবরদস্তিমূলক ভারী ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশুদের ব্যবহার এ নীতিতে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। পথশিশু ও বিপথগামী শিশুদের বিকাশে পৃথক ব্যবস্থা রাখার কথা বলা হয়েছে। সাংস্কৃতিক অগ্রগযাত্রায়ও বাংলাদেশ পিছিয়ে নেই। মাতৃভাষা বাংলা আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার মর্যাদা পেয়েছে। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে বাংলা ভাষা জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষায় পরিণত হবে। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি যে বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির জন্য

এ দেশের ছাত্র ও সাধারণ মানুষ রক্ত দিয়েছিল, আজ সে দিনটি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে জাতিসংঘ কর্তৃক স্বীকৃত। এটি আমাদের দেশ ও জনগণের জন্য বড় অর্জন। বাংলাদেশের বাংলা বর্ষবরণ উদযাপনে যে মঙ্গলশোভাযাত্রার আয়োজন করা হয় তা 'ইনট্যানজিবল হেরিটেজ' হিসেবে ইউনেস্কোর বিশ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকায় স্থান পেয়েছে। ফলে আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. মুজিবনগর স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের কাঠামোটি ছকে উপস্থাপন কর।
২. স্বাধীনতা অর্জনে গণমাধ্যমের ভূমিকা চিহ্নিত কর।
৩. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা লেখ।
৪. ১৯৯০ সালে গণঅভ্যুত্থানের মূল কারণ কী?
৫. 'স্বাধীনতা আমাদের দেশ ও জনগণের সবচেয়ে বড় অর্জন।'– কথাটির পক্ষে তোমার যুক্তিগুলো লেখ।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন :

১. স্বাধীনতা অর্জনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান বর্ণনা কর।
২. যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গঠন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।
৩. ১৯৭২ সালের সংবিধানে বর্ণিত মূলনীতিসমূহ ব্যাখ্যা কর।
৪. জেনারেল জিয়ার শাসন আমল মূল্যায়ন কর।
৫. জেনারেল এরশাদের নির্বাচন পদ্ধতি মূল্যায়ন কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. মুজিবনগর সরকারের ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী কে ছিলেন?

ক. এম. মনসুর আলী
খ. তাজউদ্দীন আহমদ
গ. খন্দকার মোশতাক আহমেদ
ঘ. এ.এইচ.এম. কামারুজ্জামান

২. মুক্তিযুদ্ধের প্রতি বিশ্ব জনমত গঠনের জন্য সরকার ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব–

i. স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র পরিচালনা করেন
ii. গেরিলা যোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন
iii. বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে বক্তব্য রাখেন

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii
খ. ii ও iii
গ. i ও iii
ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনের কার্যক্রম শুরু হয়। এই পুনর্গঠনের পদক্ষেপ হিসেবে বঙ্গবন্ধু সরকার ১৯৭২ সাল পর্যন্ত বকেয়া সুদসহ কৃষি জমির খাজনা মওকুফ করে দেন। পরবর্তী সময়ে তিনি ‘দ্বিতীয় বিপ্লব’ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন।

৩. অনুচ্ছেদের আলোকে বঙ্গবন্ধুর গৃহীত প্রাথমিক পদক্ষেপটি তাঁর কোন উদ্যোগের আওতাভুক্ত?

ক. নতুন সংবিধান প্রণয়ন
খ. রিলিফ প্রদান ও রেশনিং ব্যবস্থা
গ. ‘দ্বিতীয় বিপ্লব’ কর্মসূচি গ্রহণ
ঘ. নতুন অর্থনৈতিক পাঁচশালা পরিকল্পনা

৪. অনুচ্ছেদে বর্ণিত বঙ্গবন্ধুর গৃহীত পরবর্তী পদক্ষেপটি কী উদ্দেশ্যে গ্রহণ করেন?

ক. কৃষিক্ষেত্রের উন্নয়ন
খ. ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন সাধন
গ. প্রযুক্তি ক্ষেত্রের উন্নয়ন সাধন
ঘ. আর্থ–সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রের উন্নয়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন :

১. ইমরানের বাবা স্বাধীন বাংলা বেতারের শিল্পী ছিলেন। তাঁর গান শুনে সাধারণ মানুষ অনুপ্রাণিত হয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নেয়। অন্যদিকে তার মা মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে খাবার সরবরাহ করতেন। মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা করতেন।

ক. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে কী নামে আখ্যা দেওয়া হয়েছে?
খ. বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে মুজিবনগর সরকার কেন গঠন করা হয়েছিল ?
গ. ইমরানের বাবা যে মাধ্যমে কাজ করতেন, মুক্তিযুদ্ধে উক্ত মাধ্যমের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।
ঘ. স্বাধীনতা অর্জন ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে ইমরানের মায়ের মতো অনেক নারীর ভূমিকাই ছিল তাৎপর্যপূর্ণ।– তোমার পঠিত বিষয়বস্তুর আলোকে যুক্তি উপস্থাপন কর।

২. মুক্তিযোদ্ধার সন্তান দুলু মিয়া ১৯৭৫ সালের ৩রা নভেম্বর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে কারারক্ষী হিসেবে কর্মরত ছিলেন। গভীর রাতে তিনি দেখতে পান একদল সশস্ত্র লোক কারাগারের বিশেষ সেলে প্রবেশ করে কয়েকজনকে হত্যা করেছে। দুলু মিয়া এ কথা তার বাবাকে জানান। তার বাবা তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় বলেন যে, এ হত্যার মূল উদ্দেশ্য হলো– বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের অর্জনসমূহ ধ্বংস করা।

ক. ‘ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল’ কী?
খ. গণপরিষদ কী? ব্যাখ্যা কর।
গ. দুলু মিয়ার দেখা হত্যাকাণ্ডটি তোমার পঠিত বিষয়বস্তুর যে ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত তা ব্যাখ্যা কর।
ঘ. তুমি কি দুলু মিয়ার বাবার বক্তব্যের সাথে একমত পোষণ কর? তোমার পঠিত বিষয়বস্তুর আলোকে যুক্তি উপস্থাপন কর।

তৃতীয় অধ্যায়

সৌরজগৎ ও ভূমণ্ডল

পৃথিবীর চারদিকে অসীম মহাকাশ বিস্তৃত। মহাকাশে রয়েছে নক্ষত্র, ছায়াপথ, নীহারিকা, ধূমকেতু, গ্রহ, উপগ্রহ, উল্কা ও অন্যান্য জ্যোতিষ্ক। মহাকাশের এই অসংখ্য জ্যোতিষ্ক নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে বিশ্বজগৎ। সূর্য বিশ্বজগতের একটি নক্ষত্র। সূর্য এবং এর গ্রহ, উপগ্রহ, গ্রহাণুপুঞ্জ, অসংখ্য ধূমকেতু ও অগণিত উল্কা নিয়ে সৌরজগৎ বা সৌরপরিবার গঠিত। সৌরজগতের সকল গ্রহ ও উপগ্রহের নিয়ন্ত্রক হলো সূর্য। গ্রহ ও উপগ্রহসমূহ সূর্য ও নিজেদের পারস্পরিক মহাকর্ষণ শক্তির দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে নির্দিষ্ট কক্ষপথে নির্দিষ্ট সময়ে সূর্যের চারদিক পরিক্রমণ করছে। বিশ্বজগতের বিশালতার মধ্যে সৌরজগৎ নিতান্তই ছোট, পৃথিবী আরও ছোট। আয়তনে সৌরজগৎ পৃথিবীর চেয়ে কোটি কোটি গুণ বড়। এ অধ্যায়ে আমরা সৌরজগতের ধারণা, গ্রহসমূহ, ভূ-অভ্যন্তরের গঠন এবং বিশ্বের সময় পদ্ধতি, পৃথিবীর গতি ও এর প্রভাব, ঋতু পরিবর্তন, জোয়ার-ভাটার ধারণা ও এর প্রভাব সম্পর্কে অবহিত হব।

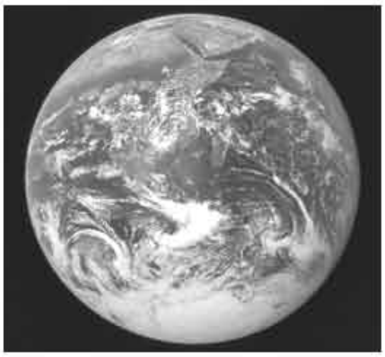

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা –

- সৌরজগতের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- সৌরজগতের গ্রহগুলোর বর্ণনা করতে পারব;
- পৃথিবী গ্রহে জীব বসবাসের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ভূ-অভ্যন্তরের গঠন বর্ণনা করতে পারব;
- সৌরজগৎ ও গ্রহসমূহের অবস্থান এঁকে দেখাতে পারব;
- নিরক্ষরেখা, সমাক্ষ রেখা, দ্রাঘিমা রেখা, মূল মধ্যরেখা, আন্তর্জাতিক তারিখ রেখার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বিশ্বের সময় নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কাল্পনিক রেখাগুলোর ভূমিকা নির্ণয় করতে পারব;
- বাংলাদেশ ও পৃথিবীর যে কোনো দেশের সময়ের পার্থক্যের কারণ ব্যাখ্যা এবং সময় নির্ণয় করতে পারব;
- বিভিন্ন রেখার অবস্থানের চিত্র আঁকতে পারব;
- পৃথিবীর গতির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতির ধারণার ব্যাখ্যা এবং পৃথিবীর ওপর এই গতির প্রভাব বর্ণনা করতে পারব;
- দিবারাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- পৃথিবীতে ঋতু পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বার্ষিক গতির সাথে বাংলাদেশের ঋতু পরিবর্তনের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারব;
- নতুন পরিস্থিতিতে গাণিতিক জ্ঞান প্রয়োগ করে সময় নির্ণয় করতে পারব;
- জোয়ার ভাটার ধারণা, কারণ ও শ্রেণিবিভাগ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- পৃথিবীর ওপর জোয়ার-ভাটার প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- পরিবেশের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি ও অভিযোজনে সক্ষম হব।

পরিচ্ছেদ ৩.১ : সৌরজগৎ

সূর্য এবং এর গ্রহ, উপগ্রহ, গ্রহাণুপুঞ্জ, ধূমকেতু, উল্কা প্রভৃতি নিয়ে যে পরিবার তাকে বলা হয় সৌরজগৎ। সৌরজগতের প্রাণকেন্দ্র হলো সূর্য। সৌরজগতে ৮টি গ্রহ, শতাধিক উপগ্রহ, হাজার হাজার গ্রহাণুপুঞ্জ ও লক্ষ লক্ষ ধূমকেতু রয়েছে।

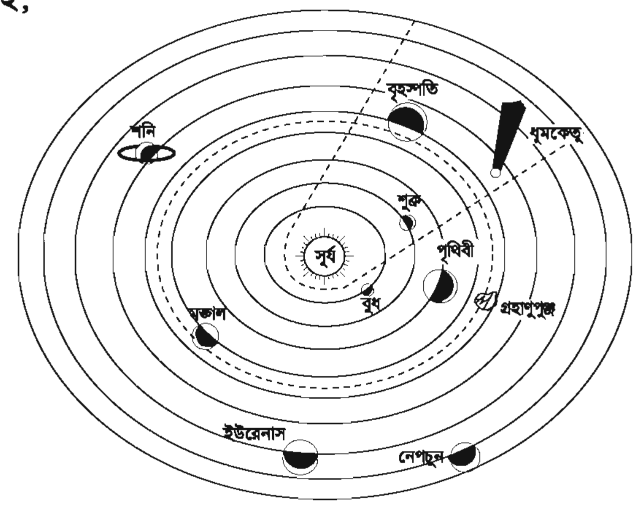

চিত্র ৩.১ : সৌরজগৎ

সূর্য

সৌরজগতের সকল গ্রহ ও উপগ্রহের নিয়ন্ত্রক হলো সূর্য। সূর্য একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। পৃথিবীর সঙ্গে সূর্যের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। সূর্য পৃথিবী অপেক্ষা ১৩ লক্ষ গুণ বড়। পৃথিবী থেকে এটি প্রায় ১৫ কোটি কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এর ব্যাস প্রায় ১৩ লক্ষ ৮৪ হাজার কিলোমিটার। সূর্যের উপরিভাগের উষ্ণতা ৫৭,০০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বিরাট দূরত্বের জন্য সূর্যের অতি সামান্য তাপ পৃথিবীতে এসে পৌঁছায়। এ সামান্য তাপ ও আলো দ্বারাই পৃথিবীর জীবজগতের সকল প্রয়োজন মেটে। অন্যান্য গ্রহ, উপগ্রহগুলোর তাপ ও আলোর উৎসও সূর্য। সূর্যের কোনো কঠিন বা তরল পদার্থ নেই। শতকরা ৫৫ ভাগ হাইড্রোজেন, ৪৪ ভাগ হিলিয়াম এবং ১ ভাগ অন্যান্য গ্যাসে সূর্য গঠিত। সূর্যের মধ্যে মাঝে মাঝে যে কালো দাগ দেখা যায় তাকে সৌরকলঙ্ক (Sun Spot) বলে। সূর্যের অন্যান্য অংশের চেয়ে সৌরকলঙ্কের উত্তাপ কিছুটা কম থাকে। আণবিক শক্তি সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় সূর্যে অনবরত হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়াম এবং হিলিয়াম থেকে শক্তি তৈরি হচ্ছে। সূর্য প্রায় ২৫ দিনে নিজ অক্ষের (Axis) ওপর একবার আবর্তন করে। সূর্যের আলো ও তাপ ছাড়া পৃথিবীতে উদ্ভিদ, প্রাণী কিছুই জন্মাতো না এবং প্রাণের স্পন্দন সম্ভব হতো না।

গ্রহ : মহাকর্ষ বলের প্রভাবে কতোগুলো জ্যোতিষ্ক সূর্যের চারদিকে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কক্ষপথে পরিক্রমণ করছে; এদের গ্রহ বলা হয়। গ্রহের নিজস্ব আলো ও তাপ নেই। সৌরজগতে গ্রহের সংখ্যা ৮টি। সূর্য থেকে গ্রহগুলোর দূরত্ব অনুযায়ী ক্রমান্বয়ে অবস্থান করছে – বুধ (Mercury), শুক্র (Venus), পৃথিবী (Earth), মঙ্গল (Mars), বৃহস্পতি (Jupiter), শনি (Saturn), ইউরেনাস (Uranus) ও নেপচুন (Neptune)। গ্রহগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় বৃহস্পতি এবং সবচেয়ে ছোট বুধ।

বুধ (Mercury) : বুধ সৌরজগতের ক্ষুদ্রতম এবং সূর্যের নিকটতম গ্রহ। এর ব্যাস ৪,৮৫০ কিলোমিটার এবং ওজন পৃথিবীর ৫০ ভাগের ৩ ভাগের সমান। সূর্যের চারদিকে পরিক্রমণ করতে এর ৮৮ দিন সময় লাগে। সূর্য থেকে বুধের গড় দূরত্ব ৫.৮ কোটি কিলোমিটার। বুধের কোনো উপগ্রহ নেই। সূর্যের নিকটতম গ্রহ বলে এর তাপমাত্রা অত্যধিক। বুধের ভূত্বকে সমতল ভূমিসহ অসংখ্য গর্ত ও পাহাড় লক্ষ করা গেছে। বুধের আয়তন ৭৪,৮০০.০০০ বর্গ কিলোমিটার।

শুক্র (Venus) : সূর্য থেকে দূরত্বের দিক দিয়ে শুক্রের অবস্থান দ্বিতীয়। এটি পৃথিবীর নিকটতম গ্রহ। সূর্য থেকে শুক্রের দূরত্ব ১০.৮ কোটি কিলোমিটার এবং পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব মাত্র ৪.৩ কোটি কিলোমিটার। একে সন্ধ্যায় পশ্চিম আকাশে আমরা সন্ধ্যাতারা রূপে এবং ভোরে পূর্ব আকাশে শুকতারা রূপে দেখতে পাই। সূর্যকে একবার পরিক্রমণ করতে

এর সময় লাগে ২২৫ দিন। শুক্রের কোনো উপগ্রহ নেই। পৃথিবীর মতো শুক্রের একটি বায়ুমণ্ডল রয়েছে কিন্তু এতে অক্সিজেন নেই। কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের পরিমাণ প্রায় শতকরা ৯৬ ভাগ। শুক্র নিজ অক্ষে খুবই ধীর গতিতে আবর্তন করে। ফলে শুক্রের আকাশে বছরে দুইবার সূর্য উদিত হয় এবং অস্ত যায়। গ্রহটিতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের ঘন মেঘের কারণে এসিড বৃষ্টি হয়ে থাকে। শুক্রের পৃষ্ঠে পৃথিবীর তুলনায় ৯০ গুণ বেশি বাতাসের চাপ রয়েছে। এর আয়তন ৪৬০,২৩০,০০০ বর্গ কি. মি. এবং ব্যাস ১২১০৪ কি. মি.।

কাজ : সৌরজগতের জোতিষ্কগুলোর বৈশিষ্টসমূহ ছকের মাধ্যমে তুলনা কর।

পৃথিবী (Earth) : পৃথিবী সূর্যের তৃতীয় নিকটতম গ্রহ। এর আয়তন ৫১০,১০০,৪২২ বর্গ কিলোমিটার। পূর্ব–পশ্চিমে এর ব্যাস ১২,৭৫২ কিলোমিটার এবং উত্তর–দক্ষিণে ১২,৭০৯ কিলোমিটার। সূর্য থেকে পৃথিবীর গড় দূরত্ব ১৫ কোটি কিলোমিটার। পৃথিবী ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেণ্ডে সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে। এ গ্রহে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন রয়েছে। পৃথিবীপৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রা ১৩.৯০° সেলসিয়াস। ভূত্বকে প্রয়োজনীয় পানি রয়েছে। গ্রহগুলোর মধ্যে একমাত্র পৃথিবীই জীবজন্তু ও উদ্ভিদের জীবন ধারণের জন্য আদর্শ গ্রহ। চন্দ্র পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ। পৃথিবী থেকে চন্দ্রের গড় দূরত্ব ৩,৮১,৫০০ কিলোমিটার। এটি ২৯ দিন ১২ ঘণ্টায় পৃথিবীকে একবার পরিক্রমণ করে। চাঁদের পৃষ্ঠদেশে গর্ত, পাহাড় ও পর্বত লক্ষ করা গেছে।

মঙ্গল (Mars) : সূর্য থেকে দূরত্বের দিক দিয়ে পৃথিবীর পরেই মঙ্গলের স্থান। সূর্য থেকে এর গড় দূরত্ব ২২.৮ কোটি কিলোমিটার এবং পৃথিবী থেকে ৭.৮ কোটি কিলোমিটার। মঙ্গল গ্রহের ব্যাস ৬,৭৭৯ কিলোমিটার এবং ওজন পৃথিবীর প্রায় দশ ভাগের এক ভাগ। এর আয়তন ১৪৪,৭৯৮,৫০০ বর্গ কি. মি.। সূর্যকে পরিক্রমণ করতে মঙ্গল গ্রহের লাগে ৬৮৭ দিন এবং নিজ অক্ষে একবার আবর্তন করতে সময় লাগে ২৪ ঘণ্টা ৩৭ মিনিট। মঙ্গলের দুটি উপগ্রহ আছে– ডিমোস ও ফেবোস। এখানে জীবন ধারণ অসম্ভব। বায়ুমণ্ডলে শতকরা ৩ ভাগ নাইট্রোজেন ও শতকরা ২ ভাগ আরগন গ্যাস আছে। পানির পরিমাণ খুবই কম। পৃথিবীর তুলনায় মঙ্গল অনেক ঠান্ডা, গড় উত্তাপ হিমাঙ্কের অনেক নিচে। মঙ্গল গ্রহের উপরিভাগে গিরিখাত ও আগ্নেয়গিরি রয়েছে। এ গ্রহের পাথরগুলোতে মরিচা পড়েছে। ফলে গ্রহটি লালচে বর্ণ ধারণ করেছে।

বৃহস্পতি (Jupiter) : সৌরজগতের সর্ববৃহৎ গ্রহ বৃহস্পতি। সূর্য থেকে দূরত্বের ভিত্তিতে বৃহস্পতি গ্রহের অবস্থান পঞ্চম। এর আয়তন পৃথিবীর প্রায় ১,৩০০ গুণ তথা ৬১,৪১৯,০০০,০০০ বর্গ কি. মি.। এর ব্যাস ১,৩৯,৮২২ কিলোমিটার। এটি সূর্য থেকে প্রায় ৭৭.৮ কোটি কিলোমিটার দূরে। বৃহস্পতি ১২ বছরে একবার সূর্যকে এবং ৯ ঘণ্টা ৫৩ মিনিটে নিজ অক্ষে আবর্তন করে। গ্রহটিতে পৃথিবীর একদিনে দুইবার সূর্য ওঠে ও দুইবার অস্ত যায়। এ গ্রহে গভীর বায়ুমণ্ডল আছে। গ্রহটির বায়ুমন্ডলের উপরিভাগের তাপমাত্রা খুবই কম তবে অভ্যন্তরের তাপমাত্রা অধিক। এর ৬৭টি উপগ্রহ রয়েছে। এগুলোর মধ্যে লো, ইউরোপা, গ্যানিমেড ও ক্যাপলিস্টো প্রধান।

গ্রহাণুপুঞ্জ (Asteroids) : মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝের পরিসরে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহাণু একত্রে পুঞ্জীভূত হয়ে পরিক্রমণ করছে। এই পরিসরের মধ্যে আর কোনো গ্রহ নেই। ১.৬ কিলোমিটার থেকে ৮০৫ কিলোমিটার ব্যাস সম্পন্ন গ্রহাণুগুলোকে একত্রিতভাবে গ্রহাণুপুঞ্জ বলে।

শনি (Saturn) : শনি সৌরজগতের দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্রহ। এর আয়তন ৪২,৭০০,০০০,০০০ বর্গ কি. মি. এবং ব্যাস ১১৬,৪৬৪ কি. মি.। সূর্য থেকে শনির দূরত্ব ১৪৩ কোটি কিলোমিটার। শনি ২৯ বছর ৫ মাসে সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে এবং ১০ ঘণ্টা ৪০ মিনিটে নিজ অক্ষে একবার আবর্তন করে। পৃথিবীর চেয়ে শনির ব্যাস প্রায় ৯ গুণ বড়। খালি চোখে এটি দেখা যায়। শনির বায়ুমণ্ডলে হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের মিশ্রণ, মিথেন ও অ্যামোনিয়া গ্যাস রয়েছে। তিনটি উজ্জ্বল বলয় শনিকে বেষ্টন করে আছে। শনির ৬২টি উপগ্রহের মধ্যে ক্যাপিটাস, টেথিস, হুয়া, টাইটান প্রধান।

ইউরেনাস (Uranus) : ইউরেনাস সৌরজগতের তৃতীয় বৃহত্তম গ্রহ। সূর্য থেকে এর দূরত্ব ২৮৭ কোটি কিলোমিটার। ৮৪ বছরে এটি সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে। এর গড় ব্যাস প্রায় ৪৯,০০০ কিলোমিটার। এর আয়তন পৃথিবীর প্রায় ৬৪ গুণ তবে ওজন পৃথিবীর মাত্র ১৫ গুণ। গ্রহটির আবহমন্ডলে মিথেন গ্যাসের পরিমাণ অধিক। এর ২৭টি উপগ্রহ রয়েছে। ইউরেনাসেরও শনির মতো বলয় রয়েছে। মিরিন্ডা, এরিয়েল, ওবেরন, আম্ব্রিয়েল, টাইটানিয়া প্রভৃতি ইউরেনাসের উপগ্রহ।

নেপচুন (Neptune) : নেপচুনের গড় ব্যাস ৪৯,২৪৪ কিলোমিটার এবং সূর্য থেকে দূরত্ব ৪৫০ কোটি কিলোমিটার। এর আয়তন ১৭,৬১৮,৩০০,০০০ বর্গ কি. মি.। সূর্য থেকে অধিক দূরত্বের কারণে গ্রহটি শীতল। গ্রহটি অনেকটা নীলাভ বর্ণের। নেপচুন ১৬৫ বছরে সূর্যকে একবার পরিক্রমণ করে। এর উপগ্রহ ১৪ টি। উল্লেখযোগ্য উপগ্রহ হচ্ছে ট্রাইটন ও নেরাইড।

পৃথিবী গ্রহে জীব বসবাসের কারণ

পৃথিবীর চারদিক নানা প্রকার গ্যাসীয় উপাদান দ্বারা বেষ্টিত। অদৃশ্য এই গ্যাসীয় আবরণ পৃথিবীকে বেষ্টন করে আছে। একে বায়ুমণ্ডল বলে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আকর্ষণে বায়ুমণ্ডল ভূপৃষ্ঠের সঙ্গে লেপ্টে আছে। আর পৃথিবীর সঙ্গে আবর্তিত হচ্ছে। বায়ুর চাপের কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠে এর ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি এবং উপরের দিকে ঘনত্ব খুবই কম। বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের প্রাধান্য রয়েছে। সকল প্রাণীর জন্য অক্সিজেন অত্যাবশ্যক। কার্বন ডাই-অক্সাইড ছাড়া অন্যান্য উপাদান বায়ুতে মোটামুটি অপরিবর্তনীয় পরিমাণে থাকে। তবে ধুলা, ধোঁয়া, জলীয় বাষ্প ইত্যাদি উপাদান বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পরিমাণে থাকে। পৃথিবীর সমস্ত জীবের বেঁচে থাকার জন্য বায়ুমণ্ডলের গুরুত্ব অপরিসীম। বায়ুমণ্ডল সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি থেকে প্রাণিকুলকে রক্ষা করে। সূর্যের গ্যাসীয় উপাদান, যেমন– কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) ও অক্সিজেন (O_2) যথাক্রমে উদ্ভিদ ও প্রাণীকে বাঁচিয়ে রাখে। ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ুমণ্ডলের সর্বনিম্ন স্তর হলো ট্রপোমণ্ডল। এ স্তরটির গড় গভীরতা প্রায় ১৩ কি.মি.। এটি মানুষের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় স্তর। কেননা, আর্দ্রতা, কুয়াশা, মেঘ, বৃষ্টি, বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতি এই স্তরে লক্ষ করা যায়। উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সাথে এ স্তরে বাতাসের গতিবেগ বেড়ে যায়। আবহাওয়া ও জলবায়ুজনিত যাবতীয় প্রক্রিয়ার বেশির ভাগই বায়ুমণ্ডলের এস্তরে ঘটে থাকে। ট্রপোমণ্ডলের ঊর্ধ্বসীমাকে ট্রপোপস বলে। ট্রপোপসের গভীরতা সরু, এখানে বায়ু স্থির। ঝড় বৃষ্টির প্রাদুর্ভাব না থাকায় বিমান এ স্তর দিয়ে নির্বিঘ্নে চলাচল করে। বায়ুমণ্ডলে ওজোন (Ozone) গ্যাসের একটি স্তর আছে, যা ওজোন স্তর নামে পরিচিত। এর গভীরতা প্রায় ১২–১৬ কি.মি.। সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি শোষণ করায় এর তাপমাত্রা ধীরে ধীরে প্রায় ৪০° (চল্লিশ ডিগ্রি) সেলসিয়াস পর্যন্ত হয়। এ স্তরটি পৃথিবীকে প্রাণিজগতের বাস উপযোগী করেছে।

কাজ

একক : পৃথিবী ব্যতীত অন্যান্য গ্রহে জীব বসবাসের অনুপযোগী হওয়ার কারণের তালিকা প্রস্তুত কর।

পৃথিবী সূর্য থেকে আলো ও তাপ পায়। সূর্যের আলো ছাড়া পৃথিবী চির অন্ধকারে থাকত। পৃথিবীতে প্রাণের স্পন্দন থাকত না এবং জীবজগৎ উদ্ভিদ ও প্রাণী কিছুই বাঁচত না। পৃথিবীতে মানুষের কর্মকাণ্ড বায়ুমণ্ডলের গঠন ও উপাদানে পরিবর্তন করতে সাহায্য করে। ব্যাপকভাবে গাছপালা কেটে ফেলা, কলকারখানা থেকে নির্গত ধোঁয়া এবং জ্বালানি তেল, কয়লা ও প্রাকৃতিক গ্যাস পোড়ানো থেকে নির্গত ধোঁয়া ও বিষাক্ত গ্যাস বায়ুমণ্ডলকে দূষিত করে। প্রাণীর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যই বায়ুমণ্ডলকে বিশুদ্ধ রাখা দরকার।

জীবজন্তুর বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন প্রচুর আলো, বাতাস ও পানি। পৃথিবী পৃষ্ঠে গড় তাপমাত্রা ১৩.৯০° সেলসিয়াস। ভূত্বকে রয়েছে প্রয়োজনীয় পানি। সূর্য থেকে যে তাপ ও আলো পৃথিবীতে পৌঁছে তাও জীবজন্তুর জন্য সহনীয়। জীবজন্তু ও উদ্ভিদের জীবন ধারণের জন্য এগুলোও উপযোগী ও প্রয়োজনীয়। এজন্য পৃথিবীতে জীবজন্তু বসবাস করতে পারে।

ভূ–অভ্যন্তরের গঠন

পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ গঠন ও বিভিন্ন স্তর বিন্যাস সম্বন্ধে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা খুবই কঠিন। কিন্তু ভূমিকম্প তরঙ্গের গতিবেগের তারতম্য দ্বারা ভূ–অভ্যন্তরে শিলার ঘনত্বের তারতম্য ও বিভিন্ন স্তরের বিষয় জানা যায়। ভূ–অভ্যন্তরে ভূ–কম্পীয় তরঙ্গের গতি ও প্রকৃতির তারতম্য লক্ষ্য করে ভূ–তত্ত্ববিদগণ ভূ–অভ্যন্তরকে তিনটি স্তরে বিভক্ত করেছেন। এ স্তরগুলো হলো– (১) কেন্দ্রমণ্ডল (২) গুরুমণ্ডল এবং (৩) অশ্মমণ্ডল।

(১) কেন্দ্রমণ্ডল : গোলাকার পৃথিবীর ব্যাসার্ধ প্রায় ৬৩৭১ কি.মি.। পৃথিবীর যে কেন্দ্রের চারদিকে প্রায় ৩৪৮৬ কি.মি. ব্যাসার্ধের গোলক রয়েছে সে গোলকটির নাম কেন্দ্রমণ্ডল। বৈজ্ঞানিকদের মতে, কেন্দ্রমণ্ডল লৌহ, নিকেল, পারদ, সীসা প্রভৃতি কঠিন ও ভারী পদার্থ দ্বারা গঠিত। এ স্তরে নিকেল (Nickel) ও লৌহের (Ferus) পরিমাণ বেশি থাকায় এ স্তরটি সংক্ষেপে নাইফ (Nife) নামে পরিচিত।এটি পানি অপেক্ষা ১০/১২ গুণ এবং পৃথিবীর অন্যান্য অংশ অপেক্ষা দ্বিগুণের অধিক ঘন। কিন্তু প্রচণ্ড তাপ ও চাপে এটি সম্ভবত কঠিন অবস্থায় নেই। ভূকম্পন তরঙ্গ থেকে বুঝা যায় যে, কেন্দ্রমণ্ডল দুটি অংশে বিভক্ত: বাইরের অংশ এবং ভিতরের অংশ। বাইরের অংশ তরল এবং ভিতরের অংশ কঠিন অবস্থায় আছে বলে অনুমান করা হয়। কেন্দ্রমণ্ডলের বাইরের অংশের বিস্তৃতি প্রায় ২২৭০ কি.মি.। কেন্দ্রমণ্ডলের ভিতরের অংশটি পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে প্রায় ১,২১৬ কি.মি. ব্যাসার্ধের মধ্যে কঠিন অবস্থায় রয়েছে।

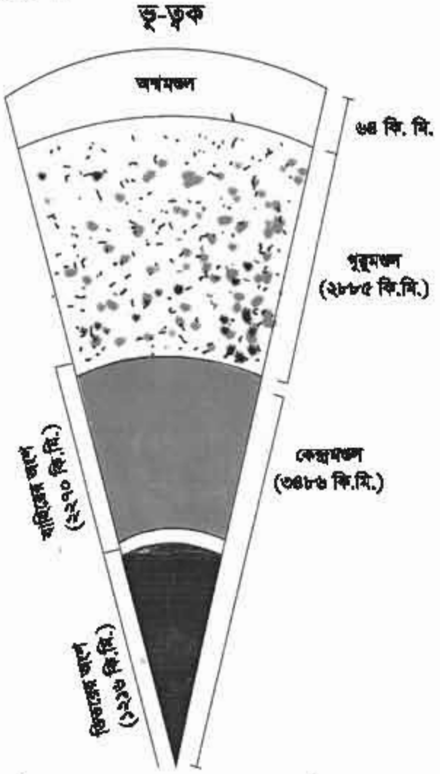

চিত্র ৩.১ : ভূ-অভ্যন্তরের গঠন

(২) গুরুমণ্ডল : কেন্দ্রমণ্ডলের উপর থেকে চতুর্দিকে প্রায় ২৮৮৫ কি. মি. পর্যন্ত মণ্ডলটিকে গুরুমণ্ডল বলে। সিলিকন, ম্যাগনেশিয়াম প্রভৃতি ভারী ধাতুগুলোর সংমিশ্রণে এ মণ্ডলটি গঠিত। এর উপরাংশে ১৪৪৮ কি.মি. স্তরে ব্যাসল্ট জাতীয় উপাদান দ্বারা গঠিত বলে একে ব্যাসল্ট অঞ্চলও বলে। সিলিকন (Silicon) ও ম্যাগনেসিয়াম (Magnesium) দ্বারা মণ্ডলটি গঠিত বলে একে সিমা (Sima) বলে।

(৩) অশ্মমণ্ডল : গুরুমণ্ডলের উপরের অংশকে অশ্মমণ্ডল বা শিলামণ্ডল বলা হয়। এটা নানা প্রকার শিলা ও খনিজ উপাদান দ্বারা গঠিত। এর গভীরতা মহাদেশীয় অঞ্চলের নিচে সবচেয়ে বেশি এবং মহাসাগরের নিচে সবচেয়ে কম। এর সঠিক গভীরতা সম্পর্কে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। এর গভীরতা স্থান বিশেষ ৩০ থেকে ৬৪ কি.মি. পর্যন্ত ধরা হয়। যেসব উপাদানে এ স্তর গঠিত তাদের মধ্যে অক্সিজেন, সিলিকন, অ্যালুমিনিয়াম, লৌহ, ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, পটাসিয়াম প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। উল্লেখ্য যে, এ স্তরে সিলিকন (Silicon) ও অ্যালুমিনিয়াম (Aluminum) এর পরিমাণ বেশি, তাই এটাকে সিয়াল (Sial) স্তর বলে। অশ্মমণ্ডলের উপরিভাগকে ভূত্বক বলে ও নিম্নভাগকে ভূত্বকের নিম্নাংশ বলে। ভূত্বকই পৃথিবীর কঠিন বহিরাবরণ। এর গভীরতা ৩ কি.মি. (সমুদ্রের তলদেশ) থেকে ৪০ কি.মি. (পর্বতের তলদেশ) তবে গড় গভীরতা ১৭ কি.মি.।

পরিচ্ছেদ ৩.২ : বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের সময় নির্ণয় পদ্ধতি

পৃথিবীর মানচিত্রে কোনো স্থানের অবস্থান নির্ণয়ের জন্য পূর্ব–পশ্চিমে এবং উত্তর–দক্ষিণে কতকগুলো কাল্পনিক রেখা অঙ্কন করা হয়। এগুলোকে যথাক্রমে অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখা বলে। কোনো স্থানের অবস্থান অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখার সাহায্যে জানা যায়। দ্রাঘিমার অবস্থান থেকে কোনো স্থানের সময় জানা যায়। অক্ষরেখার সাহায্যে যেমন নিরক্ষরেখা থেকে উত্তর ও দক্ষিণে অবস্থান জানা যায়, তেমনি মূল মধ্যরেখা থেকে পূর্ব বা পশ্চিমে অবস্থান জানার জন্য মধ্যরেখা বা দ্রাঘিমারেখা ব্যবহার করা হয়। ভূপৃষ্ঠকে সমতল মনে হলেও পৃথিবী প্রকৃতপক্ষে অভিগত গোলক। তাই পৃথিবী গোলাকার বলে মূল মধ্যরেখা থেকে দূরত্ব কৌণিক মাপে প্রকাশ করা সুবিধাজনক।

অক্ষ, অক্ষরেখা, নিরক্ষরেখা, দ্রাঘিমারেখা, মূল মধ্যরেখা

অক্ষ, অক্ষরেখা ও নিরক্ষরেখা : পৃথিবীর কেন্দ্র দিয়ে উত্তর–দক্ষিণে কল্পিত রেখাকে অক্ষ (Axis) বলে। এ অক্ষের উত্তর–প্রান্ত বিন্দুকে উত্তর মেরু এবং দক্ষিণ–প্রান্ত বিন্দুকে দক্ষিণ মেরু বলা হয়। পৃথিবীর মানচিত্রে কোনো স্থানের অবস্থান নির্ণয়ের জন্য পূর্ব-পশ্চিমে যে কতকগুলো কাল্পনিক রেখা অঙ্কন করা হয় তাকে অক্ষরেখা বলে। দুই মেরু থেকে সমান দূরত্বে পৃথিবীকে পূর্ব–পশ্চিমে বেষ্টন করে যে রেখা কল্পনা করা হয় তাকে বলা হয় নিরক্ষরেখা বা বিষুবরেখা। পৃথিবীর গোলাকার আকৃতির জন্য এ রেখা বৃত্তাকার, তাই এ রেখাকে নিরক্ষবৃত্তও বলা হয়। নিরক্ষরেখা পৃথিবীকে উত্তর ও দক্ষিণে সমান দুই ভাগে ভাগ করেছে। নিরক্ষরেখার উত্তর দিকের পৃথিবীর অর্ধেককে উত্তর গোলার্ধ এবং দক্ষিণ দিকের অর্ধেককে দক্ষিণ গোলার্ধ বলা হয়। নিরক্ষরেখার সাহায্যে উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধের কোনো স্থানের কৌণিক দূরত্ব নির্ণয় করা হয়।

পৃথিবীর বৃত্তের মোট পরিধি হলো ৩৬০°। এই পরিধির কোণকে ডিগ্রি (°), মিনিট (´) ও সেকেন্ডে (″) বিভক্ত করা হয়। নিরক্ষরেখা থেকে প্রত্যেক মেরুর কৌণিক দূরত্ব ৯০°। অক্ষরেখাগুলো পূর্ব–পশ্চিমে বিস্তৃত এবং পরস্পর সমান্তরাল। এ কারণে প্রত্যেকটি অক্ষরেখাকে সমাক্ষরেখাও বলা হয়। প্রত্যেক অক্ষরেখা একটি পূর্ণবৃত্ত। বিখ্যাত অক্ষরেখা হলো : ২৩.৫° উত্তর অক্ষাংশ বা কর্কটক্রান্তি, ২৩.৫° দক্ষিণ অক্ষাংশ বা মকরক্রান্তি, ৬৬.৫° উত্তর অক্ষাংশ বা সুমেরুবৃত্ত এবং ৬৬.৫° দক্ষিণ অক্ষাংশ বা কুমেরুবৃত্ত। নিরক্ষরেখা থেকে উত্তরে বা দক্ষিণে অবস্থিত কোনো স্থানের কৌণিক দূরত্বকে ঐ স্থানের অক্ষাংশ বলা হয়। সর্বোচ্চ অক্ষাংশ ৯০°। কোনো স্থানের অবস্থান জানার জন্য স্থানটি নিরক্ষরেখার কত উত্তরে বা দক্ষিণে এবং মূল মধ্যরেখার কত পূর্বে বা পশ্চিমে তা জানা প্রয়োজন। একই অক্ষরেখায় অবস্থিত সকল স্থানের অক্ষাংশ এক।

০° থেকে ৩০° পর্যন্ত অক্ষাংশকে নিম্ন অক্ষাংশ, ৩০° থেকে ৬০° পর্যন্ত অক্ষাংশকে মধ্য অক্ষাংশ এবং ৬০° থেকে ৯০° পর্যন্ত অক্ষাংশকে উচ্চ অক্ষাংশ বলে।

দ্রাঘিমারেখা (Meridians of Longitude)

নিরক্ষরেখাকে ডিগ্রি, মিনিট ও সেকেন্ডে ভাগ করে প্রত্যেক ভাগের উপর দিয়ে উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত যে রেখাগুলো কল্পনা করা হয়েছে তাকে দ্রাঘিমারেখা বলে। দ্রাঘিমারেখাকে মধ্যরেখাও বলা হয়। দ্রাঘিমারেখাগুলো অর্ধবৃত্ত এবং সমান্তরাল নয়। প্রত্যেকটি দ্রাঘিমারেখার দৈর্ঘ্য সমান। সর্বোচ্চ দ্রাঘিমা ১৮০° হয়। মধ্যরেখাগুলোর যে কোনো একটিকে নির্দিষ্ট মধ্যরেখা ধরে এ রেখা থেকে অন্যান্য মধ্যরেখার কৌণিক দূরত্ব মাপা হয়। দ্রাঘিমার সাহায্যে স্থানীয় সময় নির্ণয় করা যায়।

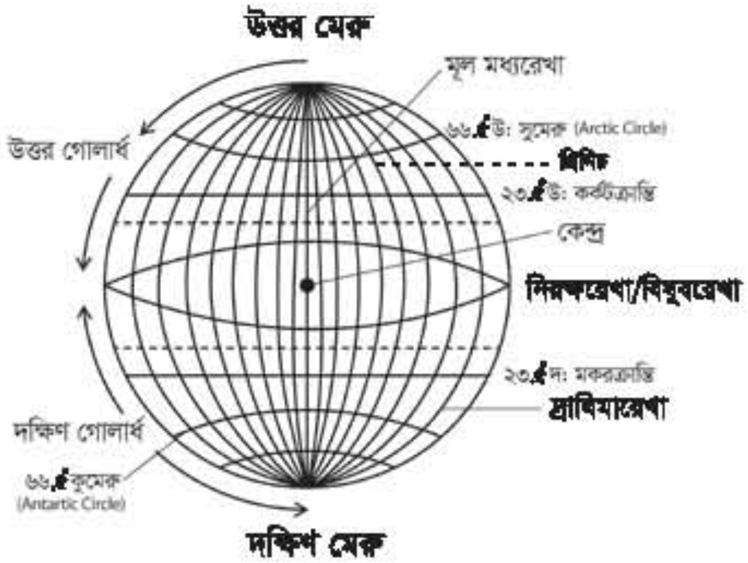

চিত্র ৩.২ : গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক রেখা

মূল মধ্যরেখা (Prime Meridian)

যুক্তরাজ্যের লন্ডন শহরের উপকণ্ঠে গ্রিনিচ (Greenwich) নামে মান মন্দিরের উপর দিয়ে উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত যে মধ্যরেখা অতিক্রম করেছে তাকে মূল মধ্যরেখা বলে। এই রেখার মান ০ ডিগ্রি ধরা হয়েছে। মূল মধ্যরেখা থেকে পৃথিবীর কেন্দ্রে উৎপন্ন কোণের সাহায্যে অন্যান্য দ্রাঘিমারেখাগুলো অঙ্কন করা যায়। গ্রিনিচের মূল মধ্যরেখা থেকে ৪৫ ডিগ্রি পূর্বে যে মধ্যরেখা বা দ্রাঘিমারেখা তার উপর সকল স্থানের দ্রাঘিমা ৪৫ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমা। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, গ্রিনিচের মূল মধ্যরেখা থেকে পূর্ব বা পশ্চিমে যে কোনো স্থানের কৌণিক দূরত্বকে সেই স্থানের দ্রাঘিমা বলা হয়। আমরা আরও জানি, গ্রিনিচের দ্রাঘিমা ০ ডিগ্রি। পৃথিবীর পরিধি দ্বারা উৎপন্ন কোণ ৩৬০ ডিগ্রি। মূল মধ্যরেখা এই ৩৬০ ডিগ্রিকে ১ ডিগ্রি অন্তর অন্তর সমান দুই ভাগে অর্থাৎ ১৮০ ডিগ্রি পূর্ব ও ১৮০ ডিগ্রি পশ্চিমে ভাগ করেছে। পৃথিবী গোলাকার বলে ১৮০ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমা ও ১৮০ ডিগ্রি পশ্চিম দ্রাঘিমা মূলত একই মধ্যরেখায় পড়ে। অক্ষাংশের ন্যায় দ্রাঘিমাকেও মিনিট ও সেকেন্ডে ভাগ করা হয়েছে। প্রতি মিনিট দ্রাঘিমা এক ডিগ্রির ষাট ভাগের এক ভাগের সমান। যেখানে নিরক্ষরেখা ও মূল মধ্যরেখা পরস্পরকে লম্বভাবে ছেদ করে সেখানে অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা উভয়ই শূন্য (০) ডিগ্রি। আর এ স্থানটি হলো গিনি উপসাগরের কোনো একটি স্থান। স্থানীয় সময় এবং গ্রিনিচের সময় থেকে কোনো স্থানের দ্রাঘিমা নির্ণয় করা যায়।

কাজ
একক : গুরুত্বপূর্ণ কাল্পনিক রেখাগুলোর অবস্থান (ডিগ্রিতে ০) ছকে লিপিবদ্ধ কর।

স্থানীয় সময়ের পার্থক্য : পৃথিবী গোলাকার এবং নিজ অক্ষ বা মেরুরেখার চারদিকে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে অনবরত আবর্তন করছে। ফলে ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থান ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সূর্যের সামনে উপস্থিত হয়। যে সময়ে কোনো স্থানের মধ্যরেখা সূর্যের ঠিক সামনে আসে অর্থাৎ ঐ স্থানে সূর্যকে ঠিক মাথার উপর দেখা যায়, তখন ঐ স্থানে মধ্যাহ্ন হয়। তখন ঘড়িতে বেলা ১২টা বাজে। মধ্যাহ্ন অনুসারে দিনের অন্যান্য সময় নির্ধারণ করা হয়। ১ ডিগ্রি দ্রাঘিমার পার্থক্যের জন্য সময়ের পার্থক্য হয় ৪ মিনিট এবং ১ দ্রাঘিমার ব্যবধানে সময়ের পার্থক্য হয় ৪ সেকেন্ড। কোনো স্থান বা অঞ্চলে যখন বেলা ১২টা তখন সে স্থান থেকে ৫ ডিগ্রি পূর্বে অবস্থিত স্থানের সময় হবে ১২টা+ (৫ × ৪) মিনিট বা ১২ ঘণ্টা ২০ মিনিট। একই স্থান থেকে ৫ ডিগ্রি পশ্চিমে অবস্থিত স্থানের সময় হবে ১২টা−(৫ × ৪) মিনিট বা (১২টা−২০ মিনিট) অর্থাৎ ১১টা ৪০ মিনিট।

গ্রিনিচ সময়ের মাধ্যমে স্থানীয় সময় নির্ণয় : গ্রিনিচের দ্রাঘিমা শূন্য (০) ডিগ্রি। এর সঠিক সময় ক্রনোমিটার ঘড়ি থেকে জানা যায়। সেক্সট্যান্ট যন্ত্রের সাহায্যে যেকোনো স্থানের দ্রাঘিমা বের করতে হলে উক্ত স্থানের আকাশে সূর্যের সর্বোচ্চ অবস্থান দেখে ঐ সময়ে উক্ত স্থানে দুপুর ১২টা ধরা হয়। নির্দিষ্ট সময়ে গ্রিনিচের সময় ও উক্ত স্থানের সময়-এর পার্থক্য

থেকে ঐ স্থানের দ্রাঘিমা নির্ণয় করা হয়। কোনো স্থান গ্রিনিচের পুর্বে হলে তার স্থানীয় সময় গ্রিনিচের সময় থেকে বেশি হবে এবং কোনো স্থান পশ্চিমে হলে তার স্থানীয় সময় গ্রিনিচের সময় থেকে কম হবে।

স্থানীয় সময় ও প্রমাণ সময়

স্থানীয় সময় (Local Time) : প্রতিদিন পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে তার নিজ মেরুরেখার উপর আবর্তিত হচ্ছে। ফলে পূর্ব দিকে অবস্থিত স্থানগুলোতে আগে সূর্যোদয় ঘটে। পৃথিবীর আবর্তনের ফলে কোনো স্থানে যখন সূর্য ঠিক মাথার উপর আসে বা সর্বোচ্চে অবস্থান করে তখন এ স্থানে মধ্যাহ্ন এবং স্থানীয় ঘড়িতে তখন বেলা ১২টা ধরা হয়। এ মধ্যাহ্ন সময় থেকে দিনের অন্যান্য সময় স্থির করা হয়। একে কোনো স্থানের স্থানীয় সময় বলা হয়। সেক্সট্যান্ট যন্ত্রের সাহায্যেও স্থানীয় সময় নির্ণয় করা যায়। পৃথিবীর কেন্দ্রে কোণের পরিমাণ ৩৬০ ডিগ্রি। এই ৩৬০ ডিগ্রি কৌণিক দূরত্ব আবর্তন করতে পৃথিবীর ২৪ ঘণ্টা বা (২৪ × ৬০) = ১,৪৪০ মিনিট সময় লাগে। সুতরাং পৃথিবী ১ ডিগ্রি ঘোরে (১,৪৪০÷৩৬০) = ৪ মিনিট সময়ে অর্থাৎ প্রতি ১ ডিগ্রি দ্রাঘিমার পার্থক্যের জন্য সময়ের পার্থক্য হয় ৪ মিনিট।

প্রমাণ সময় (Standard Time) : দ্রাঘিমারেখার উপর মধ্যাহ্ন সূর্যের অবস্থানের সময়কালকে দুপুর ১২টা ধরে স্থানীয় সময় নির্ধারণ করলে একই দেশের মধ্যে সময় গণনার বিভ্রাট হয়। সেজন্য প্রত্যেক দেশের একটি প্রমাণ সময় নির্ণয় করা হয়। প্রত্যেক দেশেই সেই দেশের মধ্যভাগের কোনো স্থানের দ্রাঘিমারেখা অনুযায়ী যে সময় নির্ণয় করা হয় সে সময়কে ঐ দেশের প্রমাণ সময় বলে। অনেক বড় দেশ হলে কয়েকটি প্রমাণ সময় থাকে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের চারটি এবং কানাডাতে পাঁচটি প্রমাণ সময় রয়েছে। গ্রিনিচের (০ ডিগ্রি দ্রাঘিমা) স্থানীয় সময়কে সমগ্র পৃথিবীর প্রমাণ সময় হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রমাণ সময় গ্রিনিচের সময় অপেক্ষা ৬ ঘণ্টা অগ্রবর্তী। ৯০ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমারেখা বাংলাদেশের প্রায় মধ্যভাগে অবস্থিত। এ কারণে এ দ্রাঘিমার স্থানীয় সময়কে বাংলাদেশের প্রমাণ সময় ধরে কাজ করা হয়।

কাজ
একক : স্থানীয় সময় ও প্রমাণ সময় নির্ণয় কর।

নিচের উদাহরণ দুটি থেকে দ্রাঘিমা ও সময়ের সম্পর্ক বোঝা যাবে।

> ঢাকা ও সিউলের সময়ের ব্যবধান ২ ঘণ্টা ৩২ মিনিট। ঢাকার দ্রাঘিমা ৯০° পূর্ব হলে সিউলের দ্রাঘিমা কত (সিউল ঢাকার পূর্বে অবস্থিত)?

সিউল ঢাকার পূর্বে অবস্থিত হওয়ায় এর দ্রাঘিমা বেশি হবে।
ঢাকা ও সিউলের সময়ের ব্যবধান ২ ঘণ্টা ৩২ মিনিট = ১৫২ মিনিট।
৪′ সময়ের ব্যবধানে দ্রাঘিমার ব্যবধান হয় ১°
সুতরাং, ১′ সময়ের ব্যবধানে দ্রাঘিমার ব্যবধান হয় $\left(\frac{১}{৪}\right)^{\circ}$
সুতরাং, ১৫২′ সময়ের ব্যবধানে দ্রাঘিমার ব্যবধান হয় $\left(\frac{১\times১৫২}{৪}\right)^{\circ} = ৩৮^{\circ}$
অতএব, সিউলের দ্রাঘিমা ৯০° + ৩৮° = ১২৮°

উত্তর: সিউলের দ্রাঘিমা ১২৮° পূর্ব।

◆ ঢাকা ও চেন্নাইয়ের দ্রাঘিমা যথাক্রমে ৯০° পূর্ব এবং ৮০°১৫′ পূর্ব। ঢাকায় যখন মধ্যাহ্ন চেন্নাইয়ের স্থানীয় সময় তখন কত?
ঢাকা ও চেন্নাইয়ের মধ্যে দ্রাঘিমার পার্থক্য, ৯০°−৮০°১৫ = ৯°৪৫′
১° দ্রাঘিমার পার্থক্যের জন্য সময়ের পার্থক্য হয় ৪ মিনিট।
অতএব, ৯° দ্রাঘিমার জন্য সময়ের পার্থক্য হয় ৯° × ৪′ = ৩৬ মিনিট। ১′ দ্রাঘিমার পার্থক্যের জন্য সময়ের পার্থক্য হয় ৪ সেকেন্ড সুতরাং ৪৫′ দ্রাঘিমার জন্য সময়ের পার্থক্য হয় ৪৫′ × ৪″ = ১৮০ সেকেন্ড = ৩ মিনিট।

সুতরাং, ৯°৪৫´ দ্রাঘিমার জন্য মোট সময়ের পার্থক্য হয় ৩৬ মিনিট + ৩ মিনিট = ৩৯ মিনিট।

চেন্নাই ঢাকার পশ্চিমে অবস্থিত। চেন্নাইয়ের দ্রাঘিমা কম। সেজন্য চেন্নাইয়ের সময়ও কম।

সুতরাং, ঢাকায় যখন মধ্যাহ্ন অর্থাৎ দুপুর ১২টা তখন চেন্নাইয়ের স্থানীয় সময় হবে, ১২টা–৩৯ মিনিট = সকাল ১১টা ২১ মিনিট।

উত্তর: চেন্নাইয়ের স্থানীয় সময় সকাল ১১টা ২১ মিনিট।

প্রতিপাদ স্থান (Antipode) : ভূপৃষ্ঠের উপর অবস্থিত কোনো বিন্দুর বিপরীত বিন্দুকে সেই বিন্দুর প্রতিপাদ স্থান বলে। প্রতিপাদ স্থান সম্পূর্ণভাবে একে অন্যের বিপরীত দিকে থাকে। প্রতিপাদ স্থান নির্ণয় করার জন্য ভূপৃষ্ঠের কোনো বিন্দু থেকে পৃথিবীর কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর ঠিক বিপরীত দিকে একটি কল্পিত রেখা টানা হয়। ঐ কল্পিত রেখা যে বিন্দুতে ভূপৃষ্ঠের বিপরীত পাশে এসে পৌঁছায় সেই বিন্দুই পূর্ব বিন্দুর প্রতিপাদ স্থান চিত্র ৩.৩ ক স্থানের প্রতিপাদ স্থান খ আর চ স্থানের প্রতিপাদ স্থান ছ। কোনো স্থানের অক্ষাংশ জানা থাকলে তার প্রতিপাদ স্থানেরও অক্ষাংশ নির্ণয় করা যায়। কোনো স্থানের অক্ষাংশ যত ডিগ্রি, এর প্রতিপাদ স্থানের অক্ষাংশ তত ডিগ্রি হবে। স্থান দুটি একটি নিরক্ষরেখার উত্তরে ও অপরটি দক্ষিণে অবস্থিত হবে। দুটি স্থান দুই গোলার্ধে হবে। একটি স্থানের অক্ষাংশ ৭০ ডিগ্রি উত্তর হলে তার প্রতিপাদ স্থানের অক্ষাংশ ৭০ ডিগ্রি দক্ষিণ হবে। কোনো স্থানের দ্রাঘিমা এবং এর প্রতিপাদ স্থানের দ্রাঘিমা যোগ করলে ১৮০ ডিগ্রি হবে। সুতরাং, ১৮০ ডিগ্রি থেকে এক স্থানের দ্রাঘিমা বাদ দিলে এর প্রতিপাদ স্থানের দ্রাঘিমা পাওয়া যায়। এক স্থানের দ্রাঘিমা পূর্ব হলে এর প্রতিপাদ স্থানের দ্রাঘিমা পশ্চিমে হবে। যেমন, ৪০ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত স্থানের প্রতিপাদ স্থানের দ্রাঘিমা হবে ১৮০–৪০ ডিগ্রি = ১৪০ ডিগ্রি পশ্চিম। স্থান দুটির মধ্যে সময়ের পার্থক্য হবে ১২ ঘণ্টা। চিত্রে চ বিন্দুর প্রতিপাদ স্থান ছ বিন্দু (চিত্র দেখ)। ঢাকার প্রতিপাদ স্থান দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত চিলির নিকট প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত।

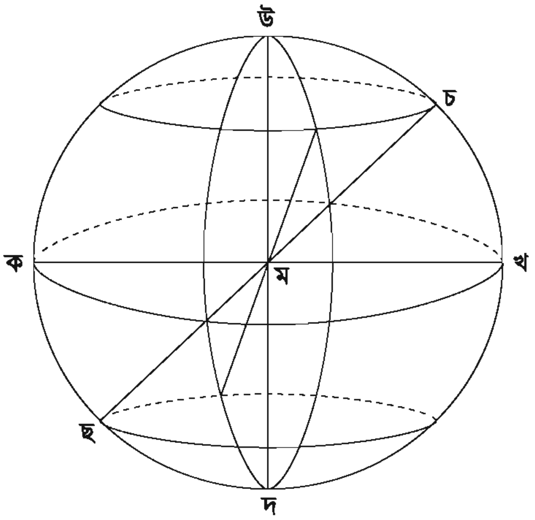

চিত্র ৩.৩ : প্রতিপাদ স্থান

আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা (International Date Line)

কোনো নির্দিষ্ট স্থান থেকে পূর্ব বা পশ্চিমে দীর্ঘপথ ভ্রমণ করার সময় স্থানীয় সময়ের পার্থক্যের সঙ্গে সঙ্গে সপ্তাহের দিন বা বার নিয়েও গরমিল হয়। কোনো নির্দিষ্ট স্থান থেকে পূর্ব বা পশ্চিম দিকে ১৮০ ডিগ্রি দ্রাঘিমারেখা অতিক্রম করলে সময় নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। এই সমস্যা সমাধানের জন্য ১৮০ ডিগ্রি দ্রাঘিমা রেখাকে অবলম্বন করে সম্পূর্ণভাবে জলভাগের উপর দিয়ে উত্তর–দক্ষিণে প্রসারিত একটি রেখা কল্পনা করা হয়। এ কল্পিত রেখাটিকে 'আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা' বলে।

আন্তর্জাতিক তারিখ রেখার প্রয়োজনীয়তা : আমরা জানি, ১ ডিগ্রি দ্রাঘিমান্তরে ৪ মিনিট সময়ের ব্যবধান হয়। সুতরাং ১৫ ডিগ্রি দ্রাঘিমান্তরে সময়ের ব্যবধান হবে ১ ঘন্টা। এভাবে মূল মধ্যরেখা (গ্রিনিচের দ্রাঘিমা) থেকে পূর্ব দিকে অগ্রসর হতে থাকলে ১৮০ ডিগ্রি দ্রাঘিমায় ১২ ঘন্টা সময় বেশি হয় এবং পশ্চিম দিকে অগ্রসর হলে ১২ ঘন্টা সময় কম হয়। সুতরাং, মূল মধ্যরেখায় যখন সোমবার সকাল ১০টা তখন ১৮০ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমায় স্থানীয় সময় সোমবার রাত ১০টা।

এভাবে আবার ঠিক পশ্চিম দিক দিয়ে দ্রাঘিমা গণনা করলে ১৮০ ডিগ্রি পশ্চিম দ্রাঘিমায় স্থানীয় সময় হবে তার পূর্ব দিন অর্থাৎ রবিবার রাত ১০টা। কিন্তু ১৮০ ডিগ্রি পূর্ব ও ১৮০ ডিগ্রি পশ্চিম দ্রাঘিমা মূলত একই রেখা। সুতরাং, দেখা যায় একই দ্রাঘিমায় স্থানীয় সময়ের পার্থক্য হচ্ছে ২৪ ঘণ্টা বা একদিন।

একই স্থানে কোথাও রবিবার কোথাও সোমবার। কিন্তু একই দ্রাঘিমারেখায় একই সঙ্গে রবিবার রাত ১০টা ও সোমবার রাত ১০টা হতে পারে না। এ অসুবিধা দূর করার জন্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির মাধ্যমে প্রশান্ত মহাসাগরের জলভাগের উপর মানচিত্রে ১৮০ ডিগ্রি দ্রাঘিমারেখাকে অবলম্বন করে একটি রেখা কল্পনা করা হয়েছে। এটিই আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা। এ রেখা অতিক্রম করলে দিন এবং তারিখের পরিবর্তন হয় বলে এ রেখাটিকে আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা বলে (চিত্র ৩.৪ দেখ)। এটি সাইবেরিয়ার উত্তর–পূর্ব অংশ অ্যালিউসিয়ান, ফিজি ও চ্যাথাম দ্বীপপুঞ্জের উপর দিয়ে গিয়েছে। স্থানীয় লোকদের বারের হিসেবে অসুবিধা দূর করার জন্য রেখাটিকে বেরিং প্রণালিতে ১২° পূর্ব, অ্যালিউসিয়ান দ্বীপপুঞ্জের কাছে ৭০° পশ্চিম এবং ফিজি ও চ্যাথাম দ্বীপপুঞ্জের কাছে ১১° পূর্ব দিকে বেঁকে জলভাগের উপর দিয়ে কল্পনা করা হয়েছে।

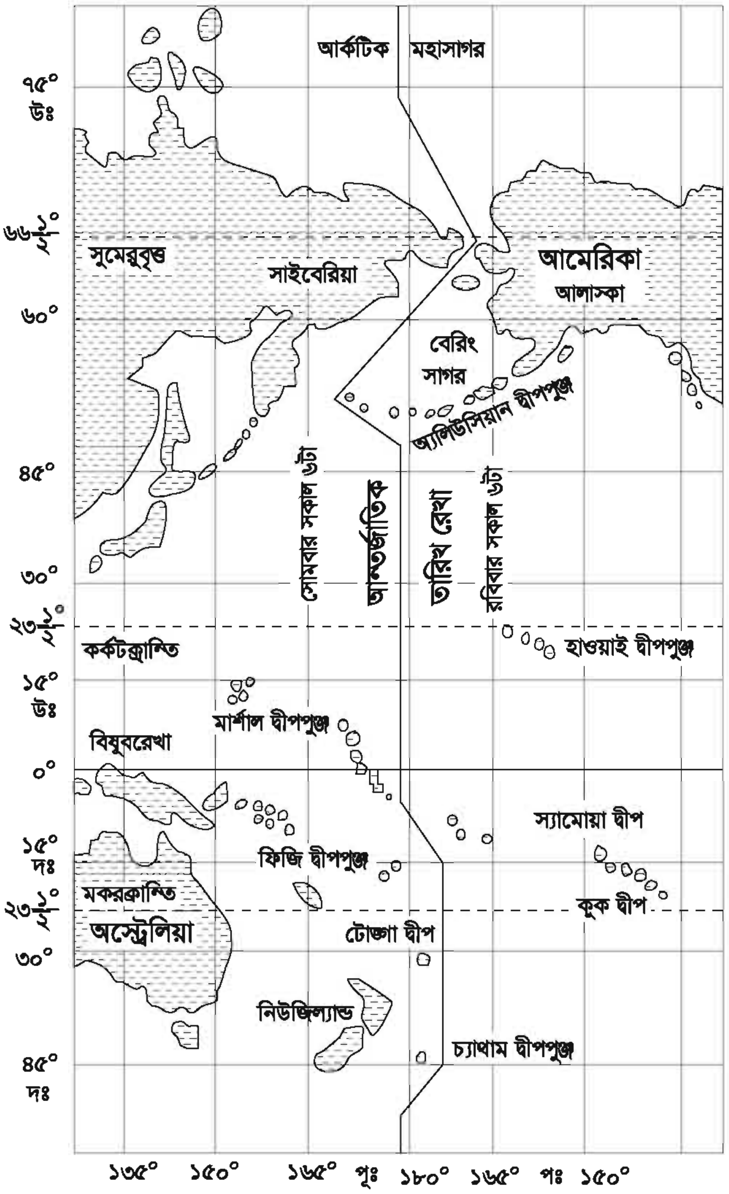
আর্কটিক মহাসাগর
৭৫° উঃ
৬৬½°
৬০°
৪৫°
৩০°
২৩½°
১৫° উঃ
০°
১৫° দঃ
২৩½°
৩০°
৪৫° দঃ
সুমেরুবৃত্ত
সাইবেরিয়া
আমেরিকা
আলাস্কা
বেরিং সাগর
অ্যালিউসিয়ান দ্বীপপুঞ্জ
সোমবার সকাল ৬টা
আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা
রবিবার সকাল ৬টা
কর্কটক্রান্তি
হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ
মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ
বিষুবরেখা
স্যামোয়া দ্বীপ
ফিজি দ্বীপপুঞ্জ
মকরক্রান্তি
কুক দ্বীপ
অস্ট্রেলিয়া
টোঙ্গা দ্বীপ
নিউজিল্যান্ড
চ্যাথাম দ্বীপপুঞ্জ
১৩৫° ১৫০° ১৬৫° পূঃ ১৮০° ১৬৫° পঃ ১৫০°

চিত্র ৩.৪ : আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা

গ্রিনিচ থেকে পূর্বগামী কোনো জাহাজ বা বিমান এ রেখা অতিক্রম করলে স্থানীয় সময়ের সঙ্গে মিল রাখার জন্য তাদের বর্ধিত সময় থেকে একদিন বিয়োগ করে এবং পশ্চিমগামী জাহাজ বা বিমান তাদের কম সময়ের সঙ্গে একদিন যোগ করে তারিখ গণনা করে থাকে।

সময় নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কাল্পনিক রেখার ভূমিকা

পৃথিবী প্রায় একটি গোলকের ন্যায়। তাই পৃথিবীর মানচিত্রে সময় নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কাল্পনিক রেখার ভূমিকা অপরিসীম। গোলাকার পৃথিবী নিজ অক্ষ বা মেরুরেখায় পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে আবর্তন করছে। ফলে ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থান ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সূর্যের সামনে উপস্থিত হচ্ছে। যে সময়ে কোনো স্থানের মধ্যরেখা সূর্যের ঠিক সামনে আসে তখন ঐ স্থানে দুপুর হয় এবং ঘড়িতে তখন ১২টা বাজে। দুপুর বা মধ্যাহ্ন অনুসারে অন্যান্য সময় নির্ণয় করা হয়। পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে আবর্তন করে বিধায় পূর্বে অবস্থিত স্থানসমূহে আগে সূর্যোদয় হয়। কোনো স্থানের সময় বেলা ১টা হলে তার ১° পূর্বের স্থানে সময় বেলা ১টা ৪ মিনিট এবং ১° পশ্চিমের স্থানে বেলা ১২টা ৫৬ মিনিট হবে। গ্রিনিচে (০°) যখন সকাল ৮টা, তখন

কোনো স্থানে সকাল ১০টা হলে উক্ত স্থানের দ্রাঘিমা হবে ৩০° পূর্ব। আবার সময় গ্রিনিচের চেয়ে কম হলে উক্ত স্থানটি গ্রিনিচের পশ্চিমে অবস্থিত হবে। এভাবে দ্রাঘিমার অবস্থান থেকে সময় ও সময়ের অবস্থান থেকে দ্রাঘিমা নির্ণয় করা হয়।

পরিচ্ছেদ ৩.৩ : পৃথিবীর গতি

আমরা লক্ষ করেছি যে, প্রতিদিন সূর্য পূর্বদিকে ওঠে এবং পশ্চিমে অস্ত যায়। কিন্তু আমরা কখনো কী ভেবে দেখেছি কেন এমনটা হয়? এর কারণ পৃথিবী গতিশীল। মহাকর্ষ শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবী নিজ অক্ষে আবর্তন করছে ও নির্দিষ্ট কক্ষপথে সূর্যের চারদিকে পরিক্রমণ করছে। এটিই পৃথিবীর গতি। পৃথিবীর গতি দুই প্রকার– আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতি।

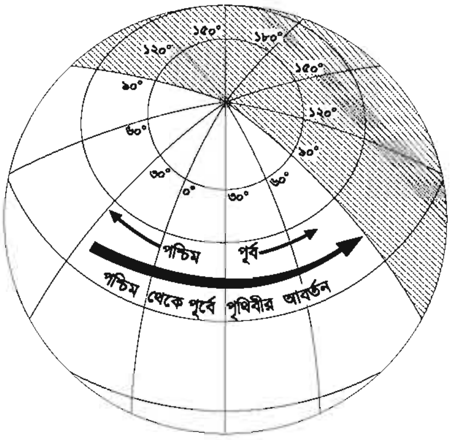

চিত্র ৩.৫ : পৃথিবীর আবর্তন

আহ্নিক গতি : আমরা নিচের ৩.৭ এর চিত্রের দিকে তাকাই। সেখানে কী দেখতে পাচ্ছি? সেখানে রয়েছে একটি জ্বলন্ত মোমবাতি ও একটি গোলক। লক্ষ করলে দেখব যে, গোলকের একদিকে আলোকিত এবং অন্যদিকে অন্ধকার। পৃথিবীতে আহ্নিক গতির ফলে ঠিক এভাবেই দিন ও রাত সংঘটিত হয়। পৃথিবী নিজ অক্ষে বা মেরুরেখায় পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে আবর্তন করছে। এভাবে আবর্তন করতে পৃথিবীর প্রায় ২৪ ঘণ্টা বা একদিন সময় লাগে। সঠিকভাবে এ সময় হলো ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেন্ড। পৃথিবীর এ গতিকে আহ্নিক গতি বা দৈনিক গতি (Diurnal Motion) বলে। পৃথিবীর একটি পূর্ণ আবর্তনের সময়কে সৌরদিন বলে।

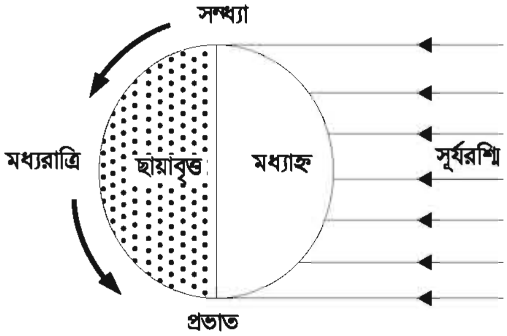

চিত্র ৩.৬ : দিনরাত্রি সংঘটন

আহ্নিক গতির ফলে দিন ও রাত হয়। পৃথিবীর নিজস্ব আলো নেই। সূর্যের আলোতে পৃথিবী আলোকিত হয়। পৃথিবী গোলাকার বলে সূর্যের আলো একই সময়ে ভূপৃষ্ঠের সকল অংশে পড়ে না। আবর্তনের সময় যে অংশে আলো পড়ে সে অংশে দিন এবং যে অংশে অন্ধকার থাকে সে অংশে রাত হয়। এভাবেই দিন–রাত হয়ে থাকে। আহ্নিক গতির ফলে সময় গণনা করা যায়। পৃথিবীর একটি পূর্ণ আবর্তনকে ২৪ ঘণ্টা ধরে সেটাকে মিনিট ও সেকেন্ডে বিভক্ত করে সময় গণনা করা যায়। আহ্নিক গতির ফলে চাঁদ ও সূর্যের আকর্ষণে পৃথিবীতে জোয়ার ও ভাটা হয়। আহ্নিক গতি সমুদ্রস্রোত ও বায়ুপ্রবাহের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে।

পরীক্ষা : একটি অন্ধকার ঘরে টেবিলের উপর জ্বলন্ত মোমবাতিকে সূর্য এবং ভূগোলককে পৃথিবী হিসেবে কল্পনা কর। জ্বলন্ত মোমবাতির সামনে ভূগোলকটি ঘুরালে দেখা যাবে বাতির সম্মুখের অংশ আলোকিত এবং তার বিপরীত অংশ অন্ধকার থাকে। আলোকিত অংশে দিন এবং অন্ধকার অংশে রাত হয়। পৃথিবীর আলোকিত ও অন্ধকার অংশের মধ্যবর্তী বৃত্তাকার অংশকে ছায়াবৃত্ত বলে। আবর্তনের ফলে পৃথিবীর যে অংশ অন্ধকার থেকে ছায়াবৃত্ত পার হয়ে সবেমাত্র আলোকিত অংশে পৌঁছায় সেখানে প্রভাত হয়। যে অংশ আলো থেকে ছায়াবৃত্ত পার হয়ে সবেমাত্র অন্ধকারে পৌঁছায় সেখানে সন্ধ্যা হয়। প্রভাতের কিছু পূর্বে যে সময় ক্ষীণ আলো থাকে তখন ঊষা এবং সন্ধ্যার কিছু পূর্বে যে সময় ক্ষীণ আলো থাকে সে সময়কে গোধূলি বলে।

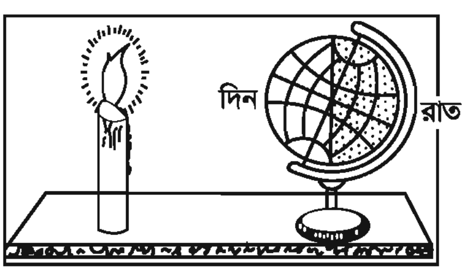

চিত্র ৩.৭ : মোমবাতি ও গোলকের সাহায্যে দিনরাত্রি

বার্ষিক গতি : পৃথিবী নিজ অক্ষে অবিরাম ঘুরতে ঘুরতে একটি নির্দিষ্ট উপবৃত্তাকার কক্ষপথে, নির্দিষ্ট দিকে এবং নির্দিষ্ট সময়ে সূর্যের চারদিকে পরিক্রমণ করছে। পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে পৃথিবীর এই পরিক্রমণকে বার্ষিক গতি (Annual Motion) বলে। পৃথিবী প্রতি সেকেন্ডে ৩০ কিলোমিটার বেগে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। সূর্যকে পরিক্রমণ করতে পৃথিবীর এক বছর সময় লাগে। এ সময়কে সৌরবছর বলা হয়। ঠিক হিসাবে এ সময় হলো ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেন্ড। কিন্তু ৩৬৫ দিনে সৌরবছর গণনা করা হয়। তাই প্রতি চার বছরে একদিন বাড়িয়ে খ্রিস্টীয় চতুর্থ বছর ৩৬৬ দিনে বছর গণনা করা হয়। সে বছর ফেব্রুয়ারি মাস ২৮ দিনের পরিবর্তে ২৯ দিনে ধরা হয়। এরূপ বছরকে অধিবর্ষ বা লিপইয়ার (Leap Year) বলে। বার্ষিক গতির ফলে পৃথিবীতে দিন–রাত্রির হ্রাস–বৃদ্ধি ও ঋতু পরিবর্তন ঘটে।

দিবা রাত্রির হ্রাস–বৃদ্ধি এবং ঋতু পরিবর্তনে বার্ষিক গতির ভূমিকা

আমরা লক্ষ করেছি যে, বছরের বিভিন্ন সময়ের দিন ও রাতের সময়ের ব্যবধান হয়। অর্থাৎ কোনো সময় দিন বড় থাকে আবার কোনো সময় রাত বড় থাকে। আমরা কখনো কি ভেবে দেখেছি কেন এই তারতম্য ঘটে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, বার্ষিক গতির ফলে এই তারতম্য ঘটে।

দিবা–রাত্রির হ্রাস–বৃদ্ধির কারণ

আমরা নিচের চিত্রের দিকে লক্ষ করি। এখানে সূর্যকে পরিক্রমণকালে কক্ষপথে পৃথিবীর চারটি অবস্থান নির্দিষ্ট করা হয়েছে, যথা : ২১শে জুন, ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২২শে ডিসেম্বর ও ২১শে মার্চ।

২১শে জুন : পৃথিবী সূর্যের চারদিকে পরিক্রমণকালে ২১শে জুন কক্ষপথের এমন এক অবস্থানে পৌঁছে যেখানে উত্তর মেরু সূর্যের দিকে সর্বাপেক্ষা বেশি কোনে (২৩.৫°) ঝুঁকে থাকে এবং দক্ষিণ মেরু সূর্য থেকে সর্বাপেক্ষা দূরে সরে পড়ে। এ দিন মধ্যাহ্নে ২৩.৫° উত্তর অক্ষাংশে সূর্যকিরণ লম্বভাবে (৯০° কোণে) পড়ে। এই তারিখে উত্তর গোলার্ধে দিন সবচেয়ে বড় এবং রাত সবচেয়ে ছোট হয়। এ সময়ে দক্ষিণ গোলার্ধে বিপরীত অবস্থা বিরাজ করে। সুমেরুবৃত্ত (৬৬.৫° উত্তর) থেকে উত্তরে উত্তর মেরু পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টা দিন ও কুমেরুবৃত্ত (৬৬.৫° দক্ষিণ) থেকে দক্ষিণে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টা রাত থাকে। ২১শে জুনের পর সূর্য আর উত্তর গোলার্ধের দিকে সরে না, দক্ষিণ গোলার্ধের দিকে সরতে থাকে। সূর্যের এই অস্থানকে উত্তর অয়নান্ত বলে।

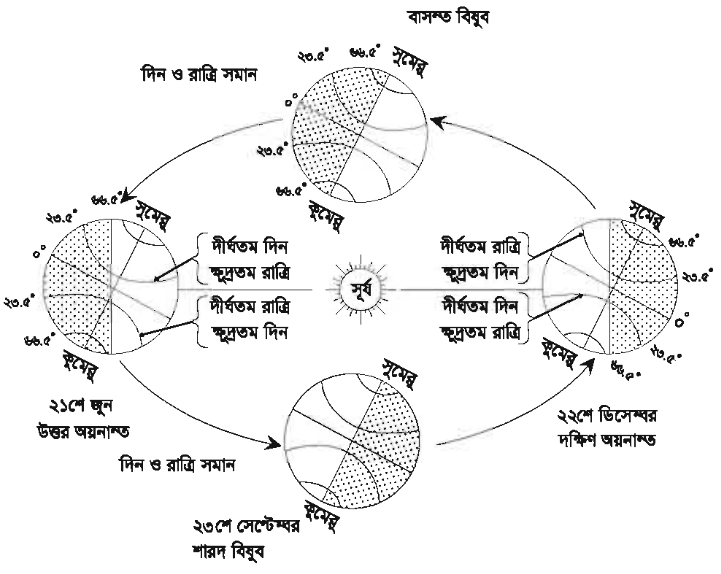
২১শে মার্চ
বাসন্ত বিষুব
দিন ও রাত্রি সমান
২৩.৫°
৬৬.৫°
সুমেরু
০°
২৩.৫°
৬৬.৫°
কুমেরু
দীর্ঘতম দিন
ক্ষুদ্রতম রাত্রি
দীর্ঘতম রাত্রি
ক্ষুদ্রতম দিন
সূর্য
দীর্ঘতম রাত্রি
ক্ষুদ্রতম দিন
দীর্ঘতম দিন
ক্ষুদ্রতম রাত্রি
২১শে জুন
উত্তর অয়নান্ত
দিন ও রাত্রি সমান
২৩শে সেপ্টেম্বর
শারদ বিষুব
২২শে ডিসেম্বর
দক্ষিণ অয়নান্ত

চিত্র ৩.৮ : দিবা-রাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধি

২৩শে সেপ্টেম্বর : ২১শে জুনের পর উত্তর মেরু সূর্য থেকে দূরে সরতে থাকে এবং দক্ষিণ মেরু নিকটে আসতে থাকে। এতে উত্তর গোলার্ধে ক্রমশ দিন ছোট ও রাত বড় এবং দক্ষিণ গোলার্ধে দিন বড় ও রাত ছোট হতে থাকে। ২৩শে সেপ্টেম্বর পৃথিবী এমন এক স্থানে অবস্থান করে যখন উভয় মেরু সূর্য থেকে সমান দূরে থাকে। এই দিন সূর্যরশ্মি নিরক্ষরেখায় লম্বভাবে (৯০° কোণে) সুমেরুবৃত্তে ও কুমেরুবৃত্তে ৬৬.৫° কোণে এবং মেরুদ্বয়ে ০° কোণে পতিত হয়। তাই এ তারিখে পৃথিবীর সর্বত্র দিবা–রাত্রি সমান হয়।

২২শে ডিসেম্বর : ২৩শে সেপ্টেম্বরের পর উত্তর মেরু সূর্য থেকে আরও দূরে সরতে থাকে এবং দক্ষিণ মেরু অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী হয়। ফলে উত্তর গোলার্ধে দিনের সময় কমতে থাকে এবং রাতের সময় বাড়তে থাকে। এভাবে ২২শে

ডিসেম্বর পৃথিবী এমন এক অবস্থানে পৌঁছে যখন দক্ষিণ মেরু সূর্যের দিকে সবচেয়ে বেশি (২৩.৫°) হেলে থাকে। এই দিন সূর্যকিরণ মকরক্রান্তি রেখায় লম্বভাবে (৯০° কোণে) পতিত হয়। তাই এই তারিখে দক্ষিণ গোলার্ধে দিন সবচেয়ে বড় এবং রাত সবচেয়ে ছোট হয়। ২২শে ডিসেম্বরের পর সূর্য আর দক্ষিণ গোলার্ধের দিকে সরে না, উত্তর গোলার্ধের দিকে সরতে থাকে। সূর্যের এই অস্থানকে দক্ষিণ অয়নান্ত বলে।

২১শে মার্চ : ২২শে ডিসেম্বরের পর পৃথিবী আপন কক্ষপথে আরও অগ্রসর হলে উত্তর মেরু ক্রমশ সূর্যের নিকট আসে এবং দক্ষিণ মেরু দূরে সরে যায়। এতে উত্তর গোলার্ধে দিন বড় ও রাত ছোট হতে থাকে। অবশেষে ২১শে মার্চ পৃথিবী আপন কক্ষপথের এমন এক স্থানে পৌঁছে যেখানে উভয় মেরু সূর্য থেকে সমান দূরে থাকে। এই দিন ২৩শে সেপ্টেম্বরের মতো দিবা–রাত্রি সমান হয়। পৃথিবীর এ অবস্থানকে বাসন্ত বিষুব বলে। ২১শে মার্চের পর পৃথিবী আপন কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে আবার ২১শে জুনের অবস্থায় ফিরে যায়। এভাবে পৃথিবীর বার্ষিক গতির জন্য দিবা–রাত্রির হ্রাস–বৃদ্ধি ঘটে।

ঋতু পরিবর্তন

আমরা পাশের ৩.৯ চিত্রটির দিকে তাকাই। এখানে সূর্যকে পরিক্রমণকালে পৃথিবীর চারটি অবস্থান থেকে ঋতু পরিবর্তনের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। বার্ষিক গতির জন্য সূর্যরশ্মি কোথাও লম্বভাবে আবার কোথাও তির্যকভাবে পতিত হয় এবং দিবা–রাত্রির হ্রাস–বৃদ্ধি ঘটে। লম্বভাবে পতিত সূর্যরশ্মি কম বায়ুস্তর ভেদ করে আসে বলে ভূপৃষ্ঠকে অধিক উত্তপ্ত করে। তির্যকভাবে পতিত সূর্যরশ্মি যে কেবল অধিক বায়ুস্তর ভেদ করে আসে তা নয়, এটি লম্বভাবে পতিত সূর্যরশ্মি অপেক্ষা অধিক স্থানব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে বছরের বিভিন্ন সময়ে ভূপৃষ্ঠের সর্বত্র তাপের তারতম্য হয় এবং ঋতু পরিবর্তন ঘটে। পৃথিবীতে সময়ভেদে তাপমাত্রার পার্থক্য বা পরিবর্তনকে ঋতু পরিবর্তন বলে। সূর্যকে পরিক্রমণকালে পৃথিবীর চারটি অবস্থান থেকে ঋতু পরিবর্তনের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

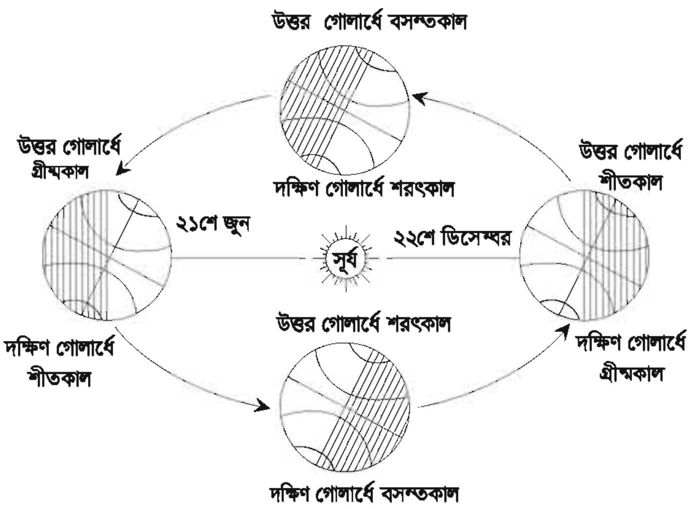

চিত্র ৩.৯ : ঋতু পরিবর্তন

উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল ও দক্ষিণ গোলার্ধে শীতকাল : ২১শে জুন সূর্যের উত্তরায়ণের শেষ দিন। এই দিন সূর্যরশ্মি কর্কটক্রান্তির উপর লম্বভাবে পতিত হয়। ফলে ঐ দিন এখানে দীর্ঘতম দিন এবং ক্ষুদ্রতম রাত্রি হয়। ২১শে জুনের দেড় মাস পূর্ব থেকে দেড় মাস পর পর্যন্ত মোট তিন মাস উত্তর গোলার্ধে উত্তাপ বেশি থাকে। এ সময় উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল। এ সময়ে সূর্যের তির্যক কিরণের জন্য দক্ষিণ গোলার্ধে দিন ছোট ও রাত বড় হয়। এজন্য সেখানে তখন শীতকাল।

উত্তর গোলার্ধে শরৎকাল ও দক্ষিণ গোলার্ধে বসন্ত কাল : ২৩শে সেপ্টেম্বর সূর্যরশ্মি নিরক্ষরেখার উপর লম্বভাবে পড়ে এবং সর্বত্র দিবা-রাত্রি সমান হয়। সেজন্য এ তারিখের দেড় মাস পূর্ব থেকে দেড় মাস পর পর্যন্ত মোট তিন মাস তাপমাত্রা মধ্যম ধরনের হয়ে থাকে। এ সময় উত্তর গোলার্ধে শরৎকাল ও দক্ষিণ গোলার্ধে বসন্তকাল।

উত্তর গোলার্ধে শীতকাল ও দক্ষিণ গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল : ২২শে ডিসেম্বর সূর্যের দক্ষিণায়নের শেষদিন অর্থাৎ এই দিন সূর্য মকরক্রান্তির উপর লম্বভাবে কিরণ দেয়। ফলে সেখানে দিন বড় ও রাত ছোট হয়। এ তারিখের দেড় মাস পূর্বে ও পরে দক্ষিণ গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল এবং উত্তর গোলার্ধে শীতকাল থাকে।

কাজ

একক : ছক পূরণ কর

তারিখ	উ. গোলার্ধ	দ. গোলার্ধ
২৪শে জুন		
২৫শে সেপ্টে:		
১১ই ডিসে:		

উত্তর গোলার্ধে বসন্তকাল ও দক্ষিণ গোলার্ধে শরৎকাল : ২১শে মার্চ তারিখে উত্তর ও দক্ষিণ মেরু সূর্য থেকে সমান দূরে থাকে। এই দিন সূর্য নিরক্ষরেখার উপর লম্বভাবে কিরণ দেয় এবং সর্বত্র দিন–রাত্রি সমান হয়। ২১শে মার্চের দেড় মাস পূর্ব থেকে দেড় মাস পর পর্যন্ত এই তিন মাস উত্তর গোলার্ধে বসন্তকাল ও দক্ষিণ গোলার্ধে শরৎকাল থাকে।

ঋতু পরিবর্তনের কারণ

পৃথিবীর বার্ষিক গতির ফলে সূর্যরশ্মি কোথাও লম্বভাবে আবার কোথাও তির্যকভাবে পতিত হয়। ফলে তাপমাত্রার পার্থক্য ঘটে এবং ঋতু পরিবর্তিত হয়। বার্ষিক গতির ফলে দিন ও রাতের হ্রাস–বৃদ্ধি ঘটে। কোনো স্থানে দিবাভাগের পরিমাণ রাতের পরিমাণ হতে দীর্ঘ হলে সেই স্থানে বায়ুমণ্ডল অধিকতর উষ্ণ থাকে। এভাবে বছরের বিভিন্ন সময়ে ভূপৃষ্ঠের সর্বত্র তাপের তারতম্য হয় এবং ঋতু পরিবর্তন ঘটে। দিন ও রাতের হ্রাস–বৃদ্ধি ঘটে। সূর্যকে পরিক্রমণকালে পৃথিবী সবসময় ৬৬.৫° কোণে হেলে ঘুরে। ফলে বিভিন্ন স্থানে সূর্যরশ্মির পতনে কৌণিক তারতম্য ঘটে এবং ঋতু পরিবর্তিত হয়। পৃথিবীর কক্ষপথের দৈর্ঘ্য ৯৩৮০৫১৮২৭ কি.মি.। এ কক্ষপথ উপবৃত্তাকার বলে পরিক্রমণকালে সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব সর্বদা সমান থাকে না। জানুয়ারির ১ থেকে ৩ তারিখে সূর্য পৃথিবীর নিকটতম অবস্থানে থাকে। একে পৃথিবীর অনুসূর (Perihelion) বলে। আবার জুলাই–এর ১ থেকে ৪ তারিখে সূর্য পৃথিবী থেকে সবচেয়ে দূরে থাকে। একে পৃথিবীর অপসূর (Aphelion) বলে। সূর্য ও পৃথিবীর দূরত্বের হ্রাস–বৃদ্ধি এবং সে কারণে আপেক্ষিক আয়তনের আপাত পরিবর্তন হতে প্রমাণিত হয় যে, পৃথিবীর কক্ষপথ উপবৃত্তাকার। এর ফলে সূর্যতাপের তারতম্য হয় এবং ঋতু পরিবর্তন ঘটে। আমাদের বাংলাদেশ উত্তর গোলার্ধে অবস্থিত এবং দেশটির মাঝামাঝি স্থান দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা (২৩.৫° উত্তর অক্ষরেখা) অতিক্রম করেছে। কাজেই উত্তর গোলার্ধে ঘনত্ব পরিবর্তনের সাথে সাথে বাংলাদেশের ঋতু পরিবর্তিত হয়।

কাজ

একক : ঋতু পরিবর্তনের কারণসমূহ চিহ্নিত কর।

পরিচ্ছেদ ৩.৪: জোয়ার–ভাটা

পৃথিবীর বিভিন্ন সাগর মহাসাগরে সমুদ্রস্রোত ছাড়াও পানিরাশির নিজস্ব গতি আছে। এর ফলে প্রতিদিনই কিছু সময় সমুদ্রের পানি ফুলে ওঠে ফলে পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পায়। আবার কিছু সময়ের জন্য তা নেমে যায়। সমুদ্রের পানি এভাবে নিয়মিতভাবে ফুলে ওঠাকে জোয়ার এবং নেমে যাওয়াকে ভাটা বলে। পৃথিবীর নিজের গতি এবং তার উপর চন্দ্র ও সূর্যের প্রভাবেই মূলত জোয়ার–ভাটা সংঘটিত হয়। জোয়ার, ভাটার নানা শ্রেণি রয়েছে। পৃথিবীর উপরও জোয়ার-ভাটা নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করে।

জোয়ার–ভাটার ধারণা, কারণ ও শ্রেণিবিভাগ

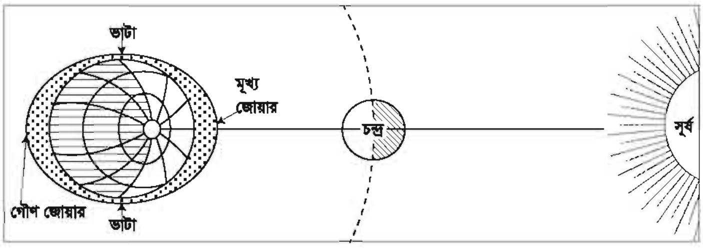

চিত্র ৩.১০: জোয়ার–ভাটা

চন্দ্র ও সূর্য ভূপৃষ্ঠের জল ও স্থলভাগকে অবিরাম আকর্ষণ করে। এ আকর্ষণের ফলে ভূপৃষ্ঠের পানি নির্দিষ্ট সময় অন্তর প্রত্যহ একস্থানে ফুলে ওঠে এবং অন্যত্র নেমে যায়। এভাবে প্রত্যেক সাড়ে বারো ঘণ্টায় সমুদ্রের পানি একবার নিয়মিতভাবে ওঠানামা করে। তবে জোয়ার ও ভাটা প্রতি ৬ ঘণ্টা ১৩ মিনিট পর পর হয়। সমুদ্র পানিরাশির নিয়মিতভাবে এ ফুলে ওঠাকে জোয়ার (High Tide) এবং নেমে যাওয়াকে ভাটা (Ebb or Low Tide) বলে। সমুদ্রের মধ্যভাগে পানি সাধারণত এক থেকে তিন ফুট উঁচু–নিচু হয়; কিন্তু উপকূলের নিকট সাগর উপসাগরের গভীরতা কম বলে সেখানে পানিরাশি অনেক উঁচু–নিচু হয়। এ জন্য সমুদ্রের মোহনা

থেকে নদীসমূহের গতিপথে কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত জোয়ার–ভাটা অনুভূত হয়।

জোয়ার–ভাটার কারণ : প্রাচীনকালে জোয়ার–ভাটার কারণ সম্পর্কে নানা ধরনের অবাস্তব কল্পনা করা হতো। কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, পৃথিবীর আবর্তনের ফলে সৃষ্ট কেন্দ্রাতিগ শক্তি ও পৃথিবীর ওপর চন্দ্র সূর্যের আকর্ষণে জোয়ার–ভাটা হয়।

মহাকর্ষ ও মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাব : এই মহাবিশ্বের যে কোনো পদার্থের আকর্ষণ শক্তি আছে। একটি বস্তু অন্য বস্তুকে আকর্ষণ করে। মহাবিশ্বের দুটি বস্তুর মধ্যে পরস্পর আকর্ষণ শক্তিকে মহাকর্ষ শক্তি বা মহাকর্ষণ বলে। এই মহাকর্ষ শক্তির ফলে পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে এবং চন্দ্র পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। যে বস্তু যত বড় তার আকর্ষণ শক্তি তত বেশি। কিন্তু দূরত্ব বৃদ্ধি পেলে আকর্ষণ শক্তি কমে যায়। পৃথিবী এবং এর নিকটতম যে কোনো বস্তুর মধ্যকার আকর্ষণকে মাধ্যাকর্ষণ বলে। একে অভিকর্ষণও বলা হয়। সূর্য চন্দ্র অপেক্ষা ২.৬০ কোটি গুণ বড় হলেও পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব চন্দ্রের দূরত্ব থেকে অনেক বেশি। তাই পৃথিবীর ওপর চন্দ্রের আকর্ষণ শক্তি সূর্য অপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ। পৃথিবীর ওপর চন্দ্রের যে আকর্ষণ তাই হলো মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। এ মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে জোয়ার–ভাটা হয়।

কেন্দ্রাতিগ বা কেন্দ্রাতিমুখী শক্তি : পৃথিবী তার অক্ষ বা মেরুদণ্ডের ওপর থেকে চারিদিকে দ্রুত বেগে ঘুরছে বলে তার পৃষ্ঠ থেকে তরল পানিরাশি চতুর্দিকে ছিটকে যাওয়ার প্রবণতা রয়েছে। একেই কেন্দ্রাতিগ শক্তি (Centrifugal Force) বলে। পৃথিবী ও চন্দ্রের আবর্তনের জন্য ভূপৃষ্ঠের তরল ও হালকা জলরাশির ওপর কেন্দ্রাতিগ শক্তির প্রভাব অধিক হয়। এর ফলেই জলরাশি সর্বদা বাইরে নিক্ষিপ্ত হয় এবং তরল জলরাশি কঠিন ভূ–ভাগ হতে বিচ্ছিন্ন হতে চায়। এমনিভাবে কেন্দ্রাতিগ শক্তিও জোয়ার–ভাটা সৃষ্টিতে সহায়তা করে।

জোয়ার–ভাটার শ্রেণিবিভাগ : জোয়ার–ভাটাকে চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়, যেমন– মুখ্য জোয়ার, গৌণ জোয়ার, ভরা কটাল ও মরা কটাল। চাঁদ পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরছে। চাঁদের এই আবর্তনকালে পৃথিবীর যে অংশ চাঁদের নিকটবর্তী হয় সেখানে চাঁদের আকর্ষণ সবচেয়ে বেশি। ফলে পার্শ্ববর্তী স্থান হতে পানি এসে ঠিক চন্দ্রের নিচে ফুলে ওঠে এবং জোয়ার হয়। একে মুখ্য জোয়ার বা প্রত্যক্ষ জোয়ার বলে। মুখ্য জোয়ারের বিপরীত দিকে পানির নিচের স্থলভাগ পৃথিবীর কেন্দ্রের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ। ফলে তার ওপর চাঁদের আকর্ষণ পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলের আকর্ষণের সমান থাকে। এতে বিপরীত দিকের পানিরাশি অপেক্ষা স্থলভাগ চাঁদের দিকে বেশি আকৃষ্ট হয়। এতে কেন্দ্রাতিগ শক্তির সৃষ্টি হয়। দুই দিকের পানি সে স্থানে প্রবাহিত হয়ে যে জোয়ারের সৃষ্টি করে, তাকে গৌণ জোয়ার বা পরোক্ষ জোয়ার বলে। যখন পৃথিবীর একপাশে মুখ্য জোয়ার ও অন্যপাশে গৌণ জোয়ার হয় তখন দুই জোয়ারের মধ্যবর্তী স্থল থেকে পানি সরে যায়। মধ্যবর্তী স্থলের পানির ঐ অবস্থাকে ভাটা বলে।

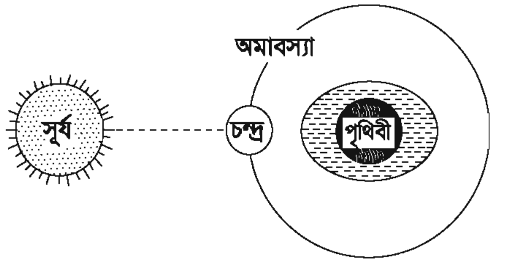

চিত্র ৩.১১ : তেজ কটাল বা ভরা কটাল (অমাবস্যায়)

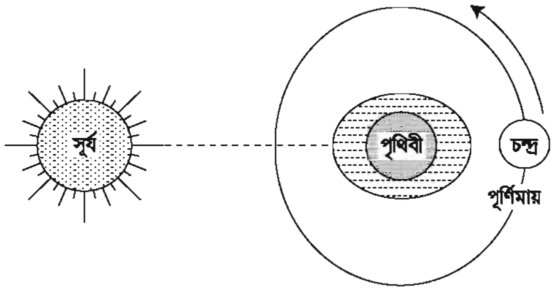

চিত্র ৩.১২ : তেজ কটাল বা ভরা কটাল (পূর্ণিমায়)

অমাবস্যা তিথিতে চন্দ্র ও সূর্য পৃথিবীর একই পাশে এবং পূর্ণিমা তিথিতে পৃথিবীর এক পাশে চাঁদ ও অপর পাশে সূর্য অবস্থান করে। ফলে এ দুই তিথিতে চন্দ্র ও সূর্য সমসূত্রে থাকে এবং উভয়ের মিলিত আকর্ষণে যে প্রবল জোয়ারের সৃষ্টি হয় তাকে তেজ কটাল বা ভরা কটাল বলে। সপ্তমী ও অষ্টমী তিথিতে চন্দ্র ও সূর্য পৃথিবীর সমকোণে অবস্থান করার ফলে চন্দ্রের আকর্ষণে এ সময়ে চাঁদের দিকে জোয়ার হয়।

কিন্তু সূর্যের আকর্ষণের জন্য এ জোয়ারের বেগ তত প্রবল হয় না। এ রূপ জোয়ারকে মরা কটাল বলে। এক মাসে দু'বার ভরা কটাল এবং দু'বার মরা কটাল হয়।

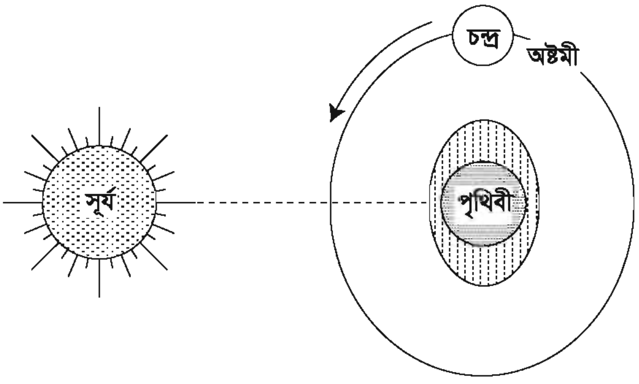

চিত্র ৩.১৩ : অষ্টমী তিথিতে মরা কটাল

জোয়ার-ভাটার ব্যবধান : পৃথিবী যেমন নিজ অক্ষের উপর পশ্চিম হতে পূর্বদিকে আবর্তন করছে চন্দ্রও তেমনি পৃথিবীর চারদিকে পশ্চিম হতে পূর্বদিকে পরিক্রমণ করে। চন্দ্র নিজ কক্ষপথে ২৭ দিনে পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে। ফলে পৃথিবীর একবার আবর্তনকালে অর্থাৎ প্রায় ২৪ ঘণ্টায় চন্দ্র (৩৬০ ÷ ২৭) বা ১৩° পথ অতিক্রম করে। পৃথিবী ও চন্দ্র উভয়ই যেহেতু পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে ঘুরছে তাই পৃথিবী উক্ত ১৩° পথ আরও (১৩ × ৪)=৫২ মিনিটে অগ্রসর হয়। ১° পথ অতিক্রম করতে পৃথিবীর ৪ মিনিট সময় লাগে। কোনো নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট সময়ে মুখ্য জোয়ার হওয়ার ১২ ঘণ্টা ২৬ মিনিট পরে সেখানে গৌণ জোয়ার হয় এবং মুখ্য জোয়ারের ২৪ ঘণ্টা ৫২ মিনিট পর সেখানে আবার মুখ্য জোয়ার হয়। এভাবে প্রত্যেক স্থানে জোয়ার শুরুর ৬ ঘণ্টা ১৩ মিনিট পরে ভাটা হয়ে থাকে।

পৃথিবীর ওপর জোয়ার-ভাটার প্রভাব

পৃথিবী তথা স্থলভাগ, পানিরাশি ও মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ওপর জোয়ার-ভাটার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব রয়েছে। দৈনিক দু'বার করে জোয়ার-ভাটা হওয়ার ফলে নদীর আবর্জনা পরিষ্কার হয়ে পানি নির্মল হয় এবং নদী মোহনায় পলি সঞ্চিত হয় না। ফলে নদীর মুখ বন্ধ হতে পারে না। জোয়ার-ভাটার স্রোতে নদীখাত গভীর হয়। অনেক নদীর পাশে খাল খনন করে জোয়ারের পানি আটকে জমিতে সেচ দেওয়া হয়। পৃথিবীর বহু নদীতে ভাটার স্রোতকে কাজে লাগিয়ে জল বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। ফ্রান্সের লার‍্যান্স বিদুৎ কেন্দ্র ও ভারতের বান্ডালা বন্দরেও এরূপ একটি পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র রয়েছে। জোয়ার-ভাটায় সমুদ্রের লবণাক্ত পানি দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার ফলে শীতপ্রধান দেশে নদীর পানি চলাচলের অনুকূলে থাকে। জোয়ারের সময় নদীতে পানি বৃদ্ধির ফলে সমুদ্রগামী বড় বড় জাহাজ অনায়াসেই নদীতে প্রবেশ করে, আবার ভাটার টানে সমুদ্রে চলে আসে। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরে জোয়ারের সময় নদীর গভীরতা বৃদ্ধি পেলে বড় বড় জাহাজ প্রবেশ করে অথবা বন্দর ছেড়ে যায়। বন্দরে প্রবেশের পূর্বে জোয়ারের অপেক্ষায় জাহাজগুলো নদীর মোহনায় নোঙর করে থাকে। বঙ্গোপসাগরের জোয়ারের পানি পদ্মা নদীতে গোয়ালন্দের কাছে এবং মেঘনা নদীতে ভৈরব বাজারের কাছাকাছি পৌঁছায়। জোয়ারের সময় সমুদ্রের পানিকে আবদ্ধ করে শুকিয়ে লবণ তৈরি করা হয়। ভরা কটালের সময় সমুদ্রের পানি কখনো প্রবল তরঙ্গে নদীর মোহনা দিয়ে স্থলভাগের মধ্যে প্রবেশ করে বানের (Tidal bore) বা বন্যার সৃষ্টি করে। বানের পানির উচ্চতা ৩/৪ ফুট থেকে প্রায় ৪০ ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। যে নদীর মোহনা সংকীর্ণ বা সম্মুখে বালির বাঁধ থাকে, সেসব নদীতে প্রবল বান হয়ে থাকে। বাংলাদেশেও বর্ষাকালে অমাবস্যায় জোয়ারে প্রবল বান হতে দেখা যায়। তবে স্থলভাগে প্রবেশের পর এর বেগ কমে যায়। মেঘনা, ভাগীরথী, আমাজান প্রভৃতি নদীতেও প্রবল বান দেখা যায়। অসাবধানতাবশত কখনো কখনো এই বানে নৌকা, স্টিমার, জাহাজসহ জানমালের ব্যাপক ক্ষতি হয়।

কাজ

একক : জোয়ার-ভাটার কারণ ও পৃথিবীর উপর এর প্রভাব লিখ।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. শুক্র গ্রহে এসিড বৃষ্টি হয় কেন?

২. সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে বৃহস্পতির অধিক সময় প্রয়োজন হয় কেন?

৩. ট্রপোপস দিয়ে বিমান চলাচল করার কারণ কী?

৪. ওজোনস্তরের তাপমাত্রা অধিক হওয়ার কারণ কী?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন :

১. আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা অতিক্রমকালে বার ও তারিখের পরিবর্তন হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।

২. কোনো স্থান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কোন কাল্পনিক রেখা অধিক গুরুত্বপূর্ণ?

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১। **ইউরেনাসের উপগ্রহ কোনটি?**

ক. ক্যাপিটাস

খ. এরিয়েল

গ. নেরাইড

ঘ. গ্যানিমেড

২। **শনির বায়ুমণ্ডলে কোন গ্যাসগুলোর মিশ্রণ রয়েছে?**

ক. নাইট্রোজেন ও হিলিয়াম

খ. হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম

গ. কার্বন ডাই-অক্সাইড ও হিলিয়াম

ঘ. অক্সিজেন ও হিলিয়াম

৩। **পৃথিবী উপবৃত্তাকার পথে পরিক্রমণ করার কারণে —**

i. বিভিন্ন ঋতুর আবির্ভাব হয়

ii. মাধ্যাকর্ষণ শক্তির হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে

iii. দিবা–রাত্রির দৈর্ঘ্যের তারতম্য ঘটে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i

খ. i ও ii

গ. i ও iii

ঘ. ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

অর্পিতা প্রতিদিন খুব ভোরে পড়তে বসে। একদিন সে লক্ষ করে, পূর্বদিকের আকাশে ভোরবেলাতেও একটি তারা দেখা যাচ্ছে। অর্পিতা বুঝতে পারে যে সে একটি গ্রহ দেখেছে।

৪. অর্পিতার দেখা গ্রহটির নাম কী–

ক. শুক্র

খ. শনি

গ. মঙ্গল

ঘ. নেপচুন

৫. পৃথিবীর সাথে উক্ত গ্রহের কোন বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হবে?

ক. গ্রহটির উপগ্রহ নেই

খ. গ্রহটিতে তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নিচে থাকে

গ. গ্রহটির চারদিকে বলয় আছে

ঘ. গ্রহটি নীলাভ বর্ণের

সৃজনশীল প্রশ্ন :

১.

স্থান	অক্ষরেখা	দ্রাঘিমা রেখা	তারিখ	সময়
A	৩০° উত্তর	১০৫° পশ্চিম	২২শে জুন	৭টা (সকাল)
B	৫০° দক্ষিণ	৫৬° পশ্চিম	২২শে জুন	?

ক. মেরুরেখা কাকে বলে?

খ. সৌরকলঙ্ক কী? ব্যাখ্যা কর।

গ. ছকের A চিহ্নিত স্থানটির স্থানীয় সময় সকাল ৭টা হলে B চিহ্নিত স্থানটির স্থানীয় সময় কত হবে?

ঘ. উক্ত তারিখে দুটি স্থানে দিবা–রাত্রির দৈর্ঘ্য কি একইরূপ হবে? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন কর।

২. মাইশা সুইডেনে (৬৬.৫° উত্তর অক্ষরেখা ও ১৫° পূর্ব দ্রাঘিমারেখা) বসবাস করে। ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি সুইডেনের স্থানীয় সময় ভোর ৬টা ক্যানবেরায় (৩৫° দক্ষিণ অক্ষরেখা ও ১৫০° পূর্ব দ্রাঘিমারেখা) বসবাসরত ছোট বোন মালিহাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানায়। মালিহা কথা প্রসঙ্গে তাকে জানায়, আগামী ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে সে সুইডেনে বেড়াতে যাবে।

ক. সৌরদিন কাকে বলে?

খ. অধিবর্ষ কী? ব্যাখ্যা কর।

গ. ক্যানবেরার স্থানীয় সময় কয়টায় মাইশা টেলিফোন করেছিল?

ঘ. মালিহার বেড়াতে যাওয়ার তারিখে দুটি স্থানে কি একই ধরনের ঋতু বিরাজ করবে? উদ্দীপকের আলোকে যুক্তি দাও।

৩. সিনথিয়া বাবা–মায়ের সাথে কক্সবাজার বেড়াতে যায়। সন্ধ্যাবেলা পূর্ণিমার আলোয় সমুদ্রের শান্ত রূপ দেখে তারা মুগ্ধ হয়। কিছুক্ষণ পরে তারা লক্ষ করে, সমুদ্রের পানি ফুলে উঠছে এবং তীরে প্রচণ্ড বেগে আছড়ে পড়ছে। বাবা তাকে ভীত হতে নিষেধ করেন এবং বলেন যে, সমুদ্রে এরূপ অবস্থা নিয়মিত ঘটে।

ক. জোয়ার-ভাটা কয়টি?

খ. কেন্দ্রাতিগ শক্তি কী? ব্যাখ্যা কর।

গ. সমুদ্রের পানিতে উক্ত সময়ে যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তার কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর সিনথিয়ার দেখা ঘটনাটির প্রভাব আছে কি ? বিশ্লেষণ কর।

৪.

স্থান	অক্ষরেখা	দ্রাঘিমারেখা	তারিখ	সময়
মেক্সিকো	৩০° উত্তর	১০৫° পশ্চিম	২২শে জুন	?
উইলিং দ্বীপপুঞ্জ	৫০° দক্ষিণ	৭৫° পশ্চিম	২২শে জুন	৭ টা (সকাল)

ক. প্রতিপাদ স্থান কাকে বলে?

খ. দিন-তারিখ নির্ধারণে আন্তর্জাতিক তারিখ রেখার ভূমিকা বর্ণনা কর ।

গ. ছকে উল্লিখিত উইলিং দ্বীপপুঞ্জের স্থানীয় সময়ের সাথে মেক্সিকোর স্থানীয় সময়ের পার্থক্য কত হবে তা নির্ণয় কর।

ঘ. উক্ত তারিখে স্থান দুটির দিবা–রাত্রির দৈর্ঘ্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর।

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ু

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ ব-দ্বীপ। সমগ্র বাংলাদেশ সামান্য পাহাড়ি অঞ্চল, সীমিত উঁচুভূমি এবং নদী বিধৌত এক বিস্তীর্ণ সমভূমি নিয়ে গঠিত। এদেশের ভূ-প্রকৃতি নিচু ও সমতল। বাংলাদেশের জলবায়ু মোটামুটি সমভাবাপন্ন। জলবায়ুর উপর মৌসুমি বায়ুর প্রভাব খুব বেশি। তাই বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঋতুর আগমন ঘটে। বিভিন্ন ঋতুতে এ দেশের জলবায়ুর তারতম্যের কারণে আমরা কখনো গরম আবার কখনো শীত অনুভব করি। জলবায়ুর কারণে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। ফলে অতিবৃষ্টি, অকাল বন্যা, জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করে। এ অধ্যায়ে আমরা বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে অবহিত হব।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

- বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও সীমানা বর্ণনা করতে পারব;
- বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূ-প্রাকৃতিক অঞ্চল চিহ্নিত করতে পারব;
- বাংলাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক অঞ্চলের শ্রেণিবিভাগ ও গঠন ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ভূ-প্রাকৃতিক গঠন কীভাবে জনসংখ্যার (জনবসতি) বিস্তরণে প্রভাব বিস্তার করে তা বিশ্লেষণ করতে পারব;
- বাংলাদেশের ভূমি ব্যবহারের উপর জনবসতি বিস্তারের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব;
- পরিবেশ সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ হব;
- বাংলাদেশের সাথে দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশের (ভারত, মিয়ানমার ও নেপাল) জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যের তুলনা করতে পারব;
- বাংলাদেশের মানুষের জীবন-জীবিকার ওপর জলবায়ুর প্রভাব বিশ্লেষণ ও এ বিষয়ে প্রতিবেদন তৈরি করতে পারব;
- ভূমিকম্পের ধারণা ও কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বিশ্বের ভূমিকম্পপ্রবণ দেশ হিসেবে পরিচিত কয়েকটি দেশের পরিস্থিতি বর্ণনা করতে পারব;
- বাংলাদেশকে ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল বলার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ভূমিকম্প ঝুঁকি মোকাবিলায় বাংলাদেশের প্রস্তুতি ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবিলায় সচেতন হব এবং অভিযোজনে সক্ষমতা লাভ করব;
- ভূমিকম্প পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবিলায় সহযোগিতার মনোভাব তৈরি করব।

পরিচ্ছেদ ৪.১ : বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি

বাংলাদেশ পলল গঠিত একটি আর্দ্র অঞ্চল। উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বের সামান্য পাহাড়ি অঞ্চল এবং উত্তর-পশ্চিমাংশের সীমিত উঁচুভূমি ব্যতীত সমগ্র বাংলাদেশ নদী বিধৌত এক বিস্তীর্ণ সমভূমি। দক্ষিণ এশিয়ার তিনটি বড় নদী—গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার অববাহিকায় বাংলাদেশ অবস্থিত। এ দেশের ভূ-প্রকৃতি নিচু ও সমতল।

ভৌগোলিক অবস্থান ও সীমানা

এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণে বাংলাদেশের অবস্থান। বাংলাদেশ ২০°.৩৪´ উত্তর অক্ষরেখা থেকে ২৬°.৩৮´ উত্তর অক্ষরেখার মধ্যে এবং ৮৮°.০১´ পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা থেকে ৯২°.৪১´ পূর্ব দ্রাঘিমা রেখার মধ্যে অবস্থিত। বাংলাদেশের মাঝামাঝি স্থান দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা (২৩°.৫´) অতিক্রম করেছে। পূর্ব-পশ্চিমে সর্বোচ্চ বিস্তৃতি ৪৪০ কি.মি. এবং উত্তর-উত্তর পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-দক্ষিণ পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত সর্বোচ্চ বিস্তৃতি ৭৬০ কি.মি.। বাংলাদেশের উত্তরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয় ও আসাম; পূর্বে আসাম, ত্রিপুরা ও মিজোরাম এবং মিয়ানমার; দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ অবস্থিত। বাংলাদেশের মোট আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কি.মি. বা ৫৬, ৯৭৭ বর্গমাইল।

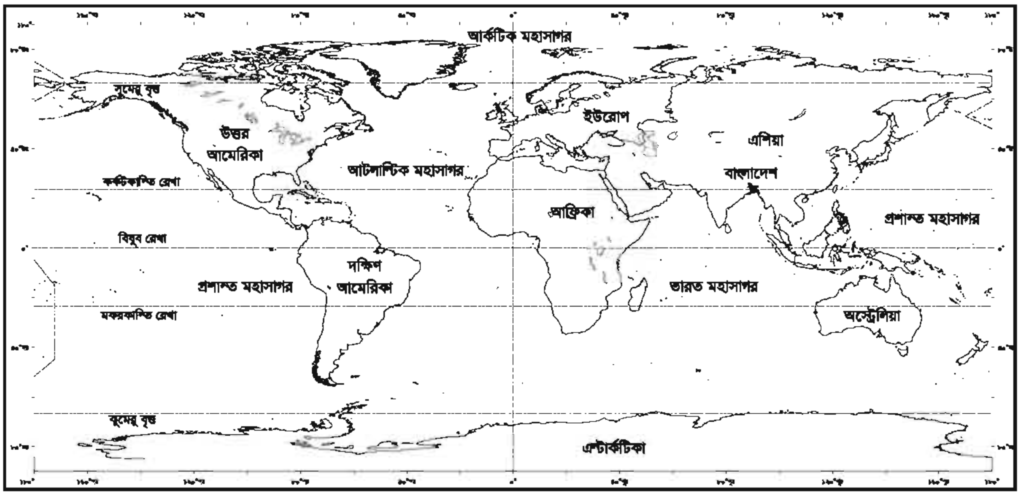
আর্কটিক মহাসাগর
সুমেরু বৃত্ত
ইউরোপ
উত্তর আমেরিকা
এশিয়া
কর্কটক্রান্তি রেখা
আটলান্টিক মহাসাগর
বাংলাদেশ
আফ্রিকা
প্রশান্ত মহাসাগর
বিষুব রেখা
দক্ষিণ আমেরিকা
প্রশান্ত মহাসাগর
ভারত মহাসাগর
মকরক্রান্তি রেখা
অস্ট্রেলিয়া
কুমেরু বৃত্ত
এন্টার্কটিকা

চিত্র ৪.১ : বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশ

ভূ-প্রাকৃতিক অঞ্চলের শ্রেণিবিভাগ ও গঠন

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ ব-দ্বীপ। বাংলাদেশের উপর দিয়ে বয়ে গেছে অসংখ্য নদ-নদী। এগুলোর মধ্যে পদ্মা, যমুনা, মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র, শীতলক্ষ্যা, কর্ণফুলী ইত্যাদি প্রধান। বাংলাদেশের ভূখন্ড উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে ক্রমশ ঢালু হয়ে অবস্থিত। ফলে এসব নদ-নদী, উপনদী ও শাখা নদীগুলো উত্তর দিক থেকে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর অভিমুখে প্রবাহিত হয়েছে। বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বাংশের পাহাড়িয়া অংশ ব্যতীত প্রায় সমগ্র দেশটিই এসব নদ-নদীর পলল দ্বারা গঠিত সমভূমি। বাংলাদেশের প্রায় সমগ্র অঞ্চল এক বিস্তীর্ণ সমভূমি।

বাংলাদেশের সামান্য পরিমাণে উচ্চভূমি রয়েছে। ভূ-প্রকৃতির ভিত্তিতে বাংলাদেশকে প্রধানত তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়- **টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ, প্লাইস্টোসিন কালের সোপানসমূহ ও সাম্প্রতিক কালের প্লাবন সমভূমি।**

টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ : বাংলাদেশের মোট ভূমির প্রায় ১২% এলাকা নিয়ে টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ গঠিত। আজ থেকে প্রায় ২ মিলিয়ন বছরেরও আগে টারশিয়ারি যুগে হিমালয় পর্বত উত্থিত হওয়ার সময় এ সকল পাহাড় সৃষ্টি হয়েছে। এ অঞ্চলের পাহাড়গুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথা- দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ এবং উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ।

দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ : রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম জেলার পূর্বাংশ এ অঞ্চলের অন্তর্গত। এ অঞ্চলের পাহাড়গুলোর গড় উচ্চতা ৬১০ মিটার। বর্তমানে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম তাজিনডং (বিজয়), যার উচ্চতা ১,২৩১ মিটার। এটি বান্দরবান জেলায় অবস্থিত। বাংলাদেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ শৃঙ্গ হচ্ছে কিওক্রাডং, যার উচ্চতা ১,২৩০ মিটার। এ ছাড়া এ অঞ্চলের আরও দুটি উচ্চতর পাহাড়চূড়া হচ্ছে- মোদকমুয়াল (১,০০০ মিটার) ও পিরামিড (৯১৫ মিটার)। এ অঞ্চলের পাহাড়গুলো বেলে পাথর, কর্দম ও শেল পাথর দ্বারা গঠিত।

উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ : ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনা জেলার উত্তরাংশ, সিলেট জেলার উত্তর ও উত্তর-পূর্বাংশ এবং মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার দক্ষিণের পাহাড়গুলো নিয়ে এ অঞ্চল গঠিত। এ পাহাড়গুলোর উচ্চতা ২৪৪ মিটারের বেশি নয়। উত্তরের পাহাড়গুলো স্থানীয়ভাবে টিলা নামে পরিচিত। এগুলোর উচ্চতা ৩০ থেকে ৯০ মিটার। এ অঞ্চলের পাহাড়গুলোর মধ্যে চিকনাগুল, খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া প্রধান।

প্লাইস্টোসিন কালের সোপানসমূহ বা চত্বরভূমি : বাংলাদেশের মোট ভূমির প্রায় ৮% এলাকা নিয়ে এ অঞ্চল গঠিত। আনুমানিক ২৫,০০০ বছর পূর্বের সময়কে প্লাইস্টোসিন কাল বলা হয়। এই সময়ের আন্তঃবরফ গলা পানিতে প্লাবনের সৃষ্টি হয়ে এসব চত্বরভূমি গঠিত হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। প্লাইস্টোসিন কালের সোপানসমূহকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যথা- বরেন্দ্রভূমি, মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় এবং লালমাই পাহাড়। নওগাঁ, রাজশাহী, বগুড়া, জয়পুরহাট, রংপুর ও দিনাজপুর জেলার অংশবিশেষ নিয়ে বরেন্দ্রভূমি গঠিত। এর আয়তন ৯,৩২০ বর্গকিলোমিটার। প্লাবন সমভূমি থেকে এর উচ্চতা ৬ থেকে ১২ মিটার। এ স্থানের মাটি ধূসর ও লাল বর্ণের। ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, গাজীপুর ও ঢাকা জেলার অংশবিশেষ নিয়ে মধুপুর ও ভাওয়ালের সোপানভূমি গঠিত। এর আয়তন প্রায় ৪,১০৩ বর্গকিলোমিটার। সমভূমি থেকে এর উচ্চতা ৬ থেকে ৩০ মিটার। মাটির রং লালচে ও ধূসর। কুমিল্লা শহর থেকে ৮ কিলোমিটার পশ্চিমে লালমাই থেকে ময়নামতি পর্যন্ত লালমাই পাহাড়টি বিস্তৃত। এর আয়তন ৩৪ বর্গকিলোমিটার। এই পাহাড়ের গড় উচ্চতা ২১ মিটার। এ অঞ্চলের মাটির রং লালচে এবং মাটি নুড়ি, বালি ও কংকর মিশ্রিত।

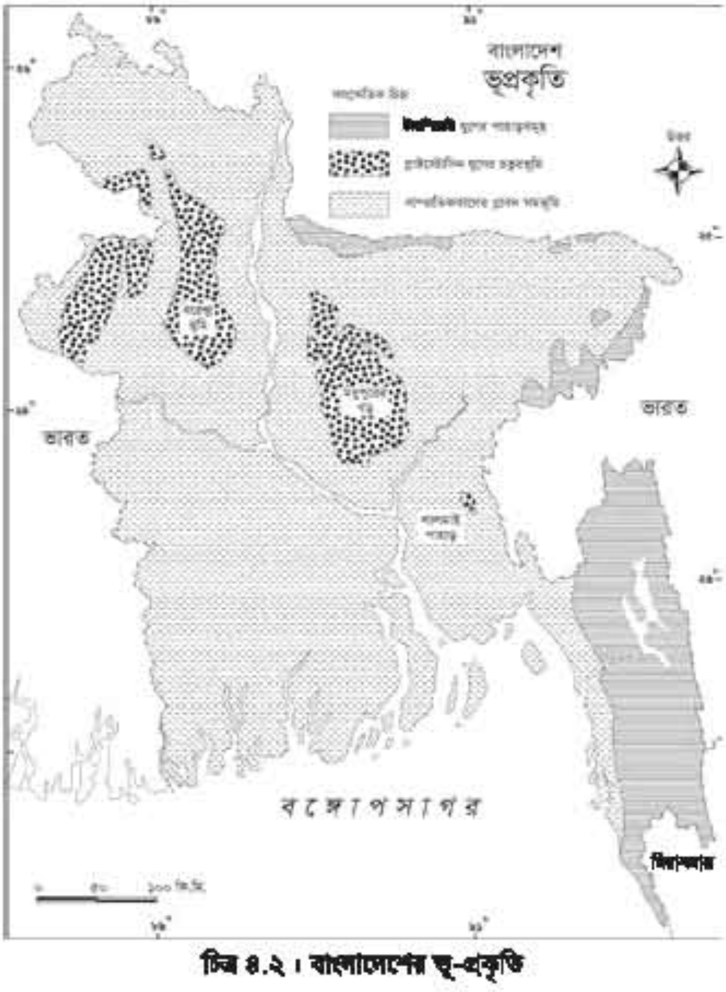
বাংলাদেশ
ভূপ্রকৃতি
সাংকেতিক চিহ্ন
টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ
প্লাইস্টোসিন যুগের চত্বরভূমি
সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি
উত্তর
ভারত
ভারত
বঙ্গোপসাগর

চিত্র ৪.২ । বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি

সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি : বাংলাদেশের প্রায় ৮০% ভূমি নদী বিধৌত এক বিস্তীর্ণ সমভূমি। সমতল ভূমির উপর দিয়ে অসংখ্য নদী প্রবাহিত হওয়ার কারণে এখানে বর্ষাকালে বন্যার সৃষ্টি হয়। বছরের পর বছর এভাবে বন্যার পানির সঙ্গে পরিবাহিত পলিমাটি সঞ্চিত হয়ে এ প্লাবন সমভূমি গঠিত হয়েছে। এ প্লাবন সমভূমির

আয়তন প্রায় ১,২৪,২৬৬ বর্গকিলোমিটার। সমগ্র সমভূমির মাটির স্তর খুব গভীর এবং ভূমি খুবই উর্বর। সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন– দেশের উত্তর–পশ্চিমে অবস্থিত রংপুর ও দিনাজপুর জেলার অধিকাংশ স্থান, ঢাকা, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, জামালপুর, পাবনা ও রাজশাহী অঞ্চলের অংশবিশেষ, কুমিল্লা, নোয়াখালী, সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার অধিকাংশ এলাকা এবং কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা জেলার পূর্বদিকের সামান্য অংশ নিয়ে এ সমভূমি গঠিত। এছাড়াও চাঁদপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অধিকাংশ এবং লক্ষ্মীপুর ও ফেনী জেলার কিছু অংশ জুড়েও এ সমভূমি বিস্তৃত। হিমালয় পর্বত থেকে আনীত পলল দ্বারা এ অঞ্চল গঠিত। ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী ও ঢাকা অঞ্চলের অংশবিশেষ নিয়ে ব–দ্বীপ সমভূমি গঠিত। নোয়াখালী ও ফেনী নদীর নিম্নভাগ থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল হলো উপকূলীয় সমভূমি। খুলনা ও পটুয়াখালী অঞ্চল এবং বরগুনা জেলার কিয়দংশ নিয়ে স্রোতজ সমভূমি গঠিত। বাংলাদেশের এ অঞ্চলগুলোর মাটি খুব উর্বর বলে কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে তা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

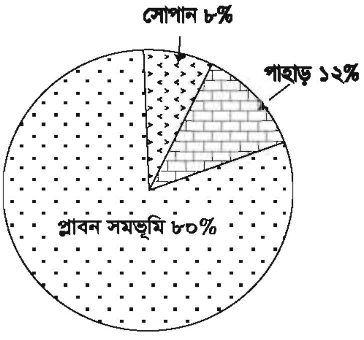

চিত্র ৪.৩ : ভূপ্রকৃতির বিস্তৃতির পরিমাণ

বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতির গঠন, জনসংখ্যা ও জনবসতি

জনসংখ্যার দিক থেকে পৃথিবীতে বাংলাদেশের স্থান নবম। ভূখণ্ডের তুলনায় এদেশের জনসংখ্যার ঘনত্বও খুব বেশি। তাছাড়া জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও বেশি। ২০০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিল প্রায় ১২.৯৩ কোটি, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৪৮% এবং প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব ৮৭৬ জন। আদমশুমারি–২০১১ অনুসারে বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৪.৯৭ কোটি, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৭% এবং প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব ১০১৫ জন। ভূ-প্রকৃতির গঠনের বিভিন্নতার কারণে এদেশে অঞ্চলভেদে জনসংখ্যার ঘনত্বের পার্থক্য দেখা যায়।

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতিতে তেমন কোনো পার্থক্য না থাকাতে মোটামুটি সব জায়গায় জনবসতি রয়েছে। তবে পার্বত্য এলাকা এবং সুন্দরবন অঞ্চলে জীবিকা সংস্থান কষ্টসাধ্য হওয়ায় এ দুটি অঞ্চলে জনবসতির ঘনত্ব খুবই কম। এসব অঞ্চলে ভালো রাস্তা–ঘাট বা রেল সংযোগ উপযুক্ত পরিমাণে না থাকায় জীবিকার সংস্থানও কষ্টকর। অনুন্নত যাতায়াত ব্যবস্থা, বনভূমি ও ভূ-প্রকৃতিগত কারণে এ সকল স্থান জনবিরল।

কাজ

একক : তোমার বিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী এলাকার ভূ-প্রকৃতি চিহ্নিত কর।

সমতল নদী অববাহিকা অঞ্চল উর্বর পলিমাটি দ্বারা সৃষ্ট। এ অঞ্চলে কৃষি আবাদ অনেকটা সহজসাধ্য। ফলে এসব অঞ্চলে ঘন জনবসতি গড়ে উঠতে দেখা যায়। এসব অঞ্চলের নদীগুলো নাব্য, সড়কপথ ও রেলপথে যোগাযোগের সুযোগ সুবিধা জনজীবনকে আকৃষ্ট করে। তাছাড়া জলবায়ুর প্রভাবের কারণেও জনবসতির বণ্টন নিয়ন্ত্রিত হয়। চরমভাবাপন্ন জলবায়ুর চেয়ে সমভাবাপন্ন জলবায়ুতে মানুষ বসবাস করতে বেশি পছন্দ করে। বাংলাদেশে সব জায়গায় আবহাওয়া প্রায় একই রকম। তবে এর মধ্যে উত্তরাঞ্চলের আবহাওয়ায় শীত–গ্রীষ্মের তারতম্য কিছু বেশি উপলব্ধি হয়। কৃষির অনুকূল জলবায়ু চাষাবাদ এবং শস্য উৎপাদনের সহায়ক বলে সমভূমি মানুষের বসবাসকে আকৃষ্ট করে।

বাংলাদেশে যেসব অঞ্চলে খনিজ সম্পদ পাওয়া গেছে সে সব অঞ্চলে জীবিকার সন্ধানে বহু শ্রমিক ও কর্মচারী জড়ো হয়ে এলাকাটিকে ঘনবসতিপূর্ণ করে তুলেছে। খনিজ সম্পদ, কৃষিজ সম্পদ ও বনজ সম্পদ এবং প্রাণিজ সম্পদকে কেন্দ্র করে জনবসতি গড়ে উঠেছে। এসব স্থানে প্রধান শিল্পের সঙ্গে ক্রমেই বহু প্রকার আনুষঙ্গিক শিল্প স্থাপিত হয়েছে। শিল্প বাণিজ্যের অগ্রগতি বৃদ্ধি পাওয়াতে প্রধান শিল্পকে ভিত্তি করে এ সমস্ত অঞ্চল জনবহুল স্থানে পরিণত হয়েছে। তেজগাঁও, টঙ্গী, নরসিংদী, খুলনা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে শিল্প শহর গড়ে ওঠায় এ স্থানগুলোতে জনবসতি ঘন। সড়ক রেলপথ অথবা নদীপথে উন্নত চলাচলের সুযোগ থাকলে বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা সহজ হয়। ফলে স্থানটি জনবহুল অঞ্চলে পরিণত হয়।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি আজকের যুগের মানুষকে গভীরভাবে প্রভাবিত করছে। যেসব অঞ্চলে শিক্ষা-দীক্ষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি প্রভৃতির অনুশীলন ও চর্চার সুযোগ বেশি, সেসব স্থানে জনবসতি স্বাভাবিক কারণেই বেশি হয়।

বাংলাদেশের ভূমি ব্যবহারে জনবসতি বিস্তারের প্রভাব

কাজ

একক : বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থার ওপর জনবসতি বিস্তারের প্রভাবসমূহ চিহ্নিত কর।

বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। এদেশের আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যা অনেক বেশি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে জনবসতিও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এদেশে প্রয়োজনের তুলনায় চাষযোগ্য জমির পরিমাণ অনেক কম। অধিক বসতি বিস্তারের ফলে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ আরও কমে গিয়ে ভূমির উপর মারাত্মক চাপ সৃষ্টি করছে। আমাদের দেশে এ জনসংখ্যা ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষিজমির ওপর অব্যাহত চাপ পড়ছে। চাপ পড়ছে বাড়ি-ঘর নির্মাণের জন্য উপযুক্ত জমির ওপর। বস্তুত বাংলাদেশে ইতোমধ্যে গ্রাম এবং শহরে বাসস্থান সমস্যা দেখা দিয়েছে। পক্ষান্তরে কৃষি জমিগুলো উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টিত হতে হতে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাচ্ছে। আর এ খণ্ডিত জমিতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতেও চাষাবাদ হয় না। জনবসতি বৃদ্ধির জন্য বহু আবাদি জমিতে ঘর-বাড়ি বানানো হচ্ছে। ৩০ বছর আগে যে পরিবারের জমির পরিমাণ ছিল ১০০ বিঘা তার পরিমাণ বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ১০ বিঘা বা তার চেয়েও কম। ১৯৭৪ সালে মাথাপিছু জমির পরিমাণ ছিল ০.২৮ একর এবং বর্তমানে তা দাঁড়িয়েছে ০.২৫ একর। ভবিষ্যতে এর পরিমাণ আরও হ্রাস পাবে। জনসংখ্যার আধিক্য এবং জনবসতি বিস্তারের প্রয়োজনীয়তায় মানুষ এখন ভূমির স্বাভাবিক প্রকৃতি ও ব্যবহারকে বদলে দিয়েছে। খাল-বিল ভরাট করে, বনজঙ্গল কেটে মানুষ এখন বসতি গড়ছে। এভাবে চলতে থাকলে একসময় প্রাকৃতিক বিপর্যয় অনিবার্য হয়ে উঠবে।

পরিচ্ছেদ ৪.২: বাংলাদেশের জলবায়ু ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ

জলবায়ু বলতে একটি বৃহৎ অঞ্চলব্যাপী আবহাওয়ার উপাদানগুলোর দৈনন্দিন অবস্থার দীর্ঘদিনের গড় অবস্থাকে বুঝায়। মানুষের জীবনে জলবায়ুর প্রভাব বহুমুখী ও গুরুত্বপূর্ণ। মৌসুমি জলবায়ুর কারণে এদেশে বছরের বিভিন্ন ঋতুতে জলবায়ুর কিছুটা তারতম্য ঘটে। বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, প্লাবিত হয় বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ এলাকা। এতে অতিবৃষ্টি, অকাল বন্যা প্রভৃতি দেখা দেয়। জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে দেখা দেয় নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ।

বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশের জলবায়ু

বাংলাদেশের জলবায়ু :

বাংলাদেশের জলবায়ু মোটামুটি উষ্ণ, আর্দ্র ও সমভাবাপন্ন। মৌসুমি জলবায়ুর প্রভাব এখানে এত অধিক যে, সামগ্রিকভাবে এ জলবায়ু 'ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ু' নামে পরিচিত।

দক্ষিণ এশিয়ার সামগ্রিক জলবায়ুর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বাংলাদেশে বছরে ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ছয়টি ঋতু দেখা যায়, যেমন– গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত। ঋতুভেদে জলবায়ুর কিছুটা তারতম্য হয়, কিন্তু কখনো এটি অন্যান্য শীতপ্রধান বা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মতো চরমভাবাপন্ন হয় না।

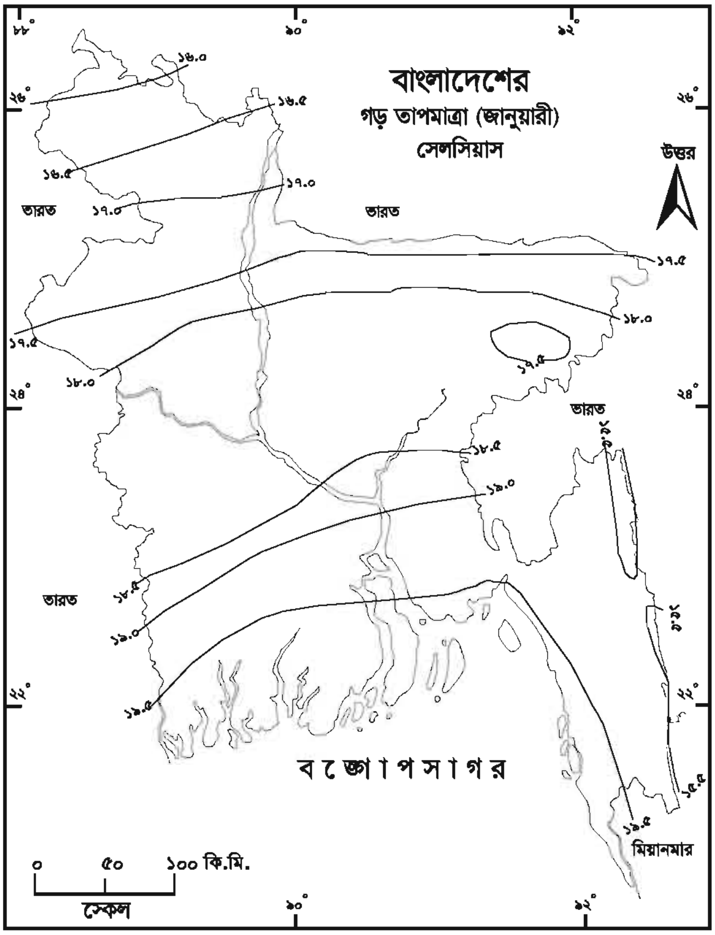

চিত্র ৪.৪: বাংলাদেশের গড় তাপমাত্রা (জানুয়ারি)

তবে বাংলাদেশের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ছয়টি ঋতুকে প্রধান তিনটি ঋতু হিসেবে দেখানো যায়। এগুলো নিচে আলোচনা করা হলো–

শীতকাল : প্রতি বছর নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত বাংলাদেশে শীতকাল। এ সময় সূর্য দক্ষিণ গোলার্ধে থাকায় বাংলাদেশে এর রশ্মি তির্যকভাবে পড়ে এবং উত্তাপের পরিমাণ যথেষ্ট কমে যায়। শীতকালীন সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পরিমাণ যথাক্রমে ২৯ ডিগ্রি সে. ও ১১ ডিগ্রি সে.। জানুয়ারি মাস বাংলাদেশের শীতলতম মাস। এ মাসের গড় তাপমাত্রা ১৭.৭ ডিগ্রি সে.। এ সময়ে দক্ষিণে সমুদ্র উপকূল থেকে উত্তর দিকে তাপমাত্রা ক্রমশ কম হয়ে থাকে। সমতাপ রেখাগুলো অনেকটা সোজা হয়ে পূর্ব–পশ্চিমে অবস্থান করে। জানুয়ারি মাসের গড় তাপমাত্রা চট্টগ্রামে প্রায় ২০ ডিগ্রি, নোয়াখালীতে ১৯.৪ ডিগ্রি, ঢাকায় ১৮.৩ ডিগ্রি, বগুড়ায় ১৭.৭ ডিগ্রি এবং দিনাজপুরে ১৬.৬ ডিগ্রি সে.। তবে কোনো কোনো সময় উত্তরাঞ্চলে তাপমাত্রা আরও কম হয়ে থাকে।

গ্রীষ্মকাল : মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত বাংলাদেশে গ্রীষ্মকাল। এটিই দেশের উষ্ণতম ঋতু। এ ঋতুতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৮ ডিগ্রি সে. এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২১ ডিগ্রি সে.পর্যন্ত হয়ে থাকে। গড় হিসেবে উষ্ণতম মাস এপ্রিল। এ সময়ে সামুদ্রিক বায়ুর প্রভাবে দেশের দক্ষিণ থেকে উত্তরদিকে তাপমাত্রা ক্রমান্বয়ে বেশি থাকে। এপ্রিল মাসের গড় তাপমাত্রা কক্সবাজারে ২৭.৬৪ ডিগ্রি সে., নারায়ণগঞ্জে ২৮.৬৬ ডিগ্রি সে. এবং রাজশাহীতে প্রায় ৩০ ডিগ্রি সে. থাকে। গ্রীষ্মকালে সূর্য উত্তর গোলার্ধের কর্কটক্রান্তি রেখার নিকটবর্তী হওয়ায় বায়ুর চাপের পরিবর্তন হয় এবং বাংলাদেশের ওপর দিয়ে দক্ষিণ–পশ্চিম মৌসুমি বায়ু প্রবাহিত হতে থাকে। একই সময়ে পশ্চিম ও উত্তর–পশ্চিম দিক থেকে শুষ্ক ও শীতল বায়ু প্রবাহিত হয়। এর ফলে একধরনের ঝড়ের সৃষ্টি হয়। এ ঝড়কে কালবৈশাখি (North Westerlies) বলা হয়। এছাড়া এপ্রিল ও মে মাসে বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপসমূহের কারণে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল প্রায়শ বিভিন্ন প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্ত হয়। ১৯৯১ সালের ২৯ এপ্রিল সংঘটিত ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে বাংলাদেশের উপকূলে বিশেষত চট্টগ্রাম উপকূলে ব্যাপক সম্পদ ও জীবনহানি ঘটেছিল।

বর্ষাকাল : বাংলাদেশে জুন হতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত বর্ষাকাল। জুন মাসের শেষদিকে মৌসুমি বায়ুর আগমনের সাথে সাথে বাংলাদেশে বর্ষাকাল শুরু হয়। এ সময় সূর্য বাংলাদেশের ওপর লম্বভাবে কিরণ দেওয়ায় এখানে অতিরিক্ত তাপ অনুভূত হওয়ার কথা। কিন্তু এ ঋতুতে অধিক বৃষ্টিপাত হয় বলে তাপমাত্রা যেরূপ বৃদ্ধি পাওয়ার কথা সেরূপ বৃদ্ধি পায় না।

তবে আবহাওয়া সর্বদা উষ্ণ থাকে। এ সময়কার গড় উষ্ণতা প্রায় ২৭ ডিগ্রি সে.। বর্ষাকালের মধ্যে জুন ও সেপ্টেম্বর মাসে সবচেয়ে বেশি গরম পড়ে।

বাংলাদেশের মোট বৃষ্টিপাতের পাঁচ ভাগের চার ভাগ বৃষ্টিপাত বর্ষাকালেই হয়ে থাকে। এ সময়কার গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সর্বনিম্ন ১১৯ সে.মি. এবং সর্বোচ্চ ৩৪০ সে.মি.। দেশের পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে বৃষ্টিপাত ক্রমেই বেশি হয়ে থাকে। যেমন– পাবনায় প্রায় ১১৪ সে.মি., ঢাকায় ১২০ সে.মি., কুমিল্লায় ১৪০ সে. মি., শ্রীমঙ্গলে ১৮০ সে.মি. এবং রাঙ্গামাটিতে ১৯০ সে.মি. বৃষ্টিপাত হয়।

বাংলাদেশের বর্ষাকালে মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এ ঋতুতে পর্বতের পাদদেশে এবং উপকূলবর্তী অঞ্চলের কোথাও ২০০ সে.মি. এর কম বৃষ্টিপাত হয় না। সিলেটের পাহাড়িয়া অঞ্চলে ৩৪০ সে. মি., পটুয়াখালীতে ২০০ সে. মি., চট্টগ্রামে ২৫০ সে. মি., রাঙ্গামাটি অঞ্চলে ২৮০ সে. মি. এবং কক্সবাজারে ৩২০ সে. মি. বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে।

ভারতের জলবায়ু : বিশাল আয়তনের দেশ হওয়ায় ভারতের জলাবায়ু বিচিত্র। অক্ষাংশ, সমুদ্র হতে দূরত্ব, বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতির ভিন্নতার কারণে এর জলবায়ুও ভিন্ন। ভারত মৌসুমি অঞ্চলে অবস্থিত। ফলে এ দেশের উষ্ণতা, বৃষ্টিপাত, আর্দ্রতা ইত্যাদি মৌসুমি বায়ুপ্রবাহের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। উষ্ণতা ও বৃষ্টিপাতের পার্থক্যের উপর নির্ভর করে ভারতের ঋতুগুলো হলো: শীতকাল, গ্রীষ্মকাল, বর্ষাকাল এবং শরৎ ও হেমন্ত কাল।

শীতকাল : শীতকালে সূর্য দক্ষিণ গোলার্ধে অবস্থান করায় সমগ্র ভারতে উত্তাপের পরিমাণ যথেষ্ট কমে যায়। ভারতে শীতকাল ডিসেম্বর হতে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এ সময় এদেশের উপর দিয়ে পূর্ব মৌসুমি বায়ু প্রবাহিত হয়। হিমমণ্ডল থেকে নির্গত হওয়ায় এবং স্থলভাগের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় বায়ু শুষ্ক ও শীতল। হিমালয় পর্বতমালা উত্তর অঞ্চল জুড়ে প্রাচীরের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকায় এ শুষ্ক ও শীতল বায়ু সরাসরি ভারতে প্রবেশ করতে পারে না; এজন্য ভারত শীতের কবল থেকে রক্ষা পায়। শীত ঋতুতে সমগ্র ভারতের আবহাওয়া মোটামুটি শুষ্ক, শীতল ও আরামদায়ক। আকাশ থাকে স্বচ্ছ, নির্মল ও মেঘমুক্ত। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কম থাকে।

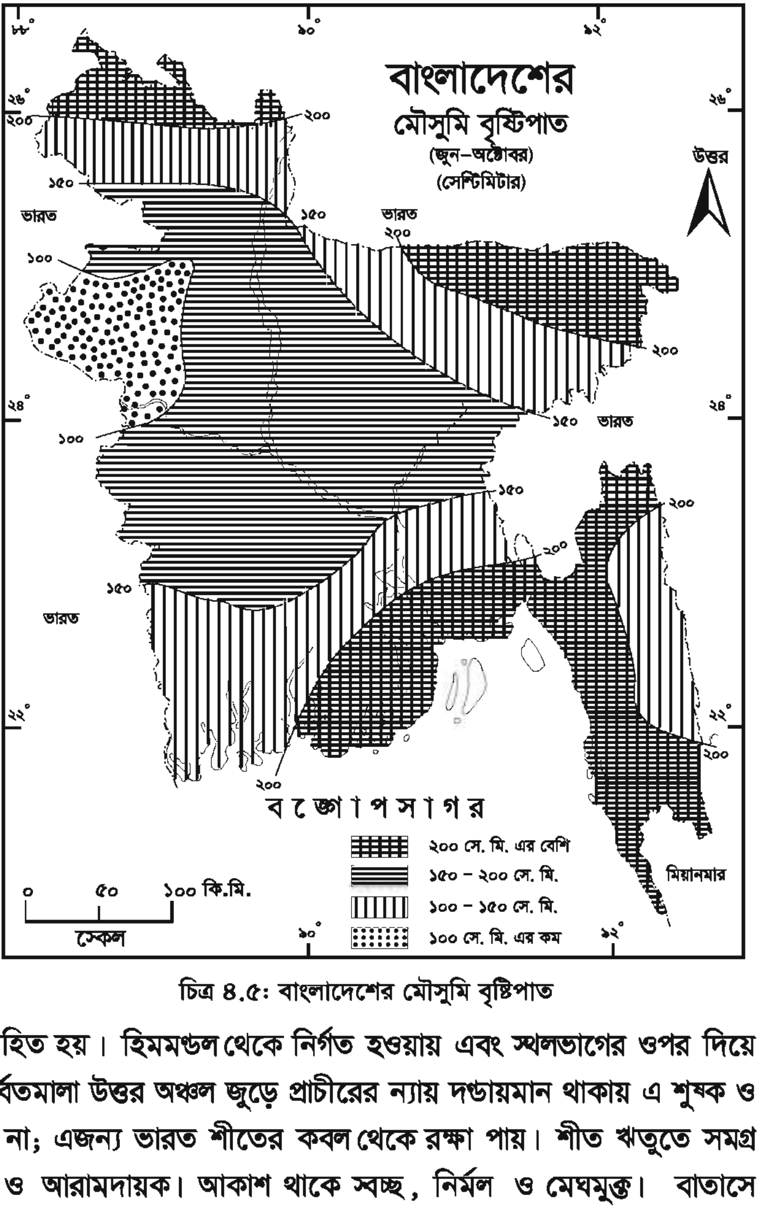

চিত্র ৪.৫: বাংলাদেশের মৌসুমি বৃষ্টিপাত

গ্রীষ্মকাল : মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত ভারতে গ্রীষ্মকাল। ২১শে মার্চ সূর্য দক্ষিণ গোলার্ধ থেকে নিরক্ষরেখায় আসে এবং তারপর ক্রমশ উত্তরে কর্কটক্রান্তি রেখার দিকে অগ্রসর হয়। সূর্যের এ উত্তরায়ণের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের তাপমাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ সময় গঙ্গা নদীর উপত্যকায় গড়ে ২৭ ডিগ্রি সে. তাপমাত্রা পরিলক্ষিত হয়। যতই উত্তরে যাওয়া যায় ক্রমশ তাপমাত্রা

বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ সময় ভারতের উত্তর-পশ্চিমে মরু অঞ্চলে তাপমাত্রা ৪৮ ডিগ্রি সে. পর্যন্ত ওঠে। মে মাসে কলকাতা শহরে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪৩ ডিগ্রি সে. পর্যন্ত উঠলেও গ্রীষ্মকালীন গড় তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রি সে. এর বেশি হয় না।

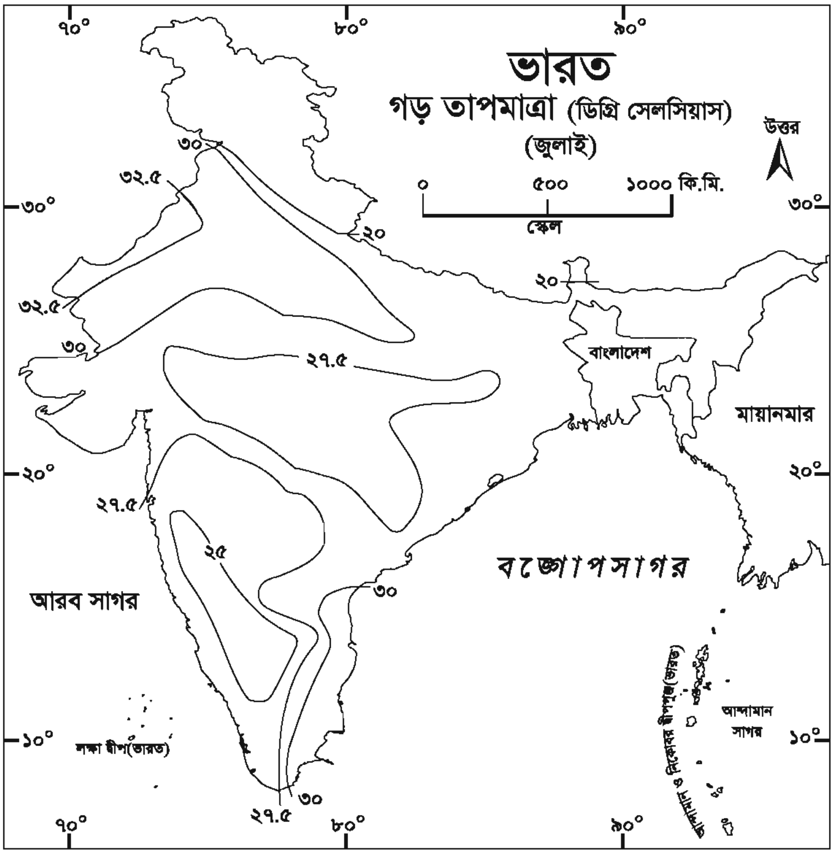
৭০°
৮০°
৯০°
ভারত
গড় তাপমাত্রা (ডিগ্রি সেলসিয়াস)
(জুলাই)
উত্তর
০ ৫০০ ১০০০ কি.মি.
স্কেল
৩০°
২০°
১০°
৩০
৩২.৫
২০
২৭.৫
২৫
বাংলাদেশ
মায়ানমার
বঙ্গোপসাগর
আরব সাগর
লক্ষা দ্বীপ(ভারত)
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ(ভারত)
আন্দামান সাগর

চিত্র ৪.৬ : ভারতের গ্রীষ্মকালীন সমতাপ রেখা

বর্ষাকাল : জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ভারতে বর্ষাকাল থাকে। জুন মাসের শেষে (২১ জুন) সূর্য কর্কটক্রান্তি রেখার ওপর অবস্থান করায় উত্তর ভারতে উত্তাপের পরিমাণ অত্যন্ত (৩২ ডিগ্রি সে. এর উপরে) বৃদ্ধি পায়। দক্ষিণে ক্রমশ তাপমাত্রা কমতে কমতে শেষপর্যন্ত ২৭ ডিগ্রি সে. এর নিচে নেমে যায়। অতিরিক্ত তাপে উত্তর ভারতের পাঞ্জাব অঞ্চলে একটি প্রবল শক্তিসম্পন্ন নিম্নচাপ বলয়ের সৃষ্টি হয়। এ সময় দক্ষিণ গোলার্ধে মকরীয় উচ্চচাপ বলয় হতে দক্ষিণপূর্ব আয়ন বায়ু নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয়ে প্রবেশ না করে পাঞ্জাবের অধিক শক্তিসম্পন্ন নিম্নচাপের টানে সরাসরি পাঞ্জাবের দিকে অগ্রসর হয়। এ বায়ু সমুদ্রের ওপর দিয়ে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে বলে এতে প্রচুর জলীয় বাষ্প থাকে। হিমালয় ও অন্যান্য উচ্চ পর্বতগাত্রে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে এ বায়ু ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়। ফলে ভারতের মোট বৃষ্টিপাতের প্রায় ৭৫% ভাগ বৃষ্টিপাত এ ঋতুতেই হয়ে থাকে।

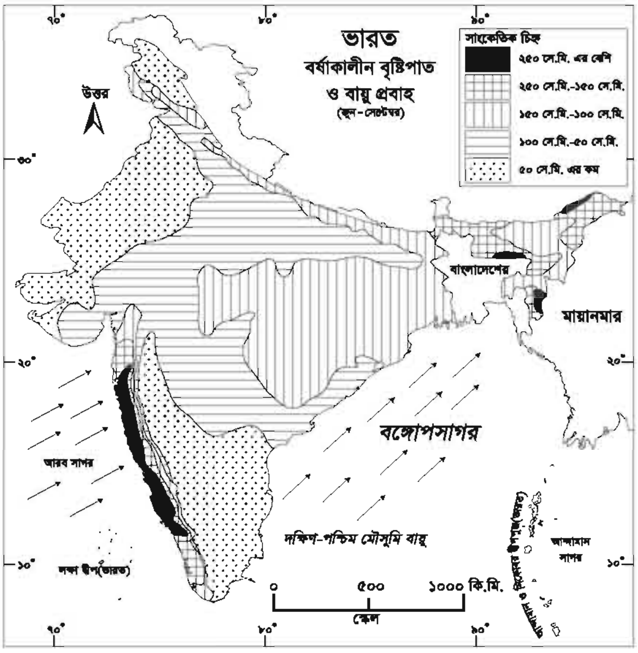
৭০°
৮০°
৯০°
ভারত
বর্ষাকালীন বৃষ্টিপাত
ও বায়ু প্রবাহ
(জুন-সেপ্টেম্বর)
উত্তর
সাংকেতিক চিহ্ন
২৫০ সে.মি. এর বেশি
২৫০ সে.মি.-১৫০ সে.মি.
১৫০ সে.মি.-১০০ সে.মি.
১০০ সে.মি.-৫০ সে.মি.
৫০ সে.মি. এর কম
৩০°
২০°
১০°
বাংলাদেশের
মায়ানমার
বঙ্গোপসাগর
আরব সাগর
দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু
লক্ষা দ্বীপ(ভারত)
আন্দামান সাগর
০ ৫০০ ১০০০ কি.মি.
স্কেল

চিত্র ৪.৭ : ভারতের বর্ষাকালীন বায়ুপ্রবাহ ও বৃষ্টিপাত

দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে ভারতে প্রবেশ করে, যেমন-আরব সাগরের ওপর দিয়ে প্রবাহিত আরবসাগরীয় শাখা এবং বঙ্গোপসাগরের ওপর দিয়ে প্রবাহিত বঙ্গোপসাগরীয় শাখা।

শরৎ ও হেমন্তকাল : অক্টোবর-নভেম্বর দুই মাস ভারতে শরৎ ও হেমন্তকাল। এ সময় দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু দিক পরিবর্তন করে উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ুতে পরিণত হতে থাকে। ফলে ভারতের কোনো কোনো স্থানে ঘূর্ণিঝড়ের মাধ্যমে বৃষ্টিপাত হয়। পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, উড়িষ্যা ও মেদিনীপুর উপকূলে এ সময়ে বৃষ্টিপাত হয়। পশ্চিমবঙ্গে এ ঝড়কে 'আশ্বিনা ঝড়' বলে। হেমন্তকালের শেষদিকে ভারতের সর্বত্র তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ক্রমশ কমতে থাকে।

মিয়ানমারের জলবায়ু

মিয়ানমারের জলবায়ু ভারতীয় উপমহাদেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং ক্রান্তিয় মৌসুমি ধরনের। এ অঞ্চলের জলবায়ুতে শীত, গ্রীষ্ম এবং বর্ষা–এ তিনটি আলাদা ঋতুর উপস্থিতি স্পষ্ট। মিয়ানমারের জলবায়ুর ঋতুভিত্তিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হলো –

গ্রীষ্মকাল : মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত মিয়ানমারে গ্রীষ্মকাল। এ সময়ে এ দেশের অধিকাংশ স্থান অত্যন্ত উত্তপ্ত থাকে। গড় তাপমাত্রা প্রায় ২৯ ডিগ্রি সে. এর কাছাকাছি পৌঁছে। সূর্য উত্তর গোলার্ধে অবস্থান করে বিধায় এ সময় মধ্য এশিয়ায় বিরাট নিম্নচাপের সৃষ্টি হয় এবং এ অঞ্চলে মৌসুমি বায়ুপ্রবাহ শুরু হয়। এ সময়ে ভামোতে ১৯ ডিগ্রি সে., মান্দালয়ে ৩২ ডিগ্রি সে. এবং ইয়াঙ্গুনে প্রায় ২৭ ডিগ্রি সে. তাপমাত্রা বিরাজ করে।

বর্ষাকাল : মে থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত মিয়ানমারে বর্ষাকাল। এ সময়ে দক্ষিণ–পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে এ অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে ইয়াঙ্গুনে বৃষ্টিপাত শুরু হয় এবং মাসের শেষ দিকে এটি সারা দেশে বিস্তার লাভ করে। অক্টোবর মাস পর্যন্ত এ বৃষ্টিপাত চলতে থাকে। মিয়ানমারের বিভিন্ন এলাকায় এ বৃষ্টিপাতের পরিমাণে ব্যাপক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আরাকান ও টেনাসেরিম উপকূলে দক্ষিণ–পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে ২০০ সে. মি. পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। এসময় দেশের সর্ব উত্তরের পাহাড়িয়া অঞ্চলেও মাত্র ৮০ সে.মি. পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়।

শীতকাল : এ ঋতুতে সূর্য দক্ষিণ গোলার্ধে অবস্থান করায় উত্তর গোলার্ধে এশিয়ার মধ্যভাগে এক বিরাট উচ্চচাপের সৃষ্টি হয়। সেখান থেকে দক্ষিণ–পূর্বদিকের সমুদ্রে অপেক্ষাকৃত অধিক তাপযুক্ত অঞ্চলে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। ফলে উত্তর–পূর্ব আয়ন বায়ু দক্ষিণ–পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়। উত্তরের এ শীতল বায়ুপ্রবাহের প্রভাবে মিয়ানমারে তখন বেশ শীত হওয়ার কথা থাকলেও উত্তরাংশে পার্বত্য অঞ্চলের উপস্থিতির কারণে শৈত্য তত প্রকট আকার ধারণ করে না। এ বায়ুপ্রবাহ মার্চ মাস পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এ সময়ে উত্তর মিয়ানমারের উঁচু পার্বত্য এলাকায় তুষারপাত হয় এবং তাপমাত্রা হিমাঙ্কের কাছাকাছি চলে যায়।

কাজ

দলীয় : বাংলাদেশ, ভারত, মিয়ানমার ও নেপালের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যের তালিকা প্রস্তুত কর।

নেপালের জলবায়ু

নেপালের জলবায়ুতে তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের তারতম্য বিবেচনায় স্পষ্টত দুটি ঋতু পরিলক্ষিত হয়। জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এ অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশি থাকে। এজন্য এ সময়কালকে বর্ষাকাল হিসেবে বিবেচনা করা যায়। জুলাই মাসে কাঠমন্ডুর তাপমাত্রা থাকে ২৪.৪ ডিগ্রি সে.। অন্যদিকে নভেম্বর থেকে জানুয়ারি মাস পর্যন্ত সময় অত্যন্ত শুষ্ক ও বৃষ্টিহীন থাকে। এ সময় তাপমাত্রাও বেশ কম থাকে বলে একে শীতকাল হিসেবে বিবেচনা করা যায়। জানুয়ারিতে কাঠমন্ডুর তাপমাত্রা থাকে প্রায় ১০ ডিগ্রি সে.। উঁচু পার্বত্য এলাকা হওয়ায় নেপালের কোনো অংশের তাপমাত্রা অতিরিক্ত বৃদ্ধি পায় না এবং শীত–গ্রীষ্মের তাপমাত্রার পার্থক্যও খুব বেশি অনুভূত হয় না। নেপালের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ১৪৫ সে.মি. যার প্রায় পুরোটাই সংঘটিত হয় জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে।

বাংলাদেশের মানুষের জীবন-জীবিকার ওপর জলবায়ুর প্রভাব

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান এবং জলবায়ুজনিত কারণে এদেশের মানুষের আর্থ–সামাজিক জীবন অধিক মাত্রায় প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভরশীল। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে মানুষের জীবন–জীবিকায় নানা পরিবর্তন ঘটেছে। জলবায়ুজনিত ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দীর্ঘস্থায়ী বন্যা, নদ–নদীর ভাঙন প্রভৃতি মানুষের জীবন–জীবিকায়

পরিবর্তন আনে। বর্ষাকালে দক্ষিণ–পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে বাংলাদেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এতে বিভিন্ন রকমের ফসল ও ফল প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। আবার শীতকালে উত্তর–পূর্ব মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে এদেশে স্বল্প পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়। ফলে ধান, গম, তামাক এবং নানা জাতের ডাল, তৈলবীজ, গোলআলু, পিঁয়াজ, রসুন, ধনিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন রবিশস্য এবং নানান ধরনের শাকসবজি উৎপাদন করা যায়। জলবায়ুর কারণে সৃষ্ট বন্যার পানিবাহিত পলিমাটি কৃষিক্ষেত্রগুলোর উর্বরতা বাড়ায়, এতে ফসল অনেক ভালো হয়।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে গড় তাপমাত্রা দেশের সর্বত্র বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্ষা মৌসুমে অধিক বৃষ্টিপাত হচ্ছে আবার বর্ষাকাল দেরিতে আসছে। স্বল্প সময়ে অধিক বৃষ্টিপাত, ভারি বর্ষণের ফলে ভূমিধস, বন্যা ও পাহাড়ধসের ঘটনা ঘটে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে গেছে। এক পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে হিরন পয়েন্ট, চর চংগা ও কক্সবাজারের উচ্চতা প্রতিবছর গড়ে ৪ মি.মি. থেকে ৬ মি.মি. পর্যন্ত বেড়েছে ।

নদীমাতৃক এদেশের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া নদী বাঁচিয়ে রাখে মানুষের জীবন–জীবিকা ও উৎপাদন। পলি জমে বহু নদী হারিয়ে যাচ্ছে। নদীর অস্তিত্ব হারিয়ে যাওয়ায় মানুষের জীবনযাত্রা বদলে যাচ্ছে। এছাড়া নদীর ভাঙনে প্রায় ৪ লাখ মানুষ বাস্তুহারা হয়ে জীবন-জীবিকার টানে শহরে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় সাধারণ কৃষক ও দিনমজুর কাজের আশায় শহরে পাড়ি জমাচ্ছে। এতে পারিবারিক ভাঙন দেখা দিচ্ছে। শিশু, বৃদ্ধ ও নারীর নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। পরিবেশের সাথে জীবন জীবিকার সম্পর্ক খুব গভীর। জলবায়ুর পরিবর্তন এবং পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে ব্যর্থ হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়েছে প্রাণিজগতের অনেক প্রাণী, বিলুপ্ত হয়েছে জীববৈচিত্র্য, কমেছে খাদ্য উৎপাদন। এতে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য বেড়েছে। উপকূলীয় অঞ্চলের জেলেদের পেশা বদলে যাচ্ছে। বহু জেলে জীবিকার টানে শহরে কর্মের খোঁজে ছুটছে। উপকূলীয় জনগণের জীবিকা কোনো না কোনোভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভরশীল। এসব অঞ্চলের দরিদ্র, অতি দরিদ্র, মধ্যবিত্ত ও ধনী মানুষের জীবন-জীবিকা প্রাকৃতিক সম্পদ, যেমন– পুকুর, খাল, জমি, বাগান, গাছ, মাছ ইত্যাদি ঘিরেই চলে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে নানামুখী দুর্যোগের কারণে তাদের জীবন ধারণের ভিত্তি হারিয়ে যাচ্ছে। জলাবদ্ধতা, লবণাক্ততা, বন্যা, প্লাবন, ঝড়, সিডর, আইলা, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি নানাবিধ প্রাকৃতিক দুর্যোগ মানুষের জীবন-জীবিকাকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে।

কাজ

একক : পরিবেশের উপর জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাব চিহ্নিত কর।

ভূমিকম্পের ধারণা

ভূমিকম্প একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। পৃথিবীর বহু দেশে এবং বহু অঞ্চলে এই প্রবণতা লক্ষ করা যায়। সভ্যতার বহু ধ্বংসলীলার কারণ হিসেবে ভূমিকম্পকে দায়ী করা হয়। ধারণা করা হয়, গত ৪,০০০ বছরে ভূমিকম্পের ধ্বংসলীলায় পৃথিবীর প্রায় ১ কোটি ৫০ লাখ লোক মারা গেছে। নানা প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় ভূপৃষ্ঠ পরিবর্তিত হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, ভূত্বকের নিচের অংশে তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলো থেকে তাপ বিচ্ছুরিত হয়। এই তাপ সঞ্চিত হয়ে পৃথিবীর অভ্যন্তরে পরিচলন স্রোতের সৃষ্টি হয় এবং সেখানে প্রবল শক্তি উৎপন্ন হয়ে ভূত্বকের বিভিন্ন অংশে আলোড়ন ও পরিবর্তন সাধন করছে। অভ্যন্তরীণ শক্তি দ্বারা ভূত্বকের এই পরিবর্তন আকস্মিক প্রক্রিয়া ও ধীর প্রক্রিয়ায় অনুষ্ঠিত হয়। আকস্মিকভাবে পরিবর্তনকারী শক্তির মধ্যে ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরি প্রধান।

কখনো কখনো ভূপৃষ্ঠের কতক অংশ হঠাৎ কোনো কারণে কেঁপে ওঠে। এ কম্পন অত্যন্ত মৃদু থেকে প্রচণ্ড হয়ে থাকে, যা মাত্র কয়েক সেকেন্ড স্থায়ী হয়। ভূপৃষ্ঠের এরূপ আকস্মিক ও ক্ষণস্থায়ী কম্পনকে ভূমিকম্প বলে। ভূঅভ্যন্তরের যে স্থানে ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয় তাকে ভূমিকম্পের কেন্দ্র (Focus) বলে। কেন্দ্রের ঠিক সোজাসুজি উপরের ভূপৃষ্ঠের নাম উপকেন্দ্র (Epicenter)। কম্পনের বেগ উপকেন্দ্র হতে ধীরে ধীরে চারিদিকে কমে যায়।

ভূমিকম্পের কারণ

ভূমিকম্পের কারণ অনুসন্ধানকালে বিজ্ঞানীরা লক্ষ করেন পৃথিবীর বিশেষ কিছু এলাকায় ভূকম্পন বেশি হয়। এ সমস্ত এলাকায় নবীন পর্বতমালা অবস্থিত। পৃথিবীর ব্যবচ্ছেদে দেখা যায় যে ভূ-ত্বক ৮টি বড় বড় টুকরা এবং ৬টি আঞ্চলিক টুকরা দ্বারা বিভক্ত। এগুলো টেকটনিক প্লেট নামে পরিচিত। ভূ-পৃষ্ঠে যেসব কারণে ভূমিকম্প হয়ে থাকে তার মধ্যে অন্যতম হলো এই প্লেটগুলোর বিভিন্ন রকমের স্থানান্তর বা বিচ্যুতি। এছাড়াও অন্য যেসব কারণে ভূমিকম্প হয় তা নিম্নরূপ : ভিত্তিশিলা চ্যুতি বা ফাটল বরাবর আকস্মিক ভূআলোড়ন হলে ভূমিকম্প হয়। আগ্নেয়গিরির লাভা প্রচণ্ড শক্তিতে ভূঅভ্যন্তর থেকে বের হয়ে আসার সময়ও ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়। ভূত্বক তাপ বিকিরণ করে সংকুচিত হলে ভূ-নিম্নস্থ শিলাস্তরে তারের সামঞ্জস্য রক্ষার্থে ফাটল ও ভাঁজের সৃষ্টির ফলে ভূকম্পন অনুভূত হয়। ভূ-আলোড়নের ফলে ভূত্বকের কোনো স্থানে শিলা ধসে পড়লে বা শিলাচ্যুতি ঘটলে ভূমিকম্প হয়। এছাড়াও পাশাপাশি অবস্থানরত দুটি প্লেটের একটি অপরটির সীমানা বরাবর তলদেশে ঢুকে পড়ে অথবা অনুভূমিকভাবে আগে–পিছে সরে যায়। এ ধরনের সংঘাতপূর্ণ পরিবেশে ভূমিকম্প সংঘটিত হয়।

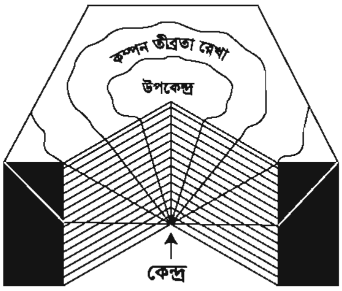

চিত্র ৪.৮ : ভূমিকম্পের কেন্দ্র ও উপকেন্দ্র

কাজ
একক : ভূমিকম্পের কারণসমূহ চিহ্নিত কর।

ভূমিকম্পের ফলাফল

ভূমিকম্পের ফলে পৃথিবীতে বহু পরিবর্তন ও ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়। ভূমিকম্পের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ফল সম্বন্ধে নিচে আলোচনা করা হলো।

ভূমিকম্পের ফলে ভূত্বকে অসংখ্য ফাটল এবং চ্যুতির সৃষ্টি হয়। কখনো সমুদ্রতলের অনেক স্থান উপরে ভেসে ওঠে। আবার কখনো স্থলভাগের অনেক স্থান সমুদ্রতলে ডুবে যায়। অনেক সময় নদীর গতি পরিবর্তিত বা বন্ধ হয়ে যায়। ভূমিকম্পের ঝাঁকুনিতে পর্বতগাত্র থেকে বৃহৎ বরফখণ্ড হঠাৎ নিচে পতিত হয় এবং পর্বতের পাদদেশে ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। ভূমিকম্পের ধাক্কায় সমুদ্রের পানি তীর থেকে নিচে নেমে যায় এবং পরক্ষণেই ভীষণ গর্জন সহকারে ১৫–২০ মিটার উঁচু হয়ে ঢেউয়ের আকারে উপকূলে এসে আছড়ে পড়ে। এ ধরনের জলোচ্ছ্বাসকে সুনামি বলে। ২০০৪ সালের ২৬ ডিসেম্বর ভূকম্পনের ফলে সৃষ্ট সুনামির আঘাতে ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড, ভারত প্রভৃতি দেশে ব্যাপক জান–মালের ক্ষতি হয়। ভূমিকম্পের ফলে কখনো উচ্চভূমি সমুদ্রের পানিতে নিমজ্জিত হয়। আবার কখনো সমুদ্রের তলদেশের কোনো স্থান উঁচু হয়ে সমুদ্রে দ্বীপের সৃষ্টি করে। ভূমিকম্পের ঝাঁকুনিতে ভূপৃষ্ঠে অনুভূমিক পার্শ্বচাপের প্রভাবে কুঁচকে ভাঁজের সৃষ্টি হয়। ভূমিকম্পের ফলে পার্বত্য অঞ্চল থেকে ধস নেমে নদীর গতি রোধ করে হ্রদের সৃষ্টি হয়। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় দুর্ভিক্ষ ও মহামারিতে বহু প্রাণহানি ঘটে। ভূমিকম্পে রেলপথ, সড়কপথ, পাইপ লাইন প্রভৃতি ভেঙে যায় এবং যাতায়াত ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়ে। টেলিফোন লাইন, বিদ্যুৎ লাইন প্রভৃতি ছিঁড়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সমুদ্রের তলদেশে প্রবল ভূমিকম্প সংঘটিত হলে ভূপৃষ্ঠের বড় বাঁধ, কালভার্ট, সেতু প্রভৃতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়াও অনেক সময় সুনামির সৃষ্টি হয়।

কাজ
দলীয় : ভূমিকম্পের প্রভাবের একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসের পদক্ষেপ : যে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঠিক পূর্বাভাস ক্ষয়ক্ষতির হার কমাতে সাহায্য করে। বিশেষ করে দুর্যোগের উৎপত্তির স্থল, সময়, স্থায়িত্বকাল এবং এর শক্তিমাত্রা ও সম্ভাব্য কবলিত এলাকা সম্পর্কে

সঠিক পূর্বাভাস বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অন্যান্য দুর্যোগের চেয়ে ভূমিকম্পের প্রকৃতি আলাদা। এটি অকস্মাৎ সংঘটিত হয়, খুবই ক্ষণস্থায়ী এবং ভূঅভ্যন্তরে ঘটে থাকে। ফলে সরাসরি পর্যবেক্ষণের কোনো সুযোগ নেই। তারপরেও কিছু পদক্ষেপ নিলে ভূমিকম্প অনুমানে সহায়ক হবে, জানমালের ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপকতা হ্রাস করা যাবে। বিজ্ঞানীরা অনুমান করেছেন, যে সমস্ত অঞ্চলে গত ১০০ বছরে ভূমিকম্প হয়নি অথচ সাধারণভাবে ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত, সেখানে ভূমিকম্পের সম্ভাবনা খুব বেশি। এগুলোর মধ্যে দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া, মধ্য জাপান, মধ্য চিলি, তাইওয়ান এবং সুমাত্রার পশ্চিম উপকূল উল্লেখযোগ্য। এ সমস্ত অঞ্চলে আগামী কয়েক দশকের মধ্যে রিখটার মান-এ উচ্চমাত্রার ভূমিকম্পের সম্ভাবনা আছে। ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকায় নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নিলে ক্ষয়ক্ষতি কমানো যায়।

বাড়ি তৈরির সময় মাটি পরীক্ষা করে বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলীর পরামর্শ নিয়ে বাড়ির ভিত মজবুত করতে হবে। বাড়ি তৈরির সময় দুটি বাড়ির মধ্যে নিরাপদ দূরত্ব রাখতে হবে। বাড়ি থেকে বের হওয়ার একাধিক পথ রাখতে হবে এবং বহুতল ভবনে জরুরি সিঁড়ি রাখতে হবে। বিদ্যুৎ ও গ্যাস লাইন ত্রুটিমুক্ত রাখতে হবে। বাড়ির আসবাবপত্র যথাসম্ভব কাঠের হওয়া ভালো। প্রতিটি বাড়িতে সদস্যদের জন্য হেলমেট রাখতে হবে। ভূমিকম্পের সময় বিদ্যুৎ ও গ্যাসের সুইচ বন্ধ রাখতে হবে। তাড়াহুড়া না করে খোলা জায়গায় আশ্রয় নিতে হবে।

বিশ্বের ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল (World's Earthquake Prone Regions)

ভূমিকম্পের প্রকোপ পৃথিবীর সর্বত্র সমান নয়। ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকাগুলোকে নিম্নোক্ত তিনটি প্রধান অংশে ভাগ করা যায়।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় অংশ : প্রশান্ত মহাসাগরের বহিঃসীমানা বরাবর সবচেয়ে বেশি ভূমিকম্প হয়। এ অংশের জাপান, ফিলিপাইন, চিলি, অ্যালিসিয়ান দ্বীপপুঞ্জ ও আলাস্কা সবচেয়ে বেশি ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা হিসেবে পরিচিত।

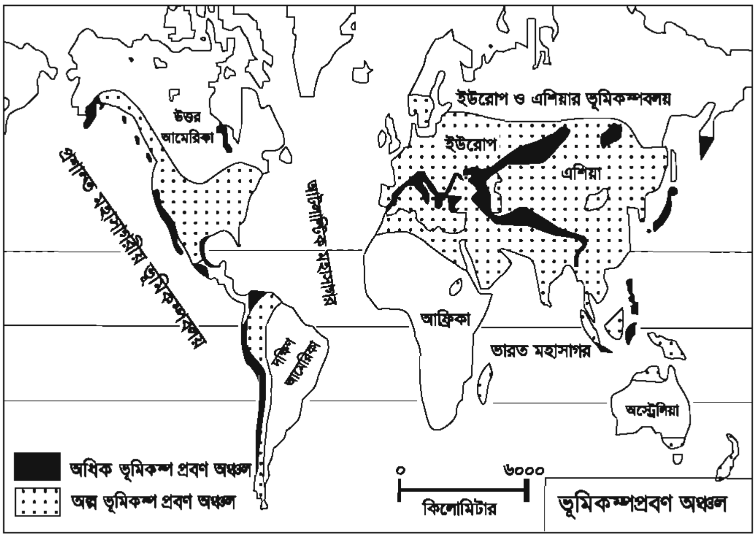

চিত্র ৪.৯ : বিশ্বের ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল

ভূমধ্যসাগরীয়–হিমালয় অংশ : এ অংশ আল্পস পর্বত থেকে শুরু করে ভূমধ্যসাগরের উত্তর তীর হয়ে ককেশাস, ইরান, হিমালয়, ইন্দোচীন ও পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হয়ে নিউজিল্যান্ড পর্যন্ত বিস্তৃত।

মধ্য আটলান্টিক–ভারত মহাসাগরীয় শৈলশিরা অংশ : উত্তর–দক্ষিণ বরাবর মধ্য আটলান্টিক শৈলশিরা এবং ভারত মহাসাগরীয় শৈলশিরা একত্রিত হয়ে মিশে আফ্রিকার লোহিত সাগর বরাবর ভূমধ্যসাগরীয় অংশের সঙ্গে মিলেছে। এ তিনটি প্রধান বলয় ছাড়াও বিচ্ছিন্নভাবে ভূপৃষ্ঠের অভ্যন্তরে এবং মহাসাগরের খাদে কিছু কিছু অংশে ভূমিকম্পের প্রকোপ দেখা যায়।

বাংলাদেশে ভূমিকম্পের কারণ

ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশ ইন্ডিয়ান ও ইউরোপিয়ান প্লেটের সীমানার কাছে অবস্থিত। এ কারণে বাংলাদেশ ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল। ভূমিরূপ ও ভূঅভ্যন্তরীণ কাঠামোগত কারণে বাংলাদেশে ভূআলোড়নজনিত শক্তি কার্যকর এবং এর ফলে এখানে ভূমিকম্প হয়।

মানবসৃষ্ট ও প্রাকৃতিক কারণে দেশের কিছু অংশ দেবে যাচ্ছে আবার কিছু অংশ ফেঁপে উঠে যাচ্ছে। এভাবে ভূ-স্ফীতির ফলে

ভূমিকম্পের সম্ভাবনা বাড়ছে। পাহাড়ি অঞ্চলে ভূমিকম্পের কারণে ফাটলের সৃষ্টি হয়। ভূমিরূপজনিত কারণেও ভূমিকম্পের সম্ভাবনা দেখা দেয়। পাহাড়কাটাসহ মানবসৃষ্ট কারণে বাংলাদেশে ভূমিকম্পের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম ভূমিকম্প বলয়ে অবস্থিত। বাংলাদেশে ভূমিকম্প হয়ে থাকে টেকটনিক প্লেটের সংঘর্ষের কারণে। ভূস্তরের ভূমিকম্প প্রবণ ইন্ডিয়ান প্লেট ও মিয়ানমার সাব–প্লেটের মাঝখানে বাংলাদেশ অবস্থিত। ভূতাত্ত্বিকদের মতে, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ও এর পার্শ্ববর্তী বিশেষ করে উত্তর ও পূর্বদিকে ভূমিকম্প হওয়ার মতো যথেষ্ট ফল্ট বা চ্যুতি বিরাজ করছে। এই চ্যুতি আসামের ডাউকি ডেঞ্জার চ্যুতির সাথে সংযুক্ত। এই ডেঞ্জার ফল্ট লাইনে অবস্থান করছে বাংলাদেশের সিলেট জেলা। ১৯৮৯ সালে ফরাসি ইঞ্জিনিয়ারিং কনসোর্টিয়াম বাংলাদেশের ভূমিকম্প বলয় সংবলিত মানচিত্র তৈরি করেন। এতে ৩টি বলয় দেখানো হয়েছে। প্রথম বলয়কে ‘প্রলয়ঙ্করী’; দ্বিতীয় বলয়কে ‘বিপজ্জনক’ এবং তৃতীয় বলয়কে ‘লঘু’ বলে বর্ণনা করেছেন। এই বলয়সমূহকে বলা হয় ‘সিসমিক রিস্ক জোন’। প্রলয়ঙ্করী বলয়ে রয়েছে বান্দরবান, চট্টগ্রাম, সিলেট, ময়মনসিংহ ও রংপুর। বিপজ্জনক বলয়ে ঢাকা, টাঙ্গাইল, বগুড়া, দিনাজপুর, কুমিল্লা ও রাঙ্গামাটির অবস্থান। দেশের অন্যান্য অঞ্চল লঘু বলয়ে অবস্থিত।

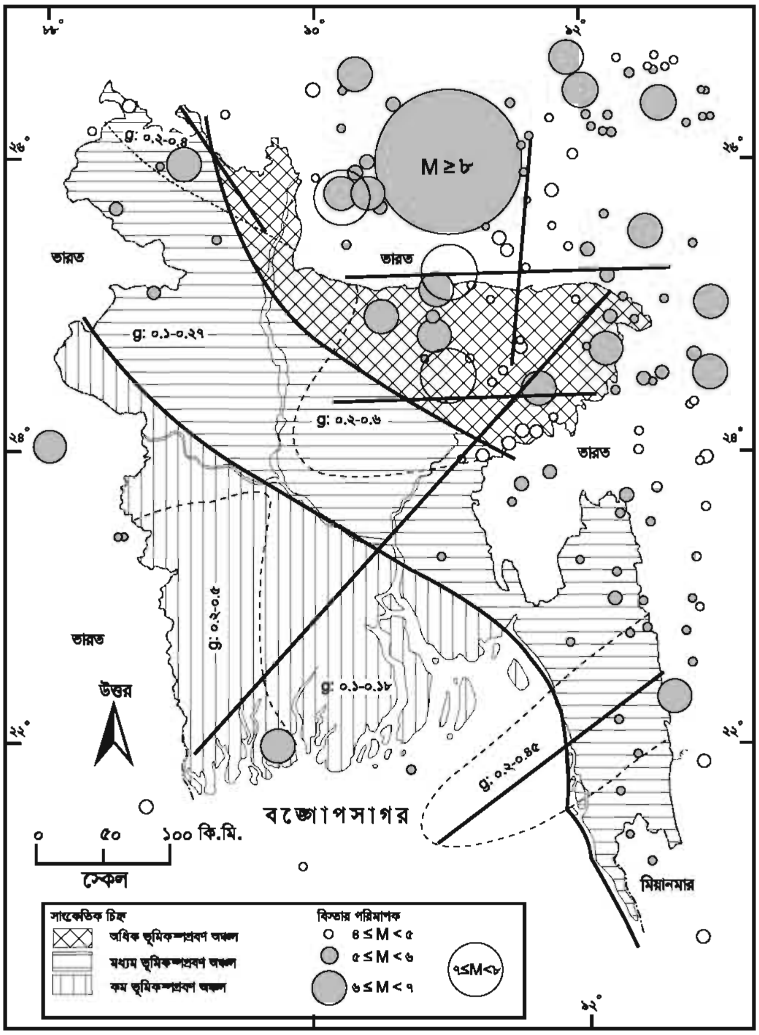
৮৮°
৯০°
৯২°
২৬°
২৪°
২২°
M ≥ ৮
g: ০.২-০.৪
ভারত
ভারত
g: ০.১-০.২৭
g: ০.২-০.৬
ভারত
ভারত
g: ০.২-০.৫
উত্তর
g: ০.১-০.১৮
g: ০.২-০.৪৫
বঙ্গোপসাগর
০ ৫০ ১০০ কি.মি.
স্কেল
মিয়ানমার
সাংকেতিক চিহ্ন
অধিক ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল
মধ্যম ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল
কম ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল
বিস্তার পরিমাপক
৪ ≤ M < ৫
৫ ≤ M < ৬
৬ ≤ M < ৭
৭≤M<৮

চিত্র ৪.১০ : বাংলাদেশের ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকাসমূহ

ভূমিকম্প ঝুঁকি মোকাবিলায় বাংলাদেশের প্রস্তুতি ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ

বাংলাদেশে বড় ভূমিকম্পের বিপর্যয় মোকাবিলার ন্যূনতম প্রস্তুতি নেই। নাজুক উদ্ধার তৎপরতার কারণে মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্পেই ঢাকায় মারাত্মক বিপর্যয় নেমে আসতে পারে। অসহায়ভাবে মৃত্যুর শিকার হতে পারে লাখ লাখ মানুষ। জনসংখ্যার ঘনত্ব, অপরিকল্পিত নগরায়ণ, অধিক বহুতলভবন, খোলা জায়গার অভাব, সরু গলিপথ, উদ্ধার উপকরণের দুরবস্থার কারণেই রাজধানীতে ভূমিকম্পজনিত ঝুঁকি বাড়ছে। ভূমিকম্প বিষয়ে সচেতনতা ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করলেই ভূমিকম্পের নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করা সম্ভব। আমরা একটু গুরুত্বের সাথে লক্ষ করলে দেখতে পাব যে, আমাদের দেশে যদি ৩০ থেকে ৩৫ সেকেন্ডের কোনো ভূমিকম্প হয় তবে ভূমিকম্পের ফলে প্রাণহানি ঘটবে তার চেয়ে বেশি

প্রাণহানি ঘটবে উদ্ধার কাজের ব্যর্থতার জন্য। এজন্য ভূমিকম্প মোকাবিলার প্রস্তুতি সম্পর্কে আমাদের ধারণা থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়। ভূমিকম্প খুব অল্প সময়ে ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। এটা সামান্য সময় স্থায়ী হয় এবং অকস্মাৎ ভূ-অভ্যন্তরে ঘটে থাকে। ফলে সরাসরি পর্যবেক্ষণের কোনো সুযোগ নেই। এতদসত্ত্বেও ভূবিজ্ঞানীরা ভূমিকম্প মোকাবেলায় বেশকিছু পূর্ব প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করেছেন যা গ্রহণ করলে ক্ষয়ক্ষতি বহুলাংশে হ্রাস করা সম্ভব।

ভূমিকম্পের ঝুঁকি মোকাবিলায় বাংলাদেশের প্রস্তুতি

ভূমিকম্পের জন্য যে সকল প্রস্তুতি নেওয়া উচিত তা হলো– যারা নতুন বাড়ি তৈরি করবেন তাদের স্ট্রাকচার ও ডিজাইন করার সময় 'ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড' অনুসরণ করতে হবে। দক্ষ প্রকৌশলীর তদারকির মাধ্যমে ভালো নির্মাণসামগ্রী ব্যবহার করে বাড়ি তৈরি করতে হবে।

ভূমিকম্প প্রতিরোধক পাকা বাড়ি তৈরি করতে কতিপয় বিষয়ের দিকে সূক্ষ্ম নজর দিলে ক্ষয়ক্ষতি ও জীবননাশের মাত্রা অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব, যথা– ইটের তৈরি দেয়াল করলে ৪ তলার উপরে ভবন না করা; ভবন দোতলার বেশি হলে প্রতিটি কোনায় ইটের মাঝখানে ও প্রত্যেক জানালা ও দরজার পাশ দিয়ে খাড়া রড ঢোকাতে হবে। দরজা ও জানালা ঘরের কোনায় না হওয়াই ভালো। এই সতর্কতা অবলম্বন করলে ইটের দেয়ালের ভবনের প্রতিরোধ ক্ষমতা বহুগুণ বেড়ে যাবে। ভূমিকম্পের সময় দেয়ালে ফাটল ধরলেও ধসে পড়ার আশঙ্কা কমে যাবে।

গ্রামাঞ্চলের টিনের ঘরগুলোর ভূমিকম্পে ক্ষতির আশঙ্কা কম। তবে মাটির তৈরি বাড়িঘরের ভূমিকম্প প্রতিরোধ ক্ষমতা কম। এজন্য প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে কোনাকুনিভাবে বাঁশ বা কাঠের বেসিং ব্যবহার করা যেতে পারে।

যদি কোনো ভবনের প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকে তবে ভবনটিকে নির্মাণের পর শক্তিশালী করা যেতে পারে। এ জন্য কংক্রিট বিল্ডিং–এর জন্য অতিরিক্ত রড ব্যবহার করে কংক্রিট ঢালাই দিয়ে দুর্বল স্থানগুলোর আয়তন ও আকার বাড়ানো যেতে পারে। অনেক সময় ফেরো সিমেন্ট দিয়ে ইটের দেয়ালে প্রলেপ দিলে প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ভবনের নিচতলা সম্পূর্ণ খোলা রাখা উচিত নয়। সেমিপাকা ঘরগুলোর চারপাশে টানা দিয়ে বেঁধে রাখলে প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

ভূমিকম্পের প্রস্তুতিস্বরূপ একজন ব্যক্তির করণীয়

বাড়িতে একটি ব্যাটারিচালিত রেডিও এবং টর্চ বাতি সব সময় রাখা। প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখা। বাড়ির গ্যাস, পানি ও বিদ্যুতের মেইন সুইচ কোথায় তা জেনে রাখা এবং এগুলো কীভাবে বন্ধ করতে হয় তা শিখে রাখা। বাড়ির সবচেয়ে সুরক্ষিত স্থানটি চিহ্নিত করা। হাসপাতাল, ফায়ার ব্রিগেড প্রভৃতির ফোন নাম্বার সাথে রাখা। স্কুলে বাচ্চাদের ভূমিকম্প সম্পর্কে ধারণা দেওয়া। ভূমিকম্পের সময় কী করতে হবে তা শিখিয়ে দেওয়া। খেলার মাঠে থাকাকালীন সময়ে দালানকোঠা থেকে দূরে থাকা।

কাজ

একক : ভূমিকম্প চলাকালীন একজন ব্যক্তির করণীয় সম্পর্কিত তালিকা প্রস্তুত কর।

ভূমিকম্প চলাকালীন সময়ে জনসাধারণের করণীয়

নিজেকে ধীরস্থির ও শান্ত রাখা। একতলা দালান হলে দৌড়ে বাইরে চলে যাওয়া এবং কোনো কিছুর লোভে ঘরে অবস্থান না করা। বাড়ির বাইরে থাকলে ঘরে প্রবেশ না করা। বহুতল দালানের ভিতর থাকলে এবং রাতে ভূমিকম্প হলে টেবিল বা খাটের নিচে ঢুকে যাওয়া এবং কাচের জানালা থেকে দূরে থাকা। প্রয়োজনে ঘরের কোণে বা বিল্ডিং এর কলামের গোড়ায় আশ্রয় নেওয়া।

ঘরের বাইরে থাকলে দালান, বড় গাছ, বিদ্যুৎ ও গ্যাস লাইন থেকে দূরে থাকা। উঁচু দালান, জানালা বা ছাদ

থেকে লাফ দিয়ে নামার চেষ্টা না করা। রাস্তায় গাড়িতে থাকলে গাড়ি না চালিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করে রাখা। পাহাড়, উঁচু খাদ বা ঢালু জমিতে ভূমিধসের আশঙ্কা থাকে তাই এসব স্থান থেকে নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নেওয়া।

ভূমিকম্পের পর একজন সচেতন ব্যক্তির করণীয়

নিজের এবং অন্যদের আঘাত পরীক্ষা করা এবং প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া। পানি, গ্যাস ও বৈদ্যুতিক লাইন পরীক্ষা করা। বাড়ির দরজা–জানালা খুলে দেওয়া। রেডিও, টেলিভিশন ও অন্যান্য সংবাদমাধ্যম খোলা রাখা, যাতে দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে প্রচারিত তথ্য শোনা যায়। খালি পায়ে চলাফেরা না করা। লুটতরাজ থেকে সাবধান থাকা এবং অভিজ্ঞ লোকদের পরামর্শ মতো চলা।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. বাংলাদেশ কত ডিগ্রি অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমা রেখায় অবস্থিত?

২. বাংলাদেশের উত্তরের পাহাড়গুলোকে টিলা বলা হয় কেন?

৩. ‘আশ্বিনা ঝড়’ বলতে কী বোঝায়?

৪. উপকেন্দ্র কী ?

৫. ‘সিসমিক রিস্ক জোন’ কী?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন :

১. ভারতের বিভিন্ন স্থানে জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটার কারণ ব্যাখ্যা কর।

২. ভূমিকম্পের ক্ষেত্রে ভূঅভ্যন্তরীণ শক্তি ও প্লেটসমূহের ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ কোন জেলায় অবস্থিত?

ক. চট্টগ্রাম খ. খাগড়াছড়ি

গ. বান্দরবান ঘ. রাঙ্গামাটি

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ২,৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

রিস্তানা ডিসেম্বর মাসের এক বিকেলে বাবা–মায়ের সাথে মেলায় যায়। হঠাৎ করেই বৃষ্টি শুরু হলে তারা দ্রুত একটি গাছের নিচে আশ্রয় নেয়। তবে সামান্য বৃষ্টিপাতের পরেই মেঘ কেটে যায়।

২. রিস্তানার দেখা বৃষ্টিপাতটি কোন বায়ুর প্রভাবে ঘটেছে?

ক. উত্তর–পূর্ব মৌসুমি বায়ু

খ. উত্তর–পশ্চিম শীতল বায়ু

গ. দক্ষিণ–পশ্চিম মৌসুমি বায়ু

ঘ. দক্ষিণ–পশ্চিম শুষ্ক বায়ু

৩. উক্ত বৃষ্টিপাতে কোন ফসল উৎপাদন করা যায়?

ক. ভুট্টা খ. গম

গ. পাট ঘ. তুলা

৪. **জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে–**

i. মানুষের পেশাগত পরিবর্তন ঘটছে
ii. সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে
iii. বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী বিপন্ন হচ্ছে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১. **সৃজনশীল প্রশ্ন**

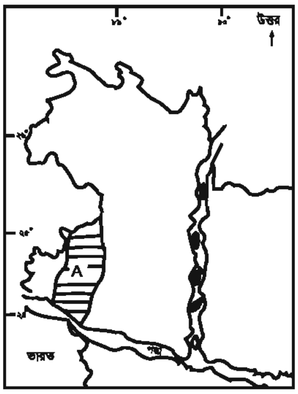

চিত্র : বাংলাদেশের মানচিত্রের অংশবিশেষ

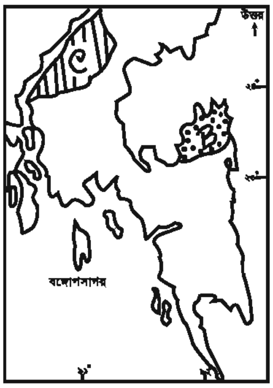

চিত্র: বাংলাদেশের মানচিত্রের অংশবিশেষ

ক. বাংলাদেশের মাঝামাঝি স্থান দিয়ে কোন রেখা অতিক্রম করেছে?

খ. বাংলাদেশের নদীগুলো বঙ্গোপসাগর অভিমুখে প্রবাহিত হয় কেন?

গ. মানচিত্রের 'A' চিহ্নিত অঞ্চলটির ভূপ্রাকৃতিক গঠন ব্যাখ্যা কর।

ঘ. চিত্রের 'B' ও 'C' চিহ্নিত অঞ্চলের কোনটিতে অধিক কী পরিলক্ষিত হবে? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন কর।

২. সাব্বির সাহেব টেলিভিশনে দুর্যোগের ওপর প্রতিবেদন দেখছিলেন। প্রতিবেদনটিতে দেখাচ্ছিল, ফিলিপাইনের একটি শহর হঠাৎ কেঁপে ওঠায় শহরটির বেশকিছু ঘরবাড়ি ভেঙে গিয়ে কয়েকটি এলাকার বিদ্যুৎ লাইন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। প্রতিবেদন দেখে সাব্বির নিজের দেশে এর ভয়াবহতা প্রতিরোধে পূর্বপ্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।

ক. চিকনাগুল কী?

খ. কালবৈশাখি ধারণাটি ব্যাখ্যা কর।

গ. উক্ত প্রতিবেদনটিতে সাব্বিরের দেখা দুর্যোগটি সৃষ্টির কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সাব্বির দুর্যোগটির ঝুঁকি মোকাবিলায় কী ধরনের পূর্বপ্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন, পঠিত বিষয়বস্তুর আলোকে তা ব্যাখ্যা কর।

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলাদেশের নদ–নদী ও প্রাকৃতিক সম্পদ

বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ। নদীগুলোই যেন বাংলাদেশকে বাঁচিয়ে রেখেছে। অসংখ্য নদ–নদী উত্তরের হিমালয় এবং ভারতের পাহাড়ি অঞ্চল থেকে নেমে এসেছে বাংলাদেশ ভূখণ্ডে। এগুলো আঁকাবাঁকা পথে চলেছে। অনেকগুলো নদী বেশ দীর্ঘ এবং প্রশস্ত। আবার বেশ কিছু নদী এখন সরু হয়ে গেছে। অনেক নদ–নদী আমাদের মানচিত্র থেকে অনেক বছর আগেই হারিয়ে গেছে। কিছু কিছু নদী হারিয়ে যাওয়ার পথে। বর্তমানে ছোট বড় মিলিয়ে বাংলাদেশ ভূখণ্ডে ৭০০টি নদ–নদী রয়েছে। এগুলোর আয়তন দৈর্ঘ্যে ২২,১৫৫ কি.মি। এসব নদী আমাদের প্রধান সম্পদ। নদী ছাড়াও বাংলাদেশে ভূমি, বনভূমি, কৃষি জমি, খনিজ পদার্থসহ বেশকিছু প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে। এই সম্পদ আহরণ, ব্যবহার, বর্ধন ও সংরক্ষণের ওপর বাংলাদেশের জনগণের অস্তিত্ব অনেকাংশে নির্ভর করছে। এ অধ্যায়ে আমরা আমাদের নদ–নদী ও প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে জানব এবং এগুলো রক্ষার জন্য সচেষ্ট হব।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা –

- বাংলাদেশের প্রধান নদ–নদীগুলোর (পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, মেঘনা, কর্ণফুলী, তিস্তা, পশুর, সাঙ্গু, ফেনী, নাফ নদী ও মাতামুহুরী) উৎপত্তিস্থল ও প্রবাহ পথের বিবরণ দিতে পারব এবং এগুলো সংরক্ষণের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব;
- নদী–নদীর উপরে জনবসতির নির্ভরশীলতা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশের কোনো কোনো অংশে পানির অভাবের কারণের সাথে সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের নদীর প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব;
- বাংলাদেশের কোনো কোনো অংশে পানির অভাবের কারণে সৃষ্ট সমস্যা বিশ্লেষণ করতে পারব এবং সমাধান পদক্ষেপ সম্পর্কে মতামত ব্যাখ্যা করতে পারব;
- যাতায়াত, জলবিদ্যুৎ ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নদীপথের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারব;
- পানির অভাব দূরীকরণে নদী সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারব;
- প্রাকৃতিক সম্পদের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদের (খনিজ, বনজ, কৃষিজ, পানি–সমুদ্র সম্পদ (মৎস্য সম্পদ), সৌর সম্পদ, সাথে দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশের (ভারত, মিয়ানমার, নেপাল) প্রাকৃতিক সম্পদের তুলনা করতে পারব;
- পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশের পানি ও খাদ্য নিরাপত্তায় পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশের বনভূমির শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা করতে পারব;
- বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এসব সম্পদের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব;
- প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে সচেতন হব।

পরিচ্ছেদ ৫.১: বাংলাদেশের নদ–নদী ও পানি সম্পদ

বাংলাদেশের প্রধান নদীগুলো হচ্ছে– পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, মেঘনা, কর্ণফুলী, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা, পশুর, সাঙ্গু প্রভৃতি। বাংলাদেশ ভূখণ্ডে চিরচেনা ও পরিচিত বেশির ভাগ নদীর উৎপত্তিস্থল হিমালয়, তিব্বত, আসামের বরাক এবং লুসাই পাহাড়ে। এগুলো শেষ পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরে মিলিত হয়েছে।

পদ্মা : পদ্মা নদী ভারত ও ভারতের উত্তরবঙ্গে গঙ্গা এবং বাংলাদেশে পদ্মা নামে পরিচিত। এর উৎপত্তিস্থল মধ্য হিমালয়ের গাঙ্গোত্রী হিমবাহে। উত্তর ভারতের কয়েকটি রাজ্য অতিক্রম করে গঙ্গা রাজশাহী জেলা দিয়ে

পদ্মা নামে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এটি গোয়ালন্দের নিকট ব্রহ্মপুত্রের প্রধান ধারা যমুনার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। চাঁদপুরে এসে এ নদী মেঘনার সঙ্গে মিলিত হয়ে বরিশাল ও নোয়াখালী অতিক্রম করে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। বাংলাদেশের অন্যতম বৃহত্তম নদী গঙ্গা–পদ্মা বিধৌত অঞ্চলের আয়তন ৩৪,১৮৮ বর্গ কি.মি.। পশ্চিম থেকে পূর্বে নিম্নগঙ্গায় অসংখ্য শাখা নদীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে– ভাগীরথী, হুগলি, মাথাভাঙ্গা, ইছামতী, ভৈরব, কুমার, কপোতাক্ষ, নবগঙ্গা, চিত্রা, মধুমতী, আড়িয়াল খাঁ ইত্যাদি।

ব্রহ্মপুত্র এবং যমুনা : তিব্বতের মানস সরোবরে ব্রহ্মপুত্র নদের উৎপত্তি হয়েছে। আসাম হয়ে বাংলাদেশের কুড়িগ্রাম জেলায় এটি প্রবেশ করেছে। ব্রহ্মপুত্রের প্রধান ধারাটি এক সময়ে ময়মনসিংহের মধ্য দিয়ে উত্তর–পশ্চিমদিক থেকে দক্ষিণ–পূর্বদিকে আড়াআড়িভাবে প্রবাহিত হতো। কিন্তু ১৭৮৭ সালে সংঘটিত ভূমিকম্পে ব্রহ্মপুত্রের তলদেশ উত্থিত হওয়ায় পানি ধারণ ক্ষমতার বাইরে চলে যায় এবং নতুন স্রোতধারার একটি শাখা নদীর সৃষ্টি হয়। এই নতুন স্রোত ধারাটি যমুনা নামে পরিচিত হয়। এটি দক্ষিণে গোয়ালন্দ পর্যন্ত যমুনা নদী বলে পরিচিত। যমুনার শাখা নদী ধলেশ্বরী এবং ধলেশ্বরীর শাখা নদী– বুড়িগঙ্গা, ধরলা, তিস্তা ও করতোয়া। আত্রাই হলো যমুনার উপনদী। ব্রহ্মপুত্রের দৈর্ঘ্য ২৮৯৭ কি.মি.। এর অববাহিকার আয়তন ৫,৮০,১৬০ বর্গ কি.মি. যার ৪৪,০৩০ বর্গ কি.মি. বাংলাদেশে অবস্থিত।

মেঘনা : আসামের বরাক নদী নাগা-মণিপুর অঞ্চলে উৎপত্তি হয়ে সিলেটের সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। এই মিলিত ধারা সুনামগঞ্জ জেলার আজমিরিগঞ্জের কাছে কালনী নামে দক্ষিণ–পশ্চিমদিকে অগ্রসর হয়ে মেঘনা নাম ধারণ করেছে। এটি ভৈরব বাজার অতিক্রম করে পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। মুন্সীগঞ্জের কাছে বুড়িগঙ্গা, ধলেশ্বরী ও শীতলক্ষ্যার মিলিত জলধারাই মেঘনায় এসে যুক্ত হয়েছে। সেখান থেকে চাঁদপুরের কাছে পদ্মার সঙ্গে মিলিত হয়ে বিস্তৃত মোহনার সৃষ্টি করেছে। এটি পতিত হয়েছে বঙ্গোপসাগরে। মনু, তিতাস, গোমতী, বাউলাই মেঘনার শাখা নদী। বর্ষার সময় প্লাবন ও পলি মাটিতে মেঘনা বাংলাদেশের উর্বরতা বৃদ্ধি করে।

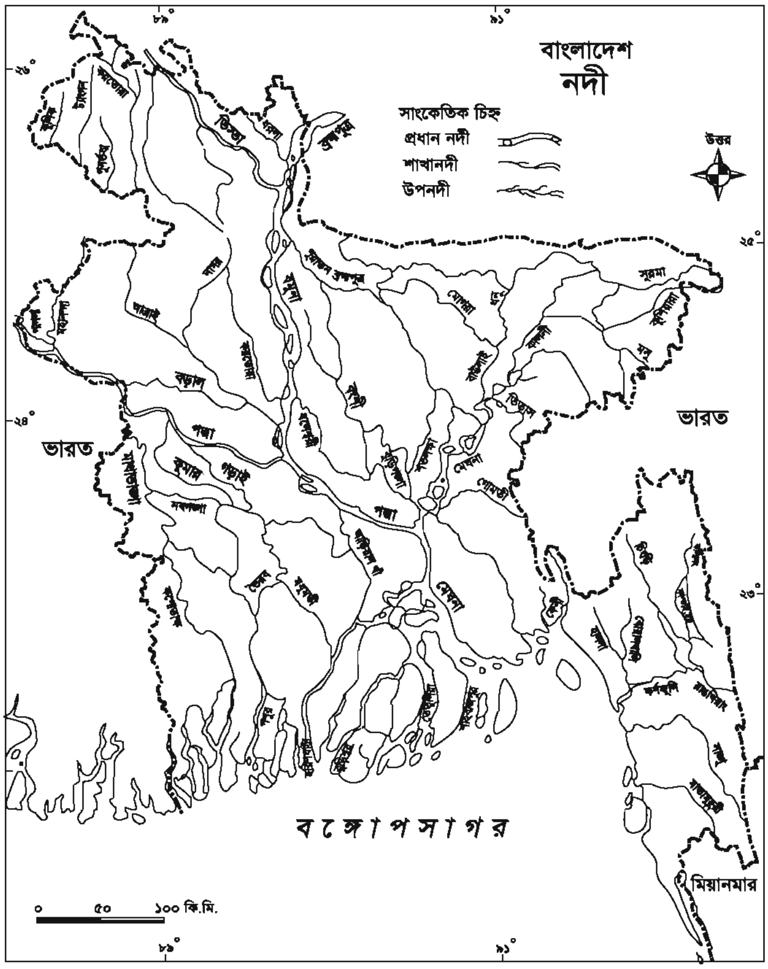

চিত্র ৫.১ : বাংলাদেশের নদ–নদীর মানচিত্র

কর্ণফুলী : বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের প্রধান নদী কর্ণফুলী। এর উৎপত্তিস্থল লুসাই পাহাড়ে। ৩২০ কি.মি. দৈর্ঘ্যের এ নদীটি চট্টগ্রাম শহরের খুব কাছ দিয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। কর্ণফুলীর প্রধান উপনদী হচ্ছে কাপ্তাই,

হালদা, কাসালাং ও রাঙখিয়াং। বাংলাদেশের প্রধান সমুদ্র বন্দর চট্টগ্রাম কর্ণফুলীর তীরে অবস্থিত। পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং চট্টগ্রাম বন্দরের জন্য এ নদীর গুরুত্ব অধিক।

তিস্তা নদী : সিকিমের পার্বত্য অঞ্চলে উৎপত্তি হয়ে তিস্তা নদী ভারতের জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং–এর মধ্য দিয়ে কুড়িগ্রামের ডিমলা অঞ্চল হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এই নদী ১৭৮৭ সালের প্রবল বন্যায় গতিপথ পরিবর্তন করে ব্রহ্মপুত্রের একটি পরিত্যক্ত গতিপথে প্রবাহিত হতে থাকে। গতিপথ পরিবর্তনের পূর্বে এটি গঙ্গা নদীতে মিলিত হয়েছিল। তিস্তা নদীর বর্তমান দৈর্ঘ্য ১৭৭ কি. মি. ও প্রস্থ ৩০০ থেকে ৫৫০ মিটার।

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থায় তিস্তা নদীর ভূমিকা সর্বাধিক। তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পটি ১৯৯৭–১৯৯৮ সালে নির্মিত হয়। ব্যারেজটি ঐ অঞ্চলে পানি সংরক্ষণ, পানি নিষ্কাশন, পানি সেচ ও বন্যা প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

পশুর নদী : খুলনার দক্ষিণে ভৈরব বা রূপসা নদী। এটি আরও দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে ত্রিকোনা ও দুবলা দ্বীপদ্বয়ের ডানদিক দিয়ে মংলা বন্দরের দক্ষিণে সুন্দরবনের ভিতর দিয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। প্রায় ১৪২ কি. মি. দীর্ঘ ও ৪৬০ মিটার থেকে ২.৫ কি. মি প্রস্থ এই নদীর গভীরতা এত বেশি যে, সারা বছর সমুদ্রগামী জাহাজ এর মোহনা দিয়ে অনায়াসে মংলা সমুদ্র বন্দরে প্রবেশ করতে পারে। খুলনা–বরিশাল নৌপথ হিসেবে পশুর নদী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

কাজ

একক : গ্রামীণ অর্থনীতিতে নদীর প্রভাব চিহ্নিত কর।

একক : নদীপ্রবাহ দুর্বলতার কারণ চিহ্নিত কর।

সাঙ্গু–ফেনী, নাফ, মাতামুহুরী : সাঙ্গু নদী উত্তর আরাকান পাহাড় থেকে নির্গত হয়ে বান্দরবান জেলার থানছি উপজেলা দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। এটি ২৯৪ কি.মি. দীর্ঘ। পার্বত্য ত্রিপুরায় উৎপত্তি হয়ে ফেনী জেলায় প্রবেশ করেছে ফেনী নদী। সন্দ্বীপের উত্তরে ফেনী নদী বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। বাংলাদেশ মিয়ানমারের সীমান্তে নাফ নদী অবস্থিত। এর মোহনা অত্যন্ত প্রশস্ত। এই নদী বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। এর দৈর্ঘ্য প্রায় ৫৬ কি. মি। অন্যদিকে লামার মাইভার পর্বতে মাতামুহুরী নদীর উৎপত্তি হয়েছে। নদীটি কক্সবাজার জেলার চকোরিয়ার পশ্চিম পাশ ঘেঁষে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। এর দৈর্ঘ্য প্রায় ১২০ কি.মি.।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর উল্লিখিত নদীসমূহের প্রভাব অপরিসীম। সেচের পানি, শিল্পে ব্যবহৃত পানি ও জল বিদ্যুৎ শক্তির উৎস এসব নদী। তাছাড়া মাছের উৎসও হচ্ছে নদী। নদী আমাদের পরিবহন ও যোগাযোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রধান মাধ্যম। জমির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধিতে এসব নদী পলি বহন করে আনে। নদীমাতৃক বাংলাদেশের কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়–বাণিজ্য, পরিবহন ইত্যাদি বহুলাংশে নদীর ওপর নির্ভরশীল বলে অর্থনৈতিক উন্নয়নে নদীর গুরুত্ব অপরিসীম। নদীর প্রবাহে বাধা, নদীতে শিল্প ও জলযানের বর্জ্য ফেলা, পয়ঃনিষ্কাশন প্রবাহ যুক্ত করা, নদী দখল প্রভৃতি কারণে আমাদের দেশের অনেক নদীর প্রবাহ দুর্বল হয়ে পড়ছে। নদীর পানি দূষিত হচ্ছে এবং নদীর নাব্য হারিয়ে যাচ্ছে। এসব নদী সংরক্ষণে আমাদের সকলকেই অধিক সচেতন হতে হবে।

নদ–নদী ও জনবসতির পারস্পরিক সম্পর্ক

প্রাচীন যুগ থেকে মানুষ নদ–নদীর তীরবর্তী সমতল ভূমিতে বসবাস শুরু করে। কেননা, নদ–নদী থেকে মানুষের প্রাত্যহিক ব্যবহার্য পানি পাওয়া নিশ্চিত থাকে। এছাড়া কৃষি কাজের জন্যে পানির জোগানও নদী থেকে দেওয়া সম্ভব। জীবনধারণের জন্য কৃষির পাশাপাশি মাছ শিকার ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। নদ–নদীই মানুষের খাদ্য ও রোজগারের

প্রধান উৎস হিসেবে ভূমিকা পালন করে। পৃথিবীর সকল সভ্যতা ও জনবসতি গড়ে ওঠার পিছনে নদ–নদীর ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। পরবর্তীকালে জীবন–জীবিকার উন্নতিতেও নদ–নদীকে মানুষ ব্যবহার করেছে। পানির কারণেই মানুষ নদীর কাছাকাছি বসতি স্থাপন ও জীবিকা নির্বাহের উৎসের সন্ধান করেছে। ফলে মানুষের সঙ্গে নদীর সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য হয়ে উঠেছে। বর্তমানকালে এ সম্পর্ক আরও বহুমাত্রিক এবং নিবিড় হয়েছে।

নদ–নদীকে কেন্দ্র করে মানুষ খাদ্যোৎপাদন, মাছ শিকার, পণ্য পরিবহন, ব্যবসায় –বাণিজ্য ইত্যাদি গড়ে তোলার মাধ্যমে স্থায়ী বসতি হিসেবে গ্রাম এবং শহর গড়ে উঠেছে। নদীসমূহ পানি সম্পদে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশে জনসংখ্যার বিস্তার সর্বাধিক ঘটেছে নদীগুলোর তীরে। ফলে অধিকাংশ শহর, গঞ্জ (বাণিজ্য) গড়ে উঠেছে বিভিন্ন নদীর তীরে। এভাবে বুড়িগঙ্গার তীরে ঢাকা, কর্ণফুলীর তীরে চট্টগ্রাম, শীতলক্ষ্যার তীরে নারায়ণগঞ্জ, সুরমার তীরে সিলেট, গোমতীর তীরে কুমিল্লা ইত্যাদি লক্ষ করা যায়।

শিল্প, কলকারখানা প্রতিষ্ঠাতেও নদ–নদীর ব্যবহার সবচেয়ে বেশি। আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করার জন্য আধুনিক সেচ প্রকল্প গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও নদ–নদীকে বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। গঙ্গা–কপোতাক্ষ পরিকল্পনা থেকে দেশের কুষ্টিয়া, যশোর ও খুলনা জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কৃষিজ জমিতে পানি সেচের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এতে ঐ অঞ্চলের মানুষ কৃষি উৎপাদনে লাভবান হচ্ছে। কর্ণফুলী বহুমুখী পরিকল্পনা থেকে ৬৪৪ কি.মি. নৌ চলাচল করছে। ১০ লক্ষ একর জমিতে কৃষিজ ফলন হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের কাপ্তাই নামক স্থানে বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে। এ বাঁধের ফলে ভয়াবহ বন্যা থেকে চট্টগ্রাম অঞ্চলকে মুক্ত রাখাও অনেকাংশে সম্ভব হয়েছে। তিস্তা বাঁধ থেকে রংপুর, বগুড়া ও দিনাজপুর অঞ্চলের মানুষ এখন সুবিধা ভোগ করছে। মেঘনা নদী থেকে পানি নিয়ে বৃহত্তর কুমিল্লা, নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলায় চাষাবাদ উন্নত করা সম্ভব হচ্ছে। সারা দেশেই নদীর পানিকে ব্যবহার করে বিভিন্ন কৃষি পরিকল্পনা এখন বিস্তৃত হচ্ছে। এর ফলে দেশের কৃষি অর্থনীতি দিন দিন উন্নত হচ্ছে। মানুষের কর্মসংস্থান ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হচ্ছে। দেশের দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে নদীপথে লঞ্চ ও স্টিমার দিন দিন সম্প্রসারিত হচ্ছে। পরিবহনের জন্যও নদী পথকে বেছে নেওয়া হচ্ছে। ভারতকে ট্রানজিট দেওয়ার ক্ষেত্রেও বিভিন্ন নদী পথকে ব্যবহার করা হচ্ছে। এর ফলে বাংলাদেশ বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের আর একটি সুযোগ পাচ্ছে। বাংলাদেশের মানুষের অর্থনৈতিক জীবন ব্যবস্থা উন্নত করা, সুস্বাস্থ্য রক্ষা করা, নির্মল বায়ু ও শহরগুলোর পানির ব্যবস্থা করাসহ জনজীবনকে গতিশীল রাখার ক্ষেত্রে নদ–নদীর ভূমিকা দিন দিন বেড়েই চলেছে। উত্তরাঞ্চলে যেখানে নদী শুকিয়ে যাচ্ছে সেখানে ফসলের ক্ষতি হচ্ছে, জনজীবন হুমকির মুখে পড়তে যাচ্ছে। সে কারণে নদীর নাব্য রক্ষার জন্যে জরুরি উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। বাংলাদেশের নগর ও গ্রামের জনজীবন, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে হলে দেশের সকল নদ–নদীকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। সে কারণেই দেশে এখন পরিবেশবাদীরা ‘নদী বাঁচাও’ জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি পালন করছেন।

বাংলাদেশে অঞ্চলভেদে পানির অভাবের কারণ, প্রভাব ও সমাধানের পদক্ষেপ

পানির অভাবের কারণ

বাংলাদেশে অসংখ্য নদ, নদী, খাল, বিল ও হাওড় থাকার পরও বেশকিছু অঞ্চলে পানির অভাব তীব্র হচ্ছে। অঞ্চলভেদে পানির অভাবের কারণের পার্থক্য থাকলেও সাধারণ কতিপয় কারণ রয়েছে।

বাংলাদেশের নদীসমূহে উজান থেকে প্রচুর পানি আসে। এ পানিতে প্রচুর পলি থাকে। এসব পলি নদীর তলদেশে জমা পড়ে। দীর্ঘদিন এভাবে পলি জমা হয়ে বেশকিছু নদীর তলদেশ ভরাট হয়ে গেছে। ফলে নদীগুলোতে চর পড়ে যাওয়ায়

পানির প্রবাহ কমে গেছে। তাছাড়া অনেক নদ–নদী বিলুপ্ত হয়ে গেছে। উত্তর বঙ্গ ও দক্ষিণাঞ্চলের জেলাসমূহে এ ধরনের অসংখ্য নদী মৃত নদী হিসেবে পরিচিত হয়ে আছে। নদীগুলোর সজীবতা রক্ষা করতে মাঝেমধ্যে তলদেশে জমাকৃত পলি খনন করা প্রয়োজন। বাংলাদেশে নদী খনন করার উদ্যোগ তেমন জোরদার নয়। ফলে অনেক নদীর পানি প্রবাহ ও নাব্য হ্রাস পেয়েছে।

বাংলাদেশের অনেক নদীর উৎপত্তি স্থল ভারতে। ভারতে বেশকিছু নদীতে বাঁধ দেওয়ায় বাংলাদেশের নদীগুলোতে শুষ্ক মৌসুমে পানির প্রবাহ কমে গেছে। এর ফলে এদেশের কোনো কোনো নদী, যেমন– তিস্তা, গঙ্গা, কপোতাক্ষ ইত্যাদি শুকিয়ে যাচ্ছে। ভারতের ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণের ফলে দেশের উত্তর–পশ্চিমাঞ্চল ভয়াবহ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। পদ্মাসহ উত্তরাঞ্চলের সব নদীতেই নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। বিশেষ করে শুষ্ক মৌসুমে পানির চরম সংকট দেখা দেয়। এর ফলে পরিবেশের ভারসাম্যের উপর পানির অপ্রতুলতার নানা ধরনের নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে।

কাজ

দলীয় : নদীর প্রবাহ ক্ষীণ বা শুকিয়ে যাওয়ার কারণে কী কী সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, তার একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

সেচসহ নানা কাজে কোনো কোনো নদী থেকে পাম্প দিয়ে প্রচুর পানি উত্তোলনের ফলে মূল নদীতেই পানি আশঙ্কাজনকভাবে কমে যাচ্ছে। ফলে নদী তার স্বাভাবিক গতি ও রূপ হারাতে বাধ্য হয়। নিয়ম–নীতি না মেনে নদীর উপর দিয়ে যত্রতত্র ব্রিজ, কালভার্ট, বাঁধ ইত্যাদি নির্মাণের ফলে অনেক নদী শুকিয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশে গ্রীষ্ম ও শীতকালে নদীতে পানিপ্রবাহ কমে যাওয়ার কারণে নদী ধীরে ধীরে নাব্য হারিয়ে ফেলছে। এর ফলে বাংলাদেশের সমাজ, অর্থনীতি ও জনজীবন দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।

বাংলাদেশের অনেক নদী শুকিয়ে যাওয়ার কারণে কৃষি, বাণিজ্য, মৎস্য চাষ, যাতায়াত বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ফলে নদীর তীরে গড়ে ওঠা বসতির জীবন ও জীবিকার সন্ধানে তল্পিতল্পা গুটিয়ে অন্যত্র চলে যেতে হচ্ছে। শুষ্ক মৌসুমে ও শীতকালে নদী শুকিয়ে গেলে মাছের অভাব দেখা দেয়। ফলে পর্যাপ্ত আমিষের অভাবে পুষ্টিহীনতা দেখা দিতে পারে। আবার বর্ষাকালে পানিপ্রবাহ বৃদ্ধির চাপে বাড়িঘর ভাঙতে পারে, মানুষজন পৈতৃক ভিটা হারিয়ে নিঃস্ব হতে পারে।

নদীপ্রবাহ হারালে দীর্ঘদিন ধরে নদীকে কেন্দ্র করে যেসব পেশার মানুষ জীবন–জীবিকা নির্বাহ করে থাকে তাদের জীবনে অভাব–অনটন নতুনভাবে সৃষ্টি হতে পারে। নদীর তীরে যেসব গাছপালা, বাগানবাড়ি, সবুজ বৃক্ষের সমারোহ গড়ে উঠেছে সেগুলো পানির অভাবে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাতে মানুষ, মাছ, পশু–পাখি ও গাছ–তরুলতার অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে।

আমাদের এসব নদীকে বাঁচাতে হবে। এর জন্যে নদী নিয়মিত খনন করা, নদীর উপর অপ্রয়োজনীয় বাঁধ, পুল, কালভার্ট নির্মাণ না করা, পানির প্রবাহ ঠিক রাখা ও জলাধার নির্মাণের উদ্যোগ নিতে হবে।

যাতায়াত, জলবিদ্যুৎ ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নদীপথের ভূমিকা

বাংলাদেশের যাতায়াত ব্যবস্থা, জলবিদ্যুৎ ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নদীপথের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

যাতায়াত : নদীমাতৃক দেশে যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ নদীগুলোই বহন করছে। পদ্মা, যমুনা, মেঘনা, কর্ণফুলী, সুরমা, কুশিয়ারা, মাতামুহুরী, আত্রাই, মধুমতী, গড়াই ইত্যাদি নদী যাত্রী পরিবহন সেবায় বড় ধরনের ভূমিকা পালন করে থাকে। নদীপথকে সকলে আরামদায়ক পথ বলে বিবেচনা করে থাকে। এদেশে নদীপথের দৈর্ঘ্য প্রায় ৯৮৩৩ কিলোমিটার। এর মধ্যে ৩,৮৬৫ কিলোমিটার পথে বছরের সবসময় নৌ চলাচল করে থাকে। বাংলাদেশে নদীপথে নৌকা, লঞ্চ, ট্রলার, স্টিমার, নৌট্রাক ইত্যাদি পরিবহনে লক্ষ লক্ষ মানুষ নিজেদের

গন্তব্যে পৌঁছতে সক্ষম হচ্ছে। দেশে সরকারি এবং বেসরকারি বেশকিছু সংস্থা এসব পরিবহনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা। ১৯৫৮ সালে অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষ তৈরি করা হয়েছে। সংক্ষেপে এটিকে বিআইডব্লিউটিএ (BIWTA) বলা হয়। জনস্বার্থে এই সংস্থা নানা ধরনের যাত্রীবাহী জলযানের ব্যবস্থা করে থাকে। নদী পথে কিছু সংরক্ষণ খরচ ছাড়া তেমন কোনো নির্মাণ খরচ না থাকায় নদীপথে যাতায়াত খরচও অপেক্ষাকৃত কম।

জলবিদ্যুৎ : নদী ও জলপ্রপাতের পানির বেগ ব্যবহার করে টার্বাইন যন্ত্রের সাহায্যে যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় তাকে জলবিদ্যুৎ বলা হয়। এটি নবায়নযোগ্য শক্তি সম্পদ। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের কাপ্তাই নামক স্থানে কর্ণফুলী নদীতে নদীর গতিপথে বাঁধ দিয়ে পাকিস্তান আমলে প্রথম জলবিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু করা হয়। সব চেয়ে কম খরচে এ বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। বর্তমান বিশ্বে তেল, গ্যাস বা পারমাণবিক চুল্লি ব্যবহারের মাধ্যমে যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় তার উৎপাদন খরচ অনেক বেশি। সেই তুলনায় জল বিদ্যুতের খরচ অনেক কম। সে কারণে দেশের নদীর পানি সম্পদ ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি করা বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য লাভজনক। তবে যে ধরনের পাহাড়ি নদী থেকে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়, সে রকম পাহাড় ও নদী দেশে বেশি নেই। ফলে বাংলাদেশে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সুযোগ কম।

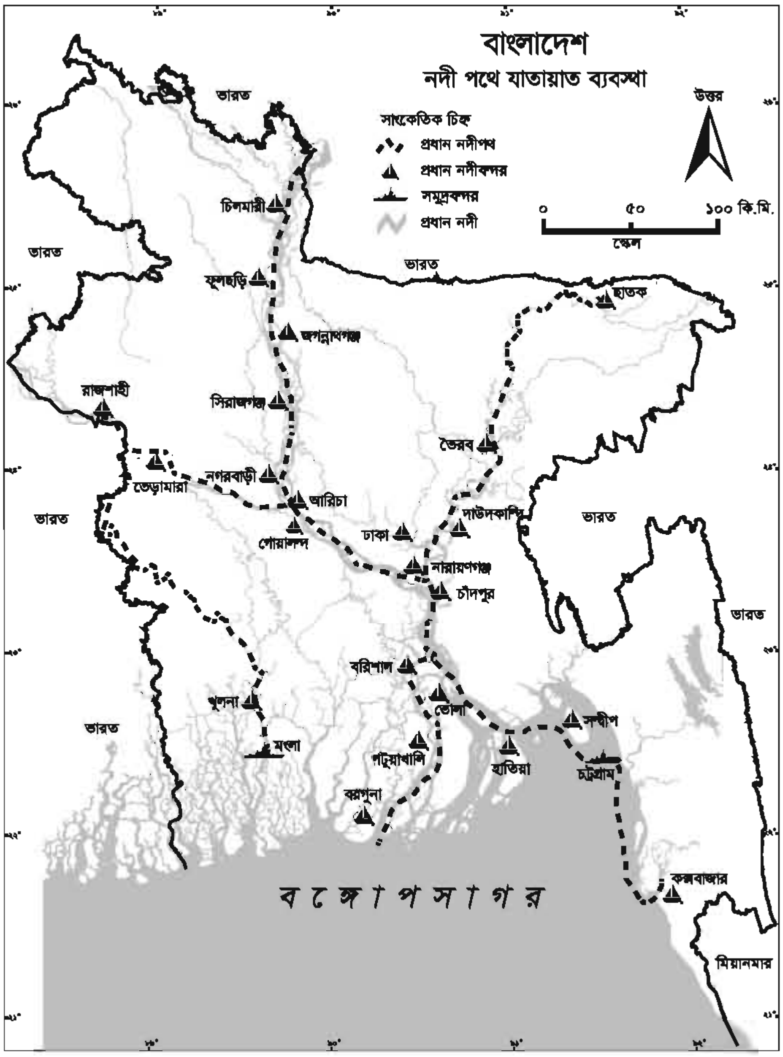
বাংলাদেশ
নদী পথে যাতায়াত ব্যবস্থা
সাংকেতিক চিহ্ন
প্রধান নদীপথ
প্রধান নদীবন্দর
সমুদ্রবন্দর
প্রধান নদী
উত্তর
০
৫০
১০০ কি.মি.
স্কেল
ভারত
ভারত
ভারত
ভারত
ভারত
ভারত
ভারত
মিয়ানমার
চিলমারী
ফুলছড়ি
জগন্নাথগঞ্জ
সিরাজগঞ্জ
রাজশাহী
নগরবাড়ী
ভেড়ামারা
আরিচা
গোয়ালন্দ
ঢাকা
দাউদকান্দি
ভৈরব
ছাতক
নারায়ণগঞ্জ
চাঁদপুর
বরিশাল
ভোলা
খুলনা
মংলা
পটুয়াখালি
বরগুনা
হাতিয়া
সন্দীপ
চট্টগ্রাম
কক্সবাজার
ব ঙ্গো প সা গ র

চিত্র ৫.২ : বাংলাদেশের নদীপথে যাতায়াত ব্যবস্থার মানচিত্র

বাণিজ্য : বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ নৌপথে দেশের মোট বাণিজ্যিক মালামালের ৭৫ শতাংশ আনা–নেওয়া করা হয়। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নদীপথের বাণিজ্যকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হয়। এক সময় আমাদের তেমন কোনো জাহাজ ছিল না। এখন বহুমুখী পণ্যবাহী জাহাজের সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশে প্রায় সব নদীপথেই সরকারি বেসরকারি উদ্যোগে লক্ষ লক্ষ টন মালামাল পরিবহন করা হয়ে থাকে। ফলে সকল প্রকার অস্থিতিশীলতার মধ্যেও নির্বিঘ্নে জাহাজ ও নৌযানযোগে পণ্য পরিবহন করা যায়। বর্ষাকালে বেশিরভাগ পণ্যই নৌপথে পরিবহন করা হয়। তবে শুষ্ক মৌসুমে নদীর নাব্য হ্রাস পাওয়ার কারণে কোনো কোনো নদীতে জাহাজ চলাচল সীমিত হয়ে আসছে। দেশের কৃষি, শিল্প ও মৎস্য সম্পদের বিকাশ

কাজ

দলীয় : নদীর ওপর নির্ভরশীল কর্মকাণ্ডের তালিকা প্রস্তুত কর।

ঘটাতে নৌপরিবহনের কোনো বিকল্প নেই। সকল সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাকে বাংলাদেশের নৌ বাণিজ্যকে গতিশীল করার জন্যে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে এগিয়ে আসতে হবে। তাহলে বাংলাদেশের নদীর সর্বোচ্চ ব্যবহার ঘটিয়ে বাংলাদেশ দ্রুত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হবে।

পরিচ্ছেদ ৫.২: বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ

প্রাকৃতিক সম্পদের ধারণা

প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত সম্পদকে প্রাকৃতিক সম্পদ (Natural Resource) বলা হয়। মাটি, পানি, বনভূমি, সৌরতাপ, মৎস্য, খনিজ ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদ।

বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ

বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশ ভারত, মিয়ানমার ও নেপালের প্রাকৃতিক সম্পদ প্রায় একই রকম। নিম্নে এসব প্রাকৃতিক সম্পদের বিবরণ দেওয়া হলো।

কৃষিজ সম্পদ : দক্ষিণ এশিয়ার দেশ ভারত, বাংলাদেশ, মিয়ানমার এবং নেপাল বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে কৃষিপ্রধান। এই অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি , জলবায়ু , মাটি, নদ-নদী ইত্যাদির উপর নির্ভর করে কৃষকগণ এখানকার কৃষিজ সম্পদ উৎপাদন করে। কৃষি উৎপাদনে একটি সুনির্দিষ্ট মাত্রার তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের দরকার হয়। এজন্য অঞ্চলভেদে কৃষি উৎপাদনে তারতম্য ঘটে। অত্যন্ত শীতল জলবায়ুর কারণে কিংবা বৃষ্টিপাতের অভাবে ভারতের কয়েকটি অঞ্চলে শস্য উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটে। নেপালে হিমালয়ের পাদদেশে শস্য উৎপাদন সীমিত আকারে হয়। অথচ ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ ও মিয়ানমারে নদী বিধৌত উর্বর অঞ্চলে ধান, গমসহ কৃষিজ পণ্য বছরে কয়েকবার উৎপাদন করা সম্ভব। বাংলাদেশে ধান, আলু ও পাটের উৎপাদন ব্যাপক হয়। ভারতের পূর্বাঞ্চলে এবং বাংলাদেশের উত্তর ও পূর্বাঞ্চলের পাহাড়ে চা উৎপাদন হচ্ছে। গম, ভুট্টা, সরিষা ইত্যাদির ফলনও বেশ ভালো হয়। এ অঞ্চলে কৃষিপণ্য উৎপাদনের পিছনে মাটির গুণাগুণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ভারত ও মিয়ানমারে তুলা, চা, ডাল, মরিচ ইত্যাদির উৎপাদন বেশ ভালো।

বনজ সম্পদ : জলবায়ুগত অবস্থার সঙ্গে বনজ সম্পদের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার দেশ- ভারত, মিয়ানমার ও নেপালের মধ্যে জলবায়ুগত তারতম্য রয়েছে। উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু অঞ্চলে সারা বছর প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় বলে সেখানে নিবিড় ও বড় বড় অরণ্য বেড়ে উঠেছে। এজন্যই বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম, ভারতের পূর্বাঞ্চল ও মিয়ানমারের উত্তরাঞ্চলে চির হরিৎ অরণ্য সৃষ্টি হয়েছে।

মৎস্য সম্পদ : যে কোনো দেশের মৎস্য সম্পদের সঙ্গে সরাসরি ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ুর সম্পর্ক রয়েছে। বাংলাদেশে বৃষ্টিপাত, নদ-নদীতে পানিপ্রবাহ, খাল, বিল, হাওড়, পুকুর ইত্যাদিতে পানি থাকায় দেশটি মৎস্য সম্পদে সমৃদ্ধ দেশ বলে পরিচিত। এখানে ছোট বড় নানা প্রকারের মাছ পাওয়া যায়। বঙ্গোপসাগরে মাছের ভান্ডার রয়েছে। প্রতিবেশী মিয়ানমার ও ভারতে প্রচুর মৎস্য সম্পদ রয়েছে।

খনিজ সম্পদ : বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলীয় পাহাড়ি জেলাসমূহের মাটির নিচে গ্যাস, কয়লা, তেল, চুনাপাথরসহ নানা ধরনের মূল্যবান খনিজ পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেছে। এসব সম্পদ আহরণ করে দেশের গ্যাসের চাহিদা মেটানো হচ্ছে। বঙ্গোপসাগরের তলদেশেও গ্যাস আবিষ্কৃত হয়েছে। সেখানে আরও অনেক ধরনের প্রাণিজ এবং খনিজ পদার্থ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশ ভারত একটি বড় দেশ। সেখানে ভূতাত্ত্বিক অবস্থা বৈচিত্র্যময়। ফলে নানা খনিজ সম্পদে ভারত অনেক বেশি সমৃদ্ধ। মিয়ানমার খনিজ সম্পদে বেশ অগ্রসর অবস্থানে আছে। তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে আছে নেপাল।

সৌরশক্তি : নিরক্ষীয় নিম্ন অক্ষাংশ অঞ্চলে সূর্য বছরের প্রায় সবসময়ই লম্বভাবে কিরণ দেয়। বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার অপরাপর দেশগুলো নিরক্ষীয় বা ক্রান্তীয় অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ার কারণে এসব দেশ সহজে প্রচুর সৌরশক্তি পেয়ে থাকে। এ অঞ্চলের দেশগুলোতে তাপমাত্রা কখনো নিম্ন পর্যায়ে নামে না। ফলে সূর্যের আলো ছাড়া অন্ধকারে বসবাস করতে হয় না। ইউরোপ ও আমেরিকা মহাদেশের বেশকিছু দেশে সূর্য বছরে কয়েকমাস বাঁকাভাবে কিরণ দেয়, কখনো কখনো সূর্য প্রায় দেখাই যায় না। সে কারণে সেসব দেশে রাষ্ট্র ও জনগণকে বাড়িঘর বসবাসের জন্যে উপযোগী রাখতে প্রচুর জ্বালানি সম্পদ ব্যয় করতে হয়। আমাদের এ অঞ্চলের দেশগুলোকে তা করতে হয় না। আমরা প্রকৃতি থেকে সূর্যের যে আলো অনায়াসে লাভ করি তা অনেক মূল্যবান সৌর সম্পদ। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে এ সম্পদ দিয়ে আমরা আমাদের বিদ্যুতের চাহিদা পূরণ করতে পারি। আমাদের খাদ্য, চিকিৎসা, বাসস্থানসহ নানা ক্ষেত্রেই সৌরশক্তিকে ব্যবহার করে বাংলাদেশের আরও উন্নতি লাভ করার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

কাজ

দলীয় : বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদগুলো অর্থনীতির কোন কোন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে তার একটি তালিকা তৈরি কর।

দলীয় : বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদগুলো সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কী কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া যায়– তার একটি চার্ট তৈরি কর।

পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার ধারণা

মানুষসহ জীব জগতের অস্তিত্বের জন্যে পানির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই পানি অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ। কৃষি ও শিল্পের বিকাশে পানির ব্যবহার অপরিহার্য। বৃষ্টি থেকে পর্যাপ্ত পানি পাওয়া গেলেও শীত ও গ্রীষ্মকালে পানির অভাব হলে কৃষি, শিল্প ও জীবনযাপন সংকটাপন্ন হয়ে ওঠে। সে কারণে সারাবছর পানির প্রাপ্তি, প্রবাহ ও বণ্টন নিশ্চিত রাখতে এই সম্পদের ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হয়। পানির পরিকল্পিত প্রাপ্যতা ও ব্যবহারকে পানি ব্যবস্থাপনা বলা হয়। সাধারণত কঠিন, তরল ও বাষ্পাকারে পানি থাকে। শীত ও শুষ্ক মৌসুমে পানির প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে নদ–নদী, খাল, পুকুর, হাওড় ও বিলে পরিকল্পিতভাবে পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা করার মাধ্যমে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা করা যায়। আধুনিককালে পানি সম্পদকে মানুষের কল্যাণে ব্যয় করার জন্যে এর ব্যবস্থাপনার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। নতুবা এ সম্পদের অপব্যবহার, দুষ্প্রাপ্যতা, রাসায়নিকীকরণসহ নানা কারণে পরিবেশ বিপর্যয় এবং জীব জগতের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে।

কাজ

একক : তোমার এলাকার পানি ও খাদ্য নিরাপত্তায় কোন কোন উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে? লেখ।

বাংলাদেশের পানি ও খাদ্য নিরাপত্তায় পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব

বাংলাদেশ পৃথিবীর সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। এত মানুষের খাদ্য, পানি ও অন্যান্য নিরাপত্তা বিধান করা বেশ কঠিন। তাই জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা খুবই কঠিন হয়ে উঠেছে। দিন দিন এদেশে ভূমি, পানি ও খাদ্য ব্যবস্থাপনাসহ নানা সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যদিও স্বাধীনতার চল্লিশ বছরে জনসংখ্যা দ্বিগুণ বেড়েছে, খাদ্যোৎপাদন তিন গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এজন্য দেশে তেমন খাদ্য সংকট নেই। কিন্তু পানিদূষণ ও দুষ্প্রাপ্যতা যেভাবে বেড়ে চলেছে তাতে খাদ্যোৎপাদন ব্যাহত হওয়ার আশংকা রয়েছে। সেজন্যে দেশে পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জনগণের খাদ্য নিরাপত্তার স্থায়ী সমাধানে সকলকে কাজ করতে হবে। পানি ব্যবস্থাপনার জন্য যে উদ্যোগগুলো নিতে হবে তা হলো–

১. **পরিবেশ সংরক্ষণ** : নদ–নদী, পুকুর, খাল, বিল, হাওড়, বাওড়, বন ও ভূমির পরিবেশ রক্ষা করতে হবে।

২. **পানির সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করা** : শুষ্ক ও শীত মৌসুমে দেশের সর্বত্র পানির অপব্যবহার দূর করার নীতি ও কৌশল বাস্তবায়ন করতে হবে।

৩. **নদ–নদীর নাব্য সংকট দূর করা** : দেশের নদ–নদীগুলো পলি পড়ে ভরাট হয়ে যাচ্ছে। প্রায় প্রতি বছর দেশের বিভিন্ন অঞ্চল বন্যা কবলিত হয়ে পানি দূষিত হয়। এটি থেকে পরিত্রাণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা, যেমন– বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও বাঁধ নির্মাণের দিকে নজর দিতে হবে। অনেক নদী শুকিয়ে গেছে। এসব নদ–নদীতে খনন সম্পাদন করলে পানির প্রবাহ এবং সংরক্ষণ সম্ভব হবে। তাতে কৃষি ও শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় পানি পাওয়া যাবে।

৪. **সংযোগ খাল ও রিজার্ভার খনন করা** : বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে পরিকল্পিতভাবে কয়েকটি রিজার্ভার খনন করা গেলে শুষ্ক মৌসুমে খাদ্য উৎপাদনে প্রয়োজনীয় পানির চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হবে। মাছ চাষ ও প্রজনন স্বাভাবিক থাকবে।

৫. **লবণাক্ততা দূর করা** : দক্ষিণাঞ্চলের বেশকিছু এলাকায় সমুদ্রের পানির কারণে মাটি লবণাক্ত হয়ে পড়েছে। মাটির উপর পাতলা আবরণ পড়ে ফসল উৎপাদন নষ্ট করে দিচ্ছে। ফলে মিঠা পানির অভাবে মাছ চাষ, কৃষিকাজ, গাছপালা ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এসব এলাকায় মিঠা পানির সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার জন্য বিভিন্ন ধরনের বাঁধ নির্মাণ করতে হবে। তাহলে পানি ও খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার হতে পারে।

৬. **নদীভাঙন রোধ করা** : বর্ষাকালে কোনো কোনো অঞ্চলে নদী ভাঙনের ফলে নদীতে চর জাগে, নদী ভরাট হওয়ার উপক্রম হয়। দ্রুত সেসব ভাঙন রোধ ও নদীতে ড্রেজিং সম্পন্ন করে পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি দিতে হবে।

৭. **পরিমিত সার ও কীটনাশক ব্যবহার করা** : আমাদের দেশে দীর্ঘদিন থেকে কৃষি কাজে অপরিমিতভাবে সার ও কীটনাশক ব্যবহারের ফলে পানি দূষণে মাছ ও কৃষি উৎপাদনের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। অপ্রয়োজনে সার ও কীটনাশক ব্যবহার করা না হলে পানি ও ভূমির গুণাগুণ অক্ষত থাকবে।

৮. **বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সদ্ব্যবহার** : দেশের পানি সম্পদকে মানুষের জীবন–জীবিকার উন্নয়নে কাজে লাগাতে হবে। একই সঙ্গে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে বৈজ্ঞানিক ধ্যান–ধারণা ও শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে। প্রযুক্তির ব্যবহারে যত্নবান হতে হবে। দেশের পানি সম্পদ সারা বছরের সকল চাহিদা পূরণ করতে পারলে দেশে কৃষি ও খাদ্য উৎপাদন ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাবে। সে কারণে প্রথমে পানির নিরাপত্তা বিধান করতে হবে, তাহলে খাদ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। এর জন্য দেশে জাতীয় পানি নীতিমালা যথাযথভাবে কার্যকর করার প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে।

বাংলাদেশের বনভূমির শ্রেণিবিভাগ

বৃক্ষরাজি যে ভূমিতে সমারোহ ঘটায় তাকে বনভূমি বলা হয়। এসব বনে কাঠ, মধু, মোম ইত্যাদি বনজ সম্পদ পাওয়া যায়। বাংলাদেশে পর্যাপ্ত বনভূমি নেই। একটি দেশের মোট আয়তনের ২০–২৫ শতাংশ বনভূমি থাকা প্রয়োজন। কিন্তু বাংলাদেশে এ সম্পদের পরিমাণ রয়েছে মাত্র ১৩ শতাংশ। জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে মানুষের ঘরবাড়ি এবং আসবাবপত্র নির্মাণে মূল্যবান কাঠের প্রয়োজন। এসব কাঠ বনভূমি থেকেই সরবরাহ করা হয়। যার কারণে এ দেশের বনভূমি ক্রমেই কমে যাচ্ছে।

মূলত জলবায়ু ও মাটির ভিন্নতার কারণে এক এক অঞ্চলে এক এক ধরনের বনের সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশের বন এলাকাকে মোটামুটি চারটি ভাগে ভাগ করা যায়– চট্টগ্রামের বনাঞ্চল, সিলেটের বন, সুন্দরবন ও ঢাকা–টাঙ্গাইল ময়মনসিংহ অঞ্চলের বনভূমি। উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য অনুসারেও বনাঞ্চলের শ্রেণিবিভাগ করা যায়, যেমন– ১. ক্রান্তীয় চির হরিৎ এবং পত্র পতনশীল বনভূমি, ২. ক্রান্তীয় পাতাঝরা বা পত্র পতনশীল বনভূমি এবং ৩. স্রোতজ (ম্যানগ্রোভ) বা গরান বনভূমি।

১. ক্রান্তীয় চিরহরিৎ এবং পত্রপতনশীল বনভূমি : বাংলাদেশের দক্ষিণ–পূর্ব ও উত্তর–পূর্ব অংশের পাহাড়ি অঞ্চলকে ক্রান্তীয় চিরহরিৎ এবং পত্রপতনশীল বনভূমি এলাকা নামে অভিহিত করা হয়। মূলত উষ্ণ ও আর্দ্রভূমির কিছু এলাকা জুড়ে বিভিন্ন প্রজাতির গাছপালা, তরুলতা, ঝোপঝাড় ও গুল্ম জন্ম নেয়। এসব গাছের পাতা একত্রে ফোটেও না, ঝরেও না। ফলে সারা বছর বনগুলো সবুজ থাকে। সে কারণেই এসব বনকে চিরহরিৎ বা চির সবুজ বনভূমি বলে। চট্টগ্রাম, খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি, বান্দরবান ও সিলেট এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এ বনভূমির পরিমাণ প্রায় ১৪ হাজার বর্গ কিলোমিটার। চাপালিশ, ময়না, তেলসুর, মেহগনি, জারুল, সেগুন, গর্জন এ বনভূমির উল্লেখযোগ্য গাছ। সিলেটের পাহাড়ে প্রচুর বাঁশ ও বেত জন্মে। পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেট অঞ্চলে রাবার চাষ হয়।

২. ক্রান্তীয় পাতাঝরা বা পত্রপতনশীল অরণ্য: বাংলাদেশের ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, গাজীপুর, দিনাজপুর ও রংপুর জেলা পাতাঝরা অরণ্যের অঞ্চল। এ বনভূমিতে বছরের শীতকালে একবার গাছের পাতা সম্পূর্ণ রূপে ঝরে যায়। শাল বা গজারি ছাড়াও এ অঞ্চলে কড়ই, বহেড়া, হিজল, শিরীষ, হরীতকী, কাঁঠাল, নিম ইত্যাদি গাছ জন্মে। এ বনভূমিতে প্রধানত শালগাছ প্রধান বৃক্ষ তাই এ বনকে শালবন হিসেবেও অভিহিত করা হয়। ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল ও গাজীপুরে এ বনভূমি মধুপুর ভাওয়াল বনভূমি নামে পরিচিত। দিনাজপুর অঞ্চলে এটিকে বরেন্দ্র অঞ্চলের বনভূমি বলা হয়।

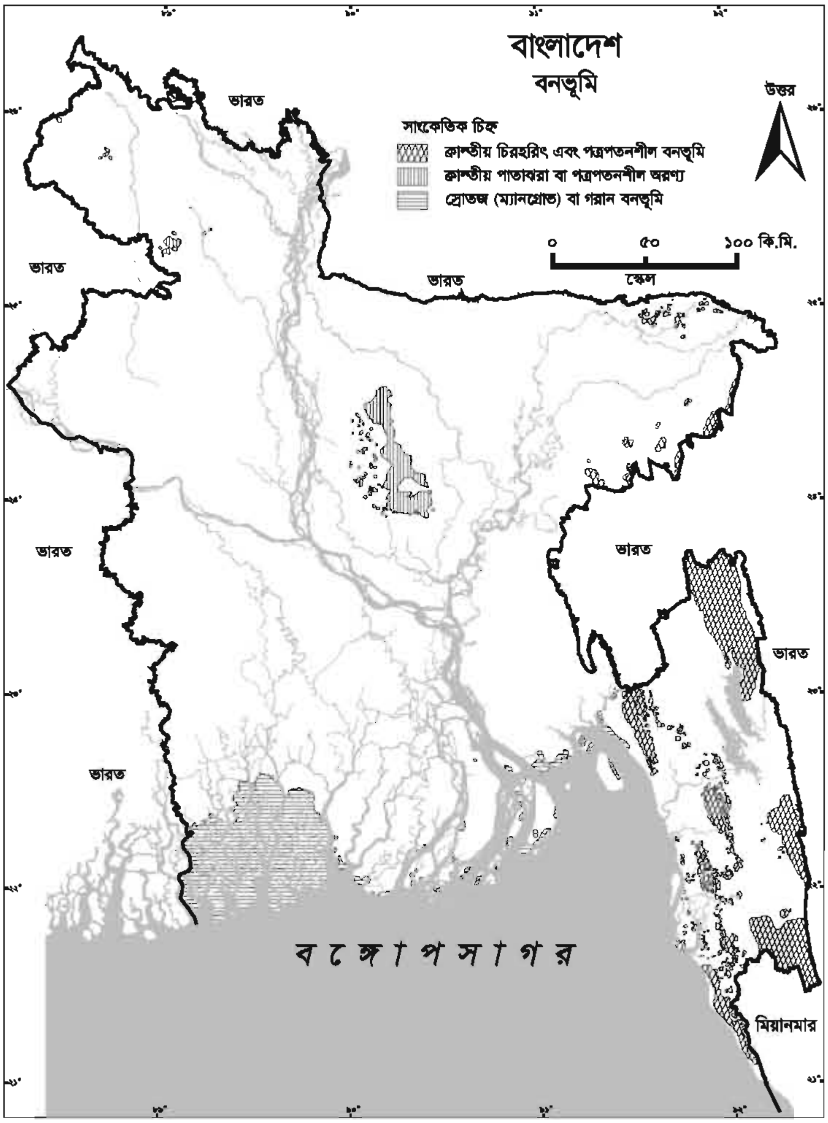
বাংলাদেশ
বনভূমি
উত্তর
সাংকেতিক চিহ্ন
ক্রান্তীয় চিরহরিৎ এবং পত্রপতনশীল বনভূমি
ক্রান্তীয় পাতাঝরা বা পত্রপতনশীল অরণ্য
স্রোতজ (ম্যানগ্রোভ) বা গরান বনভূমি
০
৫০
১০০ কি.মি.
স্কেল
ভারত
ভারত
ভারত
ভারত
ভারত
ভারত
ভারত
মিয়ানমার
বঙ্গোপসাগর

চিত্র ৫.৩ : বাংলাদেশের বনভূমির মানচিত্র

৩. স্রোতজ (ম্যানগ্রোভ) বা গরান বনভূমি : বাংলাদেশের দক্ষিণ–পশ্চিমাংশ খুলনা, নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলার উপকূলে জোয়ার ভাটার লোনা ও ভেজা মাটিতে যেসব উদ্ভিজ্জ জন্মায় তাদের স্রোতজ বা গরান বনভূমি বলা হয়। প্রধানত সুন্দরবনে এসব উদ্ভিদ বেশি জন্ম নেয়। স্যাঁতসেঁতে লোনা পানিতে সুন্দরী, গেওয়া, পশুর, ধুন্দল, কেওড়া, বাইন, গরান, গোলপাতা ইত্যাদি বৃক্ষ এ বনভূমির অন্তর্গত। বাংলাদেশে মোট ৪,১৯২ বর্গ কিলোমিটার স্রোতজ বা গরান বনভূমি রয়েছে।

বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে বনভূমি শুধু বনজ সম্পদের জন্যেই নয়, আলো, বাতাস, সবুজ-শ্যামল প্রকৃতিতে স্বাস্থ্যসম্মত জীবনের জন্যও এর গুরুত্ব অপরিসীম।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রাকৃতিক সম্পদের গুরুত্ব

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রাকৃতিক সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। ভূমি, বনভূমি, মৎস্য, খনিজ পদার্থ, সৌর তাপ, প্রাকৃতিক জলাশয় ইত্যাদি এ দেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এসব প্রাকৃতিক সম্পদকে যথাযথভাবে ব্যবহার করে দারিদ্র্য দূরীকরণ, খাদ্য নিরাপত্তা বিধান এবং উন্নত জীবনমান নিশ্চিত করা সম্ভব। প্রাকৃতিক এসব সম্পদই অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ ত্বরান্বিত করবে। বাংলাদেশের মাটি আমাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। অত্যন্ত উর্বর এই মাটিতে ফসল ফলাতে বেশি পুঁজির প্রয়োজন পড়ে না। মাটির সর্বোচ্চ ব্যবহার করে আমাদের কৃষিজ ফসল, ফুল, ফল , শাকসবজিসহ বনজ সম্পদের প্রসার ঘটাতে পারি। বাংলাদেশ স্বাধীনতার চল্লিশ বছরে তিনগুণ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পেরেছে। উন্নত প্রযুক্তি, বীজ, চাষাবাদের নিয়ম–কানুন মেনে বাংলাদেশ এই মাটিতে আরও বেশি ফসল উৎপাদন করতে পারবে। বিভিন্ন দেশি–বিদেশি ফল ফলিয়ে মানুষের পুষ্টির চাহিদা পূরণ সম্ভব। শাক–সবজির দেশীয় চাহিদা পূরণ করে বিদেশে রপ্তানি করা যেতে পারে। তবে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ, মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতির পাশাপাশি বাড়িঘর, কলকারখানা, পুল, রাস্তাঘাট, শহর–উপশহর নির্মাণে বাংলাদেশের উর্বর ভূমি হ্রাস পাচ্ছে। পরিকল্পিতভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ হিসেবে ভূমির ব্যবহার না করা হলে জাতীয় জীবনে বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে। সে কারণে বাংলাদেশে ভূমির ব্যবহার আরও বেশি পরিকল্পিতভাবে করতে হবে। আমাদের অর্থনীতিতে প্রাকৃতিক সম্পদ হিসেবে পানির গুরুত্বও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের নদ–নদী, খাল বিল, হাওড় বাঁওড়, পুকুর ইত্যাদির পানির ওপর কৃষি ও শিল্প অর্থনীতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। যোগাযোগ ব্যবস্থাও পানিপথের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। দেশের খনিজ, বনজ, সৌরসহ সকল প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যবহার করে দেশ অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হওয়ার পথে অগ্রসর হচ্ছে। দেশের জাতীয় আয়ের সিংহভাগই আসে এ সব সম্পদকে কাজে লাগানোর মাধ্যমে। দেশে যে সব শিল্প কলকারখানা গড়ে উঠেছে বা উঠছে তার পিছনে রয়েছে দেশীয় প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার। এর ফলে মানুষজন কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছে। দেশীয় চাহিদার পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে। বিদেশে রপ্তানিজাত দ্রব্যসামগ্রীও এ সব সম্পদকে ব্যবহার করেই তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নে নতুন নতুন উদ্যোগ গৃহীত হচ্ছে। প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার সেই সব উদ্যোগকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করছে। কাঁচামাল হিসেবে প্রাকৃতিক সম্পদের চাহিদা ও জোগান বাড়ছে, পণ্য উৎপাদনে প্রাকৃতিক সম্পদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। তৈরিকৃত পণ্য দিয়ে দেশীয় চাহিদা পূরণ করে বিদেশে রপ্তানি করা হচ্ছে। এর ফলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। মানুষ খাদ্যশস্য উৎপাদন, বনজ সম্পদের ব্যবহার, প্রাকৃতিক অন্যান্য সম্পদের ব্যবহারে আরও বেশি আগ্রহী ও সচেতন হচ্ছে। এভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের যথোপযুক্ত সুষ্ঠু ব্যবহার ও মানুষের নানামুখী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে দেশের অর্থনীতি দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে, মানুষ উন্নত জীবনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

কাজ

দলীয় : বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রাকৃতিক সম্পদের গুরুত্ব উল্লেখ কর।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. সৌরসম্পদ কাকে বলে?

২. জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সুবিধা কী?

৩. নদী সংরক্ষণ ধারণা তুমি কীভাবে ব্যাখ্যা করবে?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন :

১. নদীকে কেন্দ্র করে কীভাবে জনবসতির বিস্তরণ ঘটে? ব্যাখ্যা কর।

২. নদীর গতিশীলতা বজায় রাখার জন্য কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়?

৩. কৃষিজ ও বনজ সম্পদের উপর জলবায়ুর প্রভাব বিশ্লেষণ কর।

৪. প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।

৫. বাংলাদেশের উত্তর–পশ্চিমাঞ্চলে শুষ্ক মৌসুমে পানি সংকট দেখা দেওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. মাতামুহুরী নদীর উৎপত্তি স্থল কোথায়?

ক. সাইভার পর্বত

খ. লুসাই পাহাড়

গ. মানস সরোবর

ঘ. গাঙ্গোত্রী হিমবাহ

২. গজারি বৃক্ষের বৈশিষ্ট্য হলো–

i. ঋতুভেদে সকল পাতা ঝরে পড়ে

ii. এর পাতাগুলো চিরসবুজ থাকে

iii. এটি লবণাক্ত মাটিতে জন্মায়

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i

খ. i ও ii

গ. i ও iii

ঘ. ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

সজীব শিক্ষাসফরে ভারতের পূর্বাঞ্চলের একটি বনভূমিতে গিয়ে লক্ষ করে যে, সেখানকার বৃক্ষগুলো বেশ উঁচু এবং ঘন। শিক্ষক তাদের বলেন যে, বাংলাদেশের একটি অঞ্চলে এরূপ বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে জন্মায়।

৩. সজীবের দেখা বনভূমিতে কোন বৃক্ষ জন্মায়?

ক. সেগুন

খ. বহেড়া

গ. শিরীষ

ঘ. ধুন্দল

৪. বাংলাদেশের কোথায় উক্ত বনভূমির অনুরূপ বনভূমি পরিলক্ষিত হয়?

ক. টাঙ্গাইল

খ. দিনাজপুর

গ. পার্বত্য চট্টগ্রাম

ঘ. নোয়াখালী

সৃজনশীল প্রশ্ন :

১. জাহিদ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। ছুটিতে সে তার বিদেশি সহপাঠীদের সেখানকার বনভূমিতে বেড়াতে নিয়ে যায়। সেগুন, গর্জন, জারুল বৃক্ষশোভিত বনভূমিটির সৌন্দর্য তাদের মুগ্ধ করে। ফেরার পথে জাহিদ তাদের অঞ্চলটির প্রধান নদীটির তীরে নিয়ে যায় এবং বলে যে, তাদের নদীটি অফুরন্ত শক্তির উৎস।

ক. নাফ কী?

খ. ব্রহ্মপুত্রের শাখানদী সৃষ্টির কারণ ব্যাখ্যা কর।

গ. অনুচ্ছেদে বর্ণিত বনভূমিটির বৃক্ষের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর।

ঘ. জাহিদের করা মন্তব্যটির যথার্থতা তোমার পঠিত বিষয়বস্তুর আলোকে বিশ্লেষণ কর।

২. আজমল মিয়া দেশের উত্তরাঞ্চলের নদীপাড়ের বাসিন্দা ছিলেন। একটা সময় ছিল যখন তিনি মাছ শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। কিন্তু বর্তমানে নদীটির রূপ পরিবর্তিত হওয়ায় তাকে জীবিকা পরিবর্তন করতে হয়েছে। ভিটামাটি হারিয়ে তিনি নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন। তার অঞ্চলে ঋতুবিশেষে পানির চরম সংকট জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে।

ক. বঙ্গোপসাগরের তলদেশে কোন খনিজ সম্পদ আবিষ্কৃত হয়েছে?

খ. দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে প্রচুর সৌরশক্তি পাওয়া যায় কেন?

গ. আজমল মিয়ার বসবাসকৃত অঞ্চলটির নদীর রূপ পরিবর্তিত হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. অনুচ্ছেদে উল্লেখিত সংকটটি নিরসনে কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে? তোমার মতামত দাও।

ষষ্ঠ অধ্যায়

রাষ্ট্র, নাগরিকতা ও আইন

রাষ্ট্র হচ্ছে সামাজিক জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। সমাজে বসবাসরত সকল মানুষকে একটি ঐক্য সূত্রে বাঁধা এবং তাদের কল্যাণ ও সমস্যা সমাধানের জন্যই রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটে। সমাজ বিকাশের একটি স্তরে সমাজের মধ্য থেকেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঘটেছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে রাষ্ট্রকে মনে করা হতো ঈশ্বরের সৃষ্টি করা একটি প্রতিষ্ঠান। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা রাষ্ট্রকে 'সর্বজনীন কল্যাণ সাধনকারী' এবং 'মানুষের স্বাধীনতা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য অপরিহার্য' প্রতিষ্ঠান বলে ব্যাখ্যা করেছেন। রাষ্ট্র হলো নাগরিকদের জন্য। নাগরিকের সুখ ও শান্তি বিধান করার জন্য রাষ্ট্রকে অনেক কাজ করতে হয়। রাষ্ট্রের এই কাজ কতগুলো অপরিহার্য এবং কতগুলো ঐচ্ছিক। আবার রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকদেরও বেশ কিছু দায়িত্ব এবং কর্তব্য পালন করতে হয়। অন্যদিকে নাগরিক জীবনের নিরাপত্তা বিধান এবং সমাজে বিদ্যমান সমস্যাগুলো প্রতিরোধ ও প্রতিকারে আইনের বিধিবিধান আবশ্যক। এ অধ্যায়ে আমরা রাষ্ট্র, নাগরিক ও আইন সম্বন্ধে অবহিত হব।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা –

- রাষ্ট্রের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- রাষ্ট্রের কার্যাবলি ব্যাখ্যা করতে পারব;
- নাগরিকের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য ব্যাখ্যা করতে পারব;
- নাগরিক হিসেবে নিজ দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ হব;
- আইনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- আইনের উৎস ব্যাখ্যা করতে পারব;
- সুশাসনের জন্য আইনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইন ও এর প্রয়োগ বর্ণনা করতে পারব এবং এ ব্যাপারে সচেতন হব।

রাষ্ট্রের ধারণা

প্রত্যেক মানুষ কোনো না কোনো রাষ্ট্রে বসবাস করে। হঠাৎ করে কোনো রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়নি। আদিম মানুষ প্রথমে গোত্রভিত্তিক বসবাস করত। সময়ের পরিবর্তনে একসময় রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়। মানুষই রাষ্ট্র সৃষ্টি করে। রাষ্ট্রে বসবাসকারী প্রত্যেক নাগরিকেরই রাষ্ট্রের নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয়। রাষ্ট্রে বসবাসকারী জনগণকে ঐ রাষ্ট্রের নাগরিক বলা হয়। নাগরিকদের সুন্দর সুষ্ঠুভাবে বাঁচার জন্য রাষ্ট্র অনেক কাজ করে থাকে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও রাজনৈতিক তত্ত্ববিদরা রাষ্ট্রকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। অ্যারিস্টটলের মতে, 'স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনের জন্য কতিপয় পরিবার ও গ্রামের সমন্বয়ে গঠিত সংগঠনই রাষ্ট্র'। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আর. এম. ম্যাকাইভারের মতে, 'রাষ্ট্র হচ্ছে সরকার কর্তৃক প্রণীত আইন দ্বারা পরিচালিত একটি সংগঠন, যার কর্তৃত্বমূলক ক্ষমতা রয়েছে এবং যা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাসরত অধিবাসীদের ওপর বলবৎ হয়'। অধ্যাপক গার্নার রাষ্ট্রের সবচেয়ে সুস্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'রাষ্ট্র হলো বহুসংখ্যক ব্যক্তি নিয়ে গঠিত এমন এক জনসমাজ, যারা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে বসবাস করে, যা বহির্শক্তির নিয়ন্ত্রণ হতে মুক্ত এবং যাদের একটি সুসংগঠিত সরকার আছে, যে সরকারের প্রতি ঐ জনসমাজ স্বভাবতই অনুগত'।

সুতরাং, আমরা বলতে পারি, রাষ্ট্র হলো একটি ভূখণ্ডভিত্তিক সমাজ বিশেষ, যার সংগঠিত সরকার ও জনসমষ্টি রয়েছে এবং যার নিজস্ব ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠানের ওপর সার্বভৌম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত আছে।

রাষ্ট্রের উপাদান

রাষ্ট্রের ধারণা ব্যাখ্যা করলে আমরা রাষ্ট্রের চারটি উপাদান দেখতে পাই, যথা: জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, সরকার ও সার্বভৌমত্ব । প্রত্যেক রাষ্ট্রই এ চারটি উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত ।

জনসমষ্টি : রাষ্ট্রের প্রাথমিক উপাদান হচ্ছে জনসমষ্টি। জনসমষ্টি বলতে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত জনগণকে বোঝায়। রাষ্ট্র গঠনের জন্য জনসমষ্টি একান্ত অপরিহার্য। জনসমষ্টির ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ইচ্ছা এবং পারস্পরিক সম্পর্ক হতে রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে। তবে রাষ্ট্র গঠনের জন্য জনসংখ্যা কত হবে তার কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। রাজনৈতিকভাবে রাষ্ট্রের জনসংখ্যা কয়েক কোটি হতে পারে। আবার কয়েক হাজারও হতে পারে। গণচীন ও ভারতে জনসংখ্যা একশ' কোটির উপরে। অন্যদিকে স্যানম্যারিনো ও মোনাকো এ দুটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের জনসংখ্যা যথাক্রমে ৩৩২২৫ ও ৩৮ হাজার (২০১৬ সালের হিসাব অনুযায়ী)।

নির্দিষ্ট ভূখণ্ড : নির্দিষ্ট ভূখণ্ড হচ্ছে রাষ্ট্রের অপরিহার্য দ্বিতীয় উপাদান। প্রত্যেক রাষ্ট্রই একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখা দ্বারা পরিবেষ্টিত। ভূখণ্ড বলতে স্থলভাগ, সমুদ্রসীমা, আকাশসীমাও বোঝায়। রাষ্ট্রের জনগণের বসবাসের জন্য নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের উপর নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক। জনসমষ্টি ঐক্যবদ্ধ হয়ে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, সংগ্রাম ও যুদ্ধের মাধ্যমে অথবা সাংবিধানিকভাবে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। প্রতিটি রাষ্ট্রই ভূখণ্ডের সীমানাকেন্দ্রিক নিরাপত্তা বেষ্টনি গড়ে তোলে। ভূখণ্ড বড় বা ছোট হতে পারে, যেমন– রাশিয়ার আয়তন অনেক বড় আর ছোট আয়তনের রাষ্ট্র হলো– দারুস সালাম, সুইজারল্যান্ড, ব্রুনাই ইত্যাদি। ১৯৭১ সালে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ ভূখণ্ডটি পৃথিবীর মানচিত্রে সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্থান পায়। অনেক সময় রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট ভূখণ্ড বেশ কয়েকটি দ্বীপের সমষ্টিও হতে পারে, যেমন– জাপান, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি ।

কাজ

একক : বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান কোনটি এবং কেন?

সরকার : রাষ্ট্রের অপরিহার্য তৃতীয় উপাদানটি হলো সরকার। সরকার গঠনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মাধ্যমে রাষ্ট্র গঠন আংশিকভাবে সম্পন্ন হয়। রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য তিনটি বিভাগ থাকে– আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ। এ তিন বিভাগের সমন্বয়ে সরকার গঠিত হয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সাধারণতঃ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ তাদের সরকার গঠন করে। সরকার পদ্ধতি বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্ন হতে পারে। সরকার বলতে ব্যাপক অর্থে শাসকগোষ্ঠীর সকলকে বোঝায়, যারা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে। অর্থাৎ রাষ্ট্রের ক্ষমতা সরকার কর্তৃক পরিচালিত হয়। অধ্যাপক গার্নারের মতে, 'রাষ্ট্র যদি হয় জীবদেহ তবে সরকার হলো এর মস্তিষ্কস্বরূপ'।

সার্বভৌমত্ব : রাষ্ট্র গঠনের মুখ্য উপাদান সার্বভৌমত্ব বা সার্বভৌমিকতা। সার্বভৌম শব্দ দ্বারা চরম ও চূড়ান্ত ক্ষমতাকে বোঝায়। সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাষ্ট্রের গঠন পূর্ণতা পায়। এ ক্ষমতা রাষ্ট্রকে অন্যান্য সংস্থা থেকে পৃথক করে। সার্বভৌমত্ব হচ্ছে রাষ্ট্রের ঐ বৈশিষ্ট্য যার ফলে নিজের ইচ্ছা ছাড়া অন্য কোনো প্রকার ইচ্ছার দ্বারা রাষ্ট্র আইনসঙ্গাতভাবে আবদ্ধ নয়। প্রত্যেক সমাজ ব্যবস্থায় চূড়ান্ত ক্ষমতা কার্যকর করার জন্যে একটি মাত্র কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ থাকবে। আর এ ক্ষমতাই হলো সার্বভৌম ক্ষমতা। সার্বভৌমের আদর্শই হলো আইন। সার্বভৌমের আদর্শ বা আইন মানতে সকলেই বাধ্য। সার্বভৌম ক্ষমতার অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক দুইটি দিক রয়েছে। অভ্যন্তরীণ ক্ষমতা প্রয়োগের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের মধ্যকার সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা পায়। এই সার্বভৌম

ক্ষমতার ঊর্ধ্বে কোনো কর্তৃপক্ষ নেই। বাহ্যিক সার্বভৌমত্বের অর্থ হলো রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বহির্শক্তির নিয়ন্ত্রণ ও হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত থাকবে। কেবল জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ও সরকার থাকা সত্ত্বেও একটি দেশের সার্বভৌমত্ব ক্ষমতা না থাকলে তা রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচিত হবে না। যতদিন রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব বিদ্যমান থাকে ততদিন সার্বভৌমত্বের স্থায়িত্ব থাকবে। সরকারের পরিবর্তন সার্বভৌমত্বের স্থায়িত্বকে নষ্ট করে না।

সুতরাং, জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূখন্ড, সরকার এবং সার্বভৌমত্ব এ চারটি উপাদান নিয়েই রাষ্ট্র গঠিত হয়। এর যে কোনো একটি উপাদান না হলে রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না।

রাষ্ট্রের কার্যাবলি

সমাজের অঙ্গ হিসেবে রাষ্ট্র কী কাজ করে কিংবা রাষ্ট্র কী করতে পারে, আমাদের জানা দরকার। অর্থাৎ জনগণের জন্য রাষ্ট্র কী ধরনের সেবা প্রদান করে এবং এর সামর্থ্য কতটুকু এ পাঠ থেকে আমরা তা জানব। মানুষের প্রয়োজনেই রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে। মানব জীবনের সামগ্রিক কল্যাণ সাধনই রাষ্ট্রের কাজ। বিশ্লেষকদের মতে, রাষ্ট্র প্রধানত দুই ধরনের ভূমিকা পালন করে থাকে, যথা: নিয়ন্ত্রণমূলক এবং কল্যাণমূলক। এ দুই ধরনের ভূমিকার ভিত্তিতে আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যাবলিকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়, যেমন– অপরিহার্য বা মুখ্য কার্যাবলি এবং কল্যাণমূলক বা ঐচ্ছিক কার্যাবলি।

অপরিহার্য বা মুখ্য কার্যাবলি : রাষ্ট্রের অস্তিত্ব, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব এবং রাষ্ট্রে বসবাসরত জনগণের অধিকার সংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্র যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করে, সেগুলোকে অপরিহার্য বা মুখ্য কাজ বলা হয়। রাষ্ট্রের অপরিহার্য কাজগুলো নিম্নরূপ:

আর. এম. ম্যাকাইভার তাঁর *The Modern State* গ্রন্থে বলেছেন, 'আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা রাষ্ট্রের প্রাথমিক কাজ বা দায়িত্ব। নাগরিকদের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার নিশ্চয়তা থেকে রাষ্ট্র নামক সংগঠনের সৃষ্টি হয়। জনসাধারণকে আইন মেনে চলতে বাধ্য করা, সমাজের শান্তি ভঙ্গকারীদের শাস্তির বিধান করা এবং সামগ্রিক অভ্যন্তরীণ শান্তি–শৃঙ্খলা বজায় রাখা রাষ্ট্রের প্রধান কাজ। এ লক্ষ্যে রাষ্ট্র স্থানীয়, আঞ্চলিক এবং জাতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে থাকে। রাষ্ট্র আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে পুলিশ ও অন্যান্য আধা–সামরিক বাহিনী গড়ে তোলে। বাংলাদেশে পুলিশ, র‍্যাব, আনসার, গ্রাম প্রতিরক্ষা দল ইত্যাদি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কাজ করছে।

জাতীয় নিরাপত্তা, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা রাষ্ট্রের আরেকটি অপরিহার্য কাজ। দেশের ভৌগোলিক অখণ্ডতা এবং বৈদেশিক আক্রমণ থেকে দেশ রক্ষার জন্য প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠন ও পরিচালনা রাষ্ট্রের অপরিহার্য দায়িত্ব। আধুনিককালে প্রতিটি স্বাধীন রাষ্ট্রই শক্তিশালী প্রতিরক্ষা বাহিনী গড়ে তুলেছে। প্রতিরক্ষা বাহিনীর সামর্থ্য ও আধুনিকায়ন একটি রাষ্ট্রকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিশেষ সুবিধা প্রদান করে, যেমন– আমেরিকা, যুক্তরাষ্ট্র বা রাশিয়ার বিশ্বব্যাপী নেতৃত্ব প্রদানে তাদের দেশরক্ষা বাহিনীর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর সমন্বয়ে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে ওঠে।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে রাষ্ট্রকে পরিচিত করা, রাষ্ট্রীয় ভূখণ্ডে অবস্থিত সম্পদের ওপর দাবি প্রতিষ্ঠিত করা, অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন, বিভিন্ন চুক্তি সম্পাদন, আঞ্চলিক কোর্ট গঠন, বহির্বিশ্বে অর্থনৈতিক বাজার সৃষ্টি ও সম্প্রসারণ করা, বিদেশে অবস্থানরত দেশের নাগরিকদের নিরাপত্তা ও সেবা প্রদান করা ইত্যাদি হচ্ছে রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র বিষয়ক অপরিহার্য কাজ।

আইন প্রণয়ন, আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা রাষ্ট্রের মৌলিক কাজ। রাষ্ট্রীয় আইনসভা বা পার্লামেন্টের মাধ্যমে আইন প্রণীত হয়। দেশের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে জুডিসিয়াল কাউন্সিল, সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট প্রভৃতি বিচারালয়ের মাধ্যমে দেশের সুষ্ঠু বিচার ব্যবস্থা গড়ে তোলা রাষ্ট্রের আবশ্যিক কাজের মধ্যে পড়ে।

রাষ্ট্রের দৈনন্দিন কার্যাবলি সম্পাদন, নিয়ন্ত্রণ ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রত্যেক রাষ্ট্রে প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে ওঠে। এ কাঠামোয় কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ, তাদের কর্মবণ্টন ও নির্দেশ, কাজ তদারক এবং পরিচালনা করা রাষ্ট্রের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব।

অর্থ ও সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় অর্থ সংগ্রহ ও বণ্টন ব্যবস্থা গড়ে তোলা রাষ্ট্রের একটি মুখ্য কাজ। রাষ্ট্রের বিভিন্ন ধরনের কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন রয়েছে। বিভিন্ন উৎস থেকে এ অর্থ সংগ্রহ করা রাষ্ট্রের আবশ্যিক কাজ। রাষ্ট্রের অধীন বিভিন্ন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, মালিকানার ওপর খাজনা ও কর নির্ধারণ এবং তা আদায় করা ও সুষ্ঠুভাবে ব্যয় করা রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব। রাষ্ট্র বাজেট প্রণয়ন, মুদ্রা প্রবর্তন ও মুদ্রা বিনিয়োগের ব্যবস্থা, গণনা ও পরিমাপের একক নির্ধারণ এবং মূল্য নির্ধারণ করে থাকে। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালনা, মুদ্রাস্ফীতি রোধ, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখা প্রভৃতিও রাষ্ট্রের মুখ্য কার্যাবলি।

কল্যাণমূলক বা ঐচ্ছিক কার্যাবলি : বর্তমানে প্রত্যেকটি রাষ্ট্রই কল্যাণমূলক রাষ্ট্র হিসেবে নিজেদের দাবি করে। রাজনৈতিক তত্ত্ববিদরা এখন একমত যে, রাষ্ট্রের ভূমিকা শুধু আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং কর আদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত নয়। রাষ্ট্রকে অবশ্যই সমাজের সামগ্রিক উন্নতির জন্য, নাগরিকদের নৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশে কল্যাণমূলক ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। জনকল্যাণ ও উন্নয়নে রাষ্ট্রের এ কাজগুলো ঐচ্ছিক বা গৌণ কাজ। যে রাষ্ট্র অর্থনৈতিকভাবে যতবেশি উন্নত তার ঐচ্ছিক কার্যাবলি ততবেশি বিস্তৃত।

কাজ

দলীয় : রাষ্ট্রের কার্যাবলির একটি ছক তৈরি কর।

রাষ্ট্রের জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলা রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। শিক্ষিত জনগোষ্ঠী রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় সম্পদ। শিক্ষিত নাগরিক তার অধিকার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন থাকেন এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হন। এজন্য রাষ্ট্র শিক্ষা বিস্তারের প্রতি অধিক গুরুত্ব প্রদান করে এবং শিক্ষা সুবিধা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়। সরকার বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করে, নারী শিক্ষার ওপর গুরুত্বসহ বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা করে ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করে।

জনসাধারণের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় এবং বিদ্যমান বিভিন্ন বৈষম্য ও কুপ্রথা দূরীকরণে রাষ্ট্র গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ভূমিকা পালন করে। রাষ্ট্র তার নাগরিকদের স্বাস্থ্য রক্ষায় এবং অসুস্থদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে হাসপাতাল, দাতব্য চিকিৎসালয়, শিশুসদন, মাতৃমঙ্গল কেন্দ্র, পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র, দেশব্যাপী অস্থায়ী হেল্থ ক্যাম্পেইন প্রতিষ্ঠা প্রভৃতিও পরিচালনা করে। জনস্বাস্থ্য রক্ষায় বিশুদ্ধ পানীয়জলের সুব্যবস্থা, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, রোগ প্রতিরোধক ও প্রতিষেধক টিকা প্রদান প্রভৃতি সেবাও রাষ্ট্র প্রদান করে। এছাড়া যৌতুক ও বর্ণ বা গোত্রপ্রথা দূরীকরণ,

বাল্যবিবাহ রোধ এবং জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

জনগণের নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য ও পণ্য, যেমন–চাল, ডাল, আটা, ময়দা, চিনি, তেল ইত্যাদি সরবরাহ প্রক্রিয়া সচল রাখা রাষ্টের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তদুপরি খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার করার জন্য উৎপাদন ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ, কৃষিতে ভর্তুকি প্রদান, সার, বীজ, কীটনাশক সরবরাহ, সেচের ব্যবস্থা করা, খাদ্য গুদামজাতকরণ প্রভৃতি রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে স্বীকৃত। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে খাদ্যের চাহিদা অনেক বেড়ে গেছে। তাই রাষ্ট্রকে খাদ্য নিরাপত্তায় পূর্বের তুলনায় অধিক মনোযোগ দিতে হচ্ছে। বাংলাদেশ এ ক্ষেত্রে আশাব্যঞ্জক সাফল্য অর্জন করেছে।

যে কোনো রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নতি তার শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নয়ন ও প্রসারের সাথে সংশ্লিষ্ট। রাষ্ট্রে নিত্যনতুন শিল্প গড়ে তোলা, বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠায় শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের উৎসাহ ও ঋণ প্রদান, শিল্পজোন প্রতিষ্ঠা, ব্যবসায়–বাণিজ্যের প্রসার, উৎপাদিত পণ্যের বাজার সৃষ্টি ও রপ্তানির জন্য গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ভূমিকা পালন করা রাষ্ট্রের কাজ। আমদানি নির্ভর না হয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা অর্জন যে কোনো রাষ্ট্রের লক্ষ্য হওয়া উচিত। এজন্য বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত গবেষণার জন্য রাষ্ট্রকে অনেক বেশি নজর দিতে হয়। এছাড়া রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে কলকারখানা স্থাপন ও পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ এবং এর মাধ্যমে অধিক সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক কাজ।

দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, যথা: রাস্তাঘাট, সেতু, সড়ক, রেলপথ, নৌ–চলাচল, বিমান যোগাযোগ ডাক, তার ও টেলিযোগাযোগ এবং যোগাযোগের আধুনিক প্রযুক্তির সাথে সংযুক্ত থাকা রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ঐচ্ছিক কাজ। বর্তমান বিশ্বে যোগাযোগ ব্যবস্থায় ব্যাপক বিপ্লব সাধিত হয়েছে। ইন্টারনেট, নেটওয়ার্কিং ও তরঙ্গের ব্যাপক ব্যবহারের ফলে বিশ্বে পারস্পরিক যোগাযোগ অনেক বেড়ে গেছে। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ঐচ্ছিক কাজ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। সুষ্ঠু পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা রাষ্ট্রের উন্নতির জন্য অপরিহার্য।

জনগণের মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য রাষ্ট্রীয় ঐতিহ্য তুলে ধরা রাষ্ট্রের কাজ। জাতীয়তাবোধ সৃষ্টিতে দেশীয় শিল্প, গান–বাজনা, আঞ্চলিক বৈচিত্র্য রক্ষা, লোকশিল্পের সংরক্ষণ, জাদুঘর প্রতিষ্ঠা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন এবং সাংস্কৃতিক বিনিময় রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ঐচ্ছিক কাজ। জনগণের চিত্তবিনোদনের জন্য প্রয়োজনীয় মঞ্চ, খেলার মাঠ, পার্ক ও উদ্যান প্রতিষ্ঠা করা রাষ্ট্রের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

রাষ্ট্রের অতি গুরুত্বপূর্ণ ঐচ্ছিক কাজ হলো জনগণের স্বাধীনতা এবং অধিকার রক্ষা করা। রাষ্ট্র জনগণের মত প্রকাশের স্বাধীনতা, চলাচলের স্বাধীনতা, রাজনীতিতে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এ লক্ষ্যে নির্দিষ্ট সময় অন্তর রাষ্ট্র অবাধ ও সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচনের আয়োজন করে। এছাড়া জনগণের রাজনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনায় পরিবেশ সৃষ্টি, সংগঠন ও রাজনৈতিক দল গঠনের স্বাধীনতা, জনগণের বিপরীতমুখী স্বার্থের মধ্যে সমন্বয় সাধন, সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সংরক্ষণ, সমাজে দুর্নীতি প্রতিরোধ, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অধিকার সংরক্ষণ, শরণার্থীদের আশ্রয় দান ইত্যাদি রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক রাজনৈতিক কাজ।

সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য আধুনিক রাষ্ট্রসমূহ বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। রাষ্ট্রে বসবাসরত দরিদ্র, বিধবা, অনাথ ও প্রতিবন্ধীদের অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য সুবিধা প্রদান করা, বেকারদের জন্য ভাতা, বয়স্কদের জন্য বয়স্ক ভাতা, পেনশন প্রদান ইত্যাদি সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ রাষ্ট্রের কল্যাণমূলক কার্যাবলি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত।

রাষ্ট্রের বিশাল কর্মীবাহিনীকে পরিচালনা করা ও সুস্থ রাখা রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক কাজ। শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার জন্য

শ্রমনীতিমালা প্রণয়ন, ন্যূনতম সঠিক মজুরি ও কাজের সময় নির্ধারণ, কাজের পরিবেশ সৃষ্টি, বোনাস, ইন্স্যুরেন্স, পেনশন সুবিধা প্রদান, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ শ্রমিক তৈরি, কর্মরত বিদেশি শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য শ্রম অফিসার নিয়োগ প্রভৃতি রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

এছাড়া রাষ্ট্র বিবিধ উন্নয়নমূলক ও জনহিতকর কাজ সম্পাদন করে থাকে, যেমন– কৃষি ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন, বনায়ন কর্মসূচি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য ও পুনর্বাসন, দুর্ভিক্ষ ও মহামারি প্রতিরোধ, নাগরিক সুবিধা সৃষ্টি, বিদ্যুতায়ন ও জ্বালানি সরবরাহ, প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, নগরায়ণ, গ্রামীণ উন্নয়ন, কালোবাজারি রোধ, খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধ, নারী ও শিশু পাচার রোধ, অধিকার সচেতনতা সৃষ্টি ইত্যাদি বহুবিধ কাজ রাষ্ট্র সম্পাদন করে।

রাষ্ট্র একটি বৃহদাকার সংগঠন। প্রতিনিয়ত নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ রাষ্ট্রকে মোকাবিলা করতে হয়। তবে সার্বিকভাবে জনগণের কল্যাণ সাধনই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য। জনগণের চাহিদা অনুযায়ী বিশ্বের কল্যাণকামী রাষ্ট্রের মতো বাংলাদেশে রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক কাজের পরিধি দিনদিন ব্যাপক ও বিস্তৃত হচ্ছে।

নাগরিকের ধারণা

রাষ্ট্র গঠনের একটি পূর্বশর্ত হলো জনসমষ্টি। যখন একটি রাষ্ট্র পূর্ণাঙ্গভাবে আত্মপ্রকাশ করে তখন সেই জনসমষ্টি রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে বিবেচিত হয়। রাষ্ট্রের সঙ্গে এর নাগরিকের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। রাষ্ট্রের নাগরিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্যজ্ঞানের ওপর রাষ্ট্রের কার্যক্রমের সফলতা ও ব্যর্থতা নির্ভর করে। নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং কীভাবে সুনাগরিক হওয়া যায় তা আমাদের জানতে হবে।

ল্যাটিন শব্দ *Civics থেকে* Citizen বা নাগরিক শব্দটির উৎপত্তি হয়। পৌরনীতি পাঠের মূল বিষয়বস্তু হলো– নাগরিকত্ব ও রাষ্ট্র। সাধারণত নাগরিক শব্দটি দ্বারা নগরে বসবাসরত অধিবাসীকে বোঝায়। একসময়ে যারা শাসনকার্যে সরাসরি জড়িত থাকতেন, তাদেরকেই কেবল নাগরিক হিসেবে ধরা হতো। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক অ্যারিস্টটল নাগরিকের সংজ্ঞায় বলেছেন, 'সে ব্যক্তিই নাগরিক যে নগর রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব ও শাসনকার্যে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।' তিনি তাঁর ধারণায় অধিকাংশ জনগণকে নাগরিক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেননি। তাঁর মতে অধিকাংশেরই যথাযথভাবে নাগরিক অধিকার প্রয়োগ করার সামর্থ্য কিংবা অফুরন্ত সময় নেই। গ্রিক নগররাষ্ট্রে এ যুক্তিতে দাস এবং নারীদের নাগরিক হিসেবে গণ্য করা হতো না এবং তারা রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণ করতে পারত না।

বর্তমানে নগর রাষ্ট্রের স্থলে জাতীয় রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঘটেছে। আধুনিক রাষ্ট্রসমূহ আয়তনে অনেক বড়, এখানে জনসংখ্যাও বেশি এবং নাগরিক সুবিধাসমূহ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সকলেই ভোগ করে। কিন্তু এত বিপুল জনসমষ্টিকে সরাসরি শাসনকার্যে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব নয়। তাই নাগরিকত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে জনগণের শাসনকার্যে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের স্থলে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন এবং যারা রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও অন্যান্য সুবিধা ভোগ করেন এই মাপকাঠি ধরা হয়েছে। আধুনিক ব্রিটিশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হ্যারল্ড জে'লাস্কি তাঁর নাগরিকের সংজ্ঞায় বলেছেন, 'যে ব্যক্তি রাষ্ট্রের সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করে এবং রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে তাকেই নাগরিক বলা হয়।' অধ্যাপক গেটেল বলেন, 'নাগরিক হচ্ছে রাজনৈতিক সমাজের সেসব সদস্য, যারা উক্ত সমাজের প্রতি কর্তব্য পালনে বাধ্য থাকেন এবং সমাজ থেকে সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা লাভের অধিকারী হন।'

সুতরাং, নাগরিকত্ব বলতে বোঝায়, রাষ্ট্রের রাজনৈতিক অধিকার, নাগরিক সুবিধা ভোগ করা এবং রাষ্ট্রের অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে বাধ্য হওয়া। বৃহৎ অর্থে, নাগরিক হচ্ছেন তিনি, যিনি ঐ রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস

করেন এবং রাষ্ট্রের আইন, সংবিধান ও অন্যান্য নির্দেশের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেন। রাষ্ট্রের কল্যাণ সাধনে নিজের কর্মের মাধ্যমে ভূমিকা রাখেন এবং রাষ্ট্র কর্তৃক বণ্টনকৃত সকল সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করেন। রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে সকলেই সমান। বর্তমানে নারী-পুরুষ, ধর্ম, গোত্র নির্বিশেষে সকলেই নাগরিকত্ব অর্জন করতে পারে।

নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য

রাষ্ট্র যেমন নাগরিকদের বিবিধ সুযোগ-সুবিধা এবং অধিকার দিয়ে থাকে তেমনি রাষ্ট্রের প্রতিও নাগরিকদের কতগুলো দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়। অধিকার ও কর্তব্য পরস্পর নির্ভরশীল ও পরিপূরক। নাগরিকদের উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ নিম্নরূপ :

নাগরিকের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা। অর্থাৎ রাষ্ট্রের নির্দেশ মেনে চলা। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, অখণ্ডতা, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য প্রত্যেক নাগরিককে সর্বদা সজাগ এবং চরম ত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

রাষ্ট্রের প্রচলিত আইন ও সংবিধান মেনে চলা এবং আইনের প্রতি সম্মান দেখানো নাগরিকদের অন্যতম দায়িত্ব। কেউ আইন অমান্য করলে সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। স্বাভাবিক জীবনের ব্যাঘাত ঘটে। তাই সুষ্ঠু জীবনযাপন, শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষায় প্রত্যেক নাগরিককে আইন মেনে চলতে হবে।

সততা ও সুবিবেচনার সাথে ভোট দেওয়া নাগরিকের পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য। এর ফলে যোগ্য ও উপযুক্ত প্রার্থী জনপ্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হবেন। অযোগ্য ও দুর্নীতিবাজ প্রার্থীকে ভোটদানে বিরত থাকা উচিত।

রাষ্ট্রীয় আয়ের প্রধান উৎস নাগরিকদের প্রদেয় কর ও খাজনা। রাষ্ট্রের প্রশাসনিক প্রতিরক্ষা এবং উন্নয়নমূলক কাজ সম্পাদনের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন। নাগরিকদের যথাসময়ে কর প্রদান করে রাষ্ট্রীয় কাজে সহযোগিতা করতে হবে।

কাজ

দলীয় : রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্যের একটি তালিকা তৈরি কর।

রাষ্ট্রের অর্পিত দায়িত্ব অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা নাগরিকের কর্তব্য। সরকারের গৃহীত যে কোনো কাজ জনগণের কাজ। নাগরিকদের সততা, কাজে একাগ্রতা ও নিষ্ঠার ওপর সরকারের সফলতা, উন্নতি ও অগ্রগতি নির্ভর করে।

প্রতিটি শিশুই রাষ্ট্রের নাগরিক। পিতামাতা তার অভিভাবক হিসেবে কাজ করেন। তাই সন্তানদের জীবন রক্ষার জন্য বিভিন্ন প্রতিষেধক টিকাদান, সুস্থ সবল রাখা এবং নির্দিষ্ট সময়ে স্কুলে পাঠানো পিতামাতার দায়িত্ব। এতে করে সন্তান সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সুনাগরিক হয়ে গড়ে উঠবে এবং পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণে অবদান রাখবে।

প্রত্যেক নাগরিককেই দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হতে হবে। নিজস্ব সংস্কৃতি, রাষ্ট্রীয় অর্জন ও সফলতা এবং সবসময় দেশের মঙ্গল কামনা করা নাগরিকদের কর্তব্য। জাতীয় সংগীত, জাতীয় ইতিহাস, জাতীয় বীর ও মনীষীদের অবদানকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করতে হবে।

প্রত্যেক নাগরিকের একে অপরকে সহ্য করার ক্ষমতা থাকতে হবে। ভিন্ন সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা, ভিন্নমত মূল্যায়ন করা ও সম্মান করার মধ্য দিয়ে জাতীয় সংহতি অর্জন করা সম্ভব। এটা প্রত্যেককেই বিশ্বাস করতে হবে যে,

বৈচিত্র্যের মধ্যেই সৌন্দর্য নিহিত। প্রত্যেক নাগরিককেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতি এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে হবে। ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের এমনকি রাষ্ট্রের বেআইনি কোনো কাজের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো নাগরিকদের নৈতিক দায়িত্ব। তবে কোনোক্রমেই আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া যাবে না। তাহলেই সুশাসন এবং দুর্নীতিমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা হবে।

আইনের ধারণা

সাধারণভাবে আইন বলতে সামাজিকভাবে স্বীকৃত লিখিত ও অলিখিত বিধিবিধান ও রীতিনীতিকে বোঝায়। মানুষের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং সমাজে শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য অধিকাংশ মানুষই এ নিয়ম–কানুনসমূহ মেনে চলে। সুতরাং আইন হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের নিয়ম-কানুন, রীতিনীতি বা বিধিবিধান। এ অর্থে আইন মূলত দুই ধরনের– সামাজিক আইন ও রাষ্ট্রীয় আইন। সামাজিক জীবনে যে সকল বিধিবিধান বা রীতিনীতি মানুষ মেনে চলে তা হচ্ছে সামাজিক আইন। আর রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় বিভিন্ন জাতীয় নীতিমালার পরিপ্রেক্ষিতে এবং মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে কিংবা সমাজে সৃষ্ট বিভিন্ন সমস্যা প্রতিরোধে সর্বজনীনভাবে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন আদেশ–নির্দেশই রাষ্ট্রীয় আইন নামে পরিগণিত। বিভিন্ন রাজনৈতিক তত্ত্ববিদ ও আইনবিশারদগণ আইনের বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন।

টি. এইচ. গ্রীন বলেছেন, 'রাষ্ট্র কর্তৃক আরোপিত অধিকার এবং বাধ্যবাধকতাসমূহ আইন'। অধ্যাপক হল্যান্ডের মতে, 'আইন হচ্ছে মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণের কতগুলো সাধারণ নিয়ম যা সার্বভৌম রাজনৈতিক শক্তি কর্তৃক প্রণীত হয়।' আইনের একটি উৎকৃষ্ট সংজ্ঞা প্রদান করেছেন উড্রো উইলসন। তিনি বলেন, 'আইন হলো সমাজের সেইসকল প্রতিষ্ঠিত প্রথা ও রীতিনীতি যেগুলো সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত এবং যা সরকারের অধিকার ও ক্ষমতার দ্বারা বলবৎ করা হয়।'

সুতরাং সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত এবং মানুষের সামাজিক কল্যাণের জন্য গৃহীত সুনির্দিষ্ট নিয়মের সমষ্টিকেই আইন বলে।

আইনের বৈশিষ্ট্য

উপরোক্ত সংজ্ঞা থেকে আইনের যেসব বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় তা নিম্নরূপ :

১. আইন মানুষের বাহ্যিক আচরণ ও ক্রিয়াকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করে।
২. আইন হচ্ছে সার্বজনীন, তা সমভাবে রাষ্ট্রের সকলের জন্য প্রযোজ্য হয়।
৩. আইন হচ্ছে একধরনের আদেশ বা নিষেধ, যা সকলকেই মান্য করতে হয়। যারা আইন অমান্য করে তাদের সাজা পেতে হয়।
৪. আইন রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বমূলক কর্তৃপক্ষ হতে স্বীকৃত এবং আরোপিত।
৫. আইন হলো সমাজে প্রচলিত প্রথা ও রীতিনীতি।

আইনের উৎস

আইনের বিভিন্ন উৎস রয়েছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হল্যান্ড আইনের ৬টি প্রধান উৎসের কথা উল্লেখ করেছেন। এগুলো হলো :

১. প্রথা ২. ধর্ম ৩. বিচার সংক্রান্ত রায় ৪. বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা ৫. ন্যায়বোধ ও ৬. আইনসভা।

১. **প্রথা** : প্রথা হলো আইনের সবচেয়ে প্রাচীনতম উৎস। সমাজে প্রচলিত রীতিনীতি, আচার–আচরণ ও অভ্যাসই হচ্ছে সামাজিক প্রথা। এ সকল সামাজিক প্রথার আবেদন এতই বেশি যে, এগুলো অমান্য করলে সংঘাত ও বিদ্রোহের সৃষ্টি হয়। কালক্রমে এসব প্রচলিত প্রথা রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃতি পেয়ে আইনে পরিণত হয়েছে। যেমন- ব্রিটেনের অধিকাংশ আইনই প্রথা থেকে এসেছে।

২. **ধর্ম** : মানুষের ওপর ধর্মের প্রভাব অপরিসীম। প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ ঐশ্বরিক আইন অনুসরণ করে আসছে। তাই ধর্ম, ধর্মীয় অনুশাসন ও ধর্মগ্রন্থ আইনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস। ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পূণ্য ইত্যাদি মূল্যবোধ ধর্ম চিহ্নিত করেছে বলে প্রাচীন ও মধ্যযুগে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ধর্মীয় রীতিনীতি প্রভাব বিস্তার করে। ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রে ধর্মীয় বিধানই রাষ্ট্রীয় আইন হিসেবে বিবেচিত হয়। ইসলামিক রাষ্ট্রের আইন প্রধানত কুরআন ও শরিয়ার ওপর নির্ভরশীল। হিন্দু আইনও মূলত হিন্দুদের ধর্মীয় গ্রন্থ, যেমন- বেদ, গীতা, রামায়ণ প্রভৃতির ওপর নির্ভরশীল। বর্তমান যুগেও ধর্মীয় রীতিনীতি আইনরূপে গ্রহণ করে রাষ্ট্রীয় আইন প্রবর্তন করা হয়। বিবাহ, উত্তরাধিকার প্রভৃতি বিষয়ে মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায় নিজ নিজ ধর্মীয় আইন মেনে চলে।

৩. **বিচার সংক্রান্ত** : বিচারকের রায় অথবা বিচার বিভাগীয় রায়ও আইনের একটি উৎস। বিচারকালে বিচারক যদি প্রচলিত আইনের মাধ্যমে মামলার নিষ্পত্তি করতে ব্যর্থ হন তখন তিনি স্বীয় বুদ্ধি, মেধা ও প্রজ্ঞার সাহায্যে প্রচলিত আইনের সাথে সঙ্গতি রেখে আইনের নতুন ব্যাখ্যা দিয়ে বিচারের রায় প্রদান করেন। এটি একটি দৃষ্টান্ত হয়ে যায় এবং একসময় আইনে পরিণত হয়। তাই দেখা যায়, বিচারকের রায়ও আইনের একটি উৎস।

৪. **বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা** : আইনবিদদের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা বা তাদের আইন বিষয়ক গ্রন্থাবলিও আইনের উৎস হিসেবে কাজ করে। প্রখ্যাত আইনবিদদের ব্যাখ্যা, মূল্যায়ন, আলোচনা ইত্যাদি থেকে রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় আইনের সন্ধান লাভ করে। ব্রিটেনের আইন ব্যবস্থায় আইনবিদ কোক, ব্ল্যাকস্টোন,আমেরিকার কেন্ট, ইসলামি আইনের ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা (রা.) প্রমুখের অনেক অভিমতই আইনের মর্যাদা লাভ করেছে।

৫. **ন্যায়বোধ** : বিচারক যখন প্রচলিত আইনের মাধ্যমে কিংবা উপযুক্ত আইনের অভাবে ন্যায়বিধান করতে ব্যর্থ হন তখন নিজস্ব সামাজিক নীতিবোধের আলোকে ন্যায্য রায় প্রদান করেন। এরূপ নীতিবোধ দ্বারা প্রণীত আইন দেশের আইনের মর্যাদা লাভ করে। তাই ন্যায়নীতি ও ন্যায়পরায়ণতা আইনের একটি প্রকৃষ্ট উৎস।

৬. **আইনসভা** : আধুনিক রাষ্ট্রে আইনসভাই আইনের প্রধান উৎস। সকল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেরই আইনসভা বা আইন পরিষদ আছে। এ আইনসভায় দেশের জনগণের স্বার্থকে লক্ষ্য রেখে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও সংশোধন হয়ে থাকে।

এছাড়াও রাষ্ট্রীয় সংবিধান ও রাষ্ট্র প্রধানের জারিকৃত প্রশাসনিক ডিক্রি, বৈদেশিক চুক্তি, আন্তর্জাতিক আইন ও কনভেনশনের রেটিফিকেশনও আইন হিসেবে গৃহীত হয়।

সুশাসনের জন্য আইনের প্রয়োজনীয়তা

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আইনের অনুশাসন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রে আইনের অনুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে সকল নাগরিক সমানভাবে স্বাধীনতা ও রাষ্ট্র প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা পেতে পারে। কেউ কারও অধিকার ক্ষুণ্ন করতে পারে না। সাধারণভাবে আইনের অনুশাসন দুটি ধারণা প্রকাশ করে, যথা: আইনের প্রাধান্য ও আইনের দৃষ্টিতে সকলের সাম্য।

আইনের প্রাধান্য বজায় থাকলে সরকার স্বেচ্ছাচারী হতে পারে না এবং ক্ষমতার অপব্যবহার করতে সচরাচর সাহস করে না। বিনা অপরাধে কাউকে গ্রেফতার করা, বিনা বিচারে কাউকে আটক রাখা ও শাস্তি দেওয়া প্রভৃতি আইনের প্রাধান্যের

পরিপন্থি। আইনের প্রাধান্য নাগরিক স্বাধীনতার রক্ষাকবচ। সমাজে আইনের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হলে কেউ আইন অমান্য করে অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। সরকারও কারও ব্যক্তিস্বাধীনতায় অযৌক্তিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে সাহস পাবে না।

কাজ
একক : বাংলাদেশে আইনের শাসন অপরিহার্য কেন? কারণগুলো উল্লেখ কর।

আইনের দৃষ্টিতে সাম্য বলতে বুঝায় সমাজে ধনী-দরিদ্র, সবল-দুর্বল, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলেই সমান। আইনের চোখে কেউ বাড়তি সুবিধা পাবে না। সকলের জন্য একই আইন প্রযোজ্য। রাষ্ট্রে ব্যক্তি স্বাধীনতা তখনই খর্ব হয় যখন আইনের অনুশাসন থাকে না। আইনের শাসনের অভাবে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা অনেক সময় নাগরিকদের হয়রানি করে বা বিনা অপরাধে আটক করে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি না হলে আইনের শাসন কায়েম হয় না। বাংলাদেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় অগ্রগতি লক্ষ করা যাচ্ছে।

বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে চিন্তা, বিবেক ও বাকস্বাধীনতা নাগরিকের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। তথ্য প্রাপ্তির অধিকার এরই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। বাংলাদেশ সরকার ৫ এপ্রিল ২০০৯ তথ্য অধিকার আইন জারি করে। জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকারকে সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যেই এই আইন প্রণীত হয়।

পৃথিবীর বহু রাষ্ট্রেই তথ্য অধিকার আইন রয়েছে। এখানে আমাদের প্রথমে জানতে হবে তথ্য বলতে কী বুঝায়। সাধারণভাবে বলা যায় যেকোনো ধরনের রেকর্ডই তথ্য। তথ্য অধিকার আইনে তথ্য বলতে কোনো কর্তৃপক্ষের গঠন, কাঠামো ও দাপ্তরিক কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত যে কোনো স্মারক, বই, মানচিত্র, চুক্তি, তথ্য-উপাত্ত, লগবহি, আদেশ-বিজ্ঞপ্তি, দলিল, নকল কপি, পত্র, প্রতিবেদন, হিসাব বিবরণী, প্রকল্প প্রস্তাব, আলোকচিত্র, অডিভিডিও, অঙ্কিত চিত্র, ফিল্ম, ইলেকট্রনিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুতকৃত যেকোনো ইন্‌স্ট্রুমেন্ট, যান্ত্রিকভাবে পাঠযোগ্য দলিলাদি এবং ভৌত গঠন ও বৈশিষ্ট্য নির্বিশেষে সকল তথ্যবহ বস্তু বা এদের প্রতিলিপিকে বুঝানো হয়েছে। তবে দাপ্তরিক নোটশিট বা নোটশিটের প্রতিলিপি এর অন্তর্ভুক্ত হবে না।

কাজ
একক : তথ্য অধিকার আইনে তুমি কীভাবে লাভবান হয়েছ বা হবে বর্ণনা কর।

বর্তমান তথ্য অধিকার আইনে 'তথ্য কমিশন' নামে একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করা হয়েছে। তথ্য কমিশনে একজন প্রধান তথ্য কমিশনারসহ দু'জন তথ্য কমিশনার রয়েছেন। আইনে বলা হয়েছে, প্রত্যেক নাগরিকের কর্তৃপক্ষের নিকট হতে তথ্য পাওয়ার অধিকার রয়েছে এবং কর্তৃপক্ষও একজন নাগরিককে তথ্য প্রদানে বাধ্য থাকবে। আইন অনুযায়ী সরকারের কোনো মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা কার্যালয়ের সাথে সংযুক্ত বা অধীন কোনো অধিদপ্তর, পরিদপ্তর বা দপ্তরের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয়, জেলা কার্যালয় বা উপজেলা কার্যালয় তথ্য প্রদান ইউনিট হিসেবে কাজ করবে।

তথ্য অধিকার আইন অনুসারে তথ্য জানার জন্য লিখিতভাবে বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে বা ই-মেইলে আবেদন করতে হবে। যারা লেখাপড়া জানে না তাদের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সহযোগিতা প্রদান করবেন এবং আবেদনে টিপসই নিয়ে দাখিল করতে পারবেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তথ্য প্রদান না করলে তথ্য প্রদানের সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পরবর্তী ত্রিশ দিনের মধ্যে অনুরোধকারী আপিল করতে পারবেন। আবেদনকারী আপিল কর্তৃপক্ষের নিকট সুবিচার না পেলে তথ্য কমিশনের নিকট অভিযোগ পাঠাতে পারবেন। এক্ষেত্রে তথ্য কমিশনের কাজ হচ্ছে মূলত

অভিযোগ গ্রহণ করা ও সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া। তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তথ্যের সংরক্ষক বা ভাণ্ডার হয়ে উঠতে হবে। তার প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে– আবেদন প্রক্রিয়া সম্পর্কে জনগণকে জানানো, কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তথ্য প্রাপ্তির সুবিধা সৃষ্টি, তথ্যের উপযুক্ত মূল্য নির্ধারণ ও তথ্য সরবরাহে ব্যর্থতা নির্ধারণ।

সুতরাং, তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে আমাদের তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে দরিদ্র, প্রান্তিক এবং সুবিধাবঞ্চিত মানুষের উন্নয়ন নিশ্চিত করা যাবে। প্রতিটি সংস্থার কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে, সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে ও দুর্নীতি নির্মূল করা সম্ভব হবে। জনগণের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হওয়ার মাধ্যমে মানবাধিকার ও দারিদ্র্য বিমোচনে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। সর্বোপরি গণতন্ত্রের ভিত মজবুত হবে।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. 'রাষ্ট্র সামাজিক জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান।'– ব্যাখ্যা কর।

২. রাষ্ট্র গঠনের মুখ্য উপাদান কোনটি? ব্যাখ্যা কর।

৩. ওয়াদুদকে বাংলাদেশের নাগরিক বলব কোন যুক্তিতে?

৪. সুশাসনের জন্য আইনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন :

১. 'দরিদ্র, প্রান্তিক এবং সুবিধাবঞ্চিত মানুষের অধিকার সংরক্ষণে তথ্য অধিকার আইন সুফল বয়ে আনবে।– বিশ্লেষণ কর।

২. 'যে রাষ্ট্র অর্থনৈতিকভাবে যতবেশি উন্নত তার ঐচ্ছিক কার্যাবলি ততবেশি বিস্তৃত।'– উক্তিটির পক্ষে তোমার মতামত দাও।

৩. বাংলাদেশের একজন নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্রের প্রতি তোমার দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো ব্যাখ্যা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১। 'আইন হচ্ছে মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণের কতকগুলো সাধারণ নিয়ম, যা সার্বভৌম শক্তি কর্তৃক প্রণীত হয়।'–উক্তিটি কার?

ক. টি.এইচ.গ্রীন
খ. হল্যান্ড
গ. উড্রো উইলসন
ঘ. অ্যারিস্টটল

২। নাগরিকের দায়িত্ব হলো –

ক. রাস্তায় ট্রাফিক আইন মেনে চলা
খ. অধিক সংখ্যক লোককে শিল্পকারখানায় কাজে লাগানো
গ. দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা
ঘ. রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলা

৩। আইনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে–

i. মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা
ii. সকলের অধিকার সমভাবে সংরক্ষণ করা
iii. বিধিবিধান মানতে বাধ্য করা

উপরের তথ্যের আলোকে নিম্নের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

অভি ও রাফি দুই বন্ধু একদিন প্রতিবেশীর গাছ থেকে পেয়ারা পাড়তে গিয়ে ধরা পড়ে যায়। বাড়িওয়ালা দু'জনকে থানায় সোপর্দ করেন। রাফির বাবা প্রভাবশালী হওয়ায় তিনি তাকে থানা থেকে ছাড়িয়ে নেন। অভির দরিদ্র বাবা-মা অনেক মিনতি করেও অভিকে ছাড়াতে পারেননি।

৪। অভির ক্ষেত্রে আইনের অনুশাসনের যে দিকটি প্রযোজ্য হয়নি–

i. আইনের প্রাধান্য
ii. আইনের দৃষ্টিতে সাম্য
iii. আইনের সর্বজনীনতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. ii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

৫। উক্ত দিকটি সমাজে প্রতিষ্ঠিত হলে, আইনের দৃষ্টিতে–

i. ধনী-গরিব সকলেই সমান হবে
ii. সকলের জন্য আইন সমানভাবে প্রযোজ্য হবে
iii. কেউ বাড়তি সুবিধা পাবে না

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. i ও ii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন :

১। 'ক' রাষ্ট্রের জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত একজন জনপ্রতিনিধি মোবারক হোসেন শ্রমনীতি প্রণয়ন, বয়স্কভাতা ও পেনশন বৃদ্ধির জন্য আইন প্রণয়নে অংশগ্রহণ করেন। 'ক' রাষ্ট্রের সরকার ২টি নতুন হাসপাতাল, বিনামূল্যে ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য বই বিতরণ এবং বাল্যবিবাহরোধে আইন প্রণয়ন করেন।

ক. 'স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনের জন্য কতিপয় পরিবার ও গ্রামের সমন্বয়ে গঠিত সংগঠনই রাষ্ট্র ।'-উক্তিটি কার?
খ. 'নাগরিকত্ব' ধারণাটি কী? ব্যাখ্যা কর।
গ. জনাব মোবারক হোসেন কর্তৃক শ্রমনীতি প্রণয়ন রাষ্ট্রের কোন ধরনের কাজ, তা ব্যাখ্যা কর।
ঘ. অনুচ্ছেদের আলোকে 'ক' রাষ্ট্রকে কি কল্যাণমূলক রাষ্ট্র বলা যায়? উত্তরের সপক্ষে তোমার যুক্তি দাও।

২। জমিলা বেগম তার বিয়ের সময় লিখিত বিভিন্ন তথ্য জানার জন্য কাবিননামার কপি আনতে কাজি অফিসে যান। কাজি সাহেব তাকে সহযোগিতা না করে বিভিন্নভাবে হয়রানি করতে থাকেন। নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে তথ্য না পাওয়ায় তিনি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে আপিল করেন। অবশেষে তিনি প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে সফল হন।

ক. রাষ্ট্রীয় আইনের প্রধান উৎস কী?

খ. শিক্ষাবিস্তারে রাষ্ট্র অধিক গুরুত্ব প্রদান করে কেন? ব্যাখ্যা কর।

গ. জামিলা বেগম কোন আইনের সহায়তায় তার তথ্য পেলেন, ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ‘সুশাসনের ক্ষেত্রে জামিলা বেগমের সফলতা আশাব্যঞ্জক।’– মূল্যায়ন কর।

সপ্তম অধ্যায়

বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন অঙ্গ ও প্রশাসন ব্যবস্থা

আমরা ইতোপূর্বে রাষ্ট্র সম্পর্কে আলোচনা করেছি। সরকার ব্যবস্থা রাষ্ট্রের যন্ত্রস্বরূপ। সরকারের মাধ্যমে রাষ্ট্র তার কাজ করে। সরকারের কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগ বা অঙ্গ রয়েছে। সাধারণভাবে সরকার বলতে আমরা বুঝি– আইন পরিষদ, রাজনৈতিক দল, মন্ত্রিপরিষদ, শাসনকর্তা, আদালত ও পুলিশ। সামগ্রিকভাবে সরকারের তিনটি বিভাগ রয়েছে, যথা : ১. নির্বাহী বা শাসন বিভাগ, ২. আইন বিভাগ ও ৩. বিচার বিভাগ। প্রত্যেক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এ তিনটি মৌলিক বিভাগ বিদ্যমান থাকে। কেননা, সরকারের গুরুত্বপূর্ণ তিনটি কাজ হচ্ছে প্রশাসন পরিচালনা, আইন প্রণয়ন এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। প্রশাসন পরিচালনা দুই ধরনের– একটি কেন্দ্রীয় এবং অপরটি স্থানীয় শাসন। এ অধ্যায়ে আমরা বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন অঙ্গ ও প্রশাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত হব।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা –

- বাংলাদেশ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গসমূহ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারব;
- রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারব;
- জাতীয় সংসদ এবং এর ক্ষমতা ও কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারব;
- জাতীয় সংসদ শাসন বিভাগকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করে তা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশের বিচার বিভাগের ক্ষমতা ও কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারব,
- জনগণের মৌলিক অধিকার সুরক্ষা ও আইনের শাসন সংরক্ষণে বিচার বিভাগের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বিচারপতি নিয়োগ প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারব;
- বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো বর্ণনা করতে পারব;
- বাংলাদেশের স্থানীয় প্রশাসনসমূহের গঠন ও কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারব,
- বাংলাদেশের উন্নয়নে স্থানীয় প্রশাসনের গুরুত্ব মূল্যায়ন করতে পারব;
- অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হব।

পরিচ্ছেদ ৭.১ : বাংলাদেশ সরকারের অঙ্গসমূহ

নির্বাহী বা শাসন বিভাগ

রাষ্ট্রের শাসনকার্য তথা নিত্যদিনকার প্রশাসনিক ও দাপ্তরিক কাজ পরিচালনা, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং রাষ্ট্রের সার্বিক সিদ্ধান্ত এবং সুবিধাসমূহ বাস্তবায়ন করে যে বিভাগ তাকে নির্বাহী বা শাসন বিভাগ বলে। বিস্তৃত অর্থে রাষ্ট্রপ্রধান থেকে শুরু করে মন্ত্রিসভা, আমলা, নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, কূটনীতিক, দাপ্তরিক কর্মকর্তা এমনকি গ্রাম্য চৌকিদারসহ সকল প্রশাসনিক কর্মচারীদের নিয়ে নির্বাহী বা শাসন বিভাগ গঠিত।

আইন বিভাগ

সরকারের তিনটি বিভাগের একটি হলো আইন বিভাগ। আইন বিভাগ আইন প্রণয়ন এবং প্রয়োজনবোধে প্রচলিত আইনের সংশোধন বা রদবদল করে থাকে। আইন বিভাগের একটি অংশ হলো আইনসভা বা পার্লামেন্ট। আইনসভা আইন প্রণয়ন করে। নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের নিয়ে কিংবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে মনোনীত সদস্যদের নিয়ে এটি গঠিত হয়। আইনসভা প্রণীত আইন রাষ্ট্রপ্রধানের সম্মতি লাভের পর কার্যকর হয়। প্রত্যেক রাষ্ট্রের আইনসভা রয়েছে। এসব আইনসভা বিভিন্ন নামে পরিচিত। বাংলাদেশের আইনসভার নাম জাতীয় সংসদ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভা কংগ্রেস আর ব্রিটেনের আইনসভা হলো পার্লামেন্ট। অনেক মুসলিম রাষ্ট্রের আইনসভা মজলিশ নামে পরিচিত। কোনো দেশের আইনসভা এক কক্ষবিশিষ্ট আবার কোনো দেশের আইনসভা দ্বিকক্ষবিশিষ্ট হয়ে থাকে। দ্বি–কক্ষবিশিষ্ট আইনসভায় উচ্চ পরিষদ ও নিম্ন পরিষদ থাকে। বাংলাদেশের আইনসভা অবশ্য এক কক্ষবিশিষ্ট। ভারত, যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের আইনসভা দ্বি–কক্ষবিশিষ্ট।

বিচার বিভাগ

সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব। সরকারের যে বিভাগ আইন অনুসারে বিচার কাজ পরিচালনা করে থাকে তাকে বিচার বিভাগ বলে। আইন ভঙ্গকারীকে শাস্তি প্রদান, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং নাগরিকের ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকার রক্ষা বহুলাংশে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল। রাষ্ট্রের সকল আদালত ও বিচারক নিয়ে বিচার বিভাগ গঠিত হয়।

১. নির্বাহী বিভাগের ক্ষমতা

রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা

পদমর্যাদায় রাষ্ট্রপতি সবার উপরে। সংবিধান অনুযায়ী তিনি রাষ্ট্রের প্রধান। সবার উর্ধ্বে তিনি স্থান লাভ করেন। সংবিধান ও আইন অনুযায়ী তাঁকে প্রদত্ত সকল দায়িত্ব ও ক্ষমতা তিনি প্রয়োগ করেন। সংসদ প্রণীত আইন রাষ্ট্রপতি অনুমোদন করেন।

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যাবলি

সংসদীয় ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি নিয়মতান্ত্রিক প্রধান। প্রজাতন্ত্রের সকল কাজ তাঁর নামে পরিচালিত হয়। তাঁর হাতে কোনো নির্বাহী ক্ষমতা নেই। দেশের সরকার গঠন, শাসন পরিচালনা, আইন প্রণয়ন এবং অর্থ, বিচার, প্রতিরক্ষা ও কূটনীতি বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ কাজ তিনি সম্পাদন করেন। রাষ্ট্রপতির কার্যাবলি নিম্নে আলোচনা করা হলো–

১. **প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ ও শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা ও কার্যাবলি :** সংসদ নির্বাচনের পর রাষ্ট্রপতি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁর পছন্দমতো মন্ত্রীদের নিয়ে সরকার গঠন করেন। প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি কারও পরামর্শ গ্রহণ করেন না। রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীদের নিয়োগ ও তাঁদের দপ্তর বণ্টন করেন। তিনি অ্যাটর্নি জেনারেল, প্রধান নির্বাচন কমিশনার, মহাহিসাব রক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ও অন্য বিচারকবৃন্দ, রাষ্ট্রদূত ও হাই কমিশনারদের নিয়োগ দান করেন।

কাজ

দলীয় : রাষ্ট্রপতির কার্যাবলির একটি ছক তৈরি কর।

২. **সংসদ বিষয়ক ক্ষমতা :** রাষ্ট্রপতি সংসদ আহ্বান করেন। নতুন সংসদের প্রথম অধিবেশনে ও নতুন বছরের অধিবেশনের সূচনায় রাষ্ট্রপতি সংসদে ভাষণদান করেন। রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর সংসদে আলোচনা

হয় । সময়ে সময়ে রাষ্ট্রপতি সংসদে বাণী প্রেরণ করেন। তিনি সংসদ মুলতবি রাখতে পারেন এবং প্রধানমন্ত্রীর লিখিত পরামর্শে তিনি সংসদ ভেঙ্গে দিতে পারেন।

৩. **অধ্যাদেশ জারির ক্ষমতা :** সংসদ ভেঙ্গে গেলে বা অধিবেশন না থাকলে কোনো বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হলে রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ জারি করতে পারেন। এ অধ্যাদেশ সংসদ প্রণীত আইনের মতো ক্ষমতাসম্পন্ন।

৪. **প্রধান বিচারপতি নিয়োগ ও বিচার সংক্রান্ত কাজ :** রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ দেন। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি কারও পরামর্শ গ্রহণ করেন না। সুপ্রিম কোর্টের অন্য বিচারপতিগণও রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন।

৫. **ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষমতা :** রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা রয়েছে যে কোনো দণ্ড মওকুফ, স্থগিত বা হ্রাস করবার। কোনো আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত যে কোনো দণ্ড তিনি মার্জনা করতে পারেন।

৬. **অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা ও কাজ :** সরকারি ব্যয় সংক্রান্ত কোনো বিল সংসদে উত্থাপন করতে হলে তাতে রাষ্ট্রপতির সুপারিশ লাগে। প্রয়োজনে রাষ্ট্রপতি সংযুক্ত তহবিল থেকে ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থা করতে পারেন।

৭. **প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত ক্ষমতা :** বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বিভাগসমূহের সর্বাধিনায়কত্ব রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত। তিনি বহির্আক্রমণ মোকাবিলার জন্য যে কোনো প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

রাষ্ট্রপতির জরুরি ক্ষমতা

রাষ্ট্রপতি যদি বুঝতে পারেন যে, যুদ্ধ, বহিঃশত্রুর আক্রমণ বা অভ্যন্তরীণ গোলযোগের কারণে বাংলাদেশ বা এর কোনো অংশের নিরাপত্তা বা অর্থনৈতিক জীবন বিপদের সম্মুখীন হয় তাহলে তিনি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন। জরুরি অবস্থাকালে সংবিধানের কিছু বিধান ও মৌলিক অধিকারসমূহ স্থগিত থাকে।

প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা

রাষ্ট্রপতি সংসদের অধিকাংশ সদস্যের আস্থাভাজন সাংসদকেই (সংসদ সদস্য) প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন। বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রী হলেন সরকার প্রধান। তিনি সরকারের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। প্রধানমন্ত্রী সংসদ নেতা ও মন্ত্রিসভার প্রধান। তিনিই মন্ত্রিসভা গঠন করেন। প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করলে বা সংসদের আস্থা হারালে সরকারের পতন ঘটে। প্রধানমন্ত্রীকে কেন্দ্র করে শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হয়।

সংসদীয় ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা অনেক উপরে। প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হলেও রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেন। প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিসভার মূলস্তম্ভ। তিনি অত্যন্ত সম্মানজনক পদমর্যাদার অধিকারী। সংবিধান অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী তাঁর শাসন পরিচালনার জন্য সংসদের কাছে দায়ী থাকেন।

প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলি

১. **শাসন বিষয়ক ও নির্বাহী ক্ষমতা :** প্রধানমন্ত্রী পুরো শাসন ব্যবস্থায় নেতৃত্ব প্রদান করেন। সকল গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত প্রধানমন্ত্রী গ্রহণ করেন। সকল নির্বাহী ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির নামে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রীদের নিয়োগ ও তাঁদের দপ্তর বণ্টন করেন। বিচার, অর্থ, পররাষ্ট্র এবং শাসন

বিষয়ক সকল কাজ প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ও মতামত অনুযায়ী পরিচালিত হয়। প্রধানমন্ত্রী উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়োগ করেন।

২. **আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা :** আইন প্রণয়নে প্রধানমন্ত্রী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি জাতীয় সংসদে সরকারি বিলের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। প্রধানমন্ত্রীকে কেন্দ্র করে সংসদের আইন প্রণয়ন বিষয়ক কার্যাবলি পরিচালিত হয়।

৩. **সংসদ পরিচালনায় প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা :** প্রধানমন্ত্রী সংসদের নেতা। তিনি সংসদের সাফল্যজনক সুষ্ঠু পরিচালনায় কার্যকর ভূমিকা পালন করেন। বিরোধী দলের আস্থা অর্জন ও সহযোগিতা পেতে তিনি নেতৃত্বদান করেন। সংসদে সকল সদস্যের অধিকার সংরক্ষণে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব অনেক। রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে সংসদ আহ্বান, স্থগিত বা ভেঙে দেন।

৪. **অর্থ বিষয়ক ক্ষমতা :** প্রধানমন্ত্রী আর্থিক বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী। তাঁর পরামর্শ ও নির্দেশক্রমে অর্থমন্ত্রী বাজেট প্রণয়ন ও সংসদে তা উপস্থাপন করেন। বাজেটে প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক নীতির প্রতিফলন ঘটে। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহে অর্থ মঞ্জুরি প্রদান করেন।

কাজ

দলীয় : প্রধানমন্ত্রী কেন নির্বাহী প্রধান উল্লেখ কর।

দলীয় : প্রধানমন্ত্রীর কার্যাবলির একটি ছক তৈরি কর।

৫. **রাষ্ট্রীয় কাজের সমন্বয়ে প্রধানমন্ত্রী :** রাষ্ট্রীয় সকল কাজের সমন্বয় প্রধানমন্ত্রী করে থাকেন। তিনি যেহেতু প্রশাসনের কেন্দ্রে অবস্থান করেন তাই সকল মন্ত্রণালয়, দপ্তর ও অধিদপ্তরের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধনে তাঁর নেতৃত্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তিনি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় সভাপতিত্ব করেন।

৬. **জাতির মুখপাত্র হিসেবে প্রধানমন্ত্রী :** প্রধানমন্ত্রী জাতির মুখপাত্র হিসেবে কাজ করেন। বাংলাদেশকে বিশ্ব দরবারে উপস্থাপন এবং দেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। যেকোনো জাতীয় সংকট সম্পর্কে দেশবাসীকে অবহিত করেন। দেশের হয়ে বিবৃতি ও বক্তৃতা দেন।

৭. **দলের নেতা :** গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী সরকারি দলের নেতা। সংসদ ও সংসদের বাইরে দলের নীতি নির্ধারণ ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখেন। দলীয় নেতা হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী ভূমিকা রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও বিরোধী দলের সাথে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক স্থাপন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সুতরাং প্রধানমন্ত্রী দেশের শাসন পরিচালনা, আইন প্রণয়ন, অর্থ ব্যবস্থার তদারকি ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষাসহ সর্বক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয় ভূমিকা পালন করেন। তিনিই সংসদ নেতা, মন্ত্রিসভার নেতা। তদুপরি শাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু।

২. আইন বিভাগ

সরকারের তিনটি বিভাগের একটি আইন বিভাগ। অন্য দুটি হলো শাসন ও বিচার বিভাগ। আইন বিভাগের প্রধান কাজ হলো দেশের জন্য নতুন আইন প্রণয়ন ও পুরনো আইন পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন করা। আইন বিভাগের একটি অংশ হলো আইনসভা। আইনসভা নির্বাচিত এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে মনোনীত সদস্যদের নিয়ে গঠিত। এটি আইন প্রণয়ন করে। আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইন রাষ্ট্রপ্রধানের সম্মতি লাভের পর কার্যকর হয়।

জাতীয় সংসদের ক্ষমতা ও কার্যাবলি

বাংলাদেশের আইনসভার নাম ‘জাতীয় সংসদ’। জাতীয় সংসদ আইন বিভাগের একটি প্রধান প্রতিষ্ঠান। সংসদ প্রণীত আইন রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভের পর কার্যকর হয়। আইন বিভাগ সরকারের একটি অংশ।

সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী অনুসারে জাতীয় সংসদ মোট ৩৫০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। এদের মধ্যে ৩০০ জন জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যেমে নির্বাচিত হবেন। ৫০ টি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত। সংরক্ষিত আসন ছাড়াও নারীরা সাধারণ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন। সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে সদস্যদের ভোটে একজন স্পিকার ও একজন ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হবেন। সংসদের মেয়াদ ৫ বছর।

বাংলাদেশের সংবিধানে দ্বাদশ সংশোধনী (১৯৯১) এনে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর ফলে বাংলাদেশে আইন প্রণয়ন, শাসন বিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ, অর্থ-সংক্রান্ত তদারকি, নির্বাচন ইত্যাদি ক্ষেত্রে সংসদের ক্ষমতা ও কার্যাবলি অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। সংসদের বিভিন্ন রকম ক্ষমতা ও কার্যাবলি সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১. **আইন প্রণয়ন ক্ষমতা** : সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নামে একটি আইনসভা থাকবে এবং এর ওপর প্রজাতন্ত্রের আইন প্রণয়ন ক্ষমতা ন্যস্ত হবে। সংবিধান অনুযায়ী সংসদ যে কোনো নতুন আইন প্রণয়ন ও প্রচলিত আইন পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন করতে পারে। সংসদ আইনের মাধ্যমে যে কোনো সংস্থা বা কর্তৃপক্ষকে আদেশ প্রদান, বিধি, উপবিধি ও প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা দিতে পারে। সংসদ প্রণীত আইনে রাষ্ট্রপতি ১৫ দিনের মধ্যে সম্মতি প্রদান করবেন।

২. **সরকার গঠন বিষয়ক ক্ষমতা** : সরকার গঠনে সংসদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সংসদের আস্থাভাজন ব্যক্তিই প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন এবং তিনি মন্ত্রিসভা গঠন করেন। প্রধানমন্ত্রী সংসদের আস্থা হারালে সরকারের পতন হয়।

কাজ

একক : জাতীয় সংসদের কার্যাবলির একটি তালিকা তৈরি কর।

৩. **অর্থ-সংক্রান্ত ক্ষমতা** : রাষ্ট্রের অর্থ কীভাবে ব্যয় হবে তার ওপর সংসদ দৃষ্টি নিবন্ধ রাখে। সংসদের অনুমোদন ও কর্তৃত্ব ব্যতীত কোনো প্রকার ব্যয় করা যায় না। আবার কোনো কর আরোপ বা কর সংগ্রহ করতেও সংসদের অনুমতি নিতে হয়। প্রত্যেক অর্থ বছরে সরকার সংসদে বাজেট উপস্থাপন করে। সংসদ অনুমোদিত বাজেট অনুযায়ী সরকারকে চলতে হয়। সংযুক্ত তহবিলের ব্যয়সমূহের ওপরও সংসদে আলোচনা হয়। মোটকথা রাষ্ট্রীয় ও সরকারি সকল ব্যয় সংসদের সম্মতির ভিত্তিতে করতে হয়।

৪. **বিচার বিষয়ক ক্ষমতা** : সংসদ সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসন করতে পারে। সংবিধান লঙ্ঘন, গুরুতর অপরাধ, দৈহিক ও মানসিক অসুস্থতা ও অক্ষমতার জন্য সংসদ রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করতে পারে। প্রয়োজনে স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার ও ন্যায়পালকে অপসারণ করার ক্ষমতাও সংসদের রয়েছে। এ জাতীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিচার সংক্রান্ত কাজ সংসদ পরিচালনা করে।

৫. **নির্বাচন সংক্রান্ত কাজ** : জাতীয় সংসদ নির্বাচন, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার, ন্যায়পাল ইত্যাদি পদের নির্বাচনি ক্ষমতা জাতীয় সংসদের উপর ন্যস্ত। সংসদের বিভিন্ন কমিটি নির্বাচন করার ক্ষমতাও সংসদের রয়েছে।

৬. **সংবিধান সংরক্ষণ ও সংশোধন** : সংবিধানের আমানতদার হিসেবে সংসদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সংবিধানের যে কোনো সংশোধনীও সংসদে উত্থাপিত ও গৃহীত হয়।

৭. **অন্যান্য ক্ষমতা** : সুপ্রিম কোর্ট ব্যতীত অন্যান্য আদালত প্রতিষ্ঠার জন্য সংসদ আইন প্রণয়ন করতে পারে। যুদ্ধ ঘোষণা ও আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুমোদন করার ক্ষমতাও সংসদের। স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত বিধি ও প্রবিধান সংসদ প্রণয়ন করে।

জাতীয় সংসদ কর্তৃক শাসন বিভাগ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়। এ নিয়ন্ত্রণ আইন বিভাগ দ্বারা কার্যকর করা হয়। প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রিসভাকে শাসন সংক্রান্ত সকল কাজের জন্য সংসদের কাছে দায়ী থাকতে হয়। সরকার সংসদের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য। সংসদ সরকারের যে কোনো ভালো কাজের যেমন প্রশংসা করতে পারে, তেমনি সরকারের যে কোনো মন্দ কাজের সমালোচনাও করতে পারে। সরকারকে সকল শাসন সংক্রান্ত কাজের জন্য সংসদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাবের প্রতি মনোযোগ দিতে হয়। সংসদীয় ব্যবস্থায় সরকারের ওপর সংসদের নিয়ন্ত্রণ থাকে। সংসদ মুলতবি প্রস্তাব, নিন্দা প্রস্তাব, প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রীদের প্রতি প্রশ্ন বা অনাস্থা প্রস্তাবের মাধ্যমে শাসন বিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। সংসদ সদস্যদের আস্থা হারালে যে কোনো মন্ত্রী এমনকি প্রধানমন্ত্রীও পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের অর্থ হলো, সম্পূর্ণ মন্ত্রিসভার পদত্যাগ। এরূপ অবস্থা হলে দেশে আবার নতুন করে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

৩. বাংলাদেশের বিচার বিভাগের ক্ষমতা ও কার্যাবলি

বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনতা বাংলাদেশ সংবিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ন্যায় ও নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশের বিচার বিভাগ সুসংগঠিত ও সুপরিচালিত। বাংলাদেশ সংবিধান অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্ট সংবিধান বহির্ভূত বিধানকে অবৈধ ঘোষণা করে শাসনতন্ত্রকে সুনির্দিষ্ট গতিপথে পরিচালিত করতে সাহায্য করে। বাংলাদেশের বিচার বিভাগ নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের মাধ্যমে আইনের অনুশাসনকে অক্ষুণ্ণ এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সজীব রাখে।

বিচার ব্যবস্থা একটি দেশের ন্যায়বিচারের মানদণ্ড। বিচার বিভাগ ন্যায় ও নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দক্ষ শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলে। সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হিসেবে এর ক্ষমতা ও কার্য পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। বিচার বিভাগের কাজ হলো–

১. **ন্যায়বিচার করা :** বিচার বিভাগের প্রধান কাজ প্রচলিত আইন অনুযায়ী অপরাধের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তি এবং আইন অমান্যকারীর বিচার করা। এক্ষেত্রে বিচারকগণ স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে আইন অনুযায়ী ন্যায়নীতির ভিত্তিতে বিচারকার্য সম্পন্ন করেন। বিচার বিভাগ সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে। দেওয়ানি, ফৌজদারি প্রভৃতি মামলায় সত্য ঘটনা অনুসন্ধানের মাধ্যমে বিচার বিভাগ অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করে।

২. **আইন তৈরি :** সাধারণত আইনের ব্যাখ্যা প্রদান ও প্রয়োগের দায়িত্ব বিচার বিভাগের ওপর ন্যস্ত থাকে। এছাড়া বিচারকগণ নতুন আইন সংযোজন করে থাকেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিচার করতে গিয়ে উপযুক্ত আইন খুঁজে পাওয়া না গেলে বিচারকগণ ঐকমত্যের ভিত্তিতে বিচারের রায় প্রদান করেন যা আইন হিসেবে বিবেচিত হয়।

৩. **মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ :** জনগণের মৌলিক অধিকার সংবিধানে লিপিবদ্ধ থাকে। এ অধিকার সংরক্ষণের দায়িত্ব বহুলাংশে আদালতের ওপরই ন্যস্ত হয়।

৪. **আইনের ব্যাখ্যা প্রদান ও প্রয়োগ :** বিচার বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ কাজ আইনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা এবং সেই ব্যাখ্যা অনুযায়ী আইন প্রয়োগ করা। আইন বলতে সাধারণত সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইন, শাসনতান্ত্রিক আদেশ বা অর্ডার এবং বিভিন্ন প্রথাগত আইনকে বোঝানো হয়।

৫. **সংবিধান রক্ষা করা :** সংবিধানের অভিভাবক হিসেবে বিচার বিভাগ কাজ করে। বিচার বিভাগ সংবিধানের চূড়ান্ত ব্যাখ্যা দেয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থায় বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার গুরুত্ব অপরিসীম; সেখানে সুপ্রিম কোর্ট প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী।

কাজ

দলীয় : বাংলাদেশের বিচার বিভাগের কার্যাবলির একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

৬. **বিরোধের নিষ্পত্তি** : রাষ্ট্রের বিভিন্ন সংস্থা, প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বিভিন্ন সময় বিরোধ দেখা যায়। বিচার বিভাগ এ ধরনের বিরোধের মীমাংসা করে থাকে।

৭. **শাসন বিভাগকে পরামর্শ প্রদান** : শাসন বিভাগের অনুরোধে বিচার বিভাগ প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করে থাকে।

৮. **বিবিধ কার্যাবলি** : বিচার বিভাগ বিদেশি নাগরিকদের নাগরিকত্ব দান, অভিভাবকত্ব নিরূপণ, নাবালকের সম্পত্তির তত্ত্বাবধানসহ বিবিধ কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে।

অধিকার সুরক্ষা ও আইনের শাসন সংরক্ষণে বিচার বিভাগের ভূমিকা

বিচার বিভাগ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নাগরিকদের স্বাধীনতা রক্ষার ব্যবস্থা করে থাকে। ব্যক্তির মৌলিক অধিকার যাতে ক্ষুণ্ন না হয় সেজন্য বিচার বিভাগ প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। অন্যভাবে বলা যেতে পারে, বিচার বিভাগ ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা করে। নাগরিকদের নাগরিক অধিকার ও সংবিধানে স্বীকৃত মৌলিক অধিকার রক্ষা করার মাধ্যমেই এ বিভাগ ব্যক্তি স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে। এ অধিকার সংরক্ষণ করতে গিয়ে বিচার বিভাগকে কয়েকটি বিশেষ হুকুমনামা পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। এ পদ্ধতিগুলো হচ্ছে: ১. ম্যানডেমাস রিট, ২. সার্টিওয়ারি রিট, ৩. প্রহিবিশন রিট, ৪. হেবিয়াস কর্পাস রিট, ৫. কোওয়ারেন্টো রিট ইত্যাদি। এ সকল রিট (Writ) আবেদন বা হুকুমনামাগুলো জারি করার ক্ষমতা বিচার বিভাগের রয়েছে। এগুলোর মাধ্যমে অধিকারবঞ্চিত যে কোনো ব্যক্তির আবেদনক্রমে বিচার বিভাগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে বিচারের জন্য আদালতে হাজির হবার নির্দেশ দিতে পারে।

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের বিচার বিভাগ মানবাধিকার সংরক্ষণে স্বপ্রণোদিত হয়ে বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ রিট জারি করেছে, যা জনমহলে বেশ প্রশংসিত হয়েছে।

বিচারপতি নিয়োগ ব্যবস্থা

বিচারপতি নিয়োগ পদ্ধতি বাংলাদেশের বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার প্রথম পদক্ষেপ। বিভিন্ন দেশের উচ্চ বিচারালয়ের বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, যথা– জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচন, আইনসভা কর্তৃক নির্বাচন, শাসন বিভাগের প্রধান কর্তৃক নিয়োগ প্রভৃতি। বাংলাদেশ সংবিধানে বিচারকদের নিয়োগ সংক্রান্ত যোগ্যতার শর্তাবলি উল্লেখ করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতি কতিপয় শর্ত পূরণ সাপেক্ষে প্রধান বিচারপতির পরামর্শক্রমে বিচারকদের নিয়োগ প্রদান করেন। এটাই হলো এদেশে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। অন্যান্য দুটি পদ্ধতিতে বিভিন্ন জটিলতা থাকায় বর্তমানে অধিকাংশ রাষ্ট্র সাধারণত শাসন বিভাগের প্রধান কর্তৃক বিচারপতি নিয়োগ করে থাকে। প্রধান বিচারপতি ও উচ্চ আদালতের বিচারপতিদের নিয়োগ সাধারণত রাষ্ট্রপতি দিয়ে থাকেন। তবে অধস্তন আদালতসমূহের বিচারকগণ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ প্রাপ্ত হন।

পরিচ্ছেদ ৭.২: বাংলাদেশের প্রশাসন ব্যবস্থা

একটি দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা ও সমৃদ্ধির জন্য সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। প্রশাসনিক শিথিলতা নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির জন্ম দিতে পারে। প্রশাসনিক কার্যক্রমের যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন প্রশাসনের সাথে জনগণের সহযোগিতা। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। স্বাধীনতার পূর্বে বাংলাদেশ ছিল পাকিস্তানের অধীনে একটি প্রদেশ। এদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থা ছিল প্রাদেশিক। পাকিস্তান শাসনামলে এদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থা গণমুখী হয়ে ওঠেনি। স্বাধীনতার পর ব্যাপক উন্নয়নমূলক কাজের পরিপ্রেক্ষিতে পুরাতন প্রশাসনিক ব্যবস্থা অনেকটা যুগোপযোগী হয়ে ওঠে। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতির পরিবর্তে এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা

প্রবর্তিত হয়। বর্তমান বাংলাদেশের প্রশাসনিক স্তরগুলো হলো: ১. কেন্দ্র, ২. বিভাগ, ৩. জেলা ও ৪. উপজেলা এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ বা অধিদপ্তর নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসন ব্যবস্থা গঠিত। শাসন সংক্রান্ত এক বা একাধিক বিভাগ একটি মন্ত্রণালয়ের ওপর ন্যস্ত। একটি মন্ত্রণালয়ের প্রধান হলেন মন্ত্রী। আর সচিব হচ্ছেন মন্ত্রণালয়ের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা। প্রতিটি বিভাগের বা মন্ত্রণালয়ের সাথে সংযুক্ত রয়েছে বিভাগ বা অধিদপ্তর। অধিদপ্তরের প্রধান হলেন মহাপরিচালক। এছাড়া এসব অধিদপ্তরের অধীনে পূর্ণ বা আধা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, বোর্ড ও কর্পোরেশন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সরকার কর্তৃক গৃহীত আইন, নীতিমালা, কর্মসূচি কিংবা প্রকল্পের বাস্তবায়ন এসব সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। সরকারি কর্মকর্তা তথা আমলাদের প্রশাসন পরিচালনার ভিত্তি হলো সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের জ্ঞান এবং প্রশাসনিক কাজ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ।

কেন্দ্রীয় প্রশাসন

সেক্রেটারিয়েট বা সচিবালয় বাংলাদেশ প্রশাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রে অবস্থিত যা শাসন ব্যবস্থার স্নায়ুকেন্দ্র স্বরূপ। সরকারি যাবতীয় সিদ্ধান্ত সর্বপ্রথম সচিবালয়ে গৃহীত হয়। সাধারণত বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও তার বিভাগসমূহের অফিসগুলোকে যৌথভাবে সচিবালয় বলে। প্রধানমন্ত্রীর পছন্দানুযায়ী প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে একজন মন্ত্রী নিযুক্ত হন। মন্ত্রী হলেন একজন রাজনৈতিক ব্যক্তি ও মন্ত্রণালয়ের প্রধান। মন্ত্রণালয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা তথা প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন একজন সচিব। সরকারি কর্ম কমিশন কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে সেবা, যোগ্যতা, প্রশিক্ষণ এবং নির্দিষ্ট পদসোপানের মধ্য দিয়ে তিনি সচিব পদে উন্নীত হন। মন্ত্রণালয়ের যাবতীয় কাজের ভার সচিবের ওপর ন্যস্ত থাকে। তিনি মন্ত্রীকে যাবতীয় কাজে সহায়তা করেন। মন্ত্রণালয় পরিচালনার ব্যাপারে মন্ত্রী সচিবের নিকট থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ করেন। সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিষয়ে সচিব মন্ত্রীর সহচর হিসেবে কাজ করেন।

বাংলাদেশের প্রশাসন আমলাতান্ত্রিক। প্রশাসনিক কাঠামোর পদসোপান অনুযায়ী সর্বনিম্ন স্তরের প্রশাসনিক কর্মকর্তা হচ্ছেন সহকারী সচিব। ধাপের ক্রমানুসারে কর্মকর্তাদের পদবি যথাক্রমে সিনিয়র সহকারী সচিব, উপসচিব, যুগ্ম সচিব, অতিরিক্ত সচিব, সচিব এবং সবার উপরে মন্ত্রী অবস্থান করেন। পদসোপানটি পাশে চিত্রিত হলো। প্রশাসনিক কর্মকান্ড এই কাঠামো স্তরের মধ্য দিয়েই বাস্তবায়িত হয়। সিদ্ধান্ত বা নির্দেশ উপর থেকে নিচের দিকে যায়। সচিবের পরামর্শ ছাড়া মন্ত্রণালয়ের অধীন কোনো বিভাগীয় প্রধান, সরাসরি মন্ত্রীর কাছে কোনো প্রস্তাব বা সুপারিশ পাঠাতে পারেন না। একটি মন্ত্রণালয়ের অধীনে একাধিক সচিব, অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম সচিব বা অধস্তন কর্মকর্তা থাকতে পারেন। তবে কর্মকর্তাদের সংখ্যা কতজন হবে তা মন্ত্রণালয়ের গুরুত্ব ও কার্যাবলির ব্যাপকতার ওপর নির্ভর করে।

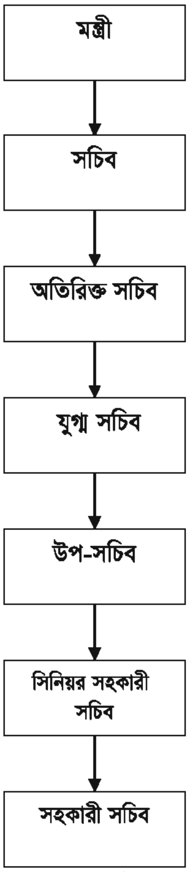

ছক: পদ সোপান

সচিবালয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত ক্রমান্বয়ে বিভাগে, জেলা প্রশাসনে এবং উপজেলা প্রশাসনে প্রেরিত হয়। তাই দেখা যায় যে, সচিবালয় বাংলাদেশ প্রশাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত। সকল বিভাগ, দপ্তর ও সংস্থাসমূহ সচিবালয়ের কাছে দায়ী।

বাংলাদেশে স্থানীয় প্রশাসনের গঠন ও কাজ

প্রত্যেক রাষ্ট্রে কোনো না কোনোরূপ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা রয়েছে। তবে এর প্রকৃতি বা ধরন এক ও অভিন্ন নয়। একটি দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার ন্যায় এর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাও অন্য আরেকটি দেশ থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে। এই ভিন্নতার মূলে রয়েছে, একটি নির্দিষ্ট দেশের ভৌগোলিক অবস্থা, জাতিসত্তা, ইতিহাস–ঐতিহ্য, অভিজ্ঞতা, পরিবর্তন ধারা, উৎপাদন ব্যবস্থা, রাজনৈতিক সংস্কৃতি ইত্যাদি। বাঙালি জাতি–রাষ্ট্র গঠনের মতো আমাদের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাও নানা ঐতিহাসিক পট পরিবর্তন ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। সময়ে সময়ে এখনও তা পুনর্বিন্যস্ত হচ্ছে।

স্থানীয় প্রশাসন

স্থানীয় শাসন বলতে সাধারণত স্থানীয় পর্যায়ের তথা বিভাগ, জেলা এবং উপজেলা শাসন ব্যবস্থাকে বুঝায়। প্রশাসনের সুবিধার্থে এর সৃষ্টি। এ প্রক্রিয়ায় কেন্দ্রীয় শাসন ও নিয়ন্ত্রণকে নিম্নস্তর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে আইন–শৃঙ্খলা রক্ষা, রাজস্ব আদায় ও সরকারি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নই এর মুখ্য উদ্দেশ্য। এ ব্যবস্থায় স্থানীয় শাসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিবৃন্দ সরকারের এজেন্ট বা প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য। উদাহরণ হিসেবে আমাদের দেশে বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কথা উল্লেখ করা যায়।

বিভাগীয় প্রশাসন

কেন্দ্রের পরেই বাংলাদেশে বিভাগীয় প্রশাসনের স্থান। বাংলাদেশের প্রশাসন ব্যবস্থাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সমগ্র দেশকে ৭টি বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে– ১. ঢাকা বিভাগ ২. চট্টগ্রাম বিভাগ ৩. রাজশাহী বিভাগ ৪. খুলনা বিভাগ ৫. বরিশাল বিভাগ ৬. সিলেট বিভাগ ৭. রংপুর বিভাগ ও ৮. ময়মনসিংহ বিভাগ। বিভাগীয় প্রশাসনের শীর্ষে অবস্থান করেন বিভাগীয় কমিশনার। একজন অতিরিক্ত কমিশনার এবং কমিশনারের ব্যক্তিগত সহকারীসহ বহুসংখ্যক কর্মচারী বিভাগীয় প্রশাসনে কর্মরত থাকেন।

বিভাগীয় কমিশনার বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের একজন পদস্থ কর্মকর্তা। তিনি একজন যুগ্ম সচিব পদমর্যাদাসম্পন্ন কর্মকর্তা। তিনি মূলত বাংলাদেশ সরকারের রাজস্ব বিষয়ক কর্মকর্তা। বিভাগীয় কমিশনার জেলা প্রশাসকদের কার্যাবলি তদারকি করেন। তিনি বিভাগীয় প্রশাসন ও জেলা প্রশাসনের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করেন। বিভাগের জনকল্যাণমূলক কাজের পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন তাঁর দায়িত্ব। সাহায্য ও সেবামূলক কাজ, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদিও তাঁকে করতে হয়। বস্তুত তিনি বিভাগ পর্যায়ে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেন।

জেলা প্রশাসন

জেলা প্রশাসন বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোর তৃতীয় স্তর। প্রত্যেক বিভাগ কয়েকটি জেলায় বিভক্ত। বর্তমানে বাংলাদেশে ৬৪টি জেলা রয়েছে। জেলা প্রশাসককে কেন্দ্র করে জেলার সমগ্র শাসন আবর্তিত হয়। জেলা প্রশাসক বা ডেপুটি কমিশনার হলেন জেলা প্রশাসনের মধ্যমণি। তিনি বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের একজন অভিজ্ঞ সদস্য। তিনি প্রশাসনের উপসচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তা। বিভাগীয় কমিশনারের পরই তাঁর স্থান।

জেলা প্রশাসনের সঙ্গে কেন্দ্রের যোগসূত্র বিদ্যমান। বাংলাদেশ সচিবালয়ে জেলা-সংক্রান্ত গৃহীত যাবতীয় সিদ্ধান্ত সরাসরি জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরিত হয়। জেলা প্রশাসক কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত মোতাবেক জেলা প্রশাসন পরিচালনা করেন। আর জেলা প্রশাসকদের কেন্দ্র করেই জেলার প্রশাসন পরিচালিত ও আবর্তিত। জেলা প্রশাসক তাঁর কাজের জন্য

বিভাগীয় কমিশনারের কাছে দায়ী। বিভাগীয় কমিশনার আবার যাবতীয় কার্যাবলির জন্য কেন্দ্রের নিকট দায়ী। বিভাগীয় কমিশনারের মাধ্যমে জেলা ও কেন্দ্রের মধ্যে সেতুবন্ধন সৃষ্টি হয়। জেলা প্রশাসকের কার্যাবলি ব্যাপক।

জেলা প্রশাসকের কার্যাবলি

জেলা প্রশাসকদের কার্যাবলি ব্যাপক ও বহুমুখী। নিম্নে তা সংক্ষেপে আলোচিত হলো :

১. **প্রশাসন সংক্রান্ত কাজ :** বাংলাদেশ সচিবালয়ে গৃহীত শাসন সংক্রান্ত সকল সিদ্ধান্ত ও নীতিমালা বাস্তবায়ন করা, বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কাজ তদারক করা, সরকারি নীতি নির্ধারণ এবং সুষ্ঠুভাবে শাসনকার্য পরিচালনায় সরকারকে সর্বাত্মক সাহায্য সহযোগিতা করা জেলা প্রশাসনের শাসন সংক্রান্ত কাজ।

২. **রাজস্ব সংক্রান্ত কাজ :** জেলা প্রশাসক ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টর হিসেবে জেলার ভূমি রাজস্ব ও অন্যান্য কর ধার্য ও আদায় করেন। এ সকল কাজে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) তাঁকে সাহায্য করেন।

৩. **সমন্বয় সংক্রান্ত কাজ :** সমন্বয় সাধন সংক্রান্ত বিষয়ে জেলা প্রশাসকের ভূমিকা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তিনি জেলার অভ্যন্তরে অবস্থিত সরকারি সকল দপ্তরের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করেন। জেলা প্রশাসক জেলার উন্নয়নের জন্য জেলার গণ্যমান্য লোকদের সাথে এলাকার বিভিন্ন সমস্যা ও সেসবের সমাধানের লক্ষ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন।

কাজ
দলীয় : জেলা প্রশাসকের কার্যাবলির একটি তালিকা তৈরি কর।

৪. **স্থানীয়শাসন সংক্রান্ত কাজ :** স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে জেলা প্রশাসকের ভূমিকা অপরিসীম। তিনি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে দেখাশুনা করেন। জেলার আওতাধীন উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষেত্রে তিনি তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

৫. **সেবামূলক কাজ :** ডেপুটি কমিশনার বা জেলা প্রশাসক মানব সেবামূলক কাজও করে থাকেন। তিনি জেলার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ও বাজার নিয়ন্ত্রণ করেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিলে জনগণের জন্য সেবামূলক কাজের দ্বারা তাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করতে সচেষ্ট হন। এসময় কেন্দ্রীয়ভাবে বরাদ্দকৃত অর্থ, খাদ্য, বস্ত্র ও ঔষধ জেলার জনগণের মধ্যে বিতরণ করেন।

৬. **শিক্ষা ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত কাজ :** জেলার শিক্ষা বিষয়ক সকল প্রকার কর্মসূচির তত্ত্বাবধান এবং জাতীয় দিবসসমূহ উদযাপন ও বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড জেলা প্রশাসক পরিচালনা করেন।

৭. **শান্তি রক্ষামূলক কাজ :** জেলার পুলিশ সুপারের সহযোগিতায় নিজ জেলায় শান্তি প্রতিষ্ঠা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করেন।

৮. **বিবিধ :** জেলা প্রশাসক জেলার প্রধান কর্মকর্তা হিসেবে বহুবিধ দায়–দায়িত্ব পালন করেন। তিনি জেলার প্রকাশনা ও সংবাদপত্র বিভাগের প্রধান নিয়ন্ত্রক। তিনি জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, খরা, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ান। আগ্নেয়াস্ত্র, স্পিরিট ও বিষ প্রভৃতির লাইসেন্স প্রদানের দায়িত্ব তাঁর উপরই ন্যস্ত। জেলা প্রশাসক জেলার প্রতিরোধমূলক বিচারকার্য সম্পন্ন করেন। তিনি জেলার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা সংশ্লিষ্ট কাজ পরিচালনা, তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করে থাকেন। কাজেই জেলা প্রশাসককে জেলার পরিচালক, তত্ত্বাবধায়ক ও নিয়ন্ত্রক বলা চলে।

উপজেলা প্রশাসন

উপজেলা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক স্তর। প্রতিটি জেলা কয়েকটি উপজেলায় বিভক্ত। বর্তমানে দেশে ৪৯২টি উপজেলা রয়েছে। উপজেলার প্রশাসনিক কর্মকর্তা হলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার। তিনি জেলা প্রশাসকের আদেশ বাস্তবায়ন এবং উপজেলার অন্যান্য কাজের সমন্বয় করে থাকেন। তিনি বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের একজন সদস্য। উপজেলা পর্যায়ের অন্যান্য কর্মকর্তাদের সহায়তায় উপজেলার সকল উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেন। এছাড়া উপজেলার শাসন ব্যবস্থা ও শান্তি-শৃঙ্খলার কাজও তিনি দেখাশুনা করেন। মূলত উপজেলার সকল উন্নয়ন ও প্রশাসনিক কাজ তদারক করা তাঁর দায়িত্ব।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বলতে নির্দিষ্ট এলাকাভিত্তিক জনগণের স্বশাসনকে বুঝায়। সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা তা পরিচালিত হয়। প্রতিনিধিরা তাঁদের কাজের জন্য জনগণের নিকট দায়ী থাকেন। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো– ক. আইনগত ভিত্তি, খ. নির্বাচিত সংস্থা, গ. সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ, ঘ. করারোপের মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহের ক্ষমতা, ঙ. পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, চ. কেন্দ্রীয় বা বিভাগীয় প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণমুক্ত থেকে স্বাধীনভাবে কার্য পরিচালনা প্রভৃতি। এটি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা বা সরকার পরিচালনা পদ্ধতির পরিশীলিত রূপ। বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলো হলো– ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, পার্বত্য জেলা পরিষদ প্রভৃতি।

ইউনিয়ন পরিষদ

ইউনিয়ন পরিষদ এদেশের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন স্থানীয় প্রতিষ্ঠান। ব্রিটিশপূর্ব আমল থেকে বর্তমান পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটির অগ্রযাত্রা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, গ্রাম এলাকায় জনপ্রতিনিধিত্বমূলক স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এটি কাজ করছে। ব্রিটিশ আমলে গ্রাম এলাকার আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সহযোগিতা করার জন্য চৌকিদারি পঞ্চায়েত আইন ১৮৭০ প্রবর্তিত হয়। পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট একটি কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে গ্রামে শান্তি–শৃঙ্খলা রক্ষা ও বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজ পরিচালনা করার জন্য এ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। ১৮৮৫ সালে স্থানীয় পর্যায়ে অধিক দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য বঙ্গীয় স্থানীয় আইন পাস হয়। এই আইনে ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন কমিটি, মহকুমা পর্যায়ে মহকুমা বোর্ড ও জেলা পর্যায়ে জেলা বোর্ড গঠন করা হয়। ১৯১৯ সালের পল্লী আইনে চৌকিদারি পঞ্চায়েত ও ইউনিয়ন কমিটি বিলুপ্ত করে ইউনিয়ন বোর্ড নামে একটিমাত্র স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয়। পাকিস্তান আমলে এর নাম হয় ইউনিয়ন কাউন্সিল। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭৬ সালে স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশে ইউনিয়ন পরিষদ, থানা পরিষদ ও জেলা পরিষদ–এই তিন স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা চালু করা হয়। ১৯৯৭ সালে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) সংশোধিত আইনের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদ গঠনে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়। সাধারণত গড়ে ১০–১৫টি গ্রাম নিয়ে একটি ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত। ইউনিয়ন পরিষদে একজন নির্বাচিত চেয়ারম্যান, নয় জন নির্বাচিত সাধারণ সদস্য ও তিন জন নির্বাচিত মহিলা সদস্য (সংরক্ষিত আসনে) থাকবেন। পূর্বে একটি ইউনিয়ন তিনটি ওয়ার্ডে বিভক্ত ছিল। সংশোধিত আইনে ওয়ার্ড সংখ্যা ৯ (নয়) টিতে উন্নীত করা হয়েছে। প্রত্যেক ওয়ার্ড থেকে একজন করে মোট নয়জন সাধারণ সদস্য জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন। প্রতি

৩ ওয়ার্ডে একজন মহিলা সদস্য পুরুষ ও মহিলা সকলের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবেন। ইউনিয়ন পরিষদের কার্যকাল ৫ বছর। বাংলাদেশে সর্বমোট ৪৫৫৪ টি ইউনিয়ন পরিষদ রয়েছে।

ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলি

ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলিকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথা: ১. প্রধান কার্যাবলি ও ২. ঐচ্ছিক কার্যাবলি।

প্রধান কার্যাবলি

১. **জনশৃঙ্খলা রক্ষা** : গ্রামে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা ইউনিয়ন পরিষদের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনের জন্য প্রতিটি ইউনিয়নে কিছু চৌকিদার ও দফাদার নিয়োগ করা; অপরাধ, বিশৃঙ্খলা ও চোরাচালান বন্ধের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ; ঝগড়া-বিবাদ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা নিরসনে ভূমিকা পালন; গ্রাম আদালত সম্পর্কিত দায়িত্ব সম্পাদন; পারিবারিক বিরোধের আপোস-মীমাংসার উদ্যোগ গ্রহণ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ইউনিয়ন পরিষদ পালন করে।

২. **জনকল্যাণমূলক কাজ ও সেবা** : ইউনিয়নে অবস্থিত কৃষি, স্বাস্থ্য, মৎস্য, পশুপালন ও শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি সংস্থার সেবা ও কার্যক্রম জনগণকে অবহিতকরণ এবং গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্থার কর্মসূচির অধীনে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, স্যানিটেশন, পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন, আত্মকর্মসংস্থান ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা ইউনিয়ন পরিষদের প্রধানতম কার্যাবলির মধ্যে পড়ে।

৩. **স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন** : এলাকার কৃষি উন্নয়নের জন্য যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ, গ্রামীণ শিল্পের উন্নয়ন সাধন, বাজার সৃষ্টি, মৎস্য চাষ ও পশু পালনের উন্নত পদ্ধতি সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিতকরণ, উন্নত বীজ, চারা ও সার বিতরণের সুষ্ঠু ব্যবস্থা সৃষ্টি করা, জনগণের আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে পরামর্শ প্রদান, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বাঁধ নির্মাণ প্রভৃতি কাজ ইউনিয়ন পরিষদ সম্পাদন করে।

কাজ
দলীয় : ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলির একটি ছক তৈরি কর।

৪. **প্রশাসনিক কাজ** : ইউনিয়ন পরিষদের সচিব, গ্রাম পুলিশ ও পরিষদের অন্যান্য কর্মচারীদের পরিচালনা, তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ করা, সকল সভা আহ্বান, বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রেরণ করা, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন ইত্যাদিও ইউনিয়ন পরিষদ করে থাকে।

ঐচ্ছিক কার্যাবলি

জনপথ ও রাজপথের ব্যবস্থা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা; বিধবা, এতিম, গরিব ও দুস্থ ব্যক্তিদের সাহায্যকরণ; প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রের ব্যবস্থাকরণ; প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার তদারকি এবং ঘরে ঘরে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেওয়া; পরিবেশ সংরক্ষণ ও বনায়ন; ইউনিয়নের পরিচ্ছন্নতা রক্ষা, পাঠাগার স্থাপন, উদ্যান ও খেলার মাঠের ব্যবস্থা, গণসংযোগ; দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণকার্য সম্পাদন; দুস্থ ব্যক্তির তালিকা প্রণয়ন; সকল প্রকার শুমারি পরিচালনার দায়িত্ব পালন; সরকারি সম্পত্তি, যেমন- সড়ক, সেতু, খাল, বাঁধ, টেলিফোন ও বিদ্যুৎ লাইন রক্ষণাবেক্ষণ, পল্লি বিদ্যুতায়নের উদ্যোগ গ্রহণ ইত্যাদি ইউনিয়ন পরিষদের ঐচ্ছিক কাজের অন্তর্গত।

উপজেলা পরিষদ

বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার এটি গুরুত্বপূর্ণ ইউনিট উপজেলা পরিষদ। দেশের ৬৪টি জেলার ৪৯২টি উপজেলায় স্থানীয় জনগণের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য নির্বাচনের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ গঠনের

বিধান রয়েছে। উপজেলা ব্যবস্থা ১৯৮৩ সালে প্রথম প্রবর্তন করা হয়। কিন্তু এ ব্যবস্থাটি বিভিন্ন কারণে পরবর্তীতে সময়ে স্থায়ীরূপ লাভ করেনি। এ লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ পুনঃপ্রচলন এবং উক্ত আইনের অধিকতর সংশোধনকল্পে ৬ এপ্রিল ২০০৯ সালে উপজেলা পরিষদ আইন পাস হয়। এ আইন 'উপজেলা পরিষদ (রহিত আইন পুনঃপ্রচলন ও সংশোধন) আইন ২০০৯' নামে পরিচিত।

আইনের বিধান অনুযায়ী নিম্নোক্তদের সমন্বয়ে উপজেলা পরিষদ গঠিত হবে:

ক. চেয়ারম্যান
খ. ২ জন ভাইস চেয়ারম্যান (যার মধ্যে একজন নারী)
গ. উপজেলার এলাকাভুক্ত প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান
ঘ. উপজেলার এলাকাভুক্ত পৌরসভার মেয়র ও
ঙ. সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত নারী সদস্যগণ।

চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান জনগণের ভোটে সরাসরি নির্বাচিত হবেন। উপজেলার এলাকাভুক্ত ইউনিয়ন পরিষদ সমূহ ও পৌরসভার মোট সদস্য সংখ্যার এক–তৃতীয়াংশের সমসংখ্যক আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে, যারা উক্ত উপজেলার এলাকাভুক্ত ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্য বা কাউন্সিলরগণ কর্তৃক তাদের মধ্য হতেই নির্বাচিত হবেন।

উপজেলা পরিষদ এলাকার সার্বিক উন্নয়নে কাজ করবে। সকল কাজের সফলতা নির্ভর করবে জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে।

জেলা পরিষদের গঠন প্রণালি

বাংলাদেশ সরকার ৬ জুলাই ২০০০ সালে 'জেলা পরিষদ আইন ২০০০' প্রবর্তন করে। আইনের বিধান অনুযায়ী খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা ও বান্দরবান পার্বত্য জেলাসমূহ ব্যতীত অন্য জেলায় জেলা পরিষদ গঠনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। একজন চেয়ারম্যান, পনেরো জন সদস্য এবং সংরক্ষিত আসনের পাঁচজন নারী সদস্য নিয়ে জেলা পরিষদ গঠিত। একটি জেলা পরিষদের মেয়াদ বা কার্যকাল থাকবে পাঁচ বছর।

জেলা পরিষদের কার্যাবলি

জেলা পরিষদের কার্যাবলি দুই ধরনের, যথা: আবশ্যিক ও ঐচ্ছিক।

আবশ্যিক কার্যাবলি

১. জেলার সকল উন্নয়ন কার্যক্রমের পর্যালোচনা;
২. উপজেলা পরিষদ ও পৌরসভা কর্তৃক প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
৩. সাধারণ পাঠাগারের ব্যবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণ;
৪. জনপথ, কালভার্ট ও ব্রিজ নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন;
৫. রাস্তার পাশে বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ;
৬. উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতা;
৭. উপজেলা ও পৌরসভাকে সহায়তা, সহযোগিতা এবং উৎসাহ প্রদান;
৮. সরকার কর্তৃক জেলা পরিষদের ওপর অর্পিত উন্নয়ন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ও
৯. সরকার কর্তৃক আরোপিত অন্যান্য কাজ।

ঐচ্ছিক কার্যাবলি

জেলা পরিষদ ঐচ্ছিক কার্যাবলির অংশ হিসেবে শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজকল্যাণ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, জনস্বাস্থ্য ও গণপূর্ত বিষয়ক বিস্তৃত কার্যক্রম গ্রহণ করে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অর্থ মঞ্জুরি প্রদান ও শিক্ষার উন্নয়নের সহায়ক অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ; জনসাধারণের জন্য ক্রীড়া ও খেলাধুলা কার্যক্রমের উন্নয়ন; তথ্যকেন্দ্র স্থাপন; জাতীয় দিবস উদযাপন; নাগরিক শিক্ষার প্রসার; দুস্থ ব্যক্তিদের জন্য কল্যাণকর আশ্রয় সদন, বিধবা সদন, এতিমখানা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন; জুয়া, মাদকদ্রব্য সেবন, কিশোর অপরাধ ও অন্যান্য সামাজিক অনাচার ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ; সালিশী ও আপোসের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ; অর্থনৈতিক উন্নয়নে আদর্শ কৃষি খামার স্থাপন, উন্নত কৃষি পদ্ধতি জনপ্রিয়করণ, কৃষি যন্ত্রপাতির সংরক্ষণ ও সরবরাহ, পতিত জমি চাষের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ, বাঁধ নির্মাণ ও মেরামত; সেচের পানি সরবরাহ, জমানো ও নিয়ন্ত্রণ; বনভূমি সংরক্ষণ, গ্রামাঞ্চলের শিল্পসমূহের জন্য কাঁচামাল সংগ্রহ এবং উৎপাদিত সামগ্রীর বাজারজাতকরণ, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন, পানি নিষ্কাশন ও অন্যান্য জনহিতকর কাজ জেলা পরিষদের ঐচ্ছিক কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত। এভাবে জেলা পরিষদ স্থানীয় এলাকাবাসীর ধর্মীয়, নৈতিক ও বৈষয়িক উন্নতি সাধনের জন্য কাজ করে।

পৌরসভা

শহর এলাকার স্থানীয় শাসন সংস্থাটির নাম পৌরসভা। বাংলাদেশে প্রত্যেক পৌর বা শহর এলাকার জন্য একটি করে পৌরসভা আছে। বর্তমানে বাংলাদেশে ছোট বড় মোট ৩২৬টি পৌরসভা রয়েছে।

গঠন

প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত একজন চেয়ারম্যান এবং ওয়ার্ডভিত্তিক নির্বাচিত সদস্য নিয়ে পৌরসভা গঠিত হয়। সদস্যগণ কমিশনার নামে পরিচিত। দেশের সকল পৌরসভার সদস্য সংখ্যা সমান নয়। পৌর এলাকার আয়তন ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে সদস্য সংখ্যা কমবেশি হতে পারে। পৌরসভার কার্যকাল পাঁচ বছর।

কার্যাবলি

পৌরসভা শহর এলাকার বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ও উন্নয়নকল্পে বহুবিধ কাজ করে থাকে। যেমন :

১. **পরিকল্পনামূলক** : শহর ও এর অন্তর্গত এলাকার সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য পৌরসভা বিভিন্ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে। শহর এলাকার সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য সড়ক বা মহাসড়ক ও আবাসিক এলাকার বিন্যাস পৌরসভার কাজ।

২. **জননিরাপত্তামূলক** : পৌরসভা অগ্নিনিরোধ ও নির্বাপণের ব্যবস্থা করে থাকে। বন্যা, মহামারি, দুর্ভিক্ষ, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে জনজীবন রক্ষা সংক্রান্ত কাজও করে।

৩. **জনস্বাস্থ্য বিষয়ক** : পৌরসভা সরকারি রাস্তা, পায়খানা, ডাস্টবিন, পয়ঃপ্রণালির ময়লা ও আবর্জনা অপসারণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে। তাছাড়া চিকিৎসা কেন্দ্র, মাতৃসদন, শিশু সদন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা, সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও প্রতিকার, দূষিত ও ভেজাল খাদ্য ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করা, বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করা ইত্যাদি পৌরসভার জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত কাজ।

কাজ
দলীয় : পৌরসভার কার্যাবলির একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

৪. **বাসস্থান সংক্রান্ত** : পৌর এলাকার গৃহ নির্মাণ ও সংস্কারে পৌরসভার অনুমোদনের প্রয়োজন হয়। পৌরসভা দালানকোঠা, বাড়িঘর নির্মাণের নকশা ও পরিকল্পনার অনুমোদন দেয়।

৫. **শিক্ষা সংক্রান্ত** : পৌরসভার শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যাবলি হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হোস্টেল নির্মাণ, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান, দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি, বিনামূল্যে বই বিতরণ, বাধ্যতামূলক ও গণশিক্ষার ব্যবস্থাকরণ ইত্যাদি।

৬. **রাস্তাঘাটের উন্নয়ন** : জনসাধারণের চলাচলের সুবিধার জন্য পৌরসভা রাস্তা নির্মাণ, নামকরণ ও সংরক্ষণ করে। রাস্তাঘাট পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন রাখা, রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা করা এবং রাস্তায় যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা পৌরসভার কাজ।

৭. **সমাজকল্যাণ সংক্রান্ত** : পৌরসভা অনাথ, গরিব–দুঃখী ও দুস্থদের জন্য কল্যাণকেন্দ্র এবং এতিমখানা স্থাপন ও পরিচালনা করে থাকে।

৮. **বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি** : পৌর এলাকার বন সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, রাস্তার পাশে ও সরকারি জায়গায় বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ, জনসাধারণের চিত্তবিনোদনের জন্য পার্ক, উদ্যান ও উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ নির্মাণ ও সংরক্ষণ এবং খেলার মাঠের ব্যবস্থা করাও পৌরসভার দায়িত্ব।

৯. **সালিশি কার্যক্রম পরিচালনা** : পৌরসভায় বসবাসরত জনসাধারণের জরিমানা সংক্রান্ত সমস্যা, সীমানা নির্ধারণ, পারিবারিক সমস্যা ও ঝগড়া বিবাদ মীমাংসা করার জন্য পৌরসভা সালিশি উদ্যোগ নিতে ও মধ্যস্থতা করতে পারে। এক্ষেত্রে ওয়ার্ড কমিশনার এবং প্রয়োজনে চেয়ারম্যান মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ভূমিকা রাখেন। জেলা ও উপজেলা শহর এলাকার উন্নয়নে পৌরসভা একটি গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকরী স্থানীয় শাসন সংস্থা যা জনগণের সমস্যা সমাধানে ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে কাজ করছে।

সিটি কর্পোরেশন

ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, সিলেট, বরিশাল, রংপুর, কুমিল্লা, গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জ পৌরসভাকে সিটি কর্পোরেশনে রূপান্তর করা হয়েছে। ঢাকা সিটি কর্পোরেশনকে আইনের মাধ্যমে ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ নামে দুটি কর্পোরেশন হিসেবে বিভক্ত করা হয়েছে।

সিটি কর্পোরেশনের এলাকা ও কাজের ওপর এর সদস্যসংখ্যা নির্ভর করে। কর্পোরেশনে একজন মেয়র ও একজন ডেপুটি মেয়র আছেন । তাঁরা জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন।

শহরের নানাবিধ সমস্যা, যেমন– পানীয়জলের ব্যবস্থা, পয়ঃনিষ্কাশন, ময়লা–আবর্জনা অপসারণ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধি এবং সার্বিক উন্নয়নের জন্য সিটি কর্পোরেশন গঠন করা হয়েছে।

স্থানীয় শাসনের মতো স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোও একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণের জীবনধারা উন্নত করার জন্য অপরিহার্য।

স্থানীয় প্রশাসনের গুরুত্ব

আধুনিককালে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের গুরুত্ব যে কত বেশি তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বর্তমানে রাষ্ট্রের আয়তন ও জনসংখ্যা বিশাল। রাজধানীতে বসে কেন্দ্রীয় সরকারের একার পক্ষে দেশের সর্বত্র সুষ্ঠুভাবে শাসনকার্য পরিচালনা, নানা বিষয়ে দৈনন্দিন নজর রাখা, স্থানীয় সমস্যা সমাধানে কার্যকর ও সঠিক সময়ে পদক্ষেপ গ্রহণ, উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ত্বরান্বিত ও অঞ্চল নির্বিশেষে সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না। স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা দ্বারা তা সহজসাধ্য হয়।

কাজ
দলীয় : স্থানীয় প্রশাসনের গুরুত্ব নিয়ে একটি বিতর্কমূলক আলোচনা কর।

স্থানীয় শাসনের শ্রেষ্ঠত্ব হলো এটি কেন্দ্রের মুখাপেক্ষিতা এবং আমলাতান্ত্রিক জটিলতা মুক্ত। এ ব্যবস্থায় স্থানীয়

পর্যায়ে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ও স্থানীয় উন্নয়নে ত্বরিত উদ্যোগ ও পদক্ষেপ গ্রহণ সম্ভব হয়। এ ব্যবস্থা স্থানীয় শাসন ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জনগণের অংশগ্রহণ, সচেতনতা বৃদ্ধি ও নেতৃত্ব সৃষ্টি করে। প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়। ফলে গণতন্ত্রের ভিত সুদৃঢ় হয়। রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থা হয় উন্নত।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. সরকারের তিনটি মৌলিক বিভাগের নাম লেখ।
২. জাতীয় সংসদ কীভাবে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে? ব্যাখ্যা কর।
৩. স্থানীয় প্রশাসনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন :

১. প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলি ব্যাখ্যা কর।
২. ‘জাতীয় সংসদই শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে’– উক্তিটি যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে লেখ।
৩. বিচার বিভাগ কীভাবে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে– ব্যাখ্যা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা আছে এমন দেশের উদাহরণ নিচের কোনটি?
ক. যুক্তরাষ্ট্র
খ. যুক্তরাজ্য
গ. ভারত
ঘ. বাংলাদেশ

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ২ ও ৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

হৃদয় তার প্রবাসী বন্ধুকে জানায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী সরকারি বিলের পৃষ্ঠপোষকতা, অর্থ বিষয়ক কাজ, দলের নেতা, সংসদ বিষয়ক ক্ষমতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন ও ক্ষমতা প্রয়োগ করেন।

২. জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে হৃদয় প্রদত্ত কোন তথ্যটি সঠিক?
i. সরকারি বিলের পৃষ্ঠপোষকতা করা
ii. বার্ষিক বাজেট অনুমোদন
iii. সংসদ সদস্যদের অধিকার সংরক্ষণ

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩. উপরোক্ত দায়িত্ব পালনের জন্য প্রধানমন্ত্রীকে বলা হয়–

ক. সরকার প্রধান

খ. নির্বাহী প্রধান

গ. সংসদ প্রধান

ঘ. দলীয় প্রধান

সৃজনশীল প্রশ্ন :

১. জনাব 'ক' কালেক্টর হিসেবে কাজ করেন। তিনি তার এলাকার সকল সরকারি দপ্তরের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করেন। তিনি তার এলাকার একজন বিচারকের কাজও করেন।

ক. বর্তমানে আমাদের দেশে কয়টি পৌরসভা আছে?
খ. 'স্থানীয় প্রশাসন' ধারণাটি ব্যাখ্যা কর।
গ. আমাদের দেশে জনাব 'ক' এর অবস্থান বর্ণনা কর।
ঘ. উদ্দীপকে জনাব 'ক' এর যে ধরনের কাজের প্রতিফলন ঘটেছে তা তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

২. বেল্লাল হোসেন তার এলাকার জনপ্রতিনিধি। তার দপ্তরে ১২ জন প্রতিনিধি রয়েছে। তিনি তার এলাকায় ৩টি নলকূপ ও টয়লেট (পায়খানা) স্থাপনের জন্য ৫টি রিং স্লাব সরবরাহ করেন। এছাড়া তিনি কৃষকদের কাছে সার বিতরণ করেন।

ক. সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী অনুসারে জাতীয় সংসদের সদস্য সংখ্যা কত?

খ. স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বলতে কী বোঝায়?

গ. বেল্লাল হোসেন কোন স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের প্রধান? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. অনুচ্ছেদে উল্লেখিত বেল্লাল হোসেনের কাজ উক্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য যথেষ্ট কি? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

অষ্টম অধ্যায়

বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও নির্বাচন

বর্তমান বিশ্বের সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য সরকার ব্যবস্থা হলো গণতন্ত্র। বিশ্বের প্রায় প্রত্যেকটি দেশেই গণতন্ত্র ব্যাপকভাবে জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। সাধারণভাবে গণতন্ত্র বলতে বোঝায়, যে শাসন ব্যবস্থায় শাসন ক্ষমতা মুষ্টিমেয় লোকের হাতে পুঞ্জীভূত না থেকে রাষ্ট্রের সব জনসাধারণের ওপর ন্যস্ত থাকে এবং জনগণই তাদের সরকার গঠন করে। গণতন্ত্র হলো এমন এক রাজনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে নির্ধারিত মেয়াদ শেষে সরকার পরিবর্তনের লক্ষ্যে সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় যাতে প্রাপ্তবয়স্কদের সর্বজনীন ভোটাধিকার থাকে। এ ব্যবস্থায় একাধিক রাজনৈতিক দল এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জনগণের অংশগ্রহণ থাকে। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনা এবং রাষ্ট্রের কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের স্বাধীনতা সংরক্ষণ ও কল্যাণ বৃদ্ধির ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক সমাজের বৈশিষ্ট্য। বাংলাদেশের সরকার পদ্ধতি একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। এখানে জাতীয় সংসদের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এজন্যে সরকার নির্বাচন কমিশন গঠন করেছে। নির্বাচনের জন্য নির্বাচনি আচরণবিধি এবং নির্বাচনি আচরণ লঙ্ঘন করার শাস্তির বিধান রয়েছে। এ অধ্যায়ে আমরা বাংলাদেশের গণতন্ত্র, নির্বাচন ও নির্বাচনি আচরণবিধি সম্পর্কে অবহিত হব।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

- গণতন্ত্রের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব;
- রাজনৈতিক দলের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ক্ষমতাসীন ও বিরোধী রাজনৈতিক দলের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- গণতন্ত্র ও নির্বাচনের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনের গঠন, ক্ষমতা ও কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- নির্বাচনি আচরণবিধি বর্ণনা করতে পারব;
- নির্বাচনি আচরণ লঙ্ঘন করার শাস্তি ব্যাখ্যা করতে পারব;
- গণতন্ত্র, রাজনৈতিক দল ও নির্বাচন সম্পর্কে অবগত হয়ে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সম্পন্ন নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে আগ্রহী হব।

গণতন্ত্রের ধারণা

আমেরিকার প্রখ্যাত প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন গণতন্ত্রের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে– গণতন্ত্র হলো, 'জনগণের, জনগণের জন্য ও জনগণ দ্বারা নির্বাচিত সরকার ব্যবস্থা।' অধ্যাপক গেটেলের মতে, 'যে শাসন ব্যবস্থায় জনগণ সার্বভৌম ক্ষমতার প্রয়োগে অংশ নেয়ার অধিকারী তাই গণতন্ত্র।' সাধারণ অর্থে, গণতন্ত্র হচ্ছে মূলত সংখ্যাগরিষ্ঠের

স্বার্থে গঠিত ও পরিচালিত সরকার। এর অর্থ এই নয় যে, গণতন্ত্র সংখ্যালঘুর মতামত ও স্বার্থকে উপেক্ষা করবে, বরং গণতন্ত্রে আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান। সুতরাং গণতন্ত্র বিশ শতকের একটি জনপ্রিয় ধারণা, যা বর্তমানে সরকার পরিচালনার সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ কারণেই গণতন্ত্র সমাজ ও রাষ্ট্র সংক্রান্ত অধ্যয়নযোগ্য বিষয়াবলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ।

সরকার ব্যবস্থা হিসেবে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ফল। গণতন্ত্র সর্বপ্রথম প্রচলিত হয় প্রাচীন গ্রিসের এথেন্সে। গ্রিসের নাগরিক সমাজ গণতন্ত্র বলতে বুঝতো এমন একটি রাজনৈতিক শাসন ব্যবস্থা যাতে গোটা নাগরিক সমাজ প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে। এথেন্সীয় গণতন্ত্র পরবর্তীতে চলমান থাকেনি। মধ্যযুগে ধর্ম ও রাজার দ্বৈত শাসন, স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ও সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় অনেকটা সময় কেটে গেছে। দীর্ঘকাল পরে ইউরোপে গণতন্ত্রের পুনর্জন্ম ঘটে খ্রিস্টীয় সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে। উনিশ ও বিশ শতকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রচলন দেখা যায়। অষ্টাদশ শতকের গণতান্ত্রিক ভাবধারার উৎসমূল হিসেবে ইংল্যান্ডকে চিহ্নিত করা হয়। বর্তমানে গণতন্ত্রের বিকাশ এতই সাফল্য লাভ করেছে যে, আধুনিক সভ্যতা গণতান্ত্রিক সভ্যতায় পরিণত হয়েছে।

গণতন্ত্রের প্রকারভেদ

গণতন্ত্র সাধারণত দুটি পদ্ধতিতে কার্যকর হয়, যথা: (১) প্রত্যক্ষ বা বিশুদ্ধ গণতন্ত্র ও (২) পরোক্ষ বা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র।

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র

যে শাসন ব্যবস্থায় নাগরিকগণ প্রত্যক্ষ বা সরাসরিভাবে শাসনকার্য পরিচালনায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায় তাকে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র বলা হয়ে থাকে। প্রাচীন গ্রিসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর রাষ্ট্রগুলোতে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র প্রচলিত ছিল। রাষ্ট্রের সকল নাগরিক আইন প্রণয়ন, রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ, কর ধার্য, বিচারকার্য পরিচালনাসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে সরাসরি অংশগ্রহণ করত। সে সময় নাগরিকের ধারণা সীমাবদ্ধ ছিল। রাষ্ট্রের সকলেই নাগরিকত্বের সম্মান পেত না। আধুনিক রাষ্ট্র আয়তনে বিশাল। এর জনসংখ্যাও বেশি। এ অবস্থায় প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র চর্চার সুযোগ কম। তবে সুইজারল্যান্ডের কয়েকটি অঞ্চলে আংশিকভাবে এখনও প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের ব্যবস্থা চালু আছে।

পরোক্ষ বা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র

পরোক্ষ গণতন্ত্র বলতে প্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনা করার পদ্ধতিকেই বোঝায়। এ ধরনের গণতন্ত্রকে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র বলা হয়। এ পদ্ধতিতে সাধারণত নাগরিকগণ সরাসরি শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করেন না। পরোক্ষ গণতন্ত্রে নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই আইন প্রণয়নসহ শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরোক্ষ বা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রই প্রচলিত রয়েছে।

গণতন্ত্রের দোষগুণ

গণতন্ত্রের সুন্দর দিকগুলো হলো গণতন্ত্রে আইনের অনুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি হলো দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা। এ শাসন ব্যবস্থায় সরকার জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয় এবং জনগণের কাছে সরকারের জবাবদিহিতা থাকে। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা হলো জনমত দ্বারা পরিচালিত সরকার। স্বৈরাচারী পন্থায় নিয়ন্ত্রণ, দমন, নিপীড়নমূলক আচরণ এ শাসনব্যবস্থায় কোনোক্রমেই কাম্য নয়। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় নীতি-নির্ধারণের ক্ষেত্রে জনগণের স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। এ ব্যবস্থায় জনগণের ব্যক্তিস্বাধীনতা ও বাকস্বাধীনতা স্বীকৃত। ফলে তাদের মধ্যে রাজনৈতিক

চেতনার সৃষ্টি হয়। এ ব্যবস্থায় সরকার জনগণের সরকার হিসেবে বিবেচিত। জনগণের আস্থা হারালে এ সরকার টিকে থাকতে পারে না। এ ব্যবস্থায় ব্যক্তি তার আত্মবিকাশের সর্বাধিক সুবিধা ভোগ করে। তদুপরি গণতন্ত্র হচ্ছে কল্যাণকামী সরকার। এর মূল উদ্দেশ্যই হলো জনকল্যাণ সাধন।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বেশকিছু সীমাবদ্ধতা বা ত্রুটিও রয়েছে। প্রাচীনকালের প্রখ্যাত মনীষী ও দার্শনিকগণ, যেমন–প্লেটো ও অ্যারিস্টটল গণতন্ত্রকে মূর্খ বা অযোগ্যের শাসনব্যবস্থা বলে অভিহিত করেছেন। কেননা, সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন হিসেবে গণতন্ত্রে নির্বাচনের মাধ্যমে অজ্ঞ, অযোগ্য ও দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিও শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পারে। ফলে উপযুক্ত লোকের অভাবে গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য অর্জিত হয় না এবং শাসনকার্য পরিচালনায় নানা ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। বাস্তবে গণতন্ত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনে পরিণত হয়। সংখ্যালঘুরা আইনসভায় তাদের প্রতিনিধি প্রেরণ করতে পারে না। ফলে তাদের অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে সরকার উদাসীন থাকতে পারে। গণতন্ত্রে বহু পরস্পরবিরোধী মত ও ধারণা দেখা যায়। এতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মতপার্থক্য ও সংঘর্ষের সৃষ্টি হয় এবং জাতীয় সংহতি বিনষ্ট হতে পারে। এছাড়া রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হলে জাতি দ্বিধা–বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং গণতন্ত্র হুমকির মুখে পড়ে। অনুন্নত দেশগুলোতে সরকারি দল নিজ দলের স্বার্থের প্রতি লক্ষ রেখে শাসনকার্য পরিচালনা করে থাকে। ফলে নিরপেক্ষতা নষ্ট হয়। এতে করে গণঅসন্তোষ দেখা দেয়। গণতন্ত্র তুলনামূলক ব্যয়বহুল শাসনব্যবস্থা। ঘন ঘন নির্বাচনের ব্যবস্থা, জনমত গঠন, ব্যাপক প্রচারকার্য ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে সরকার, রাজনৈতিক দল এবং প্রার্থীদের প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়।

বাংলাদেশের গণতন্ত্র

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পর পাকিস্তানে পার্লামেন্টারি শাসন ব্যবস্থা গৃহীত হয়। বাংলাদেশ তখন পূর্ব পাকিস্তান নামে পাকিস্তানের অংশ ছিল। পাকিস্তান গণপরিষদে দেশের সংবিধান প্রণয়ন করতে ৯ বছর সময় লাগে। এ সময় পার্লামেন্টারি শাসনের নামে বস্তুত গভর্নর জেনারেল এবং আমলারাই দেশ শাসন করত। প্রধানমন্ত্রী অথবা আইনসভার মতামতের তোয়াক্কা না করে গভর্নর জেনারেল নিজের পছন্দ অনুযায়ী মন্ত্রিসভা গঠন করতেন। সংবিধান প্রণয়নের আড়াই বছরের মাথায় জেনারেল আইয়ুব খান ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারি করেন। এর মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের ভঙ্গুর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসান ঘটে।

কিন্তু পরবর্তীতে রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবি সোচ্চার হয়েছে। পাকিস্তান রাষ্ট্রে প্রথম জাতীয় পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭০ সালে এবং সেটিই ছিল তৎকালীন পাকিস্তানে শেষ নির্বাচন। নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করে। কিন্তু পাকিস্তানের সামরিক সরকার বঙ্গবন্ধুর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভোটে নির্বাচিত নেতা হিসেবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন ২৬শে মার্চ ১৯৭১। এর চূড়ান্ত পরিণতি ১৯৭১ সালে নয় মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়।

স্বাধীনতা–পরবর্তী সময় থেকে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে তিনটি রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় এসেছে। এগুলো হলো: আওয়ামী লীগ, বি.এন.পি. ও জাতীয় পার্টি। এর মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য একটি সময় কেটেছে অগণতান্ত্রিক সেনা শাসনের অধীনে। স্বাধীনতার পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ প্রথম সরকার গঠন করে। পাকিস্তানি অপশাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে বাঙালিরা তাদের দীর্ঘ সংগ্রামের মূর্ত প্রতীক বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বেই গণতন্ত্র লাভ করেছিল। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠন, অবকাঠামো নির্মাণ, দেশের বিভিন্ন শিল্পের পুনরুজ্জীবিতকরণ এবং

জাতীয়করণ, প্রশাসনিক ব্যবস্থার উন্নয়নসহ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে আওয়ামী লীগ সরকার। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এসবের মধ্যে রয়েছে পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন, স্বাধীনতার দশ মাসের মধ্যে একটি সংবিধান প্রণয়ন (১৯৭২), নতুন রাষ্ট্র হিসেবে ১৪০টি দেশের স্বীকৃতি লাভ, জাতিসংঘ ও ওআইসিসহ আন্তর্জাতিক সংস্থা ও সংগঠনের সদস্যপদ প্রাপ্তি এবং নতুন সংবিধান অনুসারে ১৯৭৩ সালের ৭ই মার্চ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান ইত্যাদি।

১৯৭৫ সালের ১৫ ই আগস্ট দেশি-বিদেশি স্বাধীনতা বিরোধীচক্রের ষড়যন্ত্রে একদল বিপথগামী সেনা সদস্যের হাতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের উপস্থিত সকল সদস্য শাহাদাত বরণ করেন। একই সালের ৩রা নভেম্বর জাতীয় চার নেতা নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার হন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে। শুরু হয় বাংলাদেশের উল্টোপথে যাত্রা, যা নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। ৭৫ পরবর্তী পনেরো বছর দেশ ছিল সেনা শাসনের অধীনে। এ সময় জনগণের ভোটাধিকার হরণ করা হয়। বিভিন্ন দল ভেঙে বা নেতাদের ভাগিয়ে এনে সেনা–সমর্থক দল গঠন করা হয়। নির্বাচনের নামে ক্ষমতাসীনদের কর্তৃক ভোটকেন্দ্র দখল ও আসন ভাগাভাগি হয়। নির্বাচন কমিশন বলতে গেলে অকার্যকর ও অসহায় হয়ে পড়ে। নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান, বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহামদের নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন ও ২৭শে ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাংলাদেশের রাজনৈতিক বিবর্তন ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়ের সূচনা করে।

১৯৯১ সালের নির্বাচনে জয়লাভ করে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি.এন.পি.) সরকার গঠন করে। নির্বাচনের পর পর জাতীয় সংসদে সকল দলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে ১৯৯১ সালে ৬ই আগস্ট মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তিত হয়। অবশ্য সরকারি ও বিরোধী দলগুলোর মধ্যে এরূপ পারস্পরিক সমঝোতা দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়নি। জাতীয় সংসদের ঢাকার মিরপুর (১৯৯৩) এবং মাগুরার (১৯৯৪) প্রহসনমূলক উপনির্বাচনে ব্যাপক কারচুপিকে কেন্দ্র করে অচিরেই তাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। জাতীয়ভাবে একধরনের আশঙ্কা তৈরি হয় যে, দলীয় সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচনই অবাধ ও সুষ্ঠু হবে না। অতএব আওয়ামী লীগসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিএনপি সরকারের কাছে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি জানাতে থাকে। এ দাবিতে একপর্যায়ে ১৪৭ জন সদস্য জাতীয় সংসদ থেকে পদত্যাগ করেন। আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের জন্য রাজপথে আন্দোলন শুরু করে। বি.এন.পি. সরকার এ দাবি উপেক্ষা করে ১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬ জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করে। তবে আওয়ামী লীগ ও অন্য দলগুলো এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করে। প্রায় ভোটারবিহীন পরিবেশে তথাকথিত এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বিরোধী দলগুলো নির্বাচন বর্জন করায় এ নির্বাচন গুরুত্ব ও বৈধতা হারায়। চার দিন স্থায়ী ষষ্ঠ জাতীয় সংসদে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী বিল গৃহীত হয় এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সাংবিধানিক ব্যবস্থা করা হয়।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ১৯৯৬ সালের ১২ই জুন সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়লাভ করে সরকার গঠন করে। এরপর আওয়ামী লীগ সরকার গণতন্ত্র শক্তিশালীকরণে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়। এসবের মধ্যে বিভিন্ন সংসদীয় কমিটি গঠনের মাধ্যমে সংসদকে শক্তিশালী করা, সংসদে প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব প্রবর্তন, পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি সম্পাদন, ইউনিয়ন পরিষদ এবং অন্যান্য স্থানীয় সরকারের নির্বাচনে নারীদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হওয়ার পথ উন্মোচন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

২০০১ সালের ১লা অক্টোবর অনুষ্ঠিত অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বি.এন.পি.–জামায়াত সমর্থিত চারদলীয় জোট সরকার গঠন করে। এ সময় দলীয় স্বার্থে, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বিচারপতিদের অবসরের বয়সসীমা ২ বছর বাড়িয়ে ৬৫ থেকে ৬৭ বছর করে পছন্দের লোককে পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগের নীলনকশা প্রণীত হয়। ফলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সম্ভাব্য প্রধান উপদেষ্টা এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনারের নিরপেক্ষতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়। দেশে চরম সাংঘর্ষিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে। ২০০৭ সালে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল মইন ইউ আহমেদের নেতৃত্বে রাজনীতিতে পরোক্ষভাবে সেনা হস্তক্ষেপ ঘটে। তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বাধীন সেনা–সমর্থিত সরকার দুই বছর ক্ষমতাসীন থাকে। এ সময়ে প্রধান দুই রাজনৈতিক দল– বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও বিএনপির নেত্রীদ্বয়ের গ্রেফতার, তাঁদের বিচারে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে তথাকথিত গণতান্ত্রিক সংস্কার আনয়নের উদ্যোগ, একের পর এক অধ্যাদেশ জারি ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ করে অসাংবিধানিক পন্থায় ক্ষমতা স্থায়ীকরণের অপপ্রয়াস চলে। দুই বছর পর এ সরকার নির্বাচন দিতে বাধ্য হয়। ২৯শে ডিসেম্বর ২০০৮ নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নবম এ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট বিপুল বিজয় অর্জন করে সরকার গঠন করে। দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ৫ই জানুয়ারি ২০১৪ অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ববর্তী সরকার পরিচালনায় সাফল্য ও দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য এ নির্বাচনেও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন জোট বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করেছে।

রাজনৈতিক দল

আধুনিক রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার বলতে দলীয় সরকারকেই বোঝায়। রাজনৈতিক দল ব্যতীত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কথা কল্পনা করা যায় না। রাজনৈতিক দলকে কেন্দ্র করেই জনমত গঠন, দলীয় আদর্শের প্রচার, সমর্থকগোষ্ঠী এবং রাজনৈতিক সচেতন নাগরিক সমাজ গড়ে ওঠে।

রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা

সাধারণ ভাষায়, রাজনৈতিক দল বলতে একটি সংগঠিত নাগরিক সমষ্টিকে বোঝায়, যারা দলীয় আদর্শ প্রচারের মাধ্যমে জনমত গঠনের মধ্য দিয়ে বৈধ উপায়ে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করে।

অধ্যাপক গেটেল রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, ‘রাজনৈতিক দল বলতে কমবেশি সংগঠিত একদল লোককে বোঝায়, যারা রাজনৈতিক এককরূপে কাজ করে এবং ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে সরকার গঠন করতে ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে চায়। সংগঠন, কর্মসূচি প্রদান ও ক্ষমতা অর্জন রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্য’।

রাজনৈতিক দল সাধারণত একক কিংবা একদল বিশিষ্ট বা সৃজনশীল নেতৃত্বের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে। সুতরাং এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, রাজনৈতিক নেতৃবর্গের মাধ্যমে নাগরিক সমস্যাকে চিহ্নিত করে, সেই সমস্যাগুলো সমাধানে সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থায় জনমত গঠন এবং বৈধ উপায়ে সরকার গঠনের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত সংঘবদ্ধ একটি জনসমষ্টি হলো রাজনৈতিক দল। জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ ও উন্নতির পাশাপাশি সাংগঠনিক দৃঢ়তা এবং দলীয় সদস্যদের স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখতে রাজনৈতিক দল তৎপরতা প্রদর্শন করে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার রাজনৈতিক দল সম্পর্কে বলেছেন, ‘যারা কতকগুলো সুনির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয় এবং সাংবিধানিক উপায়ে সরকার গঠন করতে চেষ্টা করে, সেই জনসমষ্টিকে রাজনৈতিক দল বলা হয়’।

সুতরাং, রাজনৈতিক দল এমন একটি জনসংগঠন যার সদস্যগণ রাষ্ট্রের সমস্যা সম্পর্কে ঐকমত্য পোষণ করে এবং নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতা অর্জনের মাধ্যমে গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে সচেষ্ট হয়।

রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্য

রাজনৈতিক দলের প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য হলো–

১. রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে আদর্শগতভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে কর্মসূচি ও নীতিমালা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করা;

২. রাষ্ট্রের উন্নয়নমূলক কিছু নীতিমালা ও পরিকল্পনা জনগণের নিকট পেশ করে জনসমর্থন সৃষ্টি করা;

৩. দলীয় নীতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতীয় উন্নতি ও সমৃদ্ধি অর্জন করা এবং জাতীয় স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখা;

৪. বৈধ ও নিয়মতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রের শাসনভার গ্রহণ ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের ভূমিকা

শক্তিশালী ও সুসংগঠিত রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাফল্যের প্রধান শর্ত। অধ্যাপক ফাইনার (Finer) বলেছেন, 'আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসন কার্যত রাজনৈতিক দলের শাসন'। একটি রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক, একনায়কতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক যে ধরনের সরকার ব্যবস্থাই বিদ্যমান থাকুক না কেন, সব ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব স্বীকৃত। বস্তুত গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সর্বাধিক। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা নিম্নে আলোচনা করা হলো :

দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে তার আলোকে প্রতিটি রাজনৈতিক সংগঠন দলীয় নীতিমালা ও সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি গ্রহণ করে। এই নীতিমালা ও কর্মসূচি সাধারণত রাজনৈতিক দলের ইশতেহারে (ম্যানিফেস্টো) উল্লেখ থাকে।

কাজ

একক : গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল কেন অপরিহার্য? উল্লেখ কর।

দলীয় : রাজনৈতিক দলের প্রধান কাজগুলোর তালিকা তৈরি কর।

দলের নীতি ও পরিকল্পনা সম্পর্কে জনগণকে জানানোর জন্য রাজনৈতিক দল সভা–সমিতি, টকশো আয়োজনসহ পত্র–পত্রিকায় মতামত ব্যক্ত করে তাদের নীতি ও কর্মসূচি প্রচার করে এবং জনসমর্থন সৃষ্টি করে।

দেশের জাতীয় নির্বাচনে দলের প্রার্থী মনোনয়ন এবং তার পক্ষে দলীয় প্রচারকার্য চালানো রাজনৈতিক দলের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। মনোনীত প্রার্থীদেরকে নির্বাচিত করার জন্য রাজনৈতিক দল তাদের সমর্থনে ব্যাপক নির্বাচনি প্রচারণা চালায়।

রাজনৈতিক দলের অন্যতম কাজ হচ্ছে নির্বাচনে জয়লাভের পর সরকার গঠন করা। সাধারণত নির্বাচনে যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে, তারাই সরকার গঠন করে থাকে। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে রাজনৈতিক দল তার দলীয় নীতিমালা ও কর্মসূচির ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালনা করে। নাগরিকদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ এবং রাজনৈতিক চেতনা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় বিরোধী দলের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচনে যে সকল দল বা দলসমূহ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারে না তারাই বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করে। বিরোধী দল পার্লামেন্টে বিতর্ক, সরকারের নীতির সমালোচনা, মুলতবি প্রস্তাব উপস্থাপন এবং বিভিন্ন বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করে সংসদকে কার্যকর রাখে। সংসদের বাইরেও বক্তব্য, বিবৃতি ও সমালোচনার মাধ্যমে বিরোধী দল সরকারকে আইনের শাসন অনুশীলনে সহায়তা করে।

এ ছাড়া বিরোধী দল জনগণের সামনে সরকারের পাশাপাশি বিকল্প কর্মসূচি তুলে ধরে। তাই গঠনমূলক সমালোচনা এবং কার্যকর ভূমিকা রাখা বিরোধী দলের অন্যতম দায়িত্ব।

রাজনৈতিক দলের সদস্যরা তাদের নিজ নিজ এলাকায় জনগণের মাঝে মিশে থাকে। সরকারের নীতি ও সিদ্ধান্তসমূহ মানুষের কাছে তুলে ধরে। জনগণ তাদের মতামত ও অভিযোগ রাজনৈতিক দলের সদস্যবৃন্দের মাধ্যমে সরকারের নিকট উত্থাপন করে এবং সরকারের করণীয় দাবি করে। মূলত রাজনৈতিক দল সরকার ও জনগণের মধ্যে যোগাযোগ বা সেতুবন্ধন রচনা করে।

রাজনৈতিক দল যে কোনো স্বাধীন দেশের নাগরিকদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে আন্দোলন গড়ে তোলে। পরাধীনতা থেকে মুক্তি এবং স্বাধীনতার জন্য রাজনৈতিক দল গণআন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান করে। যেমন- বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে আওয়ামী লীগ আন্দোলন–সংগ্রাম পরিচালনা করেছে।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা অপরিহার্য। জনগণের অভাব, অভিযোগ, দুঃখ–দুর্দশাকে চিহ্নিত করে তারা সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে কর্মসূচি প্রণয়ন করে। এছাড়া সংসদীয় ব্যবস্থায় বিরোধী দল হলো বিকল্প সরকার। সরকার সমর্থন হারালে বা কোনো কারণে পতন হলে বিরোধী দলের ক্ষমতা লাভ বা সরকার গঠনের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

গণতন্ত্র ও নির্বাচনের সম্পর্ক

গণতন্ত্রের একটি মৌলিক বিষয় হলো নির্বাচন। নির্বাচন ছাড়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চিন্তা করা যায় না। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে শাসন পরিচালনার জন্য নির্বাচনের বিকল্প নেই। রাষ্ট্র ও সরকারের বিভিন্ন স্তরে জনপ্রতিনিধি বাছাইয়ের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। নির্বাচনে অংশগ্রহণ এবং ভোটদানের মাধ্যমেই জনগণ তাদের এই গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করে। এ প্রক্রিয়ায় জনগণ তাদের দৃষ্টিতে সৎ ও যোগ্য প্রতিনিধি নির্বাচন করে। জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারাই সরকার গঠিত ও পরিচালিত হয়। সুতরাং নির্বাচন ব্যবস্থার সাথে বৈধ কর্তৃপক্ষ নির্বাচন এবং গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের সম্পর্ক রয়েছে।

নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই জনগণ চাইলে পূর্ববর্তী সরকার ও দলকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে। যে সরকার বা দল জনগণের স্বার্থ বা জনমতের বিরোধিতা করে তার বা তাদের প্রতি জনগণের আস্থা থাকে না। নির্বাচনের মাধ্যমেই জনগণ তাদের জবাব প্রদান করে। গণতন্ত্র জনগণের সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি দেয়। জনগণের সার্বভৌমক্ষমতার প্রয়োগ ঘটে নির্বাচনের মাধ্যমে।

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া

প্রাচীন গ্রিসের নগর রাষ্ট্রগুলোতে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র প্রচলিত ছিল। নাগরিকগণই সরাসরি শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করতে পারত। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্র আয়তনে বিশাল এবং এর জনসংখ্যাও বেশি। সবার পক্ষে সরাসরি রাষ্ট্রের শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করা সম্ভব নয়। সুতরাং ভোটদানের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচন করে জনগণ পরোক্ষভাবে এ দায়িত্ব পালন করার সুযোগ পায়।

নির্বাচন হলো রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য নাগরিকবৃন্দ কর্তৃক বিভিন্ন প্রার্থীদের মধ্য থেকে প্রতিনিধি বাছাই প্রক্রিয়া। অন্যকথায়, যে প্রক্রিয়ায় বা পদ্ধতির মাধ্যমে রাষ্ট্রের প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিরা সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রয়োগ করে পছন্দ

চিত্র ৮.১ : বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ভবন

অনুযায়ী প্রতিনিধি বাছাই করে তাকেই নির্বাচন বলে। প্রায় সকল রাষ্ট্রেই গোপন ব্যালটে ভোট দেওয়ার মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। যারা প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষমতা অর্থাৎ ভোটদানের অধিকার ভোগ করেন তাদের ভোটার বা নির্বাচক বলে। সকল ভোটারকে একত্রিতভাবে নির্বাচকমণ্ডলী বলা হয়। প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য সারা দেশকে কতকগুলো নির্বাচনি এলাকায় (constituency) ভাগ করা হয়। এভাবে প্রতিটি এলাকা থেকে প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে পার্লামেন্ট বা আইনসভা গঠিত হয়। বাংলাদেশে নির্ধারিত মেয়াদান্তে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে দুই প্রকার নির্বাচন পদ্ধতি চালু আছে, যথা: প্রত্যক্ষ নির্বাচন ও পরোক্ষ নির্বাচন। যে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ভোটারগণ সরাসরি ভোট প্রদানের মাধ্যমে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে, তাকে প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি বলা হয়। বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি চালু রয়েছে। আর পরোক্ষ নির্বাচন বলতে সাধারণত ঐ নির্বাচন পদ্ধতিকে বোঝায় যেখানে ভোটারগণ ভোট দিয়ে সরাসরি প্রতিনিধি নির্বাচন করে একটি মধ্যবর্তী নির্বাচনি সংস্থা গঠন করে। এ নির্বাচনি সংস্থা ইলেক্টোরাল কলেজ (Electoral College) নামে পরিচিত। ইলেক্টোরাল কলেজ চূড়ান্তভাবে প্রতিনিধি বা রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন করে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি এ পদ্ধতিতে নির্বাচিত হন।

সংসদ নির্বাচনের সুবিধার জন্য সমগ্র বাংলাদেশকে ৩০০টি নির্বাচনি এলাকায় বিভক্ত করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের তারিখ এবং 'নির্বাচনি তফসিল' ঘোষণা করে। নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে প্রার্থীরা প্রাথমিকভাবে মনোনীত হন। প্রধানত রাজনৈতিক দলের মনোনয়ন নিয়েই প্রার্থীরা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ পান। এছাড়াও জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য ৫০টি সংরক্ষিত আসন রয়েছে যা নির্বাচিত আসনের আনুপাতিক হারে নির্ধারণ করা হয়ে থাকে।

নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্বাচনি তফসিল ঘোষণার পরই নির্বাচন প্রক্রিয়া অর্থাৎ নির্বাচন অনুষ্ঠান সংক্রান্ত কাজকর্ম শুরু হয়। এ কাজের তালিকায় মধ্যে আছে– ভোটার তালিকা প্রণয়ন, নির্বাচনি এলাকা নির্ধারণ, রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ, মনোনয়নপত্র বিতরণ, গ্রহণ ও বাছাই প্রভৃতি। প্রার্থীদের প্রতীক বণ্টন, ব্যালট পেপার ছাপানো, ভোটকেন্দ্র নির্ধারণ ও ব্যবস্থাপনা, প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার নিয়োগ, ব্যালট বাক্স বিতরণ, ভোট গ্রহণ ও ভোট গণনা, ফলাফল ঘোষণা প্রভৃতি নির্বাচন প্রক্রিয়ার অংশ। নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধানে ও নিয়ন্ত্রণে এ সকল কাজ সম্পাদিত হয়।

নির্বাচন কমিশনের গঠন, ক্ষমতা ও কাজ

নির্বাচন কমিশনের গঠন

বাংলাদেশে নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। কমিশন স্বতন্ত্র, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচন পরিচালনা করে। এটি একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অনধিক চারজন নির্বাচন কমিশনার নিয়ে এ কমিশন গঠিত হয়। সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্য কমিশনারদের নিয়োগদান করেন। প্রধান নির্বাচন কমিশনার কমিশনের সভাপতি হিসেবে কাজ করেন। কমিশনের মেয়াদ পাঁচ বছর। কমিশনাররা রাষ্ট্রপতির কাছে স্বেচ্ছায় পদত্যাগপত্র পেশ করতে পারেন। অসদাচরণ ও অসামর্থ্যের কারণে কমিশনাররা দায়িত্ব থেকে অপসারিত হতে পারেন।

নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা ও কাজ

নির্বাচন কমিশন স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের সকল নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও তত্ত্বাবধান করে। ভোটার তালিকা বিষয়ক কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হলে কমিশন এর নিষ্পত্তিমূলক সিদ্ধান্ত দেয়। কমিশন ইউনিয়ন পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন ও জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরিচালনা করে। এছাড়াও সংবিধান অনুযায়ী সংসদ সদস্যদের দ্বারা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ব্যবস্থাও নির্বাচন কমিশনের কাজ। নির্বাহী কর্তৃপক্ষ নির্বাচন কমিশনের জন্য সহায়তামূলক কাজ করে।

নির্বাচন কমিশন নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ করে। সীমানা বিতর্কের অবসান ঘটাতে কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হয়। কমিশনই নির্বাচন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় রিটার্নিং অফিসার ও পোলিং অফিসার নিয়োগ করে।

নির্বাচনে মনোনয়নপত্র বাছাই করার দায়িত্ব কমিশনের। মনোনয়নপত্র বাছাই সংক্রান্ত বিষয়ে বিতর্ক দেখা দিলে কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে উপ–নির্বাচনের দায়িত্ব কমিশন পালন করে। কোনো সংসদ সদস্যের অযোগ্যতা সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন দেখা দিলে কমিশন সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। নির্বাচন কমিশন সংবিধান অনুযায়ী ও আইনের দ্বারা অর্পিত দায়িত্ব পালন করে।

নির্বাচনি আচরণবিধি

নির্বাচন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় নির্বাচনি আচরণবিধি নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১. **নির্বাচন সংক্রান্ত বিধিবিধান পালন :** নির্বাচন সংক্রান্ত আইনকানুন ও বিধিবিধান অবশ্যই সকলকে মেনে চলতে হবে।

২. **কোনো প্রতিষ্ঠানে চাঁদা বা অনুদান প্রদান নিষিদ্ধ :** নির্বাচনি তফসিল ঘোষণার পর থেকে ভোট গ্রহণের দিন পর্যন্ত কোনো প্রার্থী তাঁর নির্বাচনি এলাকার কোনো প্রতিষ্ঠানে প্রকাশ্যে বা গোপনে চাঁদা বা অনুদান প্রদান বা প্রদানের অঙ্গীকার করতে পারবেন না। নির্বাচনি এলাকার কোনো উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের অঙ্গীকার প্রদান করাও যাবে না।

৩. **নির্বাচনি প্রচারণা :**

৩.১ রাজনৈতিক দল ও প্রার্থী নির্বিশেষে প্রচারণার ক্ষেত্রে সমান অধিকার ভোগ করবে। প্রতিপক্ষের কোনো সভা, শোভাযাত্রা ও প্রচারে কোনোরূপ বাধা দেওয়া যাবে না।

৩.২ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে কোনো সড়ক বা মহাসড়কে জনসাধারণের চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করে জনসভা করা যাবে না।

৩.৩ সভা বা মিছিলে কেউ বাধা প্রদান করলে তার বিরুদ্ধে পুলিশ কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করতে হবে। প্রার্থী নিজে এবং তার সমর্থকরা আইন নিজের হাতে তুলে নিয়ে কিছু করতে পারবে না।

৩.৪ রাজনৈতিক দল বা প্রার্থী সরকারি প্রচারপত্র, সরকারি যানবাহন, সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারীর সহায়তা কিংবা রাষ্ট্রীয় সুযোগ–সুবিধা ব্যবহার করতে পারবে না।

৩.৫. কোনো প্রার্থীর পোস্টার, লিফলেট ও হ্যান্ডবিলের ওপর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পোস্টার, লিফলেট ও হ্যান্ডবিল লাগানো যাবে না।

৩.৬. রাস্তা বা সড়কের উপর নির্বাচনি ক্যাম্প স্থাপন করা যাবে না।

৩.৭. সরকারি ডাকবাংলো, সার্কিট হাউস, রেস্টহাউস ও সরকারি কার্যালয়কে কোনো দল বা প্রার্থীর নির্বাচনি কার্যক্রম পরিচালনার স্থান হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।

৩.৮. নির্বাচন উপলক্ষে কোনো নাগরিকের জমি, বাড়ি–ঘর বা কোনো স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষতি সাধন করা যাবে না। কারও শান্তি ভঙ্গ হয় এমন কোনো কাজ করা যাবে না।

৩.৯. সকল প্রকার দেয়াল লিখন হতে সকলকে বিরত থাকতে হবে।

৩.১০. ভোট কেন্দ্রের নির্ধারিত সীমার মধ্যে মোটরসাইকেলসহ যান্ত্রিক যানবাহন নিয়ে প্রবেশ করা যাবে না। আগ্নেয়াস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্য বহন আইনত দণ্ডনীয়।

৩.১১. প্রভাবশালী কোনো ব্যক্তি বা সরকারি কর্মকর্তা নির্বাচনি কার্যক্রমে অবৈধ হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না।

৩.১২. ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগে এরূপ উস্কানিমূলক কোনো বক্তব্য প্রদান করা যাবে না।

৪. নির্বাচন প্রভাবমুক্ত রাখা : অর্থ, অস্ত্র, পেশিশক্তি কিংবা স্থানীয় ক্ষমতা দ্বারা নির্বাচনকে প্রভাবিত করা যাবে না।

৫. ভোট কেন্দ্রে প্রবেশাধিকার : কেবল নির্বাচনি কর্মকর্তা, কর্মচারী, প্রার্থী, নির্বাচনি এজেন্ট এবং ভোটারগণ ভোট কেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারবেন। কোনো প্রার্থীর বা দলের কর্মীগণ ভোটকেন্দ্রে ঘোরাফেরা করতে পারবে না।

৬. নির্বাচনি অনিয়ম : আচরণ বিধিমালার যে কোনো বিধানের লঙ্ঘন নির্বাচনপূর্ব অনিয়ম হিসেবে গণ্য হবে। কোনো প্রার্থী বা দল এর প্রতিকার পেতে চাইলে নির্বাচনি এলাকাধীন 'ইলেক্টোরাল ইনকোয়ারি কমিটি' বা নির্বাচন কমিশন বরাবর আবেদন করতে হবে।

নির্বাচনি অপরাধ ও অপরাধের দণ্ড

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ অনুযায়ী নির্বাচনি অপরাধ ও এর দণ্ড নির্ধারণ করা হয়েছে। সংক্ষেপে অপরাধসমূহ ও দণ্ডগুলো নিম্নে দেওয়া হলো :

কাজ

দলীয় : নির্বাচনি আচরণ ভঙ্গের প্রকৃতি চিহ্নিত কর।

ক. নির্ধারিত নির্বাচনি ব্যয়ের বিধান লঙ্ঘন করা।

খ. ঘুষ গ্রহণ করা।

গ. জাল ভোট দেওয়া বা ছদ্মনামে ভোট দেওয়া।

ঘ. নির্বাচনে প্রভাব খাটানো, জোর জবরদস্তি করে ভোট আদায় করা বা ভোটদানে বাধা সৃষ্টি করা।

ঙ. প্রার্থী বা তার আত্মীয়স্বজনের চরিত্র সম্পর্কে মিথ্যা বলা।

চ. কোনো প্রার্থীর প্রতীক সম্পর্কে মিথ্যা বলা।

ছ. কোনো প্রার্থীর প্রার্থিতা প্রত্যাহার সম্পর্কে মিথ্যা বলা।

জ. জাতি, ধর্ম, বর্ণ ইত্যাদি কারণে কোনো প্রার্থীর পক্ষে বা বিপক্ষে ভোটদান সম্পর্কে বলা।

ঝ. ভোটকেন্দ্রের কোনো ভোটারকে ভোট না দিয়ে যেতে বাধ্য করা।

ঞ. বেআইনী আচরণ করা এবং

ট. সভা ও মিছিলের ওপর আরোপিত নিষেধ লঙ্ঘন দুর্নীতিমূলক অপরাধ। এছাড়া ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যালট পেপার বা ব্যালট বাক্স নষ্ট করা, কেন্দ্র হতে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া, ব্যালট পেপার জাল করা, ভোট কেন্দ্র দখল এবং ভোট প্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করাও গুরুতর নির্বাচনি অপরাধ।

অপরাধের দণ্ড

উপরোক্ত যে কোনো অপরাধের জন্য জরিমানাসহ ক্ষেত্র বিশেষ সর্বোচ্চ ১০ বছর এবং কমপক্ষে ২ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হতে পারে। এ সকল নির্বাচন সংক্রান্ত অপরাধের জন্য উপযুক্ত আদালতে মামলা দায়ের করা যায়। তবে নির্বাচন কমিশনের লিখিত অনুমোদন ব্যতীত নির্বাচনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, কর্মচারীদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করা যাবে না।

কাজ

দলীয় : তোমার নির্বাচনি এলাকায় কোনো প্রার্থী আচরণবিধি লঙ্ঘন করলে তিনি কী ধরনের শাস্তি পাবেন, তা উল্লেখ কর।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. গণতন্ত্রের ধারণা তুমি কীভাবে ব্যাখ্যা করবে?

২. নির্বাচনি আচরণবিধি বলতে কী বোঝায়?

৩. প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র বলতে কী বোঝায়?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন :

১. রাজনৈতিক দলের কার্যাবলি তুলে ধর।

২. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের নির্বাচন প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

৩. কী আচরণ করলে নির্বাচনি আচরণ বিধি লঙ্ঘন হয়? আলোচনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. সংবিধানের কততম সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তিত হয়েছে?

ক. চতুর্থ সংশোধনী

খ. অষ্টম সংশোধনী

গ. দশম সংশোধনী

ঘ. দ্বাদশ সংশোধনী

২. গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে–

i. জনগণের আত্মবিকাশের সুযোগ বৃদ্ধি পায়

ii. সরকার দায়িত্ব পালনে সচেতন হয়

iii. শাসন ব্যবস্থায় নিপীড়নমূলক আচরণ বৃদ্ধি পায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. i ও ii

গ. i ও iii

ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন :

১. মিতুলদের ক্লাবের অধিকাংশ সদস্যই সাধারণ সম্পাদক হতে চায়। কেউ কাউকে ছাড় দিতে না চাওয়ায় অবশেষে সবাই মিলে কয়েকজনকে ক্ষমতা অর্পণ করে একজন সম্পাদক বাছাই করার জন্য। উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ পরবর্তীতে তাদের ক্লাবের একজন সাধারণ সম্পাদক বাছাই করে। নতুন সম্পাদক সবার আস্থা অর্জনের জন্য চেষ্টা করলেও পরবর্তীতে তার দূরদর্শিতার অভাব এবং তার কাছের কিছু ব্যক্তির স্বার্থ রক্ষার জন্য তিনি বিতর্কিত হয়ে পড়েন। ফলে সম্পাদক বাছাই প্রক্রিয়াটি প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে।

ক. রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার প্রদত্ত রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞাটি লেখ।

খ. নির্বাচন কমিশন কী? ব্যাখ্যা কর।

গ. মিতুলদের ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক বাছাইয়ের প্রক্রিয়াটি তোমার পঠিত বিষয়বস্তুর আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ‘বাছাই প্রক্রিয়ার দুর্বলতা নিরসন করতে পারলেই সম্পাদক বাছাই প্রক্রিয়াটি সর্বোত্তম হবে।’– মূল্যায়ন কর।

নবম অধ্যায়

জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ

মানবাধিকার ছাড়া কোনো মানুষ পূর্ণাঙ্গভাবে বিকশিত হতে পারে না। মানবাধিকার হলো প্রত্যেক মানুষের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় কিছু সুযোগ-সুবিধার অধিকার। আমাদের পৃথিবীতে দুটি বড় বড় যুদ্ধ হয়েছে। এগুলো হলো– প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। দুটি যুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে। লাখ লাখ মানুষ যুদ্ধে নিহত হয়েছেন। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপকতা এবং ধ্বংসলীলা মানুষকে যুদ্ধের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ও শান্তির জন্য আগ্রহী করে তোলে। গঠন করা হয় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান 'লীগ অব নেশনস'। প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা অর্জনে ব্যর্থ হয়। ১৯৩৯ সালে শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। মানব সভ্যতার ইতিহাসে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের চেয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ছিল আরও কলঙ্কিত ও বিভীষিকাময়। এসময়ে বিশ্বের নেতৃস্থানীয় দেশগুলো একজোট হয়ে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতি সংঘ গঠন করে। বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠাসহ নারী ও শিশুর অবস্থান উন্নয়নে জাতিসংঘ অনেক ভূমিকা রেখে চলেছে। জাতিসংঘ মানবাধিকার এবং বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য বিভিন্ন দেশে প্রয়োজনে শান্তিরক্ষী বাহিনী প্রেরণ করে। এ অধ্যায়ে আমরা জাতিসংঘ এবং জাতিসংঘে বাংলাদেশের ভূমিকা সম্পর্কে জানব।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

- জাতিসংঘ সৃষ্টির পটভূমি বর্ণনা করতে পারব;
- বাংলাদেশে জাতিসংঘের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণে জাতিসংঘের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষী বাহিনীর ভূমিকা মূল্যায়ন করতে পারব;
- বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের কার্যক্রমের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হব।

জাতিসংঘ সৃষ্টির পটভূমি

যুদ্ধ কখনও জাতিতে জাতিতে সংকট নিরসনের পথ হতে পারে না। যুদ্ধ ডেকে আনে ভয়ঙ্কর ধ্বংসলীলা এবং মানবজাতির জন্য অবর্ণনীয় দুর্ভোগ ও অশান্তি। বিশ শতকের ইতিহাসে পৃথিবী জুড়ে দুটি বিশ্বযুদ্ধ ঘটে গেছে। গত শতকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪–১৯১৮) এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯ –১৯৪৫) সংঘটিত হয়। মূলত জাতিগত দ্বন্দ্ব নিরসনে মধ্যস্থতাকারী শান্তিকামী জনতা যুদ্ধের ধ্বংসলীলায় চুপ করে থাকেনি। এরই পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ১৯২০ সালের ১০ই জানুয়ারি বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 'লীগ অব নেশনস' সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু 'লীগ অব নেশনস' –এর সাংগঠনিক দুর্বলতা ও অন্যান্য কারণে বিশ্বশান্তি বিধানে তা ব্যর্থ হয়। ১৯৩৯ সালে পুনরায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা পৃথিবীকে গ্রাস করে। লক্ষ লক্ষ মানুষ নিহত ও আহত হয়। অনেকে গৃহহারা হয় ও পঙ্গুত্ব বরণ করে। প্রতিটি দেশ হারায় তাদের কর্মক্ষম যুবসম্প্রদায়কে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা বিশ্ব বিবেককে ভীষণভাবে নাড়া দেয় ও আতঙ্কিত করে তোলে। এ প্রেক্ষাপটে বিশ্বের তৎকালীন নেতৃবৃন্দ শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য আর একটি নতুন আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। এরপর ১৯৪৩ সালে তেহরানে ও মস্কোতে

সমসাময়িক বিশ্বের ৪টি প্রধান শক্তির একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও ফ্রান্সের প্রতিনিধিবৃন্দ সম্মিলিত জাতিসংঘ গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অবশেষে ১৯৪৫ সালের ২৪শে অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে জাতিসংঘ আত্মপ্রকাশ করে। এজন্য প্রতি বছর ২৪শে অক্টোবরকে জাতিসংঘ দিবস হিসেবে পালন করা হয়। বিশ্বের স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ জাতিসংঘের সদস্য।

পাঁচটি প্রধান অঙ্গ এবং একটি সেক্রেটারিয়েট নিয়ে জাতিসংঘ গঠিত। পাঁচটি অঙ্গ হচ্ছে: সাধারণ পরিষদ, নিরাপত্তা পরিষদ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ, অছি (তত্ত্বাবধায়ক) পরিষদ এবং আন্তর্জাতিক বিচারালয় বা আদালত। জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে সাধারণ পরিষদ গঠিত। সাধারণ পরিষদকে 'বিতর্ক সভা' বলেও অভিহিত করা যায়। নিরাপত্তা পরিষদ হচ্ছে জাতিসংঘের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকরী পরিষদ। ৫টি স্থায়ী ও ১০টি অস্থায়ী মোট ১৫টি সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে এটি গঠিত। ৫টি স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্র হচ্ছে : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া ও চীন। এদের প্রত্যেকের 'ভেটো' প্রদান বা কোনো প্রস্তাব নাকচ করে দেওয়ার ক্ষমতা আছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের কাজ হচ্ছে বিশ্বের উন্নয়ন ও অগ্রগতি সাধন করা। স্বাধীনতাপ্রাপ্ত নয়– এরূপ বিশেষ এলাকার তত্ত্বাবধানের জন্য অছি পরিষদ গঠিত। আন্তর্জাতিক বিবাদ মীমাংসা হচ্ছে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের কাজ। নেদারল্যান্ডসের হেগ শহরে এর কার্যালয় অবস্থিত। সেক্রেটারিয়েট হচ্ছে জাতিসংঘের প্রশাসনিক বিভাগ। সেক্রেটারি জেনারেল বা মহাসচিব প্রধান নির্বাহী। আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে জাতিসংঘের সদর দপ্তর অবস্থিত।

কাজ

দলীয় : জাতিসংঘ সৃষ্টির পটভূমি বর্ণনা কর।

জাতিসংঘের সদস্যপদ

জাতিসংঘ চার্টার বা সনদের নিয়মকানুন মেনে চলতে আগ্রহী বিশ্বের যে কোনো শান্তিকামী দেশ জাতিসংঘের সদস্য হতে পারে। বর্তমানে বিশ্বের ১৯৩টি দেশ জাতিসংঘের সদস্য। বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের ১৩৬তম সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়।

জাতিসংঘের উদ্দেশ্য

জাতিসংঘ সনদে সুস্পষ্টভাবে বিশ্বশান্তি ও সহযোগিতা বিধানের লক্ষ্যে জাতিসংঘের উদ্দেশ্য লিপিবদ্ধ আছে।
উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ :

১. শান্তি ভঙ্গের হুমকি, আক্রমণাত্মক প্রবণতা ও কার্যকলাপ দূর করে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
২. সকল মানুষের সমান অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সহযোগিতা ও বন্ধুত্ব জোরদার করা;
৩. অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সকল জাতির মধ্যে সহযোগিতা গড়ে তোলা;
৪. জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকারের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তোলা;
৫. আন্তর্জাতিক আইনের সাহায্যে আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান নিশ্চিত করা;
৬. প্রত্যেক জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের স্বীকৃতি ও তা সমুন্নত রাখা, এবং
৭. উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য জাতিসংঘের কার্যধারা অনুসরণ করা।

বাংলাদেশে জাতিসংঘের ভূমিকা ও কার্যক্রম

বাংলাদেশে জাতিসংঘের সবক'টি অঙ্গ সংস্থার মিশন আছে। জাতিসংঘের ১৩৬তম সদস্য বাংলাদেশ সবসময়ই এর বিশেষ নজর পেয়ে থাকে। ১৯৭৪ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংধের সাধারণ পরিষদে বাংলা ভাষায় বক্তৃতা প্রদানের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের গভীর মনোযোগ আকর্ষণ করেন। জাতিসংঘের সবক'টি অঙ্গ সংস্থা শুরু থেকেই বাংলাদেশের আর্থ–সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের জন্য কাজ করছে। এ বিশ্ব সংস্থাটির চার জন

মহাসচিব পাঁচ বার বাংলাদেশ সফর করে গেছেন। জাতিসংঘে বাংলাদেশের আর্থিক অবদান কম হলেও বাংলাদেশের সৈন্যরা প্রাণ উৎসর্গ করে শান্তিরক্ষা মিশন পরিচালনায় কার্যকরী ভূমিকা রাখছে। এছাড়া জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করার পর থেকে বাংলাদেশ এই বিশ্ব সংস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ১৯৭৯–৮০ এ সময়ের জন্য নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যপদে বাংলাদেশের নির্বাচন তার এ ভূমিকার স্বীকৃতি এবং বিশ্ব সম্প্রদায়ের আস্থার স্বাক্ষরবাহী। ১৯৮৪ সাল থেকে জাতিসংঘের কার্যপ্রণালিতে বাংলা ভাষার ব্যবহার আমাদের জন্য খুবই গৌরবের। ১৯৮৬ সালে বাংলাদেশের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৪১তম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। তাঁর এই সভাপতি নির্বাচিত হওয়া বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশের বিশেষ ভূমিকার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। বিবাদের শান্তিপূর্ণ মীমাংসায় জাতিসংঘ ঘোষিত নীতি অনুসরণ করে বাংলাদেশ ভারতের সঙ্গে গঙ্গার পানি বণ্টন বিষয়ক দীর্ঘকালের সমস্যা নিরসনে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের সংঘাতময় পরিস্থিতির সুষ্ঠু সমাধানে সফল হয়েছে। বাংলাদেশে জাতিসংঘের নিম্নোক্ত অঙ্গ সংস্থাগুলো কাজ করছে :

জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি বা ইউএনডিপি (UNDP) – বাংলাদেশের আর্থিক ও সামাজিক তথা অর্থাৎ– সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ইউএনডিপি দেশব্যাপী অসংখ্য কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ২০১৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশে ইউএনডিপি সহাস্রাব্দ (মিলেনিয়াম) উন্নয়নের ৮টি লক্ষ্যমাত্রা (MDG) অর্জনে কাজ করেছে। বর্তমানে টেকসই উন্নয়নের ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা (SDG) অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করছে।

জাতিসংঘ শিশু তহবিল বা ইউনিসেফ (UNICEF) – দেশের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের মৌলিক অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে বিশেষত শিক্ষা ও চিকিৎসা নিশ্চিত করার জন্য ইউনিসেফ কাজ করছে।

জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা (UNESCO) – বাংলাদেশের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি উন্নয়নের লক্ষ্যে সংস্থাটি কাজ করছে।

জাতিসংঘের খাদ্য এবং কৃষি সংস্থা বা এফএও (FAO) – বাংলাদেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিশ্চিত করার জন্য জাতিসংঘের খাদ্য এবং কৃষি সংস্থা কাজ করছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা ডব্লিউএইচও (WHO) – স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বাংলাদেশে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছে, যেমন– বাংলাদেশের পোলিও নিবারণের জন্য শিশুদের বিভিন্ন ধরনের ঔষধ খাওয়াচ্ছে এবং টিকা দিচ্ছে।

উদ্বাস্তু বিষয়ক জাতিসংঘ হাইকমিশনারের কার্যালয় বা ইউএনএইচসিআর (UNHCR) – বাংলাদেশ–মিয়ানমার ইস্যুতে এই কার্যালয় মধ্যস্থতা করছে। বিশাল শরণার্থী পালনের খরচেও অবদান রাখছে। তাছাড়া বাংলাদেশে বিহারী জনগোষ্ঠীর আবাসনসহ অন্যান্য ইস্যুতে এই সংস্থা ব্যাপক অবদান রেখেছে।

কাজ

দলীয় : জাতিসংঘের ভূমিকায় বাংলাদেশ কীভাবে লাভবান হয়েছে? বিবরণ দাও।

জাতিসংঘ নারী উন্নয়ন তহবিল বা ইউনিফেম (UNIFEM) – বাংলাদেশে নারীদের উন্নয়নে এ সংস্থাটি বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি পালন করছে। নারীদের বিভিন্ন ধরনের অধিকার আদায়ে ভূমিকা রাখছে এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে তাদের সংশ্লিষ্ট করছে। নারীদের নিরাপদ শ্রম অভিবাসনসহ বিভিন্ন ইস্যুতেও এ সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে।

জাতিসংঘের জনসংখ্যা কার্যক্রম তহবিল (UNFPA) – সংস্থাটি বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিস্থিতি উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে জাতিসংঘের কার্যাবলি খুবই প্রশংসনীয়।

নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণে জাতিসংঘের ভূমিকা

নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণে এবং নারীর অধিকার সংরক্ষণের জন্য জাতিসংঘ তার সৃষ্টিলগ্ন থেকেই বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সনদ ও আইন প্রণয়ন করে। ১৯৪৮ সালে মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র ছাড়াও জাতিসংঘ নারী উন্নয়নে যেসব কাজ করে তা হলো :

১. ১৯৪৯– মানব পাচার দমন ও পতিতাবৃত্তি অবসানের জন্যে জাতিসংঘ সনদ অনুমোদন।

২. ১৯৫১– আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) কর্তৃক একধরনের কাজের জন্য নারী ও পুরুষ শ্রমিকের একই বেতন প্রদান।

৩. ১৯৫২– নারীর রাজনৈতিক অধিকারের স্বীকৃতি । নির্বাচনে নারী ভোট প্রদান ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে।

৪. ১৯৫৭– বিবাহিত নারী জাতীয়তা সংরক্ষণ বা পরিবর্তন করতে পারবে।

৫. ১৯৬০– নারীদের কর্মসংস্থান ও পেশাক্ষেত্রে বৈষম্য বিলোপ সনদ অনুমোদন ।

৬. ১৯৬২– বিয়ের ন্যূনতম বয়স ও রেজিস্ট্রেশন সনদ অনুমোদন।

৭. ১৯৬২– বালিকা ও নারীদের শিক্ষাক্ষেত্রে সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা ।

৮. ১৯৭৫– নারী বছর ঘোষণা।

৯. ১৯৭৫– প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলন, মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত হয়।

১০. ১৯৭৬–১৯৮৫– নারী দশক ঘোষণা।

১১. ১৯৭৯– নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ, সিডও (CEDAW) নামে অভিহিত। ১৯৮১ সালে এই সনদ কার্যকর হয়।

১২. ১৯৮০– দ্বিতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলন ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত হয়।

১৩. ১৯৮৫– তৃতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলন কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবিতে অনুষ্ঠিত হয়।

১৪. ১৯৯২ – রিও ডি জেনেরোতে পরিবেশ ও উন্নয়ন সম্মেলনে পরিবেশ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় নারীর ভূমিকার স্বীকৃতি।

১৫. ১৯৯৩– অস্ট্রিয়ার ভিয়েনা সম্মেলনে নারীর অধিকারকে মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দান।

১৬. ১৯৯৫– চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন, বেইজিং। এ বিশ্ব নারী সম্মেলনের ঘোষণা ছিল–'নারীর চোখে বিশ্ব দেখুন'। এ সম্মেলনে প্লাটফরম ফর অ্যাকশন বা বেইজিং কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

১৭. ২০০০– বেইজিং প্লাস ফাইভ সম্মেলন নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হয়।

১৮. ২০০৫– বেইজিং প্লাস টেন সম্মেলন নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হয়।

এভাবে নারীদের কল্যাণে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রটোকল, সেমিনার ও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে জাতিসংঘ অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ বা সিডও ১৯৭৯ (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women Or CEDAW 1979) :

নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদটি 'সিডও' নামে পরিচিত। ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বর মাসে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে এটি গৃহীত হয়। ১৯৮১ সালে ২০টি দেশ সমর্থন করার পর এটি কার্যকর হয়। বাংলাদেশসহ মোট ১৩২টি দেশ বর্তমানে সনদটি সমর্থন করেছে। এই সনদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো– এটি নারীর অধিকারের একটি পূর্ণাঙ্গ দলিল। এটি বিভিন্ন সময়ে নারীর প্রতি বৈষম্য নিরসনে গৃহীত বিভিন্ন ইস্যুকে সমন্বিত করে।

কাজ

দলীয়: বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্যের ছক প্রস্তুত কর এবং জাতিসংঘের ভূমিকা চিহ্নিত কর:

নারীর প্রতি বৈষম্যের ক্ষেত্র	জাতিসংঘের ভূমিকা

নারীর প্রতি বৈষম্য নিরসনে সিডও সনদের ভূমিকা

নারী ও পুরুষের সমতার নীতির ওপর ভিত্তি করে সিডও সনদটি তৈরি। নারীর মানবাধিকারের বিষয়টিও এখানে উঠে এসেছে। আইনগত পদ্ধতিতে এই অধিকারগুলো ম্যান্ডেটভুক্ত করার সমর্থনকারী দেশগুলো এই সনদ মেনে চলতে বাধ্য। এই সনদে স্বীকার করা হয় যে, বিভিন্ন দেশে নারীর আইনগত অধিকার কাগজে থাকলেও বৈষম্য রয়েছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে নারীর প্রবেশাধিকার খর্ব করার মাধ্যমে তা করা হয়ে থাকে। এই সনদ নারীর প্রতি রাষ্ট্রের দায়িত্বকে নিশ্চিত করে। সিডও সনদে ৩০টি ধারা আছে। প্রথম ১৬টি ধারা নারীর প্রতি কত প্রকার বৈষম্য আছে তা বিশ্লেষণ করে। আর পরের ১৪টি ধারা ব্যাখ্যা করে এ বৈষম্যগুলো কীভাবে বিলোপ করা যায়।

নারী নির্যাতন প্রতিরোধে ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ২৫শে নভেম্বরকে 'আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস' হিসেবে পালনের ঘোষণা দেওয়া হয়। ২৫শে নভেম্বর থেকে ১০ই ডিসেম্বর বিশ্বব্যাপী পালিত হয় নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ। জাতিসংঘ ৮ই মার্চকে বিশ্ব নারী দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে। নারীর উন্নয়নের জন্য জাতিসংঘ জন্মলগ্ন থেকে অনেক কাজ করছে এবং নারীদের অবস্থানকে অনেক উন্নত করেছে।

জাতিসংঘে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষী বাহিনীর ভূমিকা

বাংলাদেশ একটি শান্তিপ্রিয় দেশ। আর জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা হয়েছে বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। স্বভাবতই জাতিসংঘের শান্তি রক্ষা মিশনগুলোতে বাংলাদেশের অবদান ঈর্ষণীয়। বর্তমানে প্রায় ১১,০০০ এর বেশি বাংলাদেশি সৈন্য বিশ্বের ১১টি দেশে জাতিসংঘের অধীনে শান্তিরক্ষা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

চিত্র ৯.১ জাতিসংঘের শান্তিমিশনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী

আফ্রিকার দেশগুলোতে বাংলাদেশি সৈন্যদের অভূতপূর্ব সাফল্য সারা বিশ্বে বাংলাদেশের গ্রহণযোগ্যতাকে অনেক বৃদ্ধি করেছে। বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার মডেল হিসেবে এবং শান্তিপ্রিয় জাতি হিসেবে বাংলাদেশ পরিচিতি পেয়েছে।

আফ্রিকা এবং এশিয়ার বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বের কারণে অন্যান্য দেশের সৈন্যরা যেখানে গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছিল না সেখানে বাংলাদেশি সৈন্যরা শুধু গ্রহণযোগ্যতা নয়, পেয়েছে স্থানীয় মানুষের ভালোবাসা, শ্রদ্ধা। সিয়েরা লিওনে বাংলা ভাষা পেয়েছে সেই দেশের দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা। আইভরিকোস্টে অন্যতম ব্যস্ত সড়কের নাম হয়েছে 'বাংলাদেশ সড়ক'।

চিত্র ৯.২ জাতিসংঘের শান্তিমিশনে বাংলাদেশ পুলিশবাহিনী

শান্তিমিশনে শুধু বাংলাদেশ সেনাবাহিনী নয়, পাশাপাশি পুলিশ বাহিনী ও মহিলা পুলিশও নিয়োজিত আছেন। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে জাতিসংঘে তথা বিশ্বে বাংলাদেশ পেয়েছে ব্যাপক পরিচিতি ও বিশেষ মর্যাদা।

জাতিসংঘের শান্তিরক্ষার মিশন সহজ ছিল না। আফ্রিকা ও এশিয়ার দেশগুলোতে যুদ্ধংদেহী দুই বা ততোধিক সশস্ত্র গেরিলাগোষ্ঠীর মাঝে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশি সৈন্যরা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে অস্ত্র বিরতি পর্যবেক্ষণ করেছে। শান্তি

প্রতিষ্ঠার কাজ করেছে। এ কাজে এখন পর্যন্ত ৮৮ জন বাংলাদেশি সৈন্য বিশ্ব শান্তির জন্য শহিদ হয়েছেন। আহত হয়েছে অনেকে। বাংলাদেশি সৈন্যরা প্রমাণ করেছে শান্তির জন্য তারা জীবন দিতে প্রস্তুত।

বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশের পথে, অধিকন্তু এর আছে বিশাল জনগোষ্ঠী। বিশাল জনগোষ্ঠীর প্রশিক্ষিত সামরিক–বেসামরিক বাহিনী বিশ্ব শান্তিরক্ষার জন্য জাতিসংঘের মাধ্যমে অবদান রাখছে। উন্নত দেশগুলো অর্থ দিয়ে জাতিসংঘে অবদান রাখছে। বাংলাদেশ তার সেনাবাহিনী ও পুলিশ বাহিনীর মাধ্যমে বিশ্বশান্তি রক্ষায় রেখেছে এক অনন্য অবদান ; বৃদ্ধি করেছে দেশের মর্যাদা ও গৌরব।

কাজ
একক : জাতিসংঘে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষী বাহিনীর ভূমিকার ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত কর।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. সিয়েরা লিওনে বাংলা ভাষা দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পেয়েছে কেন?

২. ভেটো কী?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন :

১. জাতিসংঘ সৃষ্টির প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা কর।।

২. বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের অবদান মূল্যায়ন কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. বাংলাদেশ কত সালে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে?

ক. ১৯৭৪

খ. ১৯৮০

গ. ১৯৮৪

ঘ. ১৯৮৬

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ২ ও ৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

তাপস রায় আফ্রিকার একটি অঞ্চল থেকে তার স্ত্রীকে জানান, সেখানে যুদ্ধরত দলগুলোর মধ্যে যুদ্ধবিরতি ঘটাতে তাদের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে এবং তারা সকল শ্রেণির আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়েছেন।

২. তাপস রায় দেশের পক্ষে যে কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছেন তা হলো–

i. জাতিসংঘ মিশন

ii. শান্তিরক্ষা মিশন

iii. বাংলাদেশ মিশন

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

৩. উক্ত কার্যক্রমে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের কী অর্জন হয়েছে?

ক. বিশ্বশান্তি

খ. সুশৃঙ্খল বাহিনী গঠন

গ. বহির্বিশ্বে প্রভাব বিস্তার

ঘ. শক্তি বৃদ্ধিতে উন্নত কৌশল

সৃজনশীল প্রশ্ন :

১. গৃহবধূ রিতা উচ্চশিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও পরিবারের পক্ষ থেকে তাকে কোনো কর্মক্ষেত্রে যোগদানের অনুমতি দেওয়া হয়নি। অনেক যুক্তি ও সংগ্রামের পরে তিনি একটি প্রাইভেট ফার্মে চাকরি লাভ করেন। সেখানে একই পদমর্যাদা ও দক্ষতার পুরুষ সহকর্মী অপেক্ষা তাকে কম আর্থিক সুবিধাদি দেওয়া হয়। একপর্যায়ে যথাযোগ্য সম্মান ও প্রাপ্য সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য তিনি কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করেন; অবশেষে সফলও হন। সিয়েরা লিওনে কর্মরত বাংলাদেশ পুলিশের সদস্য রিতার ভাই লাভলু এ সংবাদ জেনে অত্যন্ত খুশি হন এবং তিনি বোনকে অভিনন্দন জানান।

ক. 'লীগ অব নেশনস' কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?

খ. জাতিসংঘের বিতর্ক সভা বলতে কী বোঝায়?

গ. রিতার মতো নারীর অধিকার আদায়ে জাতিসংঘের কোন অঙ্গ সংস্থা কাজ করছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. রিতার ভাই লাভলু দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে অবদান রেখে চলেছেন– তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও।

দশম অধ্যায়

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)

আন্তর্জাতিক সংস্থা জাতিসংঘ গঠিত হওয়ার পর থেকে এর উদ্দেশ্যগুলো অর্জনে সংস্থাটি অনেক সাফল্য লাভ করেছে। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত হয়ে সকলের সম্ভাবনা, মর্যাদা ও সমতা নিশ্চিত করতে জাতিসংঘ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশ উন্নয়নের সমন্বয়ে ‘টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট’ (এসডিজি) অর্জনে জাতিসংঘ কাজ করে যাচ্ছে। পূর্ববর্তী শ্রেণিতে আমরা এসডিজি সম্পর্কে ধারণা পেয়েছি। জাতিসংঘ নির্ধারিত এসডিজি অর্জনে বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে সাথে বাংলাদেশও সমান তালে কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু এ কাজ খুব সহজ নয়। এ কাজে সরকার ও জনগণকে একযোগে কাজ করতে হবে। এ অধ্যায়ে এসডিজি অর্জনে অংশীদারিত্বের গুরুত্ব, এসডিজি অর্জনের ফলাফল, এসডিজি অর্জনে বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জ এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আমাদের করণীয় সম্পর্কে জানব।

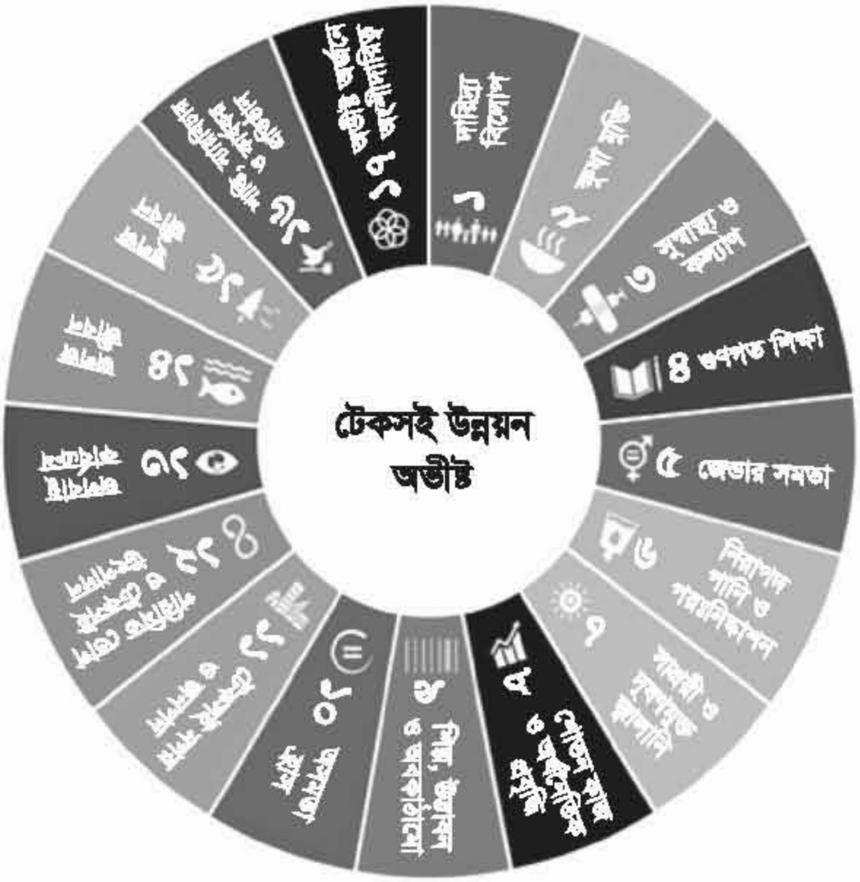
টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট
১ দারিদ্র্য বিলোপ
২ ক্ষুধা মুক্তি
৩ সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ
৪ গুণগত শিক্ষা
৫ জেন্ডার সমতা
৬ নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন
৭ সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানি
৮ শোভন কাজ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
৯ শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭ অভীষ্ট অর্জনে অংশীদারিত্ব

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে অংশীদারিত্বের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের ফলাফল বিশ্লেষণ করতে পারব;
- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করতে পারব;
- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয় ব্যাখ্যা করতে পারব;

- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে করণীয় সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য পোস্টার ডিজাইন করতে পারব;
- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে অনুপ্রাণিত হব।

পাঠ-১: টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে অংশীদারিত্বের গুরুত্ব

এসডিজি অর্জনে অংশীদারিত্বের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করার পূর্বে আমাদের জানা দরকার অংশীদারিত্ব কী? উন্নয়নের সুফল ভোগকারী গোষ্ঠীই হলো অংশীজন। তারা যদি উন্নয়নের সুফল ভোগ করতে চায় তাহলে অংশীজন হিসেবে তাদের কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকে। সেই দায়িত্ব ও কর্তব্য ঠিকমতো পালন করলে উন্নয়নে তাদের অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। উন্নয়ন কর্মী বা সরকারের একার পক্ষে উন্নয়ন গতিধারাকে অব্যাহত রাখা সম্ভব নয়। যেমন ধরা যাক, ভালো ফসল ফলানোর জন্য সরকার বা কোনো উন্নয়ন সংগঠন সার ও প্রয়োজনীয় কীটনাশক সরবরাহ করবে। কিন্তু যারা এটি ব্যবহার করবে তারা যদি অসচেতনভাবে মাত্রার অতিরিক্ত ব্যবহার করে তা কখনো পরিবেশবান্ধব হবে না। এক্ষেত্রে তাদের দায়িত্ব হচ্ছে সচেতনতার সাথে পরিমিত সার ও কীটনাশক ব্যবহার করা। কেবল ব্যক্তিক লাভের কথা চিন্তা না করে সামষ্টিক উপকারিতা কীভাবে আসবে সেটি চিন্তা করে কাজ করাটা হলো এক ধরনের অংশীদারিত্ব। যে কোনো উন্নয়ন কর্মকাণ্ডই পরিচালিত হোক না কেন তা যেন সকলের কথা ভেবে হয়। যার যতটুকু দায়িত্ব তা স্ব স্ব অবস্থানে থেকেই পালন করতে হবে। এসডিজি বাস্তবায়নে অংশীদারিত্বের গুরুত্ব একটি প্রধান বিবেচ্য বিষয়। এক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি খাতকে এগিয়ে আসতে হবে। শুধু বেসরকারি খাত বা সংগঠন নয়, তৃণমূল পর্যায় থেকে শুরু করে ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও সমাজের সর্বস্তরের অংশগ্রহণ ও মিলিত প্রচেষ্টায় একযোগে উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে কাজ করতে হবে। বিচ্ছিন্নভাবে পরিচালিত তৎপরতাকে আরও সুসমন্বিত করতে হবে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে জাতীয় পর্যায়ের সঙ্গে অংশীদারিত্বের গুরুত্ব রয়েছে। অংশীদারিত্বের প্রক্রিয়ায় সমাজের উঁচুতলার সঙ্গে সাধারণ মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ফলে সাধারণ মানুষ এসডিজি অর্জনে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন হবে। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব খুবই গুরুত্ব বহন করে। এসডিজি অর্জন কেবল নিজ দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এটা পৃথিবীর সব দেশের সব মানুষের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য।

এসডিজি অর্জনে সমাজের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের কথা যেমন চিন্তা করা হচ্ছে, তেমনি সমাজ ও রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের অংশীদারিত্বকে নিশ্চিত করে উন্নয়নের স্বার্থে কাজ করতে হবে।

তবে সব অভীষ্ট সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য নাও হতে পারে। যে দেশের জন্য যেসব অভীষ্ট অর্জন জরুরি তারা সেগুলোকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করবে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ দিক

হচ্ছে সার্বিক সক্ষমতা অর্জন। টেকসই উন্নয়নের প্রধান একটি অভীষ্ট হচ্ছে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা গড়ে তোলা। এক্ষেত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা পারস্পরিক অংশীদারিত্বের সূচনা করে। যে দেশের যে ধরনের সক্ষমতা রয়েছে সে দেশ সেভাবে নিজেদের ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সামষ্টিক উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ অর্জনে এগিয়ে আসবে। কাউকে পিছিয়ে রেখে অন্যরা এগিয়ে গেলে সেই উন্নয়ন জাতীয় ও বৈশ্বিকভাবে টেকসই হবে না।

কাজঃ টেকসই উন্নয়নে অংশীদারিত্ব কেন প্রয়োজন আলোচনা করে লেখ।

পাঠ-২: টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের সম্ভাব্য ফলাফল

বর্তমান পৃথিবী নামক গ্রহটির অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থেই এসডিজি বাস্তবায়ন করা জরুরি। বিশেষভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সারা পৃথিবীর সচেতন মানুষকে শঙ্কিত করে তুলেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মানুষ, সমাজ, কৃষি উৎপাদন, স্থলজ ও জলজ প্রাণিকুলকে ক্রমাগত মারাত্মক হুমকির মধ্যে ফেলে দিচ্ছে। এর হাত থেকে রক্ষা পেতে বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রতিটি দেশ এসডিজি বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক বিবেচনায় এবং সামাজিক সূচকের নিরীখে এগিয়ে যাচ্ছে। দারিদ্র্য কমেছে, আয় বেড়েছে, অনেক ক্ষেত্রে সক্ষমতাও এসেছে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। আমরা এমডিজি অর্জনে অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করেছি। আমরা ভবিষ্যৎ উন্নয়নে আশাবাদী। আগামী দশকগুলোতে আমরা বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলার মতো আর্থ-সামাজিক সক্ষমতা অর্জন করে চলেছি। এমডিজি অর্জনের হাত ধরেই বর্তমানে এসডিজি বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে। আশা করা যায় এটিও আমরা সফলভাবে অর্জন করতে পারব। এর ফলে দারিদ্র্যের অবসান ঘটবে। বৈষম্য কমে আসবে, আয় ও ভোগের মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টি হবে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পারস্পরিক সহযোগিতা সৃষ্টির ফলে বৈশ্বিক অঙ্গনে একটি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বিরাজ করবে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যে সুবিধাগুলো সৃষ্টি হবে তা হলো বৈদেশিক ঋণের বোঝা থাকবে না। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। নারী-পুরুষ বৈষম্য দূর হবে। সকলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশের উন্নয়নে অবদান রাখবে। শিক্ষা, সংস্কৃতি, জ্ঞানচর্চার দ্বার উন্মোচিত হবে। অবাধ তথ্য প্রবাহ এবং তথ্য অধিকার সংরক্ষিত হবে। যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত উন্নয়নের ফলে আমরা নিজেদেরকে বিশ্ব নাগরিক হিসেবে ভাবতে শিখব। খেলাধুলা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে আমরা এগিয়ে যাব। এক উন্মুক্ত বিশ্বে বসবাস করার সকল সুযোগ আমাদের দোর গোড়ায় পৌঁছে যাবে। আমরা সুখী ও সমৃদ্ধ জাতি হিসেবে নিজেদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করতে পারব। বাংলাদেশ এসডিজি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সম্ভাব্য যেসব ফলাফল লাভ করবে তা নিম্নরূপ-

- দারিদ্র্যসীমা শূন্যের কাছাকাছি নিয়ে আসা যাবে।
- মৌলিক চাহিদা অর্থাৎ অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার চাহিদা পূরণ হবে।
- জেন্ডার সমতাবিধান ও নারী এবং মেয়েদের ক্ষমতায়নের ফলে সমাজের সকল স্তরে নারী নির্যাতন হ্রাস পাবে।

- গ্রাম ও শহরে বিশুদ্ধ পানি ও সুষ্ঠু পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা গেলে ভালোভাবে বেঁচে থাকার পরিবেশ তৈরি হবে।
- বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়, নদীভাঙনসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রশমন হবে।
- টেকসই নবায়নযোগ্য জ্বালানি বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষি ও শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।
- সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হলে নৈরাজ্য কমে আসবে এবং স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে।
- গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ শক্তিশালী হলে রাজনৈতিক অস্থিরতা হ্রাস পাবে।
- বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে অংশীদারিত্ব বাড়ানোর ফলে অনেক সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা নিরসন হবে।

কাজ-১: টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের ফলে বাংলাদেশের কী কী সুবিধা হবে দলগত কাজের মাধ্যমে পোস্টার পেপারে উপস্থাপন কর।

কাজ-২: টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জিত হলে আমরা যে সুবিধাগুলো ভোগ করব সে বিষয়ে ধারণা মানচিত্র অঙ্কন কর।

পাঠ-৩: টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশ জাতিসংঘ নির্দেশিত ‘সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য’ (এমডিজি) অর্জনে ইতোমধ্যে অনুসরণীয় সাফল্য দেখিয়েছে। বাংলাদেশকে বলা হচ্ছে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের রোল মডেল। জাতিসংঘ ঘোষিত এসডিজি বা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (Sustainable Development Goals) অর্জনে অংশীদারিত্বের পারস্পরিক দায়িত্ব পড়েছে বাংলাদেশসহ জাতিসংঘের সকল সদস্য দেশের উপর। এর উদ্দেশ্য হলো বিশ্বের সর্বত্র সার্বিক ও সর্বজনীন কল্যাণ। পরিবর্তনশীল বিশ্বের সমতা ও বৈষম্যহীন উন্নয়ন নিশ্চিত করতে ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি অর্জন করতে হবে। পৃথিবীর সকল দেশ এ লক্ষ্য অর্জনে অঙ্গীকারবদ্ধ। এ পাঠে আমরা বাংলাদেশ এ লক্ষ্যগুলো অর্জনের ক্ষেত্রে কী কী চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে পারে সে বিষয়ে জানব।

একটি দেশকে উন্নয়নের শিখরে পৌঁছাতে হলে সামগ্রিক উন্নয়নের কথা ভাবতে হয়। আর টেকসই উন্নয়ন হলো সামগ্রিক উন্নয়নের কাঠামোবদ্ধ পরিকল্পনা। টেকসই উন্নয়নের পথে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো সম্পদের অসম বণ্টন, বৈষম্য ও দারিদ্র্য। আমরা একদিকে যখন দারিদ্র্য বিমোচনের কথা বলছি অন্যদিকে বিশ্বে তখন সম্পদের বৈষম্য বেড়েই চলেছে। ধনী-গরিবের ক্রমবর্ধমান ব্যবধান দারিদ্র্যকে আরও প্রকট করে তুলেছে। বিশ্বে সম্পদের বৈষম্য যত বাড়বে ধনী ও গরিবের বিভক্তি তত প্রকট হবে। আর বিভক্তি যত বাড়বে, বিদ্বেষ-বিভেদও তত বাড়তে থাকবে।

বর্তমানে পৃথিবীব্যাপী যে উন্নয়ন ঘটেছে তা ভারসাম্যহীন। এই উন্নয়ন হচ্ছে দেশে দেশে এবং মানুষে-মানুষে বিভেদ সৃষ্টিকারী, বিভেদ বর্ধনকারী উন্নয়ন। এই প্রকট ও ক্রমবর্ধমান বৈষম্য ও বিভক্তি টেকসই উন্নয়নের পথে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশও এই চ্যালেঞ্জের বাইরে নয়। যদিও বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সময়ে দারিদ্র্য ও অতিদারিদ্র্য উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। তবে একটি বিশেষ লক্ষণীয় দিক হলো আয় ও

ভোগ বৈষম্য। গত কয়েক বছরে এই বৈষম্য বাড়েনি বরং কিছুটা কমেছে, তথাপি বিদ্যমান বৈষম্য প্রকট। আমাদের সম্পদ বৈষম্য ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। সমাজে এক শ্রেণির মানুষ ভূমি দখল, নদী দখল, বন দখল এমনকি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান কুক্ষিগত করে অপরিমিত সম্পদশালী হয়েছে। এর ফলে ভারসাম্যহীন সমাজ গড়ে উঠছে ও পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী উন্নয়নের অব্যাহত যাত্রা এবং অনিয়ন্ত্রিত জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারের ফলে জলবায়ু পরিবর্তনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যাচ্ছে। ব্যক্তি পর্যায় থেকে সামষ্টিক পর্যায়-সর্বত্র জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার অভাব টেকসই উন্নয়নের পথে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

পাবলিক ও প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়হীনতা এবং অংশীদারিত্ব না থাকলে টেকসই উন্নয়ন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখী হবে। শুধু সম্পদ বৈষম্যই নয়, আয়, ভোগ, জেন্ডার এবং অঞ্চল বৈষম্যও কখনো কখনো টেকসই উন্নয়নে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে। অপরিকল্পিত শিল্পায়ন ও নগরায়ণের ফলে সৃষ্ট সমস্যা টেকসই উন্নয়নের পথে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ হিসেবে কাজ করবে। সামাজিক বিপর্যয়ের পাশাপাশি প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা করার প্রয়োজনীয় প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা না থাকা-উন্নয়নের গতিকে পথরোধ করবে। প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত দুর্বলতা, গ্যাস, তেল, বিদ্যুৎ ঘাটতি ও কৃষিপণ্য সুষ্ঠু বাজারজাতকরণের অব্যবস্থা প্রভৃতি কারণে এসডিজি অর্জন বেশ কঠিন হবে বলে ধারণা করা যায়।

কাজ -১: এসডিজি অর্জনে বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত কর।

কাজ -২: 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে বড় চ্যালেঞ্জই হলো সকল ক্ষেত্রে বৈষম্য'- পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন কর।

কাজ-৩: 'টেকসই উন্নয়নের পথে প্রধান চ্যালেঞ্জ জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশদূষণ'- এ বিষয়ে শ্রেণিকক্ষে বিতর্কের আয়োজন কর।

পাঠ-৪: চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয়

আমরা জেনেছি যে, টেকসই উন্নয়নের প্রধান ক্ষেত্র হলো আমাদের সমাজ, অর্থনৈতিক বিবেচনা এবং পরিবেশ সংরক্ষণ। এগুলোকে মৌলিক বিবেচ্য বিষয়ও বলা হয়ে থাকে। মূলত এই তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করে যদি উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয় তাহলে সকল ক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়ন আশা করা যায়। টেকসই উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা সরকারের একার পক্ষে, ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে স্ব স্ব অবস্থানে থেকে প্রত্যেককেই এগিয়ে আসতে হবে। সকলের সচেতনতা রাষ্ট্রকে উন্নয়নের আরও এক ধাপ সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, উন্নয়নের পথে একটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো পরিবেশদূষণ।

আমরা দেখতে পাই, একটানা বৃষ্টি হলেই বাংলাদেশের বড় বড় শহরগুলোতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়। তখন যান চলাচল ব্যাহত হয়, রাস্তা-ঘাটের ক্ষতি হয়, স্বল্প আয়ের লোকদের কাজ বন্ধ থাকে, আমরা ঠিকমতো স্কুল, কলেজ বা কর্মস্থলে পৌঁছাতে পারি না, দোকানপাট বন্ধ থাকে, রোগ ব্যাধির প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। আসলে আমরাই আমাদের শহরগুলোকে নষ্ট করে ফেলছি। নির্দিষ্ট স্থানে ময়লা না ফেলে যত্রতত্র ময়লা আবর্জনা, পলিথিন ব্যাগ, চিপসের প্যাকেট ইত্যাদি ফেলছি। ফলে রাস্তার পাশের ড্রেনগুলো বন্ধ হয়ে পানি

ঠিকমতো নির্গমন হচ্ছে না। দীর্ঘ সময়ব্যাপী পানি জমে নানা সমস্যা ও সংকট তৈরি করছে। এ অবস্থা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। সবার আগে আমাদেরকে সচেতন হতে হবে। আমরা জেনেছি যে বাংলাদেশকে এসডিজি বাস্তবায়ন করতে হাজারও চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হবে। এবার আমরা এ সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কী কী করতে পারি তা চিহ্নিত করি।

সকল ক্ষেত্রে বৈষম্য সহনীয় পর্যায়ে নামিয়ে আনা এসডিজি বাস্তবায়নে অত্যন্ত জরুরি। এক্ষেত্রে আয়, ভোগ, জেন্ডার, অঞ্চল ও সম্পদ বৈষম্য যথাসম্ভব কমিয়ে এনে সকল ক্ষেত্রের দরিদ্রতার অবসান ঘটাতে হবে। এ লক্ষ্যে যথাযথ কৌশল ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। সরকার ও অন্যান্য সকল অংশীজনকে সাথে নিয়ে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডল থেকে সম্পদ আহরণে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে। অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করে বিশ্লেষণপূর্বক টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচিতে দ্রুত তথ্যভাণ্ডার গড়ে তোলা ও তার ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলাফল মোকাবিলা, পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে প্রয়োজনানুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সাধারণ মানুষের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ও সম্পদের ন্যায্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য সেবা জোরদারসহ অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা প্রয়োজনানুসারে বাড়াতে হবে। এক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের দক্ষতা বাড়ানো এবং তাদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এতে তারা নিজেদের দক্ষতা কাজে লাগিয়ে সম্পদ সংগ্রহ করে সামাজিক উন্নয়ন ঘটাতে পারে এবং দেশের উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে।

নীতিকাঠামোগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থ-সামাজিক পরিবেশ সমৃদ্ধ করতে হবে। একইসাথে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রতিটি পর্যায়ে মনিটরিং ও মেনটরিং এর ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। সব মহলের সম্মিলিত অঙ্গীকার ও প্রচেষ্টায় সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করে টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচি কার্যকরভাবে বাস্তবায়নে রাজনৈতিক অঙ্গীকার জরুরি। পাশাপাশি রাজনৈতিক অস্থিরতা রোধ করতে হবে। বিদেশে সম্পদ পাচার বন্ধে আরও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশে গ্রামীণ অ-কৃষিখাতকে যথেষ্ট প্রাধান্য দিতে হবে। সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া বিভিন্ন জনগোষ্ঠী, ভৌগোলিকভাবে পিছিয়ে পড়া দুর্গম অঞ্চল বিশেষ বিবেচনায় রেখে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। অতিদারিদ্র্য ও দারিদ্র্যের হার কমাতে প্রয়োজনে বিশেষ বিশেষ কর্মসূচি হাতে নিতে হবে। অর্থনৈতিক নীতিকাঠামো বিন্যাস এমনভাবে করতে হবে যাতে আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি ন্যায্যভাবে সুবণ্টিত হতে পারে। শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এসব খাতে বাজেট বরাদ্দ বাড়ানোর পাশাপাশি ব্যবস্থাপনা ও তদারকি বাড়াতে হবে।

টেকসই উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ করণীয় হলো উন্নয়ন ও অগ্রগতির ধারা টেকসই রাখা এবং এর গতি দ্রুততর করা। ২০২১ সাল নাগাদ ডিজিটাল বাংলাদেশ এবং মধ্যম-আয়ের দেশ, ২০৩০ সাল নাগাদ এসডিজি অর্জন, ২০৪১ সালের মধ্যে আমরা উন্নত দেশে উন্নীত হওয়ার স্বপ্ন দেখছি। এগুলো বাস্তবায়ন করতে হলে সবাইকে সাথে নিয়েই আমাদের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় শামিল হতে হবে। তা না হলে আমাদের হয়তো প্রবৃদ্ধি বাড়বে কিন্তু তা কখনোই টেকসই রাখা সম্ভব হবে না। সবাই যাতে নাগরিক হিসেবে সমান অধিকার ভোগ

করে, সকলে যাতে মানব মর্যাদা পায়, তা নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মানোন্নয়ন ও জাগরণ ঘটাতে হবে। জ্বালানি খাতকে বর্তমান বাজেটে অগ্রাধিকার দিলেও তা বাস্তবায়নে কঠোর তদারকি জোরদার করতে হবে। গ্যাসের ক্ষেত্রে প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে স্থলভাগ ও সমুদ্র অনুসন্ধানে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় জোরদার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

যে কোনো উন্নয়নই ঘটুক না কেন উন্নয়নের সাথে কিছু নেতিবাচক ফলাফল আর্থ-সামাজিক অবস্থার মধ্যে ঢুকে পড়ে। যেমন দেশ তথ্যপ্রযুক্তিতে অনেক এগিয়েছে ঠিকই কিন্তু পূর্ব সতর্কতা না থাকায় বর্তমানে আমাদেরকে অনেক দায় বহন করতে হচ্ছে। যেমন, কোমলমতি কিশোর-কিশোরীরা তথ্যপ্রযুক্তি অপব্যবহারের শিকার হচ্ছে। তাই যা কিছু ভালো তা বিবেচনা করার পূর্বে যদি তার সাথে বিপন্নতা, ঝুঁকি কতোটুকু সে দিকটা বিবেচনায় রেখে সতকর্তা অবলম্বন করা হয়- তাহলে অনেকাংশেই ঝুঁকি মোকাবিলা করা সহজ হয়।

আমরা যদি এ সকল বিষয় গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে হাত দিই তাহলে ফলাফল কাঙ্ক্ষিত মানের হবে তা ধরে নেওয়া যায়। পৃথিবীর সব সমাজেই কিছু চলমান সমস্যা থাকে, আবার নতুন নতুন কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয় যা আর্থ-সামাজিক বিবর্তন প্রক্রিয়ায় কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থা তৈরি করে। বর্তমান সময়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে যতটুকু অগ্রগতি হয়েছে তা সুষম ও সুসংহত করা এবং একে গতিশীল করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া। যেগুলোর মধ্যে রয়েছে মানব সক্ষমতা বৃদ্ধি ও মানবসম্পদের উন্নয়ন। বাস্তবতার আলোকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ, গৃহীত কর্মসূচির কার্যকর বাস্তবায়ন, অপচয়রোধ, দুর্নীতিদমন এবং দেশের নাগরিকদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় আরও কার্যকরভাবে অন্তর্ভুক্তকরণ। পাশাপাশি রাষ্ট্রব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ।

কাজ-১: এসডিজি অর্জনে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয় চিহ্নিত কর।

কাজ-২: স্ব স্ব অবস্থানে থেকে আমরা কীভাবে টেকসই উন্নয়নে অবদান রাখতে পারি, দলগত আলোচনার মাধ্যমে ২০০ শব্দের একটি রচনা লিখ।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. পারস্পরিক অংশীদারিত্বের সূচনা করে কোনটি?

ক. নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর সহযোগিতা
খ. অর্থনৈতিক ও সামাজিক সহযোগিতা
গ. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা
ঘ. রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা

২. কোন পরিবর্তনের প্রভাব বিশ্বের সচেতন মানুষকে শঙ্কিত করে তুলেছে?

ক. জন্মহার
খ. জলবায়ু
গ. তাপমাত্রা
ঘ. সামাজিক সূচক

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও-

“জাতিসংঘ প্রবর্তিত একটি কর্মসূচির ২০১৫ সালের অর্জিত সাফল্য ২০৩০ সাল মেয়াদি অভীষ্ট অর্জনে বাংলাদেশকে আশাবাদী করেছে”- মন্তব্য করে জনাব শাহেদ মনসুর তাঁর “ উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাংলাদেশ” শীর্ষক বক্তৃতা শুরু করেন। তাঁর বক্তব্যের শেষে তিনি বলেন, “২০৩০ সালের মধ্যে অভীষ্ট অর্জনের মাধ্যমে আমরা নারী-পুরুষ সমতা বিধান করে সুখী ও সমৃদ্ধ জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হব।”

৩. জনাব শাহেদ তাঁর বক্তৃতায় ২০১৫ সালের কোন সাফল্যের কথা বলেছেন?

ক. এসডিজি খ. এমডিজি

গ. পরিবেশ উন্নয়ন ঘ. সামাজিক উন্নয়ন

৪. শাহেদ সাহেবের শেষ বক্তব্যে ফুটে উঠেছে-

i. অভীষ্ট অর্জনের সম্ভাব্য ফলাফল
ii. সাফল্য অর্জনের সুবিধাসমূহ
iii. সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের স্বপ্ন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১.

দৃশ্যকল্প-১	একটি রিয়েল এস্টেট প্রতিষ্ঠান বালু নদীর কিছু অংশ ভরাট করে পাশের কিছু জমিসহ সাইনবোর্ড টানিয়ে প্লট বিক্রি করছে।
দৃশ্যকল্প-২	সাভারে ট্যানারী শিল্প স্থাপনের পর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা না করে পার্শ্ববর্তী খালে বর্জ্য ফেলা হচ্ছে।
দৃশ্যকল্প-৩	‘ক’ সিটি কর্পোরেশনের নাগরিকগণ সরকারের দিকে তাকিয়ে না থেকে সকলে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করার মাধ্যমে সেটিকে সুন্দর বাসযোগ্য কর্পোরেশনে রূপান্তর করেছে।

ক. জলবায়ু কার্যক্রম কী?

খ. টেকসই উন্নয়নে অংশীদারিত্ব কেন প্রয়োজন?

গ. দৃশ্যকল্প ১ ও ২ কোন বিষয়কে নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. দৃশ্যকল্প-৩ বিশ্বের সর্বত্র সার্বিক ও সর্বজনীন কল্যাণ নিশ্চিতের উদাহরণ-মূল্যায়ন কর।

একাদশ অধ্যায়

জাতীয় সম্পদ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

কোনো দেশের সমৃদ্ধি নির্ভর করে সে দেশের জাতীয় সম্পদের প্রকৃতি ও পরিমাণের ওপর। যে দেশ জাতীয় সম্পদে যত সমৃদ্ধ সে দেশের উন্নতির সম্ভাবনা ততবেশি। তাই অর্থনীতি সম্বন্ধে জানতে হলে প্রথমেই সম্পদ সম্বন্ধে জানা প্রয়োজন। আবার একটি দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বুঝতে হলে সে দেশের সম্পদ উৎপাদন ও বণ্টনের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি জানতে হবে। বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আওতায় এই উৎপাদন ও বণ্টন পদ্ধতি ভিন্ন হয়। যে পদ্ধতি, প্রক্রিয়া এবং নিয়মনীতির আওতায় কোনো দেশের অর্থনীতি পরিচালিত হয়, তাই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। এ অধ্যায়ে আমরা জাতীয় সম্পদ উৎপাদন, বণ্টন ও সংরক্ষণ সম্বন্ধে জানার পাশাপাশি বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সম্পদ উৎপাদন ও বণ্টনের বিষয়টিও জানব।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

- জাতীয় সম্পদের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশের জাতীয় সম্পদের সংরক্ষণ ও অপচয় রোধের উপায় বর্ণনা করতে পারব;
- বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার তুলনা করতে পারব;
- বাংলাদেশের প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারব;
- বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের বণ্টন পরিস্থিতি বর্ণনা করতে পারব;
- সম্পদ সংরক্ষণ ও অপচয় রোধে সচেতন হব;
- বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হব।

জাতীয় সম্পদের ধারণা

আমরা সাধারণত অর্থ, জমিজমা, বাড়িঘর, নানারকম প্রয়োজনীয় ও স্থায়ী দ্রব্যসামগ্রী, স্বর্ণ–রৌপ্য প্রভৃতিকে সম্পদ বলে থাকি। প্রকৃত অর্থে কোনো বস্তু বা দ্রব্যকে সম্পদ বলতে হলে সে বস্তুর উপযোগ, অপ্রাচুর্য, বাহ্যিকতা এবং হস্তান্তরযোগ্যতা থাকতে হবে। এগুলো সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো-

উপযোগ : কোনো দ্রব্যের মানুষের অভাব পূরণের ক্ষমতাকে উপযোগ বলে। যেমন, মানুষের বস্ত্রের প্রয়োজন বা অভাব আছে। শার্ট, প্যান্ট, শাড়ি– এসব দ্রব্যের বস্ত্রের অভাব পূরণের ক্ষমতা আছে। অর্থাৎ এগুলোর উপযোগ আছে।

অপ্রাচুর্য : কোনো দ্রব্য বা সেবার চাহিদার তুলনায় যোগান বা সরবরাহের পরিমাণ কম হলে দ্রব্যটির অপ্রাচুর্য দেখা দেয়। যেমন– খাদ্য। যে কোনো দেশে যে কোনো সময়ে খাদ্যের সরবরাহ এর চাহিদার তুলনায় কম। সেই জন্য খাদ্য পেতে হলে এর দাম পরিশোধ করতে হয়। অর্থাৎ খাদ্যের অপ্রাচুর্য আছে। আবার, নিশ্বাস–প্রশ্বাসের জন্য মানুষের প্রতিমুহূর্তেই বাতাসের প্রয়োজন। কিন্তু প্রকৃতিতে বাতাস অফুরন্ত হওয়ায় প্রয়োজনের তুলনায় এর সরবরাহ বেশি। তাই বাতাসের জন্য মানুষকে কোনো দাম দিতে হয় না। অর্থাৎ বলা যায়, বাতাসের অপ্রাচুর্য নেই। শুধু উপযোগ ও অপ্রাচুর্য থাকলে একটি জিনিস সম্পদ নাও হতে পারে, যেমন– স্বাস্থ্যের অপ্রাচুর্য এবং উপযোগিতা আছে কিন্তু বাহ্যিকতা ও হস্তান্তরযোগ্যতা না থাকায় একে সম্পদ বলা যাবে না। তবে কোনো স্বাস্থ্যবান পুরুষ যখন দেহ স্বাস্থ্য প্রদর্শনের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনে সক্ষম হবেন তখন তার ঐ বিশেষ ধরনের স্বাস্থ্যটি সম্পদ বলে গণ্য হবে।

সম্পদের শ্রেণিবিভাগ

সম্পদকে ব্যক্তিগত, একান্ত ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক–এই পাঁচ শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা যায়। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জায়গা–জমি, বাড়িঘর, কলকারখানা, অর্থসম্পদ, গাড়ি, দ্রব্যসামগ্রী ইত্যাদি ব্যক্তিগত সম্পদ। নিজস্ব প্রতিভা, ব্যক্তির দক্ষতা ইত্যাদি যদিও হস্তান্তরযোগ্য নয়, কিন্তু ব্যক্তি এগুলো ব্যবহার করে সম্পদ সৃষ্টি করতে পারে। তাই এগুলো একান্ত ব্যক্তিগত সম্পদের অন্তর্ভুক্ত।

সমাজের সকলে সম্মিলিতভাবে যে সকল সম্পদ ভোগ করে, সেগুলো সমষ্টিগত সম্পদ। এই সম্পদের ওপরে সকল নাগরিকের সমান অধিকার থাকে এবং এগুলোর প্রতি তাদের সমান দায়িত্বও রয়েছে। রাস্তাঘাট, রেলপথ, বাঁধ, পার্ক, সরকারি হাসপাতাল ও স্কুল, রাষ্ট্রের মালিকানাধীন সকল প্রাকৃতিক সম্পদ (যেমন– বনাঞ্চল, খনিজসম্পদ, নদ–নদী ইত্যাদি) প্রভৃতি সমষ্টিগত সম্পদ।

রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের ব্যক্তিগত সম্পদ এবং সমাজের সমষ্টিগত সম্পদকে একত্রে জাতীয় সম্পদ বলে। তাছাড়া কোনো জাতির নাগরিকের গুণবাচক বৈশিষ্ট্য, যেমন–কর্মদক্ষতা, উদ্ভাবনী শক্তি প্রযুক্তিগত জ্ঞান ইত্যাদি জাতীয় সম্পদের অন্তর্ভুক্ত।

কোনো কোনো সম্পদ আছে, যা বিশেষ কোনো রাষ্ট্রের মালিকানাধীন নয়। বিশ্বের সকল জাতিই সেগুলো ভোগ করতে পারে। এগুলো আন্তর্জাতিক সম্পদ। উদাহরণ হিসেবে সাগর–মহাসাগর, পেটেন্টবিহীন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, প্রযুক্তি ইত্যাদির কথা বলা যায়।

জাতীয় সম্পদের উৎস

জাতীয় সম্পদের উৎস প্রধানত দুটি। প্রথমটি প্রকৃতি প্রদত্ত আর দ্বিতীয়টি মানবসৃষ্ট। কোনো দেশের ভৌগোলিক সীমানার ভিতরের ভূমি, ভূমির উপরিস্থিত এবং অভ্যন্তরস্থ যা কিছু সবই প্রকৃতির দান। প্রাকৃতিক বনাঞ্চল ও বনের গাছপালা–ফলমূল–প্রাণী ও পাখিকুল, নদ–নদী ও প্রাকৃতিক জলাশয় এবং এগুলোর মৎস্যসম্পদ, অন্যান্য জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদ, ভূমির অভ্যন্তরস্থ পানি ও সকল রকম খনিজ সম্পদ–এ সবই প্রকৃতি প্রদত্ত জাতীয় সম্পদ।

কোনো দেশের অধিবাসীরা তাদের শ্রম ও মূলধনের সাহায্যে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার, সংগ্রহ ও উত্তোলন করে এবং সেগুলোর রূপান্তর বা স্থানান্তর করে যে নতুন সম্পদ সৃষ্টি করে তা মানবসৃষ্ট সম্পদ। মানুষ ভূমি আবাদ করে শস্য–ফল–ফুল–গাছপালা উৎপাদন করে। জলাশয়ে মাছ চাষ করে, খনিজ সম্পদ উত্তোলন করে ব্যবহার উপযোগী করে। এছাড়া ব্যক্তি নিজ উদ্যোগে বা সরকারের অর্থ ও পরিচালনায় রাস্তাঘাট, কলকারখানা, যন্ত্রপাতি, যানবাহন, বাঁধ ও সেতু এবং নানারকম স্থাপনা নির্মাণ করে এবং নানারকম শিল্পদ্রব্য উৎপাদন করে। এভাবে দেশের নাগরিকেরা সারা বছরব্যাপী নানারকম অর্থনৈতিক দ্রব্য ও সেবা অর্থাৎ সম্পদ সৃষ্টির কাজে নিয়োজিত থাকে। এসব মানব সৃষ্ট সম্পদ।

জাতীয় সম্পদের সংরক্ষণ ও অপচয়রোধ

সংরক্ষণের অর্থ বিশেষভাবে রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান। আমরা জানি, একটি দেশের সকল নাগরিকের ব্যক্তিগত সম্পদ ও সমষ্টিগত সম্পদ একত্রে জাতীয় সম্পদ। সমষ্টিগত সম্পদের মধ্যে সকল জনগণ সম্মিলিতভাবে যেসব সম্পদের মালিক সেগুলো এবং রাষ্ট্রের মালিকানাধীন সকল প্রাকৃতিক ও উৎপাদিত সম্পদ অন্তর্ভুক্ত। তাই জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণ বলতে ব্যক্তিগত সম্পদ ও সমষ্টিগত সম্পদ উভয়েরই সংরক্ষণ বোঝায়।

(ক) ব্যক্তিগত সম্পদ সংরক্ষণ

কোনো বস্তু, দ্রব্য, প্রতিষ্ঠান, সম্পত্তি, বিশেষ যত্নসহকারে রক্ষা করা ও তার তত্ত্বাবধান করাকে বলে সংরক্ষণ। ব্যক্তি সাধারণত তার নিজস্ব সম্পদ, যেমন–অর্থ সম্পদ, ভূসম্পত্তি, স্বর্ণ–রৌপ্য, অলংকার, আসবাবপত্র, নিজস্ব কলকারখানা বা শিল্প প্রতিষ্ঠান, যানবাহন ইত্যাদি নিজ স্বার্থেই বিশেষ যত্নের সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করে। শুধু তাই নয়, সে এগুলোর উন্নয়ন করতে ও বৃদ্ধি করতেও তৎপর থাকে। এছাড়া প্রত্যেকেই নিজস্ব সম্পদের অপচয় রোধ করতে এগুলোর তত্ত্বাবধানও করে। কোন সম্পদ কোথায় কী অবস্থায় আছে তার খোঁজখবর রাখা, সম্পদের কোনোরকম ক্ষতির কারণ ঘটলে তা রোধ করা বা দূর করা, সম্পদ নষ্ট হলে যথাসম্ভব তা পূরণ করার ব্যবস্থা নেওয়াও সংরক্ষণ কাজের অন্তর্ভুক্ত।

ব্যক্তি সাধারণত তার নিজস্ব সম্পদ অযথা ব্যয় করে না বা অপচয় করে না। প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যয় না করার জন্য সে সর্বদা সতর্ক থাকে।

(খ) সমষ্টিগত সম্পদ সংরক্ষণ

রাস্তাঘাট, সেতু, হাসপাতাল, বিদ্যালয়, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন যানবাহন (গাড়ি, ট্রেন, জাহাজ, বিমান ইত্যাদি) ও কলকারখানা, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান, অফিস ভবন, গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা, প্রাকৃতিক সম্পদ, ভূমি ও ভূমির উপরিস্থিত এবং অভ্যন্তরভাগের সম্পদ(বনাঞ্চল, নদী–নালা, জলাশয়, মৎস্য সম্পদ, খনিজ সম্পদ ইত্যাদি)–এসবই সমষ্টিগত সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। রাষ্ট্র ও জনগণ সম্মিলিতভাবে এসব সম্পদের অধিকারী। জনগণ এগুলো ব্যবহার করে ও ভোগ করে। এগুলোর পরিকল্পিত ব্যবহারের মাধ্যমে রাষ্ট্র জনগণের সার্বিক উন্নয়ন ও কল্যাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। তাই এসব সমষ্টিগত সম্পদ সংরক্ষণে প্রতিটি নাগরিকেরই বিশেষ যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। এছাড়া সমষ্টিগত সম্পদের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের যথাযথভাবে তার দায়িত্ব পালন করা আবশ্যক।

বাংলাদেশের জাতীয় সম্পদের সংরক্ষণ ও অপচয় রোধে করণীয়

- জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্রীয় যেসব ব্যবস্থা আছে, সেগুলো যাতে কোনোভাবে ব্যাহত না হয় সেদিকে লক্ষ রাখা। আমরা জানি যে, সেতু, গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা, অফিস ভবন ইত্যাদি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিরাপত্তা রক্ষী থাকে। এসব কোনো সময় অরক্ষিত দেখলে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে জানানো।
- কেউ যেন এসব সম্পদের কোনো ক্ষতিসাধন না করে সে বিষয়ে সচেতন থাকা। এ ধরনের কোনো অপচেষ্টার বিষয়ে জানলে বা দেখলে যথাযথ ব্যক্তি/কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে অবৈধভাবে গাছ কাটা, পশুপাখি শিকার করা ইত্যাদি জাতীয় সম্পদের ক্ষতিসাধন করা হিসেবে গণ্য হবে।
- জাতীয় সম্পদের উন্নয়ন ও বৃদ্ধিসাধনের জন্য সচেষ্ট থাকা।
- সমষ্টিগত বা জাতীয় সম্পদের অপব্যবহার ও অপচয়রোধে সচেতন ও সচেষ্ট থাকা, যেমন– রাষ্ট্রীয় সংস্থা কর্তৃক সরবরাহকৃত পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস ইত্যাদি অপ্রয়োজনে খরচ না করা এবং এগুলো ব্যবহারে মিতব্যয়ী হওয়া।
- সম্পদ সংরক্ষণের জন্য নিজ নিজ কর্তব্য বিষয়ে প্রতিটি নাগরিক সচেতন ও সচেষ্ট থাকলে জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণ ও এগুলোর অপচয় রোধ করা কঠিন নয়। নাগরিকদের সচেতন করার জন্য গণমাধ্যমে তাদের করণীয় সম্পর্কে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- সম্পদ সংরক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের জন্য নির্ধারিত সংস্থার দায়িত্ব ও কর্তব্য সংস্থার দলিলসমূহে সুস্পষ্টভাবে বিবৃত থাকে। সংস্থার কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দের এসব দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনে তৎপর থাকা এবং
- এসব দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা।

কাজ

দলীয় : কয়েকটি জাতীয় সম্পদ চিহ্নিত কর এবং এগুলো সংরক্ষণের কয়েকটি পদক্ষেপ লিখ।

একক : ব্যক্তিগত সম্পদ থেকে জাতীয় সম্পদ কীভাবে আলাদা করবে? খাতায় লিখে দেখাও।

বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

মানুষের প্রয়োজন বহুবিধ। তার খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের প্রয়োজন। সুশিক্ষা ও সুস্বাস্থ্যেরও প্রয়োজন। এছাড়া সুন্দরভাবে বাঁচতে হলে প্রয়োজন বিনোদনের ব্যবস্থা, সুশৃঙ্খল ও নিরাপদ পরিবার এবং সমাজ ব্যবস্থা। এসব প্রয়োজন থেকে অভাবের সৃষ্টি হয়। সম্পদ সবসময়ই অপ্রতুল। অভাব পূরণের জন্য মানুষ চেষ্টা করে এবং উৎপাদন করে। উৎপাদন হলো দ্রব্য বা সম্পদের এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তর।

যেমন, কাঠ থেকে চেয়ার তৈরি করা হয়। এ রূপান্তরই উৎপাদন। উৎপাদনের জন্য চারটি উপাদান আবশ্যক : ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন। এগুলো সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো–

ভূমি : সাধারণ অর্থে ভূমি বলতে জমি বোঝায়। কিন্তু অর্থনীতিতে ভূমি বলতে সকল প্রাকৃতিক সম্পদ, যেমন– জমি, জমির উপরিস্থিত এবং অভ্যন্তরের সকল কিছুকে বোঝায়।

শ্রম : উৎপাদন কাজে ব্যবহারযোগ্য মানুষের শারীরিক ও মানসিক কর্মক্ষমতাকে শ্রম বলে।

মূলধন : উৎপাদিত উপাদানকে মূলধন বলে। মূলধন হলো সেই ধরনের সম্পদ যা সরাসরি ভোগ করা হয় না কিন্তু যা কাজে লাগিয়ে অধিকতর উৎপাদন করা হয়। যন্ত্রপাতি, কলকারখানা, উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত ভবন, অর্থ ইত্যাদি হলো মূলধন।

সংগঠন : উৎপাদনের তিনটি উপকরণ, যথা– ভূমি, শ্রম ও মূলধনকে সমন্বিত করে উৎপাদন কার্য পরিচালনা ও সম্পাদন করাকে বলে সংগঠন। যিনি সংগঠন করেন, তাকে বলে সংগঠক বা উদ্যোক্তা। উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে ঝুঁকি বা অনিশ্চয়তা রয়েছে, সংগঠক সেটা বহন করেন।

চেয়ারের জন্য কাঠ সংগ্রহ হয় ভূমি থেকে। কাঠ সংগ্রহের জন্য অর্থ এবং কাঠকে চেয়ারে রূপান্তরের জন্য যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উপকরণ প্রয়োজন। এই অর্থ ও যন্ত্রপাতি মূলধন। এরপর প্রয়োজন শ্রমিক বা কারিগর, যিনি যন্ত্রপাতি ও নিজ শ্রমের সাহায্যে কাঠ থেকে চেয়ার তৈরি করবেন। আর এই ভূমি, মূলধন ও শ্রমকে সমন্বিত করে চেয়ার উৎপাদন প্রক্রিয়া সম্পাদন করবেন সংগঠক বা উদ্যোক্তা।

এভাবে মানুষ সবসময়ই তার বিভিন্ন অভাব পূরণের জন্য এই চারটি উপাদানের সাহায্যে প্রচেষ্টা চালায়। উৎপাদন প্রক্রিয়া সম্পাদনের জন্য উক্ত চারটি উপাদান অপরিহার্য। মোট উৎপাদিত সম্পদ থেকে প্রাপ্ত অর্থ চারটি উপাদানের মধ্যে অর্থাৎ খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফা হিসেবে ভাগ হয়ে যায়। এগুলো হচ্ছে উৎপাদনের উপাদানসমূহের আয়। এই আয়ের সাহায্যে ভূমির মালিক, শ্রমিক, পুঁজিপতি বা মূলধনের মালিক এবং উদ্যোক্তা তাদের বিভিন্ন প্রয়োজন বা অভাব পূরণ করে। কোনো বস্তুগত বা অবস্তুগত দ্রব্যের অর্থাৎ সেবার জন্য অনুভূত প্রয়োজনই অভাব। অভাব হলো কোনো বস্তু বা সেবা পাবার ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা। উৎপাদিত সম্পদ উৎপাদনের উক্ত চারটি উপাদানের মধ্যে ভাগ হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়াকে বলে বণ্টন।

আমরা এ আলোচনা থেকে বলতে পারি, মানুষ তার নানাবিধ অভাব পূরণের জন্য বিভিন্ন অর্থনৈতিক কার্যাবলি সম্পাদন করে। এর বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে :

অভাব → প্রচেষ্টা → উৎপাদন → বণ্টন → ভোগ

উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভূমির ব্যবহারের জন্য ভূমির মালিককে খাজনা দেওয়া হয়। অনুরূপভাবে শ্রমিককে মজুরি, মূলধনের মালিককে সুদ এবং সংগঠককে মুনাফা দেওয়া হয়। এইসব পারিতোষিক, যেমন– খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফা উপাদানসমূহের মধ্যে সুষ্ঠু ও যথাযথভাবে বণ্টিত হলে অর্থনৈতিক কার্যক্রমে গতি আসে ও অর্থনৈতিককল্যাণ সাধিত হয়। আর বণ্টন ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ ও অসম হলে অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দেয়, জীবনযাত্রার মানে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ঘটতে পারে না। সমাজে অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়।

মোট উৎপাদিত সম্পদের অর্থমূল্য কীভাবে উৎপাদনের উপাদানগুলোর মধ্যে বণ্টন করা হয়, তা নির্ভর করে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বা Economic System -এর ওপর। যে ব্যবস্থা বা কাঠামোর আওতায় উৎপাদনের উপাদান-সমূহের মালিকানা নির্ধারিত হয় এবং উৎপাদন প্রক্রিয়া, উৎপাদিত সম্পদের বণ্টন ও ভোগ প্রক্রিয়া সম্পাদিত হয় তাকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলে। এ ব্যবস্থা জনগণের অর্থনৈতিক কার্যাবলি এবং অর্থনীতি বিষয়ক প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনগত কাঠামোর সমন্বয়ে গড়ে ওঠে।

বর্তমান বিশ্বে প্রধানত চার ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কার্যকর আছে: ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী, সমাজতান্ত্রিক, মিশ্র ও ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। এ অধ্যায়ে আমরা চারটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আওতায় কীভাবে উৎপাদন ও বণ্টনের কাজটি সমাধা হয়, সে বিষয়েই জানবো। এটা জানতে হলে উক্ত চারটি ব্যবস্থাধীনে অর্থনীতির কার্যপ্রণালি ও বৈশিষ্ট্যগুলো জানতে হবে।

১. ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ

- **উৎপাদনের উপাদানসমূহের মালিকানা :** ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের উপাদানসমূহ, যথা–ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন ব্যক্তিমালিকানাধীন। অর্থাৎ ব্যক্তি তার সম্পদ/আয়ের সাহায্যে ভূমির মালিকানা অর্জন করতে পারে, শ্রমিককে নিয়োগ দিতে পারে, মূলধন বা পুঁজি গঠন করতে পারে। ব্যক্তি তার নিজস্ব সম্পদ স্বাধীনভাবে ভোগ ও হস্তান্তর করতে পারে। এসব বিষয়ে ব্যক্তি নিজেই সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

- **উদ্যোগ গ্রহণের স্বাধীনতা :** ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যক্তি এককভাবে বা গোষ্ঠীবদ্ধভাবে যে কোনো দ্রব্য/সেবা উৎপাদনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে এবং সেজন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ করতে পারে। এক্ষেত্রে কোনোরকম বিধিনিষেধ নেই। এ ব্যবস্থায় প্রায় সকল অর্থনৈতিক কার্যাবলি ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত হয়।

ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিকে অনেক সময় মুক্ত বাজার অর্থনীতি বলা হয়। এ অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় দ্রব্যের উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ সবই বাজারে দ্রব্যের চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক ক্রিয়া–বিক্রিয়া দ্বারা পরিচালিত হয়। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সম্পদের ব্যক্তি মালিকানা এবং উৎপাদন ও ভোগের ক্ষেত্রে ব্যক্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা। এসব ক্ষেত্রে সরকারের হস্তক্ষেপ নাই বললেই চলে।

- **অবাধ প্রতিযোগিতা :** যে কোনো ব্যক্তি যে কোনো দ্রব্য বা সেবা উৎপাদনের উদ্যোগ নিতে পারে। তাই বাজারে একই দ্রব্যের বহুসংখ্যক উৎপাদক বা বিক্রেতা থাকেন এবং তাদের মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতা থাকে। বিক্রেতা এবং দ্রব্যের ক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয়।

কাজ

একক : ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় আয়বণ্টন সম্পর্কে তোমার মতামত দাও।

- **ভোক্তার স্বাধীনতা :** মানুষের অভাব পূরণের জন্য কোনো দ্রব্যের উপযোগিতা ব্যবহার করার প্রক্রিয়াকে ভোগ বলে। খাদ্য দ্বারা মানুষ ক্ষুধা মেটায়। সুতরাং খাদ্যবস্তু মানুষ ভোগ করে। কিন্তু কোনো কারণে খাদ্যবস্তু নষ্ট হলে তা ভোগ হবে না। মানুষের অভাব পূরণের জন্য ব্যবহার করা হলেই ভোগ হবে। ভোক্তা কোনো দ্রব্য কী পরিমাণে ক্রয় ও ভোগ করবে, এ বিষয়ে সে নিজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তবে তার পছন্দ, আয় ও দ্রব্যের বাজার মূল্যের দ্বারা এ সিদ্ধান্ত প্রভাবিত হয়।

- **সর্বাধিক মুনাফা অর্জন :** ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যেই উৎপাদন প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়। উৎপাদন কাজে নিয়োজিত অর্থ হচ্ছে বিনিয়োগ। বিদ্যমান মূলধন সামগ্রীর সাথে নতুন মূলধন (অর্থ বা যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম, উৎপাদনের জন্য কাঁচামাল প্রভৃতি) যুক্ত হওয়াকে বলে বিনিয়োগ। যেসব দ্রব্যের ক্ষেত্রে মুনাফার সম্ভাবনা বেশি, ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উৎপাদনকারীরা সেসব দ্রব্যেই বেশি বিনিয়োগ করে।

- **শ্রমিক শোষণ :** সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য থাকে বিধায় উদ্যোক্তা বা পুঁজিপতিরা দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় কম রাখতে ও বিক্রয় মূল্য বেশি পেতে চেষ্টা করে। উৎপাদন ব্যয় কম রাখার জন্য শ্রমিককে তার ন্যায্য মজুরির চেয়ে কম মজুরি দেওয়া হয়। এই উদ্বৃত্ত মজুরি পুঁজিপতি ও উদ্যোক্তার কাছে মুনাফা হিসেবে সঞ্চিত হয়। এভাবে উৎপাদিত সম্পদ বণ্টনে অসমতা ও বৈষম্য সৃষ্টি হয়। শ্রমিক প্রাপ্যের চেয়ে কম মজুরি পান আর পুঁজিপতি ও উদ্যোক্তা তাদের প্রাপ্যের চেয়ে বেশি অর্থ উপার্জন করেন। যেহেতু পুঁজিপতির সংখ্যা কম, তাই একটি ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর হাতেই সমাজের অধিকাংশ সম্পদ কেন্দ্রীভূত হয়। আর যেহেতু শ্রমিক অগণিত, তাই সমজের বিশাল জনগোষ্ঠী মোট সম্পদের ক্ষুদ্র অংশের সুবিধা ভোগ করে।

২. সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ

সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপাদানসমূহের মালিকানা, উৎপাদন প্রক্রিয়া, উৎপাদিত সম্পদের বণ্টন ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার চেয়ে আলাদা। সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হলো :

- **উৎপাদনের উপাদানসমূহের মালিকানা :** সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণসহ সকল সম্পদ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন। সম্পদের ওপর কোনো রকম ব্যক্তিমালিকানা থাকে না। সমাজতন্ত্র হচ্ছে 'সমাজের অর্থনৈতিক সংগঠন'। এই সংগঠনের মাধ্যমেই রাষ্ট্র উৎপাদনের চারটি উপাদানকে সমন্বিত করে একটি সার্বিক কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা অনুসারে উৎপাদন কার্যের নির্দেশনা দেয় ও তা পরিচালনা করে। সমাজের সকল সদস্য এই পরিকল্পিত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে সর্বাধিক কল্যাণ অর্জন করবে–এটিই সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উদ্দেশ্য।

- **অর্থনৈতিক কার্যাবলিতে সরকারি নির্দেশনা :** সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সরকার দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনের ক্ষেত্রে মৌলিক সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে। কোনো দ্রব্য কী পরিমাণে, কখন ও কোন প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত হবে এবং এই দ্রব্য কাদের নিকট সরবরাহ করা হবে– এ সবই সরকার নির্ধারণ করে। এসব সিদ্ধান্ত সরকারের কেন্দ্রীয় পরিকল্পনারই অংশ। এখানে ব্যক্তিগত উদ্যোগ গ্রহণ ও বিনিয়োগের সুযোগ নেই।

- **ভোক্তার স্বাধীনতার অভাব :** সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় উৎপাদকের যেমন উৎপাদন বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বাধীনতা নেই, তেমনি ভোগকারীর নিজ ইচ্ছামতো দ্রব্যসামগ্রী ভোগের সুযোগ নেই। উৎপাদক সরকার নির্ধারিত দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করে এবং ভোগকারী সেগুলো প্রয়োজন মতো ক্রয় ও ভোগ করে। তবে সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নির্বাচন ও ক্রয়ের ব্যাপারে ভোক্তার স্বাধীনতা আছে।

কাজ

দলীয় : ধনতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে প্রধান তিনটি পার্থক্য চিহ্নিত কর।

- **অর্থনৈতিক কার্যাবলির উদ্দেশ্য :** সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক চাহিদা পূরণ এবং জনগণের সর্বাধিক কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। এখানে ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনের সুযোগ নেই।

- **আয় বণ্টন :** ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মুনাফার মধ্যে শ্রমিকের মজুরির একটি অংশ থাকে, যা তাকে দেওয়া হয় না। পুঁজিপতি ও উদ্যোক্তা এ মুনাফা গ্রহণ করে। সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় অর্জিত মুনাফার মালিক রাষ্ট্র বা সরকার। একইভাবে ভূমির খাজনা ও মূলধনের সুদও সরকারের কোষাগারেই জমা হয়। কারণ সরকারই ভূমি ও মূলধনের মালিক।

সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় রাষ্ট্রই শ্রমিকের মজুরি প্রদান করে এবং উৎপাদনের অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ করে। ফলে ধনতন্ত্রের মতো পুঁজিপতি কর্তৃক শ্রমিককে বঞ্চিত করার সুযোগ থাকে না। এখানে শ্রমিকের মজুরি প্রদানের মূলনীতি হলো– 'প্রত্যেকে তার যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ পাবে এবং কাজ অনুযায়ী পারিশ্রমিক পাবে।' এই ব্যবস্থায় বেকারত্ব থাকে না। কারণ রাষ্ট্র প্রত্যেকের সামর্থ্য ও যোগ্যতা অনুযায়ী কাজের ব্যবস্থা করে দেয়। সকলের আয় এক নয়। কিন্তু কেউ উৎপাদনে তার অবদান অনুসারে প্রাপ্য আয় থেকে বঞ্চিত হয় না। এসব বৈশিষ্ট্যের কারণে অর্জিত সম্পদের সুষম বণ্টন হয়। এ অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় আয় বৈষম্য ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার আয় বৈষম্যের চেয়ে কম। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে জনগণের প্রয়োজন অনুযায়ী উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। সকল অর্থনৈতিক কার্যক্রম একটি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার আওতায় রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত হয়। তাই সম্পদের অপচয়ও অপেক্ষাকৃত কম। এর ফলে মোট জাতীয় উৎপাদনও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায় এবং সম্পদের সুষম বণ্টন সম্ভব হয়।

সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তি মালিকানা স্বীকৃত নয়, মালিকানা রাষ্ট্রের। আবার উৎপাদনের উদ্যোগ গ্রহণ এবং ভোগের ক্ষেত্রে ব্যক্তির স্বাধীনতা নেই। ফলে উৎপাদন ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যক্তির প্রণোদনা ও উদ্যম হ্রাস পেতে পারে। এতে সম্পদের কাম্য ব্যবহার বিশেষত ব্যক্তির সর্বোচ্চ উৎপাদনশীলতা ও সৃজনশীলতা নিশ্চিত করা যায় না।

৩. মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ

ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পাশাপাশি বর্তমান বিশ্বে আর একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিরাজমান। সেটি হচ্ছে মিশ্র অর্থনীতি। এটি ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা একটি ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় দ্রব্য উৎপাদন, বিনিয়োগ ও ভোগের ক্ষেত্রে যেমন ব্যক্তির মালিকানা স্বীকৃত, তেমনি সরকারি উদ্যোগে উৎপাদন ও বিনিয়োগের ব্যবস্থাও রয়েছে। অর্থনীতির কোনো কোনো খাত বা খাতের অংশবিশেষ সরকারি নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়। বাংলাদেশসহ বিশ্বের অনেক দেশে মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা রয়েছে। মিশ্র অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

- **সরকারি ও বেসরকারি খাতের সহাবস্থান**

মিশ্র অর্থনীতিতে ব্যক্তিমালিকানা ও ব্যক্তি উদ্যোগের পাশাপাশি কিছু কিছু খাতে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে সরকারি মালিকানা, উদ্যোগ ও নিয়ন্ত্রণ কার্যকর থাকে। জনসাধারণের জন্য অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য ও সেবা, যেমন–যোগাযোগ ব্যবস্থা, চিকিৎসা ব্যবস্থা, শিক্ষার আয়োজন প্রভৃতি প্রধানত সরকারি নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়। তবে এক্ষেত্রেও আংশিক ব্যক্তিগত বা বেসরকারি উদ্যোগ দেখা যায়।

এছাড়া মৌলিক ও বৃহদায়তন শিল্প, জনগুরুত্বপুর্ণ প্রতিষ্ঠান, বড় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, প্রধান আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্য, জীবন রক্ষাকারী ঔষধ, শিশুখাদ্য এসবও সাধারণত সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকে।

আবার মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগপণ্য, যেমন– কৃষিপণ্য, কাপড় ও তৈরি পোশাক, প্রক্রিয়াকৃত খাদ্যদ্রব্য, হোটেল–রেস্তোরাঁ, ব্যক্তিগত যানবাহন ইত্যাদি প্রধানত ব্যক্তিগত উদ্যোগে উৎপাদিত ও সরবরাহ করা হয়।

- **প্রতিযোগিতা** : মিশ্র অর্থনীতিতে ব্যক্তি বা বেসরকারি খাতেরই প্রাধান্য থাকে। তাই দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে উৎপাদকদের প্রতিযোগিতা এবং দ্রব্যের দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে বাজারে চাহিদা ও যোগানের স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়া-বিক্রিয়া বিরাজমান। দাম ও সামর্থ্যের উপর ভিত্তি করে ক্রেতার পছন্দ ও উদ্যোক্তার বিনিয়োগ স্থির হয়।

- **মুনাফা অর্জন** : মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সম্পত্তিতে ব্যক্তির মালিকানা, সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যক্তির স্বাধীনতা ও বেসরকারি খাতের প্রাধান্য থাকে। তাই উৎপাদনকারীদের সকল অর্থনৈতিক কার্যাবলির মূল উদ্দেশ্য থাকে সর্বাধিক মুনাফা অর্জন। এমনকি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন খাতসমূহও কমবেশি মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য দ্বারা প্রভাবিত থাকে।

তবে জনকল্যাণমূলক কার্যাবলি বিশেষত সেবামূলক অর্থনৈতিক কার্যাবলিতে (যেমন–স্বাস্থ্য, শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যাবলি) মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য থাকে না। আরও কিছু জনকল্যাণমূলক খাত, যেমন–টেলিযোগাযোগ, পরিবহন ইত্যাদিতে মুনাফা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রাখা হয়।

- **উদ্যোক্তা ও ভোগকারীর স্বাধীনতা** : মিশ্র অর্থনীতিতে বিশেষত জনসাধারণের ব্যবহার্য অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর ক্ষেত্রে একচেটিয়া ব্যবসার ওপর বিধিনিষেধ আরোপিত থাকে। ফলে এসব দ্রব্যের ক্ষেত্রে একাধিক উৎপাদনকারী প্রতিযোগিতামূলক দামে দ্রব্যটি বাজারে ছাড়তে বাধ্য হন। এতে জনসাধারণ উপকৃত হয়।

এ অর্থ ব্যবস্থায় ভোগকারী অবাধে সাধারণ দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় ও ভোগ করতে পারে। তবে বিশেষ অবস্থায় বা দুর্যোগকালীন সময়ে উৎপাদনে বিপর্যয় ঘটলে সরকার যে কোনো দ্রব্যের ক্রয়–বিক্রয়ে পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরোপ করতে পারে।

আয় বণ্টন : মিশ্র অর্থনীতির উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যের দ্বারা বণ্টনও প্রভাবিত হয়। ব্যক্তি মালিকানার পাশাপাশি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের একটি বড় অংশ, যেমন– বড় বড় কলকারখানা, ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠান, অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের উৎপাদন ও বিপণন এবং আমদানি–রপ্তানি সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অর্থনীতির ব্যক্তি মালিকানাধীন অংশ ব্যক্তির দ্বারা সম্পূর্ণভাবে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। এ খাতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মতোই শ্রমিককে প্রাপ্য মজুরির চেয়ে কম মজুরি দেওয়া হয়। উদ্বৃত্ত মজুরি ব্যক্তির মুনাফার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলে উৎপাদিত সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন হয় না। উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের আয়ে বৈষম্য দেখা দেয়। এতে সমাজের সকল জনগণের সর্বাধিক কল্যাণ নিশ্চিত করা যায় না।

মিশ্র অর্থনীতিতে উৎপাদনের যে অংশ সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন, সে অংশে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে নয় বরং সর্বাধিক সামাজিক কল্যাণ অর্জনের উদ্দেশ্যে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এ খাতের আওতাধীন কলকারখানা ও উৎপাদন প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শ্রমিকরা সাধারণত ন্যায্য মজুরি পায়। ফলে সম্পদের সুষম বণ্টন সম্ভব হয়।

মিশ্র অর্থনীতিতে সম্পদ বা আয়ের আংশিক সুষ্ঠু বণ্টন ঘটে। আর অংশবিশেষে শ্রমিক শোষিত ও বঞ্চিত হয়। ফলে আয় বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়।

৪. ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ

ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি পবিত্র কুরআন ও হাদিস। এ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উৎপাদন ও বণ্টনের বিষয়টি বুঝতে হলে আমাদের ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্যগুলো বুঝতে হবে।

ইসলামি অর্থব্যবস্থা মানুষের জীবনের সামগ্রিক বিষয় আলোচনা করে। সৃষ্টিকর্তা মানুষ সৃষ্টি করেছেন। মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় সবরকম দ্রব্যসামগ্রী, জীবজন্তু, পরিবেশ এবং বস্তুসমূহও সৃষ্টি করেছেন। মানুষ সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত এসকল বস্তুসামগ্রী ও পরিবেশ–প্রকৃতি ব্যবহার করে ধর্মানুমোদিতভাবে অধিকতর সম্পদ সৃষ্টি ও ভোগ করবে এটাই ইসলামের বিধান।

- **সম্পদের মালিকানা** : ইসলামে সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সম্পদ মানুষ তার ইচ্ছামতো ব্যবহার ও ভোগ করতে পারে। এ সম্পদ সে তার উত্তরাধিকারীদের নিকট হস্তান্তর করতে পারে।

- **শরিয়তভিত্তিক অর্থনৈতিক কার্যাবলি** : ইসলামি অর্থব্যবস্থায় অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সকল কার্যাবলি শরিয়তের বিধান অনুসারে পরিচালিত হয়। ইসলাম ধর্মের পাঁচটি মৌল স্তম্ভ, পবিত্র কুরআনের নির্দেশাবলি এবং রাসুল (সা.) এর হাদিসের বিধান অনুসারে অর্থনৈতিক কার্যাবলির মৌলিক নীতিমালা নির্ধারিত হয়।

- **উৎপাদন ব্যবস্থা ও উৎপাদনের উপাদানসমূহের পারিতোষিক** : ইসলামি অর্থব্যবস্থায় যে কোনো ব্যক্তি একক বা গোষ্ঠীবদ্ধভাবে শরিয়তসম্মত দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনের জন্য বিনিয়োগ করতে পারে। সে নিজেও প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় ও ভোগ করতে পারে। উৎপাদনের লক্ষ্য হলো 'হালাল' বা ধর্মসম্মত দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন নিশ্চিত করা। সামাজিক কল্যাণমুখী শোষণহীন উৎপাদন প্রক্রিয়া অনুসরণ করা। ইসলামি অর্থ ব্যবস্থায় বৃহদায়তন উৎপাদন কার্যক্রম প্রচলিত আছে। এ ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত বা বেসরকারি উদ্যোগ নাই এমন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে উৎপাদন কার্যক্রম গৃহীত হয়। ইসলামি অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তির নিকট নির্দিষ্ট সময়ব্যাপী নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ বা সম্পদ থাকলে তার একটি নির্ধারিত অংশ দরিদ্র জনগণের মধ্যে বণ্টনের ব্যবস্থা রয়েছে। এই ব্যবস্থাকে বলে যাকাত। সম্পদশালী ব্যক্তির জন্য যাকাত প্রদান বাধ্যতামূলক। ন্যূনতম যে পরিমাণ সম্পদ থাকলে যাকাত দিতে হয় তাকে ইসলামি পরিভাষায় নিসাব বলে।

যে কোনো অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের অন্যতম উপাদান পুঁজি বা মূলধন। মূলধনের জন্য সুদ প্রদানের ব্যবস্থা আছে। ইসলামি অর্থব্যবস্থায় সুদ লেনদেন হারাম বা নিষিদ্ধ। এ অর্থ ব্যবস্থায় সুদের বদলে পুঁজিপতি তার পুঁজি বিনিয়োগের আনুপাতিক হারে লাভ বা লোকসানে অংশগ্রহণ করে। ইসলামি ব্যাংক ব্যবস্থায় সুদমুক্ত আমানত রাখা ও ঋণ গ্রহণ করার ব্যবস্থা আছে। উৎপাদক ও ব্যবসায়ী এই ঋণ গ্রহণ করতে পারেন এবং ব্যবসায় থেকে প্রাপ্ত লাভ থেকে ঋণদানকারী ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে (অর্থাৎ ব্যাংক) লভ্যাংশ পরিশোধ করতে পারেন। এ অর্থ ব্যবস্থায় শ্রমিকের ন্যায্য পাওনা যথাসময়ে পরিশোধ করার ব্যবস্থা রয়েছে। এর ফলে উৎপাদিত সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন সম্ভব হয়।

কাজ

একক : নিজ দেশে তোমাকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করার ক্ষমতা দেওয়া হলে তুমি কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করবে? কেন?

দলীয় : বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চিহ্নিত করে এর বণ্টন কার্যক্রমের সমস্যাগুলো লেখ।

- **আয় বণ্টন :** ইসলামি অর্থ ব্যবস্থায় শোষণহীন উৎপাদন প্রক্রিয়া অনুসৃত। এখানে উৎপাদনের উপাদানসমূহের পারিতোষিক প্রদানে ন্যায় এবং সাম্যের নীতি অনুসরণ করা হয়। উৎপাদনে অবদানের ভিত্তিতে উপাদানসমূহের পাওনা পরিশোধ করা হয়।

বাংলাদেশে প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

প্রাচীন বাংলায় এবং মুসলিম ও ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলাদেশে প্রধানত সামন্ততান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। এ ব্যবস্থা ছিল ভূস্বামীকেন্দ্রিক। উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ভূমির মালিককে ভূস্বামী বলা হতো। অর্থনীতি ছিল কৃষিনির্ভর। একজন ভূস্বামী ছিলেন অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ। তার নিয়ন্ত্রণে সকল বৃত্তি ও পেশার লোকজন, যেমন–কৃষক, কামার, কুমার, তাঁতী, জেলে, ছুতার, স্বর্ণকার, ব্যবসায়ী, শিক্ষক, চিকিৎসক প্রভৃতি থাকতেন। এমনকি তার সম্পদ বা সম্পত্তির নিরাপত্তার জন্য নিজস্ব প্রজাকুল বা লাঠিয়াল বাহিনী থাকত। ব্রিটিশ শাসনামলে এই ভূস্বামীদের বলা হতো জমিদার।

পাকিস্তান আমলে জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হয়ে ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা স্থান করে নেয়। তবে বেশ কিছুকাল যাবৎ জমিদারি প্রথার প্রভাবও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার পাশাপাশি চালু ছিল। পাকিস্তান আমলের শেষদিকে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রাধান্য লাভ করে। দেশের জনগণের একটি ক্ষুদ্র অংশের হাতে দেশের অধিকাংশ মূলধন ও সম্পদ কেন্দ্রীভূত হয়।

১৯৭১ সালে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ এ প্রণীত সংবিধানের ভিত্তিতে দেশে সমাজতন্ত্র অভিমুখী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়। বড় বড় কলকারখানা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, বিমা কোম্পানি, পরিবহন, প্রধান প্রধান শিল্প প্রতিষ্ঠান, প্রাথমিক শিক্ষা, আমদানি-রপ্তানি ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণে নেওয়া হয়। পাকিস্তান আমলে কলকারখানা, ব্যবসায় ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান অধিকাংশই অবাঙালি মালিকদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। এই অবাঙালি মালিকেরা স্বাধীনতার পর দেশত্যাগ করলে এসব প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি হয়। আবার সদ্য স্বাধীন দেশের যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতি, অবকাঠামো ও বিপর্যস্ত সমাজের সমস্যা ও সংকট মোকাবিলায় সরকারকে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হয়। স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন সময়ে দক্ষ প্রশাসক, ব্যবস্থাপক, উদ্যোক্তাসহ মানবসম্পদের ব্যাপক ধ্বংস সাধিত হয়। ফলে উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। এতে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প কারখানা ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান লোকসানের সম্মুখীন হয়। ফলে বেসরকারি খাত ও ব্যক্তি উদ্যোগকে সম্প্রসারণ করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

বেসরকারি খাত ও ব্যক্তি উদ্যোগ সম্প্রসারণের এই ধারা বর্তমান সময় পর্যন্ত চালু আছে। এই ধারায় স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে রাষ্ট্রীয়করণকৃত কলকারখানা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান বিরাষ্ট্রীয়করণ করা শুরু হয়। বর্তমান

বিশ্বে বিরাজমান অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে সমতালে চলার লক্ষ্যে মুক্তবাজার অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে অর্থনীতিকে পরিচালনা করা হচ্ছে। বর্তমানে অর্থনীতির কিছু খাতে সরকারি–বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পরিচালনার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

স্বাধীনতার পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও নানারকম সংস্কার এবং পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলছে। বর্তমানে দেশে ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রাধান্যসহ মিশ্র অর্থনৈতিক অবস্থা বিদ্যমান। প্রধান প্রধান শিল্প, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের অন্তর্ভুক্ত। তবে অর্থনীতির প্রায় সব খাত ক্রমশ বেসরকারি উদ্যোগের নিয়ন্ত্রণাধীনে চলে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আর একটি বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বেসরকারি উদ্যোগ সম্প্রসারণের সাথে সাথে বাজার অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে। দ্রব্যের চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক ক্রিয়ায় দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয়। এই দামই আবার উৎপাদনের প্রকৃতি ও পরিমাণ এবং ক্রেতার ভোগকে প্রভাবিত করে।

দেশে উৎপাদনের জন্য যে মূলধন বা পুঁজি প্রয়োজন, তা অভ্যন্তরীণ উৎস থেকেই বেশিরভাগ সংগৃহীত হয়। তবে বৈদেশিক ঋণ, সাহায্য, অনুদান এবং ব্যক্তিগত পুঁজিও এক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

দেশে উৎপাদন ও বণ্টন প্রক্রিয়ায় সরকারি ও বেসরকারি খাতের সহাবস্থান রয়েছে। বেসরকারি খাত ক্রমশ সম্প্রসারিত হচ্ছে। ফলে উদ্যোক্তা ও ভোগকারীর স্বাধীনতা আছে। যে কোনো উদ্যোক্তা বা উৎপাদনকারী যে কোনো দ্রব্য যে কোনো পরিমাণ উৎপাদন করতে পারে। এই উৎপাদন কার্য অবশ্য সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত হয়।

বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের বণ্টন পরিস্থিতি

উপরের আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট যে, বাংলাদেশে প্রধানত ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিদ্যমান। তবে অর্থনীতির কিছু খাতে বিশেষত সেবা খাতে সরকারি মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ রয়েছে।

আমরা জানি ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন উৎপাদনের চারটি উপাদান। ভূমির আয়কে খাজনা আর শ্রমের আয়কে বলে মজুরি। মূলধনের আয় হলো সুদ এবং সংগঠন বা উদ্যোক্তার আয় হচ্ছে মুনাফা। এ চারটির সমষ্টিই জাতীয় আয়।

উৎপাদনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে মূলধনের মালিক বা পুঁজিপতি এবং সংগঠক একই ব্যক্তি। কারণ মূলধন ছাড়া উদ্যোগ গ্রহণ করা যায় না। বাংলাদেশের জনগণের একটি ক্ষুদ্র অংশ পুঁজিপতি ও উদ্যোক্তা। বৃহত্তর অংশই শ্রমিক বা মজুর।

ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য পুঁজিপতির দ্বারা শ্রমিকের শোষণ। শ্রমিককে তার প্রাপ্য ও ন্যায্য মজুরি দেওয়া হয় না। তার প্রাপ্য মজুরির একটি বড় অংশ পুঁজিপতিদের কাছে সুদ ও মুনাফা হিসেবে সঞ্চিত হয়। অর্থাৎ জাতীয় আয়ের বৃহত্তর অংশ অল্পসংখ্যক ব্যক্তি বা গোষ্ঠী ভোগ করে আর ক্ষুদ্রতর অংশ বন্টিত হয় বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্যে।

বাংলাদেশে ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রায় সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। আয় বণ্টনের ক্ষেত্রে ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মতো বাংলাদেশেও শ্রমিকদের মজুরির নিম্নহার এবং উদ্যোক্তাদের মুনাফার উচ্চহার লক্ষণীয়। সুদ এবং খাজনা উচ্চহারে পরিশোধ করা হয়। সরকারি খাতে সরকারের নিয়ন্ত্রণ থাকায় শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি তুলনামূলকভাবে নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। তবে অর্থনীতির খাতসমূহের অধিকাংশই বেসরকারি নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকায় বাংলাদেশে আয় বৈষম্য রয়েছে। ফলে শ্রমিক শ্রেণির জীবনযাত্রার মান নিম্ন।

কাজ

একক : বাংলাদেশে বিদ্যমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কী পরিবর্তন আনলে আয় বৈষম্য কমে যাবে বলে তুমি মনে কর?

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. উদ্যোক্তা কাকে বলে?

২. ব্যক্তিগত সম্পদের উদাহরণ দাও?

৩. জাতীয় সম্পদ কী?

৪. সমষ্টিগত সম্পদকে তুমি কীভাবে সংজ্ঞায়িত করবে?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন :

১. বাংলাদেশের জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণে রাষ্ট্রের করণীয়সমূহ ব্যাখ্যা কর।

২. ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য তুলে ধর।

৩. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ চিহ্নিত কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. সমষ্টিগত সম্পদ নিচের কোনটি?

ক. ঘরবাড়ি

খ. সাগর

গ. কলকারখানা

ঘ. বনাঞ্চল

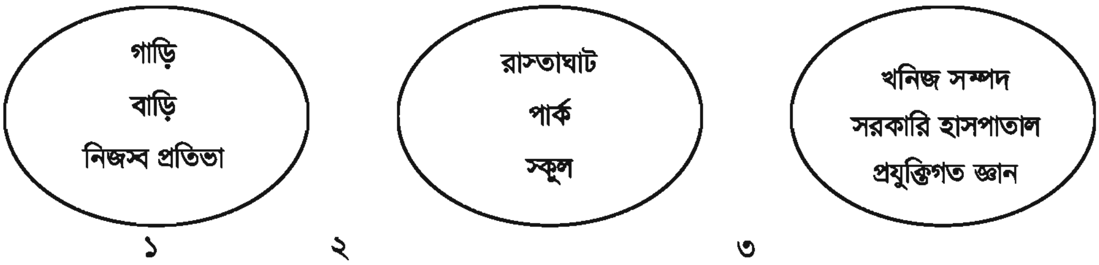
গাড়ি
বাড়ি
নিজস্ব প্রতিভা
রাস্তাঘাট
পার্ক
স্কুল
খনিজ সম্পদ
সরকারি হাসপাতাল
প্রযুক্তিগত জ্ঞান
১
২
৩

২. উপরের কোন বৃত্তে ব্যক্তিগত সম্পদ রয়েছে?

ক. ১

খ. ২

গ. ১ ও ২

ঘ. ২ ও ৩

৩. মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হলো–

i. সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যক্তির স্বাধীনতা ও সরকারি খাতের প্রাধান্য

ii. কোনো দ্রব্য কী পরিমাণ উৎপাদিত হবে সরকার কর্তৃক স্থিরকৃত থাকে

iii. একক উৎপাদনকারী হিসেবে একক ব্যবস্থার প্রচলন

২০১৫

নিচের কোনটি সঠিক ?

- ক. i
- খ. i ও ii
- গ. iii
- ঘ. i ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

গাজীপুর জেলার বকুলপুর গ্রামের তানভীর লক্ষ করলেন কতিপয় লোক বনের গাছ কেটে নিয়ে যাচ্ছে। তানভীর গ্রামের লোকজনের সহায়তায় গাছ কাটার সঙ্গে জড়িত লোকদের ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেন।

৪. তানভীরের কাজটি জাতীয় সম্পদের সংরক্ষণ ও অপচয় রোধের কোন ধরনের উদ্যোগ?
- ক. ব্যক্তিগত
- খ. রাষ্ট্রীয়
- গ. সমষ্টিগত
- ঘ. আন্তর্জাতিক

৫. উক্ত উদ্যোগটি গ্রহণের ফলে–
- i. জাতীয় সম্পদ রক্ষা পাবে
- ii. অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটবে
- iii. কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে

নিচের কোনটি সঠিক ?

- ক. i
- খ. ii
- গ. i ও ii
- ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন :

১. পার্থ ‘ক’ নামক দেশের নাগরিক। তিনি যে দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন সে দেশে ব্যক্তিগত কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা যায় না। পার্থর বাবা উক্ত ‘ক’ দেশে যে কারখানায় কাজ করতেন তার প্রাপ্য মজুরির একটি অংশ প্রয়োজন অনুসারে তাকে দেওয়া হতো। সাম্প্রতিক কালে পার্থ ‘খ’ নামক দেশের নাগরিকত্ব লাভ করেন। তিনি সেখানে এক লক্ষ ডলার খরচ করে একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। পরবর্তীতে তিনি তার আয় দিয়ে আরও একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন।

- ক. সম্পদকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়?
- খ. অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কী? ব্যাখ্যা কর।
- গ. পার্থের ‘ক’ দেশের অর্থব্যবস্থার ধরনটি তোমার পঠিত বিষয়বস্তুর আলোকে ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. ‘খ’ দেশে যে ধরনের অর্থব্যবস্থা প্রচলিত তার সাথে ‘ক’ দেশের অর্থব্যবস্থার পার্থক্য রয়েছে–যুক্তির মাধ্যমে ব্যাখ্যা কর।

দ্বাদশ অধ্যায়

অর্থনৈতিক নির্দেশকসমূহ ও বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রকৃতি

কোনো দেশের অর্থনীতির অবস্থা জানতে হলে সে দেশের মোট জাতীয় উৎপাদন, মোট অভ্যন্তরীণ বা দেশজ উৎপাদন ও জনগণের মাথাপিছু আয় জানা প্রয়োজন। এগুলোকে বলা হয় অর্থনীতির নির্দেশক। কারণ, এগুলো অর্থনীতির অবস্থা নির্দেশ করে। দেশের অর্থনীতি পূর্ববর্তী অবস্থার তুলনায় এগিয়ে যাচ্ছে, পিছিয়ে যাচ্ছে, নাকি একই অবস্থায় আছে, তা উক্ত নির্দেশকসমূহের মান দ্বারা বোঝা যায়। এগুলোর সাথে সাথে কৃষি, শিল্প, সেবা এবং অন্যান্য খাতে উৎপাদনের অবস্থা কী, বিদেশ থেকে কর্মজীবী মানুষ যে অর্থ দেশে প্রেরণ করছে তা জাতীয় অর্থনীতিতে কেমন প্রভাব ফেলছে– এ সবকিছু বিবেচনায় নিয়ে দেশের অর্থনীতির অবস্থা ও গতিপ্রবাহ জানা সম্ভব। এই অধ্যায়ে এ সকল অর্থনৈতিক নির্দেশক অর্থাৎ মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন, মোট জাতীয় উৎপাদন, মাথা পিছু আয় এবং বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রকৃতি ও এর উল্লেখযোগ্য খাতসহ বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে আমরা অবহিত হব।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা –

- মোট জাতীয় উৎপাদন (জিএনপি), মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) ও মাথাপিছু আয়ের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- জিএনপি ও জিডিপি এর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারব;
- দেশজ উৎপাদনে অর্থনীতির খাতসমূহের অবদান ব্যাখ্যা করতে পারব;
- কয়েকটি দেশের জিএনপি, জিডিপি ও মাথাপিছু আয়ের তুলনা করতে পারব;
- ক্ষুদ্র পরিসরে জিএনপি, জিডিপি ও মাথাপিছু আয় নির্ণয় করতে পারব;
- বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশের অর্থনীতির অগ্রসরতার গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধকসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতা উত্তরণের পদক্ষেপসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- উন্নত, উন্নয়নশীল এবং অনুন্নত অর্থনীতির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের সাথে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারব;
- অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে সচেতন হব।

পরিচ্ছেদ ১১.১ : অর্থনৈতিক নির্দেশকসমূহ

মোট জাতীয় উৎপাদন (Gross National Product)

একটি দেশের অর্থনীতি ও অর্থনীতির অবস্থা জানার জন্য সে দেশের মোট জাতীয় উৎপাদন ও মাথাপিছু জাতীয় উৎপাদন সম্বন্ধে জানা দরকার।

কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে কোনো দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ বা ভূমির ওপর সে দেশের মোট শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করে যে পরিমাণ বস্তুগত ও অবস্তুগত দ্রব্য ও সেবা উৎপাদিত হয়, তার আর্থিক মূল্যকে ঐ দেশের মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) বলে। সেবা বলতে কোনো অবস্তুগত দ্রব্যকে বুঝায় যার উপযোগ এবং বিনিময় মূল্য আছে। শিক্ষকের পাঠদান, চিকিৎসকের চিকিৎসা প্রদান, ব্যাংকারের অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে সহায়তা দান ইত্যাদি সেবা হিসেবে বিবেচিত।

মোট জাতীয় উৎপাদন পরিমাপ

মোট জাতীয় উৎপাদনকে তিনটি দিক থেকে বিবেচনা করে পরিমাপ করা যায়–

১. উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা

যে কোনো দেশের অর্থনীতিতে জনগণের প্রয়োজনের ভিত্তিতে নানাবিধ দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা উৎপাদন করা হয়। উৎপাদিত দ্রব্যের বিভিন্নতার কারণে সবগুলো একত্রে যোগ করে এগুলোর মোট পরিমাণ নির্ণয় করা যায় না। তাই মোট জাতীয় উৎপাদনের পরিমাণ নির্ণয় করতে হলে প্রতিটি দ্রব্য ও সেবার মোট উৎপাদনের পরিমাণকে তার বাজার দাম দিয়ে গুণ করতে হয়। এভাবে প্রাপ্ত প্রতিটি দ্রব্য ও সেবার আর্থিক মূল্যের সমষ্টিকে মোট জাতীয় উৎপাদন বলে। এ পদ্ধতিতে মোট জাতীয় উৎপাদন নির্ণয় করতে হলে শুধুমাত্র চূড়ান্ত দ্রব্যই গণনা করতে হবে। অনেক দ্রব্যই চূড়ান্ত পর্যায়ে বাজারে আসার আগে প্রাথমিক দ্রব্য ও মাধ্যমিক দ্রব্য হিসেবে একাধিকবার ক্রয়–বিক্রয় হয়। এই ক্রয়–বিক্রয় হয় উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে। দ্রব্যটি উৎপাদনের চূড়ান্ত পর্যায়ে ভোগকারী এটি ক্রয় ও ভোগ করে। ভোগকারীর ক্রয়ের পর দ্রব্যটি আর ক্রয়–বিক্রয় হয় না। মোট জাতীয় উৎপাদন নির্ণয়ের জন্য প্রত্যেক ধাপেই দ্রব্যটির হিসাব করা হলে জাতীয় উৎপাদনের পরিমাণ সঠিক হবে না। তাই মোট জাতীয় উৎপাদন নির্ণয়ের ক্ষেত্রে শুধু চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্যটিই হিসাব করতে হবে।

একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বুঝতে চেষ্টা করা যাক। ধরা যাক, তুলা থেকে সুতা, সুতা থেকে কাপড় এবং কাপড় থেকে শার্ট উৎপাদন করা হলো। এখানে তুলা হচ্ছে প্রাথমিক দ্রব্য, সুতা ও কাপড় মাধ্যমিক দ্রব্য এবং শার্ট চূড়ান্ত দ্রব্য। তুলা, সুতা, কাপড় এবং শার্ট–এই চারটি পর্যায়েই দ্রব্যটির দাম হিসাব করা হলে তা হবে একটি ভুল হিসাব। কারণ শার্টের দামের মধ্যেই তুলা, সুতা ও কাপড়ের দাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাই উৎপাদন পদ্ধতিতে মোট জাতীয় উৎপাদন গণনা বা পরিমাপ করতে হলে শুধুমাত্র চূড়ান্ত পণ্য– যা সরাসরি ভোগ করা হয়, তাই হিসাব করা হয়।

২. উৎপাদনের উপকরণের অর্জিত আয়

এ পদ্ধতিতে মোট জাতীয় উৎপাদন পরিমাপ করতে হলে উৎপাদনের উপাদানসমূহের মোট আয়ের সমষ্টি নির্ণয় করতে হয়। ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন–উৎপাদনের এ চারটি উপাদানের আয় যথাক্রমে খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফা। এক বছরে কোনো দেশের জাতীয় আয় হলো ঐ বছরে উৎপাদনের উপাদানসমূহের অর্জিত মোট খাজনা, মজুরি বা বেতন, সুদ ও মুনাফার সমষ্টি।

৩. সমাজের মোট ব্যয়

সমাজের মোট ব্যয়ের ভিত্তিতেও মোট জাতীয় উৎপাদন নির্ণয় করা যায়। এই পদ্ধতি অনুসারে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে দেশের সমস্ত ধরনের ব্যয় যোগ করলে মোট জাতীয় উৎপাদনের আর্থিক মূল্য পাওয়া যায়। কোনো দেশের মোট আয়

দু'ভাবে ব্যয়িত হয়– (i) ভোগ্যদ্রব্য ও সেবা কেনার জন্য এবং (ii) বিনিয়োগ করার জন্য। ব্যয়কারীদের প্রধানত তিন শ্রেণিতে বিন্যাস করা যায়: সরকার, বিভিন্ন সরকারি–বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং জনগণ। কোনো নির্দিষ্ট সময়ে, সাধারণত এক বছরে সরকারি, প্রাতিষ্ঠানিক এবং বেসরকারি ভোগ-ব্যয় ও বিনিয়োগ-ব্যয়ের সমষ্টি ঐ সময়ে ঐ দেশের মোট জাতীয় উৎপাদন।

কাজ

একক : মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) ও মোট জাতীয় আয়ের (GNI) মধ্যে পার্থক্য উদাহরণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা কর।

মোট জাতীয় উৎপাদনকে অনেক সময় মোট জাতীয় আয় বলা হয়। যে কোনো সরল অর্থনীতিতে মোট জাতীয় উৎপাদন (**Gross National Product : GNP**) ও মোট জাতীয় আয় (**Gross Nationat Income: GNI**) একই হতে পারে। আমরা জানি, কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো দেশে উৎপাদিত মোট দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার আর্থিক মূল্যের সমষ্টিকে মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) বলে। কিন্তু এর সঙ্গে সমাজের মোট আয় বা মোট ব্যয়ের সমতা নাও হতে পারে। কারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া চালু রাখার জন্য ব্যবহৃত মূলধন সামগ্রী, যেমন–কলকারখানা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির ক্ষয়ক্ষতি পূরণের জন্য মোট জাতীয় উৎপাদনের আর্থিক মূল্য থেকে কিছু অংশ পৃথক করে রাখা হয়। উৎপাদনের উপাদানসমূহের আয়ের মধ্যে এই অংশটি অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। তাই মোট জাতীয় উৎপাদনের (GNP) আর্থিক মূল্য এবং উৎপাদনের উপাদানসমূহের আয় (খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফা) বা জাতীয় আয় এক নয়। তবে আলোচনার সুবিধার জন্য অনেক সময়ই মোট জাতীয় উৎপাদন ও মোট জাতীয় আয়কে সমার্থকভাবে ব্যবহার করা হয়।

মোট দেশজ উৎপাদন (Gross Domestic Product) : মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) হচ্ছে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে, সাধারণত এক বছরে কোনো দেশের অভ্যন্তরে বা ভৌগোলিক সীমানার ভিতরে বসবাসকারী সকল জনগণ কর্তৃক উৎপাদিত চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের অর্থমূল্যের সমষ্টি। এতে উক্ত সীমানার মধ্যে বসবাসকারী দেশের সকল নাগরিক ও বিদেশি ব্যক্তি, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের মূল্য অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে বিদেশে অবস্থানকারী ও কর্মরত দেশের নাগরিক বা সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের আয় অন্তর্ভুক্ত হবে না।

কাজ

একক: কোনো নির্দিষ্ট বছরে কোনো দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত মোট দ্রব্য ও সেবার আর্থিক মূল্য ২১,০০০ কোটি টাকা। এর মধ্যে ঐ দেশে বসবাসকারী বিদেশিদের দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার মূল্য ২,০০০ কোটি টাকা। ঐ একই বছরে উক্ত দেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী দেশের নাগরিকদের মোট উৎপাদনের আর্থিক মূল্য ৪,৫০০ কোটি টাকা। দেশটির মোট জাতীয় উৎপাদন (জিএনপি) ও মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) নির্ণয় কর।

যদি X দ্বারা আমরা বিদেশে অবস্থানরত দেশি জনগণের আয় বুঝাই এবং M দ্বারা দেশে অবস্থানরত বিদেশিদের আয় বুঝাই তাহলে মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) = মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) + (X-M) । মোট দেশজ উৎপাদন বুঝতে হলে মোট জাতীয় উৎপাদন বা GNP এর ধারণাটিও মনে রাখতে হবে। কোনো নির্দিষ্ট সময়ে, সাধারণত এক বছরে কোনো দেশের জনগণ মোট যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন করে তার অর্থমূল্যকে মোট জাতীয় উৎপাদন বলে। জাতীয় উৎপাদনের মধ্যে দেশের অভ্যন্তরে বসবাসকারী ও কর্মরত বিদেশি ব্যক্তি ও সংস্থার উৎপাদন বা আয় অন্তর্ভুক্ত হবে না। তবে বিদেশে বসবাসকারী ও কর্মরত দেশি নাগরিক, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন বা আয় অন্তর্ভুক্ত হবে।

উপরের আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট যে, মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) শুধু দেশের নাগরিকদের উৎপাদন হিসেবে গণনা করে। এ নাগরিকেরা দেশে অথবা বিদেশে যেখানেই অবস্থান করুক না কেন, এক্ষেত্রে নাগরিকই গুরুত্বপূর্ণ।

মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) বলতে শুধু দেশের সীমানার ভিতরের মোট উৎপাদনকে বুঝায়। এটা দেশের নাগরিক বা বিদেশি ব্যক্তি যাদের দ্বারাই উৎপাদিত হোক না কেন, এক্ষেত্রে দেশের ভৌগোলিক সীমানার বিষয়টিই গুরুত্বপূর্ণ।

মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) –এর চেয়ে বেশি বা কম হতে পারে, আবার সমানও হতে পারে।

তবে সাধারণত GNP, GDP – এর চেয়ে বেশি বা কম হয়, সমান হয় না।

মাথাপিছু আয় (per Capita Income) : মাথাপিছু আয় হলো কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো দেশের নাগরিকদের গড় আয়। মাথাপিছু আয় দুইটি পৃথক মান দ্বারা নির্ধারিত হয় : (১) মোট জাতীয় আয় এবং (২) মোট জনসংখ্যা।

কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো দেশের মোট জাতীয় আয়কে (GNI) সে দেশের মোট জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে মাথাপিছু জাতীয় আয় বা মাথাপিছু আয় পাওয়া যায়। মাথাপিছু আয়কে নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা যায় :

$$\text{মাথাপিছু আয়} = \frac{\text{মোট জাতীয় আয়}}{\text{মোট জনসংখ্যা}}$$

সংকেতের সাহায্যে মাথাপিছু আয় প্রকাশ করলে আমরা পাই :

$$\overline{Y} = \frac{Y}{P}$$

যেখানে $\overline{Y}$ = মাথাপিছু আয়

Y = মোট জাতীয় আয়

P = মোট জনসংখ্যা

কাজ

একক : ২০১৩ সালে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ১৫ কোটি এবং এ সময়ে মোট জাতীয় উৎপাদন ৮০০০ কোটি মার্কিন ডলার হলে দেশটির জনগণের মাথাপিছু আয় বের কর।

ধর, ২০১১ সালের মধ্য সময়ে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ১৪ কোটি এবং ঐ সময়ে মোট জাতীয় আয় ৭০০০ কোটি মার্কিন ডলার।

$$\text{সুতরাং ঐ সময়ে মাথাপিছু আয় } (\overline{Y}) = \frac{\text{৭০০০ কোটি মার্কিন ডলার}}{\text{১৪ কোটি}}$$

$$= \text{৫০০ মার্কিন ডলার}$$

মাথাপিছু আয় ব্যক্তির জীবনযাত্রার মান নির্ধারণ করে। উচ্চ মাথাপিছু আয় উন্নত জীবনমান নিশ্চিত করে। তবে জীবনমান নির্ধারণের জন্য উচ্চ মাথাপিছু আয়ের সাথে দ্রব্যমূল্যের বিষয়টিও বিবেচনায় নিতে হবে। যদি কোনো বছরে কোনো দেশের জনগণের মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ হয়ে যায়, আবার একই সাথে দ্রব্যের মূল্যস্তরও দ্বিগুণ হয়, তাহলে প্রকৃতপক্ষে জীবনযাত্রার মান একই থাকবে। কারণ ঐ দ্বিগুণ আয় দিয়ে ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে একই পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করতে পারবে। অর্থাৎ তার আর্থিক আয় দ্বিগুণ হলেও তার প্রকৃত আয় বৃদ্ধি পায়নি। কারণ, আর্থিক আয় ও দ্রব্যমূল্য একই হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে মূল্যস্তর অপরিবর্তিত থেকে মাথাপিছু আয় বাড়লে জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাবে এবং মাথাপিছু আয় কমলে জীবনযাত্রার মান হ্রাস পাবে।

আবার, জাতীয় আয়ের বণ্টন যদি সুষম না হয় তাহলে মাথাপিছু আয় বাড়লেও অধিকাংশ জনগণের জীবনমান নিচুই থাকে। কারণ, মাথাপিছু আয় একটি গড় মান। জনগণের একটি ক্ষুদ্র অংশের মাথাপিছু আয় অনেক বেশি অথচ বৃহদাংশের আয় অনেক কম হলেও উভয় অংশের মাথাপিছু আয়ের গড় মান এমন হতে পারে যাতে মনে হয় যে, জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে। কিন্তু মোট জাতীয় আয়ের এ রকম অসম বণ্টন হলে বেশিরভাগ মানুষের মাথাপিছু আয় মাথাপিছু জাতীয় আয়ের চেয়ে কম হবে। ফলে অধিকাংশ মানুষের জীবনযাত্রাও উন্নত হবে না। তবে যে দেশে জাতীয় আয়ের সুষম বণ্টন আছে, সেসব দেশে মাথাপিছু আয় বাড়লে এবং মূল্যস্তর অপরিবর্তিত থাকলে বা আয় বৃদ্ধির চেয়ে কম হারে বৃদ্ধি পেলে জীবনযাত্রার মানও বৃদ্ধি পাবে।

২০১৫-২০১৬ সালে চলতি মূল্যে বাংলাদেশের মাথাপিছু জাতীয় আয় ১,১৪,৫৪৭ টাকা এবং মার্কিন ডলারে ১,৪৬৬ ডলার। (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৬, অর্থ মন্ত্রণালয়) ২০১৬

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো রিপোর্ট (মে, ২০১৭) অনুসারে বাংলাদেশের বর্তমান মাথাপিছু আয় ১,৬০২ মার্কিন ডলার।

জাতীয় অর্থনীতির খাতসমূহ ও মোট দেশজ উৎপাদনে এগুলোর অবদান

অর্থনীতির খাত বলতে বোঝায় অর্থনীতির বিভিন্ন অংশ, বিভাগ বা শাখা। বিশ্বের যে কোনো অর্থনীতিকে প্রধান তিনটি খাতে ভাগ করা হয় : কৃষি, শিল্প ও সেবা খাত। ভূমি ও ভূমি থেকে উৎপন্ন সবকিছু – শস্য ও ফলমূল, শাকসবজি, বনজ সম্পদ, পশু ও মৎস্যসম্পদ প্রভৃতি কৃষি খাতের অন্তর্গত। বৃহদায়তন ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প, সব ধরনের নির্মাণ, খনিজ দ্রব্যাদি সংক্রান্ত সকল কাজ শিল্প খাতের অন্তর্গত। অবশিষ্ট সকল ক্ষেত্র, যেমন– শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিনোদন, ব্যাংক, বিমা, হোটেল–রেস্তোরাঁ, ডাক, তার, যোগাযোগ ও পরিবহন– এসব কিছুই সেবা খাতের আওতাধীন। তবে বিভিন্ন দেশে বাজেট বরাদ্দ এবং কাজ করার সুবিধার জন্য এ তিনটি প্রধান খাতের প্রত্যেকটিকে আবার কিছু সংখ্যক উপখাতে ভাগ করা হয়। যে কোনো দেশের অর্থনীতিকে বেশকিছু খাতে ভাগ করা যায়। বাংলাদেশের অর্থনীতিকে মোট ১৫টি প্রধান খাতে ভাগ করা হয়। এই ১৫টি খাত হচ্ছে: (১) কৃষি ও বনজ (২) মৎস্য (৩) খনিজ ও খনন (৪) শিল্প, (৫) বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সম্পদ (৬) নির্মাণ (৭) পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য (৮) হোটেল ও রেস্তোরাঁ (৯) পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ (১০) আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক সেবা (১১) রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা (১২) লোকপ্রশাসন ও প্রতিরক্ষা (১৩) শিক্ষা (১৪) স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা ও (১৫) কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা। তবে এ ১৫টি খাতকে ৩টি বৃহত্তর খাতে সমন্বিত করা যায়, যেমন– কৃষি, শিল্প ও সেবা খাত।

কৃষি খাত : কৃষি খাতে রয়েছে কৃষি ও বনজ। বৃহত্তর অর্থে মৎস্য সম্পদও কৃষি খাতের অন্তর্গত।

শিল্প ও বাণিজ্য খাত : শিল্প খাতের মধ্যে রয়েছে ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্প। তবে বৃহত্তর অর্থে খনিজ ও খনন, বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি সম্পদ এবং নির্মাণ– এই খাতগুলোকেও শিল্প খাতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য এবং রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসায়–এ খাতের আওতায় পড়ে।

সেবা খাত : হোটেল ও রেস্তোরাঁ; পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ; আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক সেবা (ব্যাংক ও বিমা) ইত্যাদি সেবা খাতের অন্তর্ভুক্ত। লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা; শিক্ষা; স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা; কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা এগুলো এ খাতের আওতাভুক্ত।

২০১৫–২০১৬ অর্থবছরের মোট দেশজ উৎপাদনে খাতওয়ারি অংশ বা অবদান হিসেবে উক্ত ৩টি সমন্বিত খাতের মধ্যে সবচেয়ে উপরে রয়েছে শিল্প ও বাণিজ্য খাত। এ খাতের অবদান ৫৩.৯৪%। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে সেবা খাত। মোট দেশজ উৎপাদনে এর অংশ ৩৩.৭২%। তৃতীয় স্থানে রয়েছে কৃষি খাত। মোট দেশজ উৎপাদনে এর অবদান ১৫.৩৩%।

মোট দেশজ উৎপাদনে অর্থনীতির ১৫টি বিভিন্ন খাতের অংশ বা অবদান সারণি-১ এ উপস্থাপন করা হলো।

সারণি–১

মোট দেশজ উৎপাদনে অর্থনীতির খাতসমূহের অবদান (২০১১-২০১২)

ক্রমিক নং	অর্থনীতির খাত	মোট দেশজ উৎপাদনে অংশ (শতাংশে)
১.	কৃষি ও বনজ (শস্য, শাকসবজি, পশু সম্পদ ও বনজ সম্পদ)	১৫.০২
২.	মৎস্য সম্পদ	৪.৩৯
৩.	খনিজ ও খনন (প্রাকৃতিক গ্যাস, অপরিশোধিত তেল ও অন্যান্য খনিজ সম্পদ)	১.২৮
৪.	শিল্প (ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্প)	১৮.৯৬
৫.	বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সম্পদ	১.৬৯
৬.	নির্মাণ	৯.২০
৭.	পাইকারী ও খুচরা বাণিজ্য	১৪.২৪
৮.	হোটেল ও রেস্তোরাঁ	০.৭৪
৯.	পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ (স্থল, পানি ও আকাশ পথে পরিবহন, সহযোগী পরিবহন সেবা ও সংরক্ষণ, ডাক ও তার যোগাযোগ)	১০.৭৪
১০.	আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক সেবা (ব্যাংক, বীমা ও অন্যান্য)	২.১০
১১.	রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা	৬.৮৬
১২.	লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	২.৯১
১৩.	শিক্ষা	২.৮১
১৪.	স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	২.৪৬
১৫.	কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা	৬.৬২

সূত্র : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৬, অর্থ মন্ত্রণালয়

কয়েকটি দেশের জিএনপি, জিডিপি ও মাথাপিছু আয়ের তুলনা

আমরা জানি, যে কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান সূচক সে দেশের জনগণের মাথাপিছু আয়। তবে একটি দেশ উন্নত, অনুন্নত নাকি উন্নয়নশীল, তা নির্ধারণের জন্য মাথাপিছু জাতীয় আয় বা মাথাপিছু আয় ছাড়াও আরো বেশ কিছু বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন।এক্ষেত্রে,অর্থনীতির প্রকৃতি অর্থাৎ অর্থনীতি কৃষি প্রধান না কি এর শিল্পায়ন ঘটেছে, সাক্ষরতার হার, জনগণের কাছে স্বাস্থ্য সেবার প্রাপ্যতা, অর্থনৈতিক অবকাঠামোর উর্ধ্বমুখী উন্নয়ন ঘটেছে কিনা অর্থাৎ পরিবহন, যোগাযোগ সুবিধা এবং মূলধন গঠন ও বিনিয়োগের হার উর্ধ্বমুখী কিনা এসবও বিবেচ্য বিষয়।

কাজ

একক : মোট দেশজ উৎপাদনে কৃষি খাতের অবদান নির্ণয় কর।

দলীয় : উপরের সারণিতে বাংলাদেশের অর্থনীতির মোট ১৫টি খাত এবং মোট দেশজ উৎপাদনে (২০১১–২০১২) এগুলোর শতকরা অংশ দেখানো হয়েছে। একক খাত হিসাবে মোট দেশজ উৎপাদনে খাতসমূহের অংশের ভিত্তিতে এই ১৫টি খাত ক্রমানুসারে একটি সারণিতে উপস্থাপন কর।

তবে বিশ্বব্যাংক মাথাপিছু মোট জাতীয় আয়ের ভিত্তিতে পৃথিবীর দেশগুলোকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করেছে। এগুলো হলো: উচ্চ আয়ের দেশ (High Income Countries), মধ্য আয়ের দেশ (Middle Income Countries) এবং নিম্ন আয়ের দেশ (Low Income Countries)। মধ্য আয়ের দেশগুলোকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে : উচ্চ মধ্য আয়ের দেশ (Upper Middle Income Countries) এবং নিম্ন মধ্য আয়ের দেশ (Lower Middle Income Countries)। নিচে আয়ভিত্তিক শ্রেণিগুলো দেখানো হলো :

সারণি–২

মাথাপিছু মোট জাতীয় আয়ের (Percapita GNI) ভিত্তিতে কতিপয় দেশের শ্রেণিবিন্যাস (২০১০)

নং	আয়ভিত্তিক শ্রেণি		দেশ	মোট জাতীয় আয় (জিএনআই) (বিলিয়ন ডলার)	জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	মাথাপিছু মোট জাতীয় আয় (ইউএস ডলার)
১	২		৩	৪	৫	৬
(১)	**উচ্চ আয়ের দেশ** (১২২৭৬ ডলার ও তার বেশি)		যুক্তরাষ্ট্র	১৪৬০০.৮	৩১০	৪৭১৪০
			কানাডা	১৪১৫.৪	৩৪	৪১৯৫০
			যুক্তরাজ্য	২৩৯৯.৩	৬২	৩৮৫৪০
			নরওয়ে	৪১৬.৯	৫	৮৫৩৮০
			সুইডেন	৪৬৯.০	৯	৪৯৯৩০
			জাপান	৫৩৬৯.১	১২৭	৪২১৫০
			সিংগাপুর	২১০.৩	৫	৪০৯২০
(২)	**মধ্য আয়ের দেশ** (১০০৬–১২২৭৫ ডলার)	**(ক) উচ্চ মধ্য আয়ের দেশ** (৩৯৭৬–১২২৭৫ ডলার)	চীন	৫৭০০.০০	১৩৩৮	৪২৬০
			ইরান	৩৩০.৪	৭৪	৪৫৩০
			মালয়েশিয়া	২২০.৪	২৮	৭৯০০
			তুরস্ক	৭১৯.৪	৭৬	৯৫০০
			থাইল্যান্ড	২৮৬.৭	৬৮	৪২১০
		(খ) নিম্ন মধ্য আয়ের দেশ (১০০৬–৩৯৭৫ ডলার)	ভারত	১৫৬৬.৬	১১৭১	১৩৪০
			পাকিস্তান	১৮২.৫	১৭৩	১০৫০
			মিসর	১৯৭.৯	৮৪	২৩৪০
			নাইজেরিয়া	১৮৬.৪	১৫৮	১১৮০
			শ্রীলংকা	৪৬.৭	২০	২২৯০
(৩)	**নিম্ন আয়ের দেশ** (১০০৫ ডলার অথবা তার কম)		বাংলাদেশ	১০৪.৫	১৬৪	৬৪০ *
			নেপাল	১৪.৫	৩০	৪৯০
			কম্বোডিয়া	১০.৭	১৪	৭৬০
			উগান্ডা	১৬.৬	৩৪	৪৯০
			কেনিয়া	৩১.৮	৪১	৭৮০

উৎস : ওয়ার্ল্ড ব্যাংক রিপোর্ট, ২০১২

উপরের সারণি-২ লক্ষ কর। সারণিটিতে ২০১০ সালে জনসংখ্যা ও মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে বেশকিছু দেশকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে দেখানো হয়েছে। এগুলো হলো উচ্চ, মধ্য ও নিম্ন আয়ের দেশ। মধ্য আয়ের দেশকে আবার উচ্চ মধ্য আয় ও নিম্ন মধ্য আয়ের দেশ হিসেবে ভাগ করে দেখানো হয়েছে। এ তথ্য বিশ্বব্যাংক তার ২০১২ এর রিপোর্টে দেখিয়েছে।

উচ্চ আয়ের দেশসমূহ উন্নত দেশ হিসেবে স্বীকৃত। উন্নয়ন প্রক্রিয়া শীর্ষ পর্যায়ে পৌঁছানোর ফলেই এসব দেশ এই উন্নত অবস্থা অর্জন করেছে। এসব দেশের মাথাপিছু আয় এমন যে জনগণের সকল মৌলিক চাহিদা পূরণের পরও প্রচুর অর্থ উদ্বৃত্ত থাকে–যা সঞ্চয় ও মূলধন গঠনে ব্যয় হয়। এসব দেশ উদ্বৃত্ত অর্থ দিয়ে অধিকতর উন্নয়ন কার্যক্রম চালায় এবং উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশের উন্নয়ন কার্যক্রমে সহায়তা করে। উপরের **সারণি–২** তে দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশ এবং এশীয় দেশসমূহের মধ্যে জাপান ও সিংগাপুর 'উচ্চ আয়ের দেশ' শ্রেণিভুক্ত। ২০১০ সালে এসব দেশের মাথাপিছু জাতীয় আয় ছিল ৩৮৫৪০ ডলার থেকে ৮৫৩৮০ ডলারের মধ্যে।

মধ্য আয়ের দেশসমূহ সাধারণত উন্নয়নশীল দেশ। তবে মধ্য আয়ের ২টি ভাগের মধ্যে উচ্চ মধ্য আয়ের দেশগুলোর অবস্থান উন্নত। এসব দেশের জনগণের মৌলিক চাহিদা অনেকটাই পূরণ হয়েছে। দেশগুলো দ্রুত শিল্পায়িত হচ্ছে এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার মতো সামাজিক অবকাঠামোর দ্রুত উর্ধ্বমুখী উন্নয়ন ঘটছে। তবে উন্নত দেশগুলোর সমপর্যায়ে পৌঁছাতে এসব দেশকে এখনও দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে। উপরের সারণিতে অন্তর্ভুক্ত উচ্চ মধ্য আয়ের দেশগুলোর জনগণের মাথাপিছু আয় ৪২১০ ডলার থেকে ৯৫০০ ডলার পর্যন্ত। এদেশগুলোর মধ্যে রয়েছে চীন,

ইরান, মালয়েশিয়া, তুরস্ক, থাইল্যান্ড। ‘মধ্য আয়ের দেশ’ শ্রেণির নিচের ধাপে রয়েছে নিম্ন মধ্য আয়ের দেশ । এগুলোও উন্নয়নশীল দেশ। সারণিতে ‘নিম্ন মধ্য আয়ের দেশ’ হিসেবে ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, মিশর, নাইজেরিয়া– এ ছয়টি এশীয় ও আফ্রিকান দেশ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এসব দেশের জনগণের মাথাপিছু আয় ১০৫০ ডলার থেকে ২৩৪০ ডলার পর্যন্ত। মাথাপিছু জাতীয় আয়ভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাসের সবচেয়ে নিচে রয়েছে ‘নিম্ন আয়ের দেশ’। এ দেশগুলোকে কোনো কোনো সময় উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে আখ্যায়িত করা হলেও মূলত এগুলো অনুন্নত দেশ। তবে এসব দেশের অধিকাংশে উন্নয়নের ধারা শুরু হয়েছে বেশ কিছুকাল থেকেই। পরিকল্পিত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দেশগুলো কিছুটা উন্নয়নও অর্জন করেছে। সেজন্য অনেক ক্ষেত্রেই এদেশগুলোকে অনুন্নত না বলে স্বল্পোন্নত দেশ বলা হয়। সারণিতে এই শ্রেণিতে এশীয় দেশের মধ্যে নেপাল, বাংলাদেশ ও কম্বোডিয়া এবং আফ্রিকান দেশের মধ্যে কেনিয়া ও উগান্ডাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এসব দেশের জনগণের মাথাপিছু আয় অত্যন্ত কম। সারণিতে অন্তর্ভুক্ত ‘নিম্ন আয়ের দেশ’ সমূহের মাথাপিছু আয় ৪৯০ ডলার থেকে ৭৮০ ডলারের মধ্যে। উল্লেখ্য যে, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক রিপোর্ট-২০১৫ অনুসারে বাংলাদেশের মাথাপিছু জাতীয় আয় ছিল ১১৯০ মার্কিন ডলার আর বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৬ অনুসারে ২০১৫-২০১৬ সালে বাংলাদেশের মাথাপিছু জাতীয় আয় ছিল ১৪৬৬ মার্কিন ডলার।

কাজ

একক : মাথাপিছু মোট জাতীয় আয়ের ভিত্তিতে পৃথিবীর দেশগুলো শ্রেণিবিন্যাস কর।

বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ

কোনো দেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য প্রধানত সে দেশের অর্থনীতির প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে। অর্থনীতির প্রকৃতি আবার দেশের ভূ-প্রকৃতি, প্রাকৃতিক সম্পদ, জনগণের শিক্ষা ও দক্ষতার স্তর এবং তাদের উদ্যম ও উদ্যোগ গ্রহণের মানসিকতা–এ সবকিছুর ওপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশের অর্থনীতি অতি প্রাচীনকাল থেকেই একটি কৃষিপ্রধান বা কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি হিসেবে পরিচিত। এ পাঠে আমরা বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে জানব ।

১. কৃষিপ্রধান অর্থনীতি : অতি প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষিপ্রধান অর্থনীতি হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। যদিও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেশের অর্থনীতিতে শিল্প খাতের গুরুত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৫–২০১৬ অর্থবছরে মোট দেশজ উৎপাদনে মৎস্য খাতসহ কৃষিখাতের অবদান প্রায় ১৬ শতাংশ। দেশের শ্রমশক্তির মোট ৪৫.১০ শতাংশ কৃষি খাতে নিয়োজিত। দেশের রপ্তানি আয়েও কৃষি খাতের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। খাদ্যশস্য কৃষি খাতের অন্যতম প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশে খাদ্য উৎপাদন ক্রমবর্ধমান এবং জনসংখ্যাও ক্রমবর্ধমান। এতদ সত্ত্বেও দেশটি ক্রমশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠছে। এছাড়া আমাদের শিল্প খাতের অনেক কাঁচামালের যোগান দেয় আমাদের কৃষি খাত, যেমন– পাট শিল্প, চা , চামড়া শিল্প ইত্যাদি। এসব কারণেই কৃষি খাত এখন পর্যন্ত দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে বিবেচিত।

নিচের সারণি-৩ এ বাংলাদেশে ১৯৯০–১৯৯১ থেকে ২০১৫–২০১৬ সাল পর্যন্ত সময়কালে খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ দেখানো হলো। লক্ষণীয় যে, এই উৎপাদন ক্রমবর্ধমান।

সারণি–৩

বাংলাদেশের খাদ্যশস্য উৎপাদন পরিস্থিতি

বছর	মোট উৎপাদন (লক্ষ মেট্রিক টন)	বছর	মোট উৎপাদন (লক্ষ মেট্রিক টন)
১৯৯০–১৯৯১	১৮৮.৬	২০১৩-২০১৪	৩৮১.৭৪
১৯৯৫–১৯৯৬	১৯০.০	২০১৪-২০১৫	৩৮৪.১৯
২000– ২০০১	২৬৯.০৬	২০১৫-২০১৬	৩৮৯.৯৭
২00৫– ২00৬	২৭৭.৮৭		
২০০৯– ২০১০	৩৫৮.১২		
২০১০– ২০১১	৩৬০.৬৫		
২০১১–২০১২	৩৬৮.৩৯		
২০১২–২০১৩	৩৭২.৬৬		

উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, অর্থ মন্ত্রণালয়, ১৯৯৬, ২00৩, ২০১১, ২০১৬

২. কৃষি খাতের প্রকৃতি : কৃষি খাত বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একটি প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ খাত। এটি বাংলাদেশের অর্থনীতির ভিত্তিস্বরূপ। তবে এখন এত গুরুত্বপূর্ণ হলেও কৃষি উৎপাদন প্রণালি এখনও সম্পূর্ণ আধুনিক হয়ে ওঠেনি। চাষাবাদের আওতাধীন জমির বৃহদাংশে এখনও পর্যন্ত সনাতন পদ্ধতির চাষাবাদ চলছে। এর ফলে কৃষিজমির উৎপাদনশীলতাও কম।

কাজ

দলীয় : বাংলাদেশের অর্থনীতিকে এখন পর্যন্ত কৃষিপ্রধান অর্থনীতি বলার কারণগুলো চিহ্নিত কর।

এছাড়া এদেশের কৃষি প্রকৃতিনির্ভর। বৃষ্টিপাতের সময় ও পরিমাণ কৃষি উৎপাদনের ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে। যথাসময়ে প্রয়োজনীয় পরিমাণ বৃষ্টিপাত না হলে বা অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত হলে উৎপাদন বিপুল পরিমাণে কমে যায়।

কৃষিখাতের আরেকটি বড় ত্রুটি হলো কৃষক বা কৃষি মজুরদের ন্যায্য মজুরি দেওয়া সবক্ষেত্রে নিশ্চিত করা যায় না। এছাড়া পরিবহন সুবিধার অপ্রতুলতা ও বাজার ব্যবস্থার ত্রুটির কারণে প্রকৃত উৎপাদকেরা অনেক ক্ষেত্রেই উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য দাম পায় না। এ বিষয়টি দেশের সমগ্র কৃষি ক্ষেত্রে একটি বিরূপ প্রভাব ফেলে।

৩. শিল্প খাতের ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব ও অবদান : বাংলাদেশের অর্থনীতিতে শিল্প খাতের গুরুত্ব ও অবদান ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৮০-৮১ অর্থবছরে স্থির মূল্যে জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান ছিল ১৭.৩১ শতাংশ। ২০১১-২০১২ অর্থবছরে এ খাতের অবদান ৩১% এর বেশি। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, বৃহৎ শিল্প, খনিজ ও খনন, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ এবং নির্মাণ-এ খাতগুলোর সমন্বয়ে শিল্প খাত গড়ে উঠেছে।

৪. শিল্প খাতের প্রকৃতি : মোট দেশজ উৎপাদনে শিল্প খাতের অবদান ক্রমবর্ধমান হলেও আমাদের শিল্প খাতে মৌলিক ও ভারী শিল্পের (Basic and Heavy Industries) অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। সার কারখানা, চিনি ও খাদ্যশিল্প, বস্ত্র শিল্প, পাটশিল্প, চামড়া শিল্প, তৈরি পোশাক শিল্প প্রভৃতি দেশের প্রধান প্রধান শিল্পের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু অর্থনীতির উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে হলে দ্রুত শিল্পায়ন প্রয়োজন। এজন্য ভারী বা মৌলিক শিল্প, যেমন-লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, অবকাঠামোর জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদন, জ্বালানি শিল্প ইত্যাদি অত্যাবশ্যক। দেশে ভারী যানবাহন সংযোজন, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ও জলযান নির্মাণ ও মেরামত প্রভৃতি শিল্প রয়েছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এগুলোও অপ্রতুল।

৫. জনসংখ্যাধিক্য ও শিক্ষার নিম্নহার : বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য এর জনসংখ্যাধিক্য। এদেশের মোট জনসংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি। জনবসতির ঘনত্ব অত্যন্ত বেশি। প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১০৬৩ জন (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৬)। বাংলাদেশ জনসংখ্যাধিক্যের দেশ হলেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ক্রমহ্রাসমান। আদম শুমারি রিপোর্ট ১৯৯১ ও ২০০১ সালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ২.১৭% ও ১.৪৮%। এ হার ক্রমশ হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১.৩৭%-এ (আদমশুমারি রিপোর্ট, ২০১১)।

তবে বাংলাদেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার উভয়ই তার প্রতিবেশী দেশগুলোর চেয়ে অনেক বেশি। ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট (ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, ২০১২) অনুসারে ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, মিয়ানমার, মালয়েশিয়া এসব দেশে ২০০৯ সালে জনসংখ্যার ঘনত্ব ছিল প্রতি বর্গকিলোমিটারে যথাক্রমে ৩৮৯, ২২০, ৩২৪, ৭৭ ও ৮৪ জন। আর এ দেশগুলোতে ২০০০-২০১০ সময়কালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির বার্ষিক গড় হার ছিল যথাক্রমে ১.৪%, ২.৩%, ০.৯%, ০.৮% ও ১.৮%।

কাজ

একক : 'বাংলাদেশে জনসংখ্যাধিক্য রয়েছে।'- উক্তিটি মূল্যায়ন কর।

জনসংখ্যাকে দেশের সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু বাংলাদেশে জনসংখ্যা এখন পর্যন্ত একটি সমস্যা। এর কারণ বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার ৬১.৫ (ইউনেস্কো রিপোর্ট ২০১৬)। অর্থাৎ ৩৮.৫ শতাংশ জনগণ নিরক্ষর। নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে সাক্ষর করা, প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেওয়া, এদের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা, কর্মক্ষেত্রে উদ্যোগী করে তোলা, মূলধনের জোগান দেওয়া, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি রাষ্ট্রের জন্য একটি বড় চাপ সৃষ্টি করছে।

৬. ব্যাপক বেকারত্ব : জনসংখ্যাধিক্য এবং দ্রুত শিল্পায়নের অভাব দেশে বেকারত্বের জন্ম দিয়েছে। বাংলাদেশে মোট শ্রমশক্তির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বেকার। দেশে মজুরির হার কম বলে দিনমজুরদের অধিকাংশকে অর্ধ বেকার হিসেবে গণ্য করা যায়।

৭. স্বল্প মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার নিম্নমান : মজুরির নিম্নহার, ব্যাপক বেকারত্ব ও অর্ধবেকারত্বের ফলে জনগণের গড় আয় অর্থাৎ মাথাপিছু আয় কম। বাংলাদেশে ২০১৫–২০১৬ সালে মাথাপিছু জাতীয় আয় ১৪৬৬ মার্কিন ডলার। এই আয় প্রতিবেশি শ্রীলংকা ও ভারতের মাথাপিছু আয়ের চেয়ে কম। এ দুটো দেশের মাথাপিছু আয় যথাক্রমে ৩৯২৬.২ ও ১৫৯৮.৩ ডলার (ওয়ার্ল্ড ডেভলপমেন্ট রিপোর্ট, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, ২০১৬)। নিম্ন মাথাপিছু আয়ের কারণে জীবনযাত্রার মানও নিম্ন। দেশের ২৪.৮ শতাংশ অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ জনগণের অবস্থান দারিদ্র্যসীমার নিচে। (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৬)

৮. সঞ্চয়, মূলধন গঠন ও বিনিয়োগের নিম্নহার: মাথাপিছু আয় নিম্ন হওয়ায় জনগণের সঞ্চয়ের হার কম যা জিডিপির ৩০.০৮%। তাই মূলধন বা পুঁজি গঠনের এবং উৎপাদনের জন্য বিনিয়োগের হারও কম অর্থাৎ জিডিপির ২৯.৩৮%। (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৬)। আবার বিনিয়োগের নিম্নহারের কারণে নতুন শিল্প স্থাপনের গতি মন্থর। ফলে নতুন কর্মসংস্থানের হারও কম। বাংলাদেশ এমনই একটি দারিদ্র্যের চক্রের মধ্যে আবদ্ধ। তবে এই চক্র থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সরকার পরিকল্পিত উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

৯. অবকাঠামোর দুর্বলতা : অবকাঠামো প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা হয়:- সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিনোদন ইত্যাদি সামাজিক অবকাঠামোর অন্তর্ভুক্ত। যোগাযোগ ব্যবস্থা (ডাক ও টেলিযোগাযোগ, ইলেকট্রনিক যোগাযোগ ইত্যাদি), পরিবহন (স্থল, পানি ও আকাশপথে), আর্থিক প্রতিষ্ঠান (ব্যাংক, বিমা প্রভৃতি), শিল্পের জন্য ঋণদানকারী অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, বিদ্যুৎ, পানি ও জ্বালানি সরবরাহ, বাঁধ ও সেচ ব্যবস্থা ইত্যাদি অর্থনৈতিক অবকাঠামোর অন্তর্ভুক্ত। এই আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তিস্বরূপ। অবকাঠামো উন্নত না হলে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড শুরু করা যায় না। বাংলাদেশে এই অবকাঠামো অনুন্নত ও অপর্যাপ্ত।

১০. বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরতা : আর্থ–সামাজিক উন্নয়নের জন্য বৈদেশিক ঋণ ও অনুদানের ওপর বাংলাদেশ অতিমাত্রায় নির্ভরশীল ছিল। তবে বিগত প্রায় এক দশক ধরে বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ঋণের পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর বৈশ্বিক বিভিন্ন পরিবর্তনজনিত কারণে বৈদেশিক উৎস থেকে ঋণ ও অনুদান প্রাপ্তি ক্রমশ কমে আসছে।

১১. বৈদেশিক বাণিজ্য : বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ প্রধানত স্বল্পমূল্যের কৃষিজাত পণ্য– চা, কাঁচাপাট; শিল্প পণ্যের মধ্যে তৈরি পোশাক ও নিটওয়্যার, চামড়া, পাটজাত দ্রব্য, সিরামিক দ্রব্যাদি ইত্যাদি ও শ্রমিক রপ্তানি করে। কিন্তু বাংলাদেশের আমদানি পণ্যের মধ্যে রয়েছে উচ্চমূল্যের মূলধনসামগ্রী (কলকব্জা, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি); জ্বালানি ও পেট্রোলিয়াম এবং খাদ্য ও বিলাসদ্রব্য (রঙিন টেলিভিশন, গাড়ি, প্রসাধনসামগ্রী ইত্যাদি)। বাংলাদেশে দীর্ঘ সময় ধরেই রপ্তানি আয় আমদানি ব্যয়ের চেয়ে কম। ফলে বাংলাদেশের বৈদেশিক লেনদেনের ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় ধরে ঘাটতি অব্যাহত রয়েছে।

১২. প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদের অপূর্ণ ব্যবহার : বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে উর্বর কৃষিজমি, নদ-নদী, প্রাকৃতিক জলাশয় এবং ভূগর্ভস্থ খনিজসম্পদ। খনিজ সম্পদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস, চুনাপাথর, সিলিকা, বালু, সাদা মাটি, চীনা মাটি, কঠিন শিলা ইত্যাদি।

প্রধানত যথাযথ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, কারিগরি ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান এবং দক্ষতা ও সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার মাধ্যমে একটি জনগোষ্ঠী মানবসম্পদে রূপান্তরিত হয়। বাংলাদেশের জনসংখ্যার একটি বড় অংশ এখনও শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত। বেকারত্ব ও দারিদ্র্যের কারণে জনগণের বড় একটি অংশ খাদ্যাভাব ও পুষ্টিহীনতার শিকার। কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় বিজ্ঞান শিক্ষা, কারিগরি ও প্রযুক্তি শিক্ষার বিস্তার ঘটেনি। এসব কারণে বাংলাদেশের জনগণের বৃহত্তর অংশকেই মানবসম্পদে রূপান্তর করা এখনও সম্ভব হয়নি। এর ফলে প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদের সম্পূর্ণ পরিমাণ জানা ও এগুলোর পূর্ণ ব্যবহারও এখন পর্যন্ত সম্ভব হয়নি।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রসরতার প্রতিবন্ধকতাসমূহ

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে জেনেছি। আমরা দেখেছি, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষি একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত, তবে শিল্প খাত ক্রমশ সম্প্রসারিত হচ্ছে। দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো অপর্যাপ্ত ও অনুন্নত।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার মূল কারণ নিহিত রয়েছে আমাদের ইতিহাসের গভীরে। আমাদের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বাংলাদেশ যে অর্থনৈতিকভাবে এত অনগ্রসর এবং সমস্যা জর্জরিত, তার দুই শতাব্দীকাল বিস্তৃত একটি পটভূমি রয়েছে। এই পটভূমি রচিত হয়েছে প্রায় দুইশ' বছরব্যাপী ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন এবং ২৪ বছরের পাকিস্তানি শাসন আমলে।

১. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার পটভূমি : বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার মূল কারণ প্রায় দুইশ' বছরের ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ। স্বাধীনতা-পূর্ব বাংলাদেশের অর্থনীতির ইতিহাসকে ৪টি পর্বে ভাগ করা যায়- প্রাচীন বাংলা, মুসলিম শাসনামল, ব্রিটিশ শাসনকাল ও পাকিস্তানি আমল। প্রাচীন বাংলায় কৃষি উৎপাদনে প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য ছিল। শিল্প ক্ষেত্রে ধাতব শিল্প, কাঠ শিল্প ও বস্ত্র শিল্প বিশেষ প্রসার লাভ করেছিল।

কাজ

দলীয় : বাংলাদেশের অর্থনীতির বর্তমান অবস্থার সাথে ১৭৫৭-১৯৭১ সময় কালকে কীভাবে তুলনা করবে?

মুসলিম শাসনামল ছিল বাংলার স্বর্ণযুগ। এ সময়ে কৃষি, শিল্প, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সকল ক্ষেত্রেই বাংলাদেশ সমৃদ্ধির শিখরে আরোহণ করেছিল। বাংলার শিল্পজাত পণ্য বিশেষত বস্ত্র পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিশেষ সমাদৃত ছিল। কিন্তু ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পরে বাংলায় ইংরেজদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী অব্যাহতভাবে এদেশে শোষণ ও লুণ্ঠন চালায়। কৃষিক্ষেত্রে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে জমিদারি প্রথা ও বাধ্যতামূলক নীলচাষ প্রবর্তনের ফলে কৃষি ও কৃষকসমাজ বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মুসলিম শাসনামলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য ছিল। প্রতিবেশী দেশসমূহসহ ইউরোপীয় দেশগুলোতেও বাংলাদেশের বিস্তৃত রপ্তানি বাণিজ্য ছিল। কৃষিপণ্যের সাথে বাংলাদেশ শিল্পপণ্যেরও বড় রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে পরিগণিত হতো। ইংরেজরা সকল ব্যবসায়-বাণিজ্য নিজেদের কুক্ষিগত করে। এ সময় ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব ঘটার ফলে যন্ত্রযুগের শুরু হয়। ইংল্যান্ডের বস্ত্রকলে কম খরচে উৎপাদিত বস্ত্র দিয়ে বাংলাদেশের বাজার দখল করার ফলে বাংলাদেশের বিশ্বখ্যাত বস্ত্রশিল্প ও অন্যান্য শিল্প ধ্বংস হয়। এভাবে বাংলাদেশ ইংল্যান্ডের শিল্পজাত পণ্যের বাজারে পরিণত হয়। এই ঔপনিবেশিক শাসনামলে বাংলাদেশ কৃষি ও শিল্পপণ্য রপ্তানির পরিবর্তে শুধু কাঁচামাল রপ্তানিকারক

দেশে পরিণত হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে লেনদেনের ভারসাম্য বাংলাদেশে অব্যাহত ঘাটতি দেখা দেয়। ফলে সঞ্চয় ও মূলধন গঠনের প্রক্রিয়াও বাধাগ্রস্ত হয়।

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি দেশে বিভক্ত হয়ে যায়। এরপর শুরু হয় পাকিস্তানি শাসনামল। পাকিস্তানের দুটি অংশ ছিল– পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান। বর্তমানের বাংলাদেশ ছিল তদানীন্তন পূর্ব বাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তান। ১৯৪৭–১৯৭১ সময়কালে পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানকে নানাভাবে শোষণ করে। চাকরি, সম্পদ বণ্টন, বাজেট বরাদ্দ, সশস্ত্র বাহিনীতে নিয়োগ, বৈদেশিক সাহায্যের অংশ প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে চরম বঞ্চনার শিকার হতে হয়। প্রশাসনের সকল ক্ষেত্রেই পশ্চিম পাকিস্তানের প্রাধান্য ছিল। এভাবে দুইশ' বছরেরও বেশি সময় ধরে (১৭৫৭–১৯৭১) ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ চলার ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতির ভিত্তি ধ্বংস হয়ে যায়। কৃষি, শিল্প, ব্যবসায় বাণিজ্য সকল ক্ষেত্রে এক সময়কার বিশ্বে অগ্রণী দেশ বাংলাদেশ একটি পরনির্ভর অর্থনীতিতে পরিণত হয়। ১৯৭১ সালে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন হওয়ার পরে বাংলাদেশ এই পরনির্ভর অর্থনীতির উত্তরাধিকার লাভ করে। ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু করার জন্য ভিত্তি প্রস্তুতেই আমাদের দীর্ঘ সময় ব্যয় হয়। অধিকন্তু পঁচাত্তর পরবর্তী বিভিন্ন অগণতান্ত্রিক শাসনও আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিবন্ধক ছিল।

২. কৃষিক্ষেত্রের প্রতিবন্ধকতাসমূহ : আমাদের কৃষিপ্রধান অর্থনীতিতে কৃষিজমির পরিমাণ ক্রমশ কমে আসছে। কৃষিকাজে উন্নত বীজ, সার, সেচ সুবিধা এবং আধুনিক চাষ প্রণালি প্রয়োগ করা হচ্ছে। তবে কৃষিকাজের সাথে সংশ্লিষ্ট জনগণের একটি অংশের কাছে কৃষি সুবিধাগুলো এখনও পৌঁছেনি। কৃষি উন্নয়নের জন্য সুলভ কৃষিঋণ একটি বড় উপাদান। কৃষিঋণ বিতরণের পরিমাণ প্রতিবছরই বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধার অপর্যাপ্ততার কারণে বহু কৃষকের কাছে কৃষিঋণ এখনও সুলভ নয়। কৃষিক্ষেত্রে অগ্রসরতার সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক অবকাঠামোর দুর্বলতা। সেচ সুবিধা, বীজ ও সারের অপর্যাপ্ততা এবং যথাসময়ে প্রাপ্তির অনিশ্চয়তা, বিদ্যুতের অভাব, উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করার ক্ষেত্রে পরিবহনের উচ্চ ব্যয়, পণ্য সংরক্ষণ ও গুদামজাত করে রাখার সুবিধার অভাবে উৎপাদন কম হয়। আবার উৎপাদন পর্যায় থেকে বাজারজাত করা পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে দালাল ও মধ্যস্বত্বভোগীদের আধিপত্যের ফলে প্রকৃত উৎপাদকেরা পণ্যের ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে তারা উৎপাদনের উৎসাহ হারিয়ে ফেলে এবং নতুন উদ্যোগ নিতে আগ্রহী হয় না। তবে বাংলাদেশে বর্তমানে এসব প্রতিবন্ধকতা অনেকাংশে হ্রাস পাচ্ছে।

বাংলাদেশকে বলা হয় প্রাকৃতিক দুর্যোগের দেশ। প্রাকৃতিক দুর্যোগ কৃষিক্ষেত্রের উন্নয়নে একটি বড় বাধা। প্রতিবছরই এ দেশের বিভিন্ন অঞ্চল বন্যা, খরা, ঝড়, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি কারণে দুর্যোগকবলিত হয়। এসব দুর্যোগ কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপক ক্ষতির কারণ।

৩. শিল্পক্ষেত্রের প্রতিবন্ধকতাসমূহ : বাংলাদেশের অর্থনীতিতে শিল্প খাত ক্রমশ সম্প্রসারিত হচ্ছে। তবে শিল্প খাতের মৌলিক বা ভিত্তিমূলক শিল্প (Basic Industries) নেই বলে শিল্প খাত খুব দ্রুত উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে পারছে না। ভারী শিল্প, যেমন– লোহা ও ইস্পাত শিল্প, ভারী যানবাহন শিল্প, বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় স্থাপনা, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম বিষয়ক শিল্প ইত্যাদি প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত অপ্রতুল।

অর্থনৈতিক অবকাঠামোর দুর্বলতাও শিল্পক্ষেত্রে অগ্রগতির একটি বড় বাধা। প্রয়োজনীয়সংখ্যক স্থল, নৌ ও বিমানবন্দরের অভাব, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও গ্যাসের উচ্চমূল্য, এগুলো উৎপাদন ও সরবরাহে অপর্যাপ্ততা, রাস্তাঘাট, সেতু ইত্যাদির অপ্রতুলতা ও অনুন্নত অবস্থা নতুন শিল্প স্থাপন ও উৎপাদন বৃদ্ধির বড় প্রতিবন্ধক।

ব্যাংক ঋণ সুবিধা শিল্প খাত উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। বাংলাদেশে চাহিদার তুলনায় ঋণসুবিধা অপ্রতুল। নতুন উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করে, এমন ঋণ সুবিধা দেওয়ার উদ্যোগ কম। এছাড়া ঋণ ব্যবস্থাপনাও খুব সুষ্ঠু নয়।

দেশের সামাজিক–রাজনৈতিক পরিস্থিতি তথা রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা শিল্প খাতের উন্নয়নের অনুকূল নয়। রাজনৈতিক কর্মসূচি যেমন– হরতাল, বিক্ষোভ, অবরোধ ইত্যাদি শিল্প খাতের উৎপাদনশীলতায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। শ্রমিকদের আয় কমে যায়। উৎপাদন প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। উৎপাদিত পণ্যের দাম বেড়ে যায়। এতে বাজারে দ্রব্যের চাহিদা কমে ও শিল্পমালিকদের আয় কমে যায়। ফলে নতুন উদ্যোগ ও বিনিয়োগ করার প্রবণতাও হ্রাস পায়।

আর্থ–সামাজিক প্রতিবন্ধকতাসমূহ : আর্থ–সামাজিক প্রতিবন্ধকতা হিসেবে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় অর্থনৈতিক অবকাঠামোর দুর্বলতা ও অপর্যাপ্ততার বিষয়টি। প্রথমে ধরা যাক যোগাযোগের দিকটি। যোগাযোগের মধ্যে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছে। ইলেকট্রনিক যোগাযোগ সুবিধা এখনো বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর নাগালের বাইরে রয়েছে। পরিবহন (আকাশ,স্থল ও জলপথে) সুবিধার দুর্বলতা ও অপর্যাপ্ততার কারণে যাতায়াত ও পণ্য উৎপাদন ও বিপণন কাঙ্ক্ষিত গতি পায় না। জ্বালানি ও শক্তির ক্ষেত্রে গ্যাস ও বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ উভয়ই ত্রুটিপূর্ণ ও অপর্যাপ্ত। ফলে কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। অর্থনৈতিক অবকাঠামোর একটি বড় উপাদান মূলধন যোগানের জন্য উৎপাদন ও বিনিয়োগকারীদের ঋণ সুবিধা প্রদান। ব্যাংক ও অন্যান্য ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ দেশের মোট ঋণ চাহিদা পূরণের জন্য যথেষ্ট নয়। এছাড়া রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতাও বিনিয়োগ প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

এরপরে আসে সামাজিক অবকাঠামো প্রসঙ্গ। সামাজিক অবকাঠামোগত সমস্যার মধ্যে সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে দেশের ব্যাপক জনগণের নিরক্ষরতা। শিক্ষিত ও সাক্ষর জনগণও দেশের উন্নয়নে আশানুরূপ অবদান রাখতে পারে না। এর কারণ শিক্ষা অনেকটাই পুঁথিগত ও জ্ঞানভিত্তিক। অর্জিত জ্ঞানের প্রয়োগের জন্য পর্যাপ্ত দক্ষতাও শিক্ষার্থীরা অর্জন করতে পারে না। তবে বর্তমানে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাকে জ্ঞান ও দক্ষতাভিত্তিক করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

শিক্ষা ব্যবস্থার এই দুর্বলতা, জনগণের সাক্ষরতার নিম্নহার এবং কারিগরি ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও জ্ঞানের অভাবের ফলে সাধারণ শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা কম। এর সাথে পুষ্টিহীনতা ও সুস্বাস্থ্যের অভাব উৎপাদনশীলতা আরও কমিয়ে দেয়। শ্রমিক ও জনগণের মধ্যে উদ্যোগ গ্রহণের আগ্রহ ও সাধ্যও কম। এসব কিছুই অর্থনীতির সকল খাত বিশেষত শিল্পখাতের অগ্রসরতাকে অনেকটাই বাধাগ্রস্ত করে রেখেছে।

যদিও নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, তবুও সমাজের সকল ক্ষেত্রে পুরুষদের তুলনায় নারী এখনও অনগ্রসর। দেশের জনগণের অর্ধেকই নারী। এই পশ্চাৎপদতার ফলে নারীরা কর্মক্ষেত্রেও পিছিয়ে আছে। সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে এমনকি পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও নারীদের ভূমিকা খুব কম। এর ফলে ব্যাপকভাবে বাল্যবিবাহ, পারিবারিক সহিংসতা, অধিক সংখ্যক সন্তানের জন্মদানের ঘটনা ঘটছে।

কাজ

একক : বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের আর্থ–সামাজিক প্রতিবন্ধকতাসমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

আর্থ–সামাজিক প্রতিবন্ধকসমূহের মধ্যে অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধক জনসংখ্যাধিক্য ও এর থেকে সৃষ্ট অন্যান্য সমস্যা। জনসংখ্যাধিক্যের কারণে দেশে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ সকল ক্ষেত্রেই সরকারকে বাড়তি চাপ মোকাবিলা করতে হয়।

জনসংখ্যা সমস্যা থেকে সৃষ্ট আরেকটি বড় সমস্যা বেকারত্ব। দেশের শ্রমশক্তির একটি বড় অংশ বেকার বা অর্ধবেকার। এর ফলে মাথাপিছু আয় কম হয়। সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হারও নিম্ন। ফলে নতুন শিল্প স্থাপনের হারও কম।

বেকারত্ব অনেক সামাজিক সমস্যারও জন্ম দেয়। বেকার কিশোর ও তরুণেরা সামাজিক অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। এতে সমাজজীবন পর্যুদস্ত হয় এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি দুর্বল হয়ে পড়ে।

৫. সুশাসনের অভাব ও দুর্নীতি : স্বাধীনতার পর নানা কারণে দেশের শাসন ব্যবস্থায় গণতন্ত্র দৃঢ় হয়ে উঠতে পারেনি। স্বাধীনতাউত্তর চল্লিশ বছরের একটি বড় সময়কাল দেশে সামরিক শাসন চলেছে। প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব রয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে তাল রেখে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি। ফলে তরুণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপক বেকারত্ব, অসন্তোষ ও অস্থিরতা রয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি খাতে কর্মরতদের মধ্যে একটি বড় প্রভাবশালী অংশ দুর্নীতিগ্রস্ত হওয়ায় সমাজের সর্বস্তরে দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়েছে। এ দুর্নীতি, সামাজিক অস্থিরতা এবং সুশাসনের অভাবের কারণে দেশের শিল্প ও সেবা খাতে আশানুরূপ অগ্রগতি সাধিত হয়নি।

৬. প্রকৃতিসৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা : প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাংলাদেশে একটি সাধারণ ঘটনা। বলা হয়, বাংলাদেশ একটি দুর্যোগ কবলিত দেশ। প্রধান প্রধান প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে রয়েছে– বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়, টর্নেডো, নদীভাঙন প্রভৃতি। এই দুর্যোগগুলো প্রধানত দেশের কৃষি খাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এছাড়া বাড়িঘর, পথঘাট ও গাছপালার ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। বিশেষত প্রতিবছর বন্যা ও নদীভাঙনে সীমিত কৃষি জমির এই দেশের বিপুল পরিমাণ জমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। মানুষের প্রাণহানির পাশাপাশি গবাদিপশু, মৎস্য ও পাখি সম্পদেরও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়। এই ক্ষতিপূরণ দিয়েই প্রতিবছর আবার উৎপাদন কাজ শুরু করতে হয়।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিবন্ধক উত্তরণের পদক্ষেপসমূহ

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান প্রধান প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য সরকারি ও বেসরকারিভাবে গৃহীত পদক্ষেপগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

১. উন্নয়নের জন্য নীতিগত ভিত্তি প্রস্তুত করা : যে কোনো জাতীয় উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য একটি নীতিগত ভিত্তি প্রয়োজন হয়। সরকার অর্থনীতির বিভিন্ন খাতের জন্য জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন বা সংশোধন করে একটি উন্নয়ন কাঠামো প্রস্তুতের প্রকল্প গ্রহণ করেছে। নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা ও প্রকল্প প্রয়োজন হয়।

দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জনের জন্য বর্তমান সরকার পরিকল্পিত উন্নয়নের উদ্যোগ নিয়েছে। এ উদ্যোগের আওতায় সরকার ঘোষিত 'রূপকল্প ২০২১'–এর আলোকে 'বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০–২০২১' শীর্ষক পরিকল্পনা দলিল প্রস্তুত করেছে।

উক্ত পরিকল্পনার ভিত্তিতে মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা হিসেবে সপ্তম বার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬–২০২১) প্রস্তুত করা হয়েছে। এ পরিকল্পনায় সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্য ও সেগুলো অর্জনের কৌশল, পদ্ধতি ও সম্পদের বিবরণ ও দিকনির্দেশনা আছে । উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ইতোপূর্বে ছয়টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছে।

২. কৃষিক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ : কৃষিক্ষেত্রে উন্নয়নের বড় বাধাগুলোর মধ্যে রয়েছে : কৃষিজমির পরিমাণ হ্রাস পাওয়া, কৃষিঋণের অপর্যাপ্ততা, কৃষি উপকরণ, যেমন–বীজ, সার ও কীটনাশকের অপর্যাপ্ততা, অবকাঠামোগত দুর্বলতা যেমন, সেচ সুবিধা ও বিদ্যুতের অভাব, উৎপাদিত পণ্য বিপণন সুবিধার অভাব এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ।

সরকার বিবিধ নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে এসব বাধার মোকাবিলা করছে। এসব নীতির মধ্যে রয়েছে 'জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি', 'জাতীয় বীজ নীতি', 'সমন্বিত সার বিতরণ নীতিমালা' এবং 'সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা'। এছাড়া 'জাতীয় কৃষি নীতি ১৯৯৯' অনুসারে কৃষি উন্নয়নের কাজ চলছে। এসব নীতির আওতায় গৃহীত পদক্ষেপসমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

- দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও হাওর এলাকায় পরিকল্পিত পানি নিষ্কাশনের মাধ্যমে কৃষিজমির আওতা সম্প্রসারণ;

- কৃষি উপকরণে ভর্তুকি বৃদ্ধি, ন্যায্যমূল্যে কৃষি উপকরণ সহজলভ্য করা ও কৃষকদের কাছে এগুলোর সরবরাহ নিশ্চিতকরণ ;
- দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার করে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ ও কৃষকদের কাছে সেচ যন্ত্রপাতির সহজলভ্যতা বৃদ্ধি ;
- উন্নতমানের উচ্চ ফলনশীল বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ ইত্যাদি খাতে অধিকতর বিনিয়োগ ;
- ফসল সংরক্ষণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা, কৃষিজাত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ করা এবং সকল কৃষিজাত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা ;
- জৈব সার ব্যবহারের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করে সারাদেশে ৯৭ লক্ষ পরিবারের বসতভিটার চারদিকে জৈব সার, সবুজ সার ও জীবাণু সার উৎপাদনের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কার্যক্রম গ্রহণ ;

কাজ

একক : কৃষি উন্নয়নের জন্য গৃহীত পদক্ষেপসমূহের মধ্যে তোমার দৃষ্টিতে সবচেয়ে বেশি ফলপ্রসূ দুটি পদক্ষেপ ব্যাখ্যা কর।

- সার ব্যবহার সুষমকরণ ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সারের আমদানি খরচের উপর ভর্তুকি প্রদান অব্যাহত রাখা ;
- ব্যাংক ও অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ কার্যক্রম চলমান রাখা ;
- সম্প্রতি বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকসহ বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংকে কৃষি ঋণ কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়ন ।

৩. শিল্পক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ : বাংলাদেশের অর্থনীতিতে শিল্প খাতের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। মোট দেশজ উৎপাদনে শিল্প খাতের অবদান ক্রমশ বাড়ছে। দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জনের জন্য শিল্প খাতের প্রসার, ভারী বা মৌলিক শিল্প স্থাপন এবং এ খাতের সার্বিক উন্নয়ন জরুরি।

দেশের শিল্প খাতে বিরাজমান প্রধান সমস্যাগুলোর মধ্যে রয়েছে– ভারী বা মৌলিক শিল্পের অভাব, দুর্বল অবকাঠামো, মূলধন বা পুঁজি এবং শিল্পঋণের অপর্যাপ্ততা, উদ্যোগ গ্রহণের মানসিকতার অভাব, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা প্রভৃতি। এসব বাধা ও সমস্যার সমাধানে সরকার 'জাতীয় শিল্পনীতি ২০১০' ঘোষণা করেছে। এ নীতির গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে : উৎপাদনশীল কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা, নারীদের শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার মূলধারায় নিয়ে আসা এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ, শ্রমঘন, রপ্তানিমুখী ও আমদানিবিকল্প শিল্প স্থাপন, দেশের শিল্পায়নে সরকারি–বেসরকারি অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা, একটি সমৃদ্ধ ও আধুনিক শিল্প খাত গড়ে তোলা ইত্যাদি। এই জাতীয় শিল্পনীতি বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

দেশের দ্রুত শিল্পায়ন নিশ্চিত করতে সরকার ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের পাশাপাশি বৃহৎ তথা মৌলিক শিল্প স্থাপন ও প্রসারের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। শিল্পায়নের জন্য প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন পুঁজি বা মূলধন। পুঁজি বা মূলধনের প্রধান উৎস ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান। এজন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে শিল্পঋণ বৃদ্ধি ও অন্যান্য সহযোগিতা প্রদানের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ২০০৫–২০০৬ অর্থ বছরে যেখানে দেশে শিল্পঋণ বিতরণের পরিমাণ ছিল ৩৮০৯৮.৫৫ কোটি টাকা, সেখানে ২০১৫–২০১৬ সালে এই পরিমাণ ১২৪০২৬.২৮ কোটি টাকা অর্থাৎ প্রায় ৩.২৫ গুণ বেশি। (উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৬)।

৪. সামাজিক প্রতিবন্ধকতা দূর করার লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ : দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আর্থ–সামাজিক অবকাঠামোর দুর্বলতা খুব বড় বাধা বা চ্যালেঞ্জ। অর্থনৈতিক অবকাঠামোর দুর্বলতার মধ্যে রয়েছে– বিদ্যুৎ ও গ্যাস–এর উপৎপাদন ও যোগানের অপর্যাপ্ততা। বিগত কয়েক বছরে এসবের উৎপাদন লক্ষণীয় মাত্রায় বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে।

২০১৫–২০১৬ অর্থবছরে বিদ্যুৎ উৎপাদন ছিল ৮১৭৭ মেগাওয়াট। সরকার প্রণীত পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান ২০১০ অনুযায়ী ২০১৫ ও ২০২১–২০৩০ সাল নাগাদ বিদ্যুতের চাহিদা হবে যথাক্রমে প্রায় ১০,০০০, ১৯,০০০ ও ৩৪,০০০ মেগাওয়াট। উক্ত চাহিদা পূরণের জন্য সরকারের স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার আওতায় বিদ্যুৎ উৎপাদন, বিতরণ ও সঞ্চালন লাইনসমূহের প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন বিভিন্ন ধাপে রয়েছে। বর্তমান পরিকল্পনা অনুসারে ২০১৭ সালের মধ্যে প্রায় ১২,৯০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হবে বলে আশা করা যায়।

দেশের ক্রমবর্ধমান গ্যাস চাহিদার কথা বিবেচনা করে মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার আওতায় ২০১৫ সালের শেষে দৈনিক ২৮০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদনের কার্যক্রম চলমান ছিল। এছাড়াও ২০১৩ সাল নাগাদ গ্যাস আমদানির পদক্ষেপও গ্রহণ করা হয়েছিল।

স্থল, রেল ও নৌপথ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষে সরকারের সংস্কার কার্যক্রম ও বিভিন্ন মেয়াদি প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলছে।

যোগাযোগের ক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের অর্ধেকেরও বেশি মানুষের মোবাইল ফোন আছে। তথ্যপ্রযুক্তিতে দেশকে অগ্রগামী করে তুলতে সরকার নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে আসছে। সরকার দেশের আর্থ–সামাজিক উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে চালিকাশক্তি হিসেবে গণ্য করে 'রূপকল্প ২০২১'–এর মাধ্যমে দেশকে মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে উন্নীত করার লক্ষে কাজ করে যাচ্ছে।

সামাজিক অবকাঠামোর দুর্বলতার মধ্যে—নিরক্ষরতা, শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকা, শ্রমিকদের কারিগরি ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও দক্ষতার অভাব, জনসংখ্যাধিক্য, বেকারত্ব, শিক্ষা ও সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারী সমাজের পশ্চাৎপদতা ও ক্ষমতায়নের অভাব, জনগণের স্বাস্থ্যসেবার অপর্যাপ্ততা ইত্যাদি প্রধান। এসব বাধা অপসারণ করার লক্ষ্যে একটি নীতিগত ভিত্তি গড়ে তোলা হয়েছে। 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০', 'স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচি', এবং 'প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি'র দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের আওতায় বহুমুখী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে :

- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় ছাত্র ভর্তি ও উপস্থিতির হার বৃদ্ধি এবং ঝরে পড়া রোধে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ;
- নারীর রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা;
- নারী শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রী উপবৃত্তি প্রদান এবং বেতন মওকুফ সুবিধা প্রদান;
- নিরক্ষরতা দূরীকরণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যালয়ে ভর্তি, প্রাক–প্রাথমিক শিক্ষা, উপবৃত্তি বৃদ্ধির প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ;
- প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তির সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৪৮ লক্ষ থেকে ৭৮ লক্ষে উন্নীত করা ;
- বিদ্যালয়বিহীন গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন;
- বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের নতুন পাঠ্যপুস্তক বিতরণ ;
- বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষায় নিয়োজিত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান, স্কুলসমূহে তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষা প্রবর্তন ও সম্প্রসারণের ব্যবস্থা;
- কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যে মাদ্রাসাসহ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের বিদ্যালয়সমূহে ভোকেশনাল কোর্স অন্তর্ভুক্তকরণ ;
- মাধ্যমিক শিক্ষাকে জীবন ও কর্মমুখী করার লক্ষ্যে শিক্ষাক্রমে জীবন দক্ষতাসহ বিভিন্ন দক্ষতা অন্তর্ভুক্তকরণ;
- স্বাস্থ্য সেবাকে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহে স্বাস্থ্য, পরিবারকল্যাণ ও পুষ্টি সেবা প্রদানের ব্যবস্থা;

- তিন স্তর বিশিষ্ট (কমিউনিটি, ইউনিয়ন ও উপজেলা) উপজেলা স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও জেলা স্বাস্থ্য ব্যবস্থা প্রবর্তন।

৫. প্রকৃতিসৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য পদক্ষেপসমূহ : প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য দেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গড়ে উঠেছে। সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো ও আবহাওয়া অধিদপ্তর, পানি উন্নয়ন বোর্ড ইত্যাদি সংস্থা বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বাভাস প্রদান করে থাকে। বহুসংখ্যক এনজিও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় কাজ করছে। ত্রাণ ও পুনর্বাসন, খাদ্য, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরসমূহ ও পানিসম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ 'কম্প্রিহেনসিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি)' শীর্ষক প্রকল্পের ২য় পর্যায় ২০১০–২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়ন করেছে। এর আওতায় দুর্যোগ সম্পর্কে আগাম সতর্কীকরণ, দুর্যোগের জন্য পূর্বপ্রস্তুতি, ঝুঁকি হ্রাস, দুর্যোগ মোকাবিলায় জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদি পদক্ষেপ গৃহীত ও বাস্তবায়িত হচ্ছে। তবে এ সকল পদক্ষেপ বাস্তবায়নের জন্য দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন প্রতিষ্ঠা এবং সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে।

কাজ

একক : উন্নয়নের সামাজিক প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর করার লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপগুলো ছাড়া তুমি আর কোনো পদক্ষেপ সুপারিশ করবে কী? করলে, পদক্ষেপটি কী? ব্যাখ্যা কর।

উন্নত, অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশ ও এসব দেশের অর্থনীতি

কোনো দেশের অর্থনীতির উন্নত, অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল অবস্থা বুঝতে হলে প্রথমে আমাদের জানতে হবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কাকে বলে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারণা

উন্নয়ন বলতে বুঝায় বিদ্যমান অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন। উন্নয়ন হলো সমৃদ্ধি বা সার্বিক মানোন্নয়ন। দেশের সম্পদ ও সম্ভাবনা কাজে লাগিয়ে আর্থ–সামাজিক সমৃদ্ধি ও বিকাশ সাধনকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলা যায়। সম্পদ বলতে দেশের প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদ উভয়কে বোঝায়। উন্নয়ন অর্জনের প্রক্রিয়ায় বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাহায্য, সহযোগিতা ও সমর্থনেরও প্রয়োজন হয়।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন

অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্বন্ধে সঠিক ধারণা পেতে হলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বিষয়টি বুঝতে হবে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন (Economic Development) ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (Economic Growth) এ দুটিকে অনেক সময় একই অর্থে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এ দুটি এক নয়, কিছুটা পার্থক্য আছে।

কোনো দেশের জাতীয় আয়ের বার্ষিক বৃদ্ধির হারকে প্রবৃদ্ধির হার বলা হয়। প্রবৃদ্ধি হার হচ্ছে জাতীয় আয়ের পরিবর্তনের হার। প্রবৃদ্ধির হারের সাথে জনসংখ্যা ও দ্রব্যমূল্যস্তর বিবেচনায় নিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্ধারণ করা হয়। এখানে প্রকৃত মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির বিষয়টিও বিবেচনায় নেওয়া হয়।

কোনো দেশের প্রবৃদ্ধির হার যদি ২% হয় এবং সে দেশের জনসংখ্যাও যদি ২% হারে বৃদ্ধি পায়, তাহলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটছে বলা যাবে না। কারণ, প্রবৃদ্ধির হার ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার একই হলে মাথাপিছু আয় একই থাকবে। যদি প্রবৃদ্ধির হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশি হয়, তাহলেই মাথাপিছু আয় বাড়বে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটছে বলা যাবে। তবে এর সাথে দ্রব্যমূল্যস্তর পরিবর্তনের বিষয়টিও বিবেচনায় নিতে হবে।

ধরা যাক, কোনো নির্দিষ্ট বছরে কোনো দেশের জনগণের মাথাপিছু আয় ৫% বেড়েছে। একই সময়ে সে দেশের দ্রব্যমূল্যও ৫% বৃদ্ধি পেয়েছে। এক্ষেত্রে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও জনগণ পূর্বাপেক্ষা অধিকতর দ্রব্য ও সেবা ক্রয়

করতে পারবে না। অর্থাৎ তাদের আর্থিক আয় বৃদ্ধি পেলেও তাদের প্রকৃত আয় বাড়েনি। এমতাবস্থায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জিত হয়েছে বলা যাবে না। দ্রব্যমূল্য স্থির থেকে যদি মাথাপিছু আয় বাড়ে অথবা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির হার মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হার অপেক্ষা কম হয়, তাহলেই প্রকৃত মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাবে। প্রকৃত মাথাপিছু আয় দীর্ঘ সময় ধরে অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকলে তবেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটছে বলা যাবে।

কোনো দেশের মোট জাতীয় উৎপাদন বা আয় বৃদ্ধির সাথে দীর্ঘ সময় ধরে মাথাপিছু প্রকৃত আয়ের বৃদ্ধিকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলে। এই অব্যাহত প্রকৃত আয় বৃদ্ধি তখনই সম্ভব যখন কোনো দেশের অর্থনীতির কাঠামোগত এবং প্রকৃতিগত পরিবর্তন ঘটে। অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তনের মধ্যে রয়েছে অর্থনৈতিক অবকাঠামো এবং উৎপাদন ও বণ্টন প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন।

অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তনের আওতায় ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণদান কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নততর হয়। দ্রব্য ও সেবার বিপণন ব্যবস্থায় উন্নয়ন ঘটে। একই সাথে উৎপাদনে উন্নততর প্রযুক্তি ও কৌশল ব্যবহৃত হয়। ফলে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেয়ে উৎপাদনের পরিমাণ বেড়ে যায়। উৎপাদিত সম্পদ বা জাতীয় আয় বণ্টনে বৈষম্য বা অসমতা ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। ফলে উৎপাদনের উপাদানসমূহ বিশেষত শ্রমিক তার ন্যায্য পারিশ্রমিক বা মজুরি লাভ করে। এতে জনগণের সার্বিক কল্যাণ বৃদ্ধি পায়।

কাজ

একক : 'প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন এক নয়।'– উদাহরণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা কর।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্য দেশের সকল জনগণের সর্বাধিক কল্যাণ। মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ও আয়ের সুষম বণ্টন এই কল্যাণ নিশ্চিত করে।

এছাড়া অর্থনৈতিক উন্নয়নে সামাজিক অবকাঠামোরও পরিবর্তন ঘটে। এর ফলে সুশাসনের সুফল, শিক্ষার সুযোগ এবং স্বাস্থ্যসেবার সুবিধা সকল জনগণের কাছে পৌঁছে যায়। এতে জনগণের জীবনমানে উন্নয়ন ঘটে। জনগণ উন্নত জীবনযাত্রার সুবিধা উপলব্ধি করে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও কমে যায়।

অর্থনীতির প্রকৃতিগত পরিবর্তন বলতে কৃষিপ্রধান অবস্থা থেকে শিল্পপ্রধান অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হওয়াকে বোঝায়। এর ফলে দেশ গ্রামীণ অর্থনীতি থেকে শহরভিত্তিক অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হয়। জনগণের আয় বৃদ্ধি পায়। সঞ্চয় ও মূলধন গঠনের হার এবং বিনিয়োগও বৃদ্ধি পায়। ফলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়, বেকারত্ব হ্রাস পায় এবং উৎপাদন আরও বৃদ্ধি পায়। জীবনযাত্রার মানে ক্রমাগত উন্নতি হতে থাকে। এই সার্বিক উন্নত অবস্থাকে বলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি যে, প্রবৃদ্ধির হারের তুলনায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন একটি বহুমাত্রিক বিষয়।

কোনো দেশের আর্থ–সামাজিক অবকাঠামোর ক্রমাগত উন্নয়ন ও অর্থনীতির প্রকৃতিগত পরিবর্তনের ফলে সে দেশের জনগণের মাথাপিছু প্রকৃত আয় বৃদ্ধি পায়। এ অবস্থায় আয়ের সুষম বণ্টন নিশ্চিত হলে তাকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলে।

উন্নয়নের মাত্রার ভিত্তিতে বিশ্বের দেশসমূহকে তিনটি ভাগে বিন্যস্ত করা হয়: উন্নত দেশ, অনুন্নত দেশ ও উন্নয়নশীল দেশ।

উন্নত দেশ

অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে এবং এই উন্নয়ন দীর্ঘ মেয়াদে অব্যাহত আছে এমন দেশকে বলে উন্নত দেশ। উন্নত দেশগুলোর জনগণের মাথাপিছু আয় বেশি। মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হারও বেশি এবং সে কারণে জীবনযাত্রা অত্যন্ত উন্নত। এসব দেশে আর্থ–সামাজিক অবকাঠামো অত্যন্ত উন্নত, শিল্পখাত সম্প্রসারিত, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা

উন্নত, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অর্থনীতির অনুকূল। দেশের সকল জনগণের আবাসন, শিক্ষাসুবিধা এবং স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা হয়। শিক্ষার প্রসারের ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞানও দ্রুত প্রসার লাভ করে এবং নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়।

যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ইউরোপীয় দেশসমূহ, যেমন–ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, সুইজারল্যান্ডস, নেদারল্যান্ডস, সুইডেন, নরওয়ে, এশীয় দেশসমূহের মধ্যে জাপান ইত্যাদি বিশ্বের উন্নত দেশ। এসব উন্নত দেশের নিম্নোক্ত সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়।

১. জীবনযাত্রার উচ্চমান : উন্নত দেশসমূহের প্রধান লক্ষণ হলো এসব দেশের জনগণের মাথাপিছু আয় অত্যন্ত বেশি। তাদের জীবনযাত্রার মানও অত্যন্ত উঁচু। ২০১০ সালে বিশ্বের প্রধান কয়েকটি উন্নত দেশের জনগণের মাথাপিছু আয় ছিল বার্ষিক ৪০,০০০ মার্কিন ডলার থেকে ৮৫,০০০ মার্কিন ডলারের মধ্যে।

২. শিল্পায়িত অর্থনীতি : উন্নত দেশগুলোর অর্থনীতি শিল্পনির্ভর। দ্রুত শিল্পায়নের ফলেই এসব দেশ উন্নতি অর্জন করেছে। কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি থেকে এসব দেশ শিল্পপ্রধান দেশে পরিণত হয়েছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প থেকে এসব দেশে ক্রমে মৌলিক ও বৃহদায়তন শিল্পের প্রসার ঘটেছে।

৩. সঞ্চয়, মূলধন গঠন ও বিনিয়োগের উচ্চহার : উচ্চ মাথাপিছু আয়ের কারণে ভোগব্যয় করার পরও জনগণের কাছে উদ্বৃত্ত আয় থাকে যা সঞ্চয় হিসাবে জমা হয়। সঞ্চয়ের উচ্চহারের ফলে মূলধন গঠন ও বিনিয়োগের হারও উচ্চ। ফলে উৎপাদনের পরিমাণও ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়।

৪. উন্নত উৎপাদন পদ্ধতি ও বণ্টন প্রক্রিয়া : উন্নত দেশসমূহ যতই উন্নতির পথে অগ্রসর হয় ততই তাদের উৎপাদন পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনা উন্নত হয়। উন্নত উৎপাদনের একটি বড় কারণ প্রযুক্তির (Technology) উন্নয়ন। উন্নত প্রযুক্তির কারণে বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে এবং উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। উন্নত দেশে জাতীয় আয় বণ্টন ব্যবস্থাও উন্নত। উৎপাদনের উপাদানসমূহ বিশেষত শ্রমিক তার ন্যায্য মজুরি পায়। ফলে আয়বণ্টনে বৈষম্য হ্রাস পায়। এতে জনগণের সার্বিক কল্যাণ বৃদ্ধি পায়।

৫. উন্নত আর্থ–সামাজিক অবস্থা : উন্নত দেশসমূহের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এসব দেশের উন্নত আর্থ–সামাজিক অবকাঠামো। এর মধ্যে রয়েছে–

- উন্নত ব্যাংক ব্যবস্থা ও ঋণদান ব্যবস্থাপনা
- উন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা
- জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও বেকারত্বের অত্যন্ত নিম্নহার
- বিদ্যুৎ, পানি ও জ্বালানির পর্যাপ্ততা
- শিক্ষার উচ্চহার, সকলের জন্য শিক্ষাসুবিধা ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ ও
- সকলের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

কাজ

একক : উন্নত দেশ চিহ্নিত করার জন্য কোন্ কোন্ নির্ণায়ক ব্যবহার করবে?

৬. উন্নত ও আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা : উন্নত দেশগুলোতে কৃষি একটি অপ্রধান খাত হলেও কৃষি উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থা অত্যন্ত উন্নত। উৎপাদনের পরিমাণ ও কৃষিপণ্যের গুণগত মান উভয়ই উচ্চ।

৭. নিয়ন্ত্রিত জনসংখ্যা ও উন্নত মানবসম্পদ : উন্নত দেশসমূহের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রবৃদ্ধির হারের চেয়ে কম হওয়ায় মাথাপিছু আয় অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পায়। এছাড়া শিক্ষার উচ্চহার, যথাযথ প্রশিক্ষণ ও উন্নত স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির কারণে জনগণ মানবসম্পদে পরিণত হয়। এই জনসম্পদ দেশের উৎপাদন ও উন্নয়নে প্রভূত অবদান রাখে।

৮. অনুকূল বৈদেশিক বাণিজ্য : উন্নত বিশ্বের কৃষি এবং শিল্পপণ্য উভয়েরই পরিমাণ এবং গুণগতমান উন্নত। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এসব দেশ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সাথে অনুকূল বাণিজ্য সম্পর্ক গড়তে পারে। এই সম্পর্কও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহায়ক হয়।

৯. ব্যাপক নগরায়ণ : কৃষিপ্রধান অবস্থা থেকে ক্রমশ শিল্পায়ন ঘটার ফলে এবং পথ–ঘাট, যোগাযোগ, বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে উন্নত বিশ্বে গ্রামীণ অর্থনীতি শহুরে রূপ লাভ করে। ফলে গ্রামীণ জনগোষ্ঠী শহরে আসতে থাকে এবং গ্রামগুলোও ক্রমশ শহরে রূপান্তরিত হয়।

১০. রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা : উন্নত দেশসমূহে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা রয়েছে। এখানে প্রশাসনযন্ত্র স্বচ্ছতার সাথে কাজ করে। দুর্নীতির পরিমাণ খুবই কম। রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থিতিশীল ও উন্নত। ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহায়ক পরিবেশ গড়ে ওঠে ও তা বজায় থাকে।

অনুন্নত দেশ

প্রধানত মাথাপিছু প্রকৃত আয়ের নিরিখে একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাত্রা নির্ধারণ করা হয়। যেসব দেশের জনগণের মাথাপিছু প্রকৃত আয় উন্নত দেশ, যথা– যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং পশ্চিম ইউরোপীয় দেশসমূহের জনগণের মাথাপিছু আয়ের তুলনায় অনেক কম, সেসব দেশকে অনুন্নত দেশ বলা হয়। তবে শুধু মাথাপিছু প্রকৃত আয়ের ভিত্তিতে একটি দেশকে অনুন্নত বলা ঠিক নয়। অনুন্নত দেশ বলতে সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার করতে সক্ষম নয়, এমন দেশকেও বোঝায়। অর্থনীতিবিদদের মতে, যেসব দেশে প্রচুর জনসংখ্যা এবং অব্যবহৃত প্রাকৃতিক সম্পদের সহাবস্থান, সেসব অনুন্নত দেশ। অধ্যাপক র‍্যাগনার নার্কস বলেন, 'অনুন্নত দেশ হচ্ছে সেসব দেশ যেগুলোতে জনসংখ্যা অত্যধিক ও প্রাকৃতিক সম্পদের তুলনায় পুঁজি বা মূলধন কম।' এসব দেশে প্রাথমিক পেশার প্রাধান্য, পুঁজির স্বল্পতা ও ব্যাপক বেকারত্ব বিদ্যমান। অনুন্নত দেশের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য নিম্নে আলোচনা করা হলো।

১. নিম্ন মাথাপিছু আয় এবং জীবনযাত্রার নিম্নমান : অনুন্নত দেশের প্রধান বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ হলো উন্নত দেশের তুলনায় জনগণের অত্যন্ত কম মাথাপিছু আয় এবং জীবনযাত্রার নিম্নমান। জনগণের বৃহত্তর অংশেরই মৌলিক চাহিদাসমূহ, যেমন– খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা সুবিধা ইত্যাদি পূরণ করার সামর্থ্য থাকে না।

প্রধান প্রধান উন্নত দেশসমূহে যেখানে মাথাপিছু আয় ৪০,০০০ থেকে ৫৬,০০০ মার্কিন ডলার এর মধ্যে (ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ২০১৬), সেখানে অনুন্নত দেশসমূহের মধ্যে ২০০ ডলারের কম মাথাপিছু আয়ের দেশও রয়েছে।

২. কৃষির ওপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা : অনুন্নত দেশের জনগণের বৃহদাংশ খাদ্য, জীবিকা ও অন্যান্য প্রয়োজন পূরণের জন্য কৃষির ওপর নির্ভরশীল। কৃষি জাতীয় উৎপাদনের একক বৃহত্তম খাত।

৩. অনুন্নত কৃষি উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থা : অনুন্নত দেশে অধিকাংশ জনগণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। তবে এসবদেশে কৃষি উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা অনুন্নত। সনাতন পদ্ধতিতে চাষাবাদ, ত্রুটিপূর্ণ মালিকানা, স্বল্প বিনিয়োগ, কৃষি উপকরণ ও কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও উপাদান, যথা– সার, বীজ, সেচ ও বিপণন সুবিধার অভাব, কৃষির প্রকৃতি নির্ভরতা প্রভৃতি কারণে কৃষি অত্যন্ত অনুন্নত।

২০১৬

৪. ক্ষুদ্র ও অনুন্নত শিল্প খাত : পুঁজি এবং দক্ষ জনশক্তির অভাবের কারণে অনুন্নত দেশে শিল্প খাত অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও সীমিত। এসব দেশে মৌলিক বা ভারী শিল্প নেই। ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্পেরই প্রাধান্য দেখা যায়। সাধারণত মোট জাতীয় উৎপাদনে শিল্প খাতের অবদান শতকরা মাত্র ৮ থেকে ১০ ভাগ।

৫. মূলধন গঠন ও বিনিয়োগের নিম্নহার এবং ব্যাপক বেকারত্ব : অনুন্নত দেশে মাথাপিছু আয় কম বলে জনগণের আয়ের সবটাই নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ভোগের জন্য ব্যয় করতে হয়। এ কারণে জনগণের সঞ্চয়ের হার অত্যন্ত কম। ফলে মূলধন বা পুঁজির স্বল্পতা দেখা দেয় এবং বিনিয়োগের হার নিম্নমুখী হয়। বিনিয়োগ খুব কম বলে নতুন উৎপাদন বা শিল্প স্থাপনের গতি খুব মন্থর। ফলে নতুন কর্মসংস্থান হয় না। বেকারত্ব বেড়ে যায়। মাথাপিছু আয় কম হতে থাকে। এইভাবে দারিদ্র্যের চক্রে দেশটি আবর্তিত হয়।

৬. প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনশক্তির অসম্পূর্ণ ব্যবহার : প্রাকৃতিক সম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন মূলধন বা পুঁজি এবং দক্ষ জনশক্তি। অনুন্নত দেশে পুঁজি এবং কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ জনশক্তির এতই অভাব যে, দীর্ঘকাল ধরেও দেশে কী কী খনিজ সম্পদ কী পরিমাণে আছে তা নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না। ফলে সম্পদ থাকা সত্ত্বেও এসব দেশ দরিদ্র থেকে যায়।

৭. জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চহার এবং অদক্ষ জনশক্তি : অশিক্ষা, কুসংস্কার এবং যথাযথ নিয়ন্ত্রণের অভাবে অনুন্নত দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার উচ্চ। দেশের পরিপোষণ ক্ষমতার চেয়ে জনসংখ্যার আয়তন বড়। এই জনসংখ্যাকে সাধারণ শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং স্বাস্থ্য সুবিধা সরবরাহের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করার ব্যবস্থাও নগণ্য।

৮. দুর্বল আর্থ–সামাজিক অবকাঠামো : অনুন্নত দেশের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক উভয় প্রকার অবকাঠামোর দুর্বলতা। কৃষি ও শিল্পে ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ অপর্যাপ্ত। এগুলোর ব্যবস্থাপনা দুর্বল। পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থাও অনুন্নত ও অপর্যাপ্ত। জনগণের বৃহত্তর অংশই শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা বঞ্চিত। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ অত্যন্ত অপ্রতুল।

৯. প্রতিকূল বৈদেশিক বাণিজ্য : অনুন্নত দেশগুলো জনগণের মৌলিক চাহিদা এমনকি খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসার চাহিদা পূরণের জন্যও আমদানিনির্ভর। এসব দেশ প্রধানত কৃষিপণ্য ও শিল্পের কাঁচামাল রপ্তানি করে এবং শিল্পপণ্য আমদানি করে। রপ্তানি আয় সবসময়ই আমদানি ব্যয়ের চেয়ে কম। ফলে এসব দেশের আন্তর্জাতিক লেনদেনের ভারসাম্যে সবসময়ই ঘাটতি থাকে।

১০. বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরতা : পুঁজির স্বল্পতার কারণে অনুন্নত দেশসমূহ বিনিয়োগের লক্ষ্যে পুঁজি সংগ্রহের জন্য বিদেশি সাহায্যের ওপর অত্যধিক নির্ভরশীল থাকে। শুধু পুঁজির জোগান দেওয়ার জন্যই নয়, দুর্যোগ ও আপৎকালীন সময়েও প্রয়োজনীয় অর্থ ও অন্যান্য সামগ্রীর জন্য এসব দেশ অতিমাত্রায় বিদেশি সাহায্যের উপর নির্ভরশীল।

কাজ

একক : কোনো দেশের অনুন্নত অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।

১১. উদ্যোগ ও ঝুঁকি গ্রহণের মানসিকতার অভাব : অনুন্নত দেশগুলোতে জনগণের মধ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়নে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো জনশক্তির অভাব পরিলক্ষিত হয়। অর্থনৈতিক কার্যাবলির অগ্রগতি যেমন পুঁজির ওপর নির্ভরশীল, তেমনি

দক্ষ উদ্যোক্তাও এর জন্য অপরিহার্য। এছাড়া দুর্বল অবকাঠামো এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে পুঁজিপতিরা বিনিয়োগে আগ্রহী হন না। গতানুগতিক ধারায় বিনিয়োগ শুরু হয়। নতুন উৎপাদন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করার উদ্যোগ ও ঝুঁকি নেওয়ার মানসিকতার অভাব রয়েছে। ফলে অর্থনীতিতে নতুন প্রাণসঞ্চার হয় না এবং অনুন্নয়ন দীর্ঘমেয়াদি হয়।

উন্নয়নশীল দেশ

বিশ্বের উন্নত ও অনুন্নত দেশসমূহের মধ্যপর্যায়ে আরেক ধরনের দেশ আছে–যেগুলোকে বলা হয় উন্নয়নশীল দেশ। এসব দেশে মাথাপিছু প্রকৃত আয় উন্নত দেশসমূহের তুলনায় অনেক কম। উন্নয়নশীল দেশসমূহে অনুন্নত অর্থনীতির অধিকাংশ বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান। এগুলোর মধ্যে রয়েছে কৃষি খাতের প্রাধান্য, শিল্প খাতের অনগ্রসরতা, ব্যাপক বেকারত্ব, পরিবহন, যোগাযোগ ও বিদ্যুতের অপর্যাপ্ততা, শিক্ষার নিম্নহার, মূলধন গঠন ও বিনিয়োগের নিম্নহার, নিম্ন মাথাপিছু আয় ও দারিদ্র্য, জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চহার ইত্যাদি।

তবে অনুন্নত দেশসমূহের সাথে এ দেশগুলোর পার্থক্য এই যে, এসব দেশ পরিকল্পিত উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনসংখ্যাকে ব্যবহার করে মোট জাতীয় উৎপাদন তথা মাথাপিছু প্রকৃত আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এর ফলে দীর্ঘ সময় ধরে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির একটি প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছে।

পরিকল্পিত উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় এসব দেশ আর্থ–সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন ও দেশের দ্রুত শিল্পায়ন করার প্রচেষ্টা নেয়। ফলে পুঁজিগঠন ও বিনিয়োগের হার বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা দেয়। জনসংখ্যাকে মানবসম্পদে পরিণত করার জন্য শিক্ষার প্রসার ঘটানো হয় এবং সকলের জন্য স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এইসব উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার ফলে অর্থনীতিতে বিরাজমান উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর হওয়ার অবস্থা সৃষ্টি হয়।

উন্নয়নশীল দেশসমূহের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য নিম্নে আলোচনা করা হলো ।

১. অর্থনৈতিক অবস্থা বিষয়ে সচেতনতা ও পরিকল্পিত উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ : উন্নয়নশীল দেশ হচ্ছে সেসব দেশ যারা নিজেদের অর্থনীতির উন্নয়নের অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হয়ে তা পরিবর্তনের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এই পদক্ষেপের সূচনা হয় সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে। উন্নয়নশীল দেশসমূহে উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে নানারকম বাধাবিঘ্ন থাকে। বস্তুত জনসংখ্যাধিক্য ও সম্পদের স্বল্পতার কারণে পরিকল্পিত কর্মসূচি ছাড়া উন্নয়ন অর্জন করা যায় না।

২. প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাপ্যতা ও উন্নয়নের সম্ভাবনা: উন্নয়নশীল দেশে প্রাকৃতিক সম্পদ, যেমন– ভূমি, খনিজসম্পদ, পানিসম্পদ প্রভৃতি রয়েছে। জনসংখ্যার আয়তনও বড়। এসব প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনসংখ্যাকে কাজে লাগিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

৩. কৃষির ওপর নির্ভরতা হ্রাস ও দ্রুত শিল্পায়ন : কৃষিপ্রধান অবস্থা থেকে ক্রমশ শিল্পপ্রধান দেশে পরিণত হওয়ার ধারা উন্নয়নশীল দেশের লক্ষণ। এ উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত কর্মসূচির মাধ্যমে দেশে মৌলিক শিল্পস্থাপন ও শিল্পে বিনিয়োগ বৃদ্ধির পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

৪. কৃষির ক্রমোন্নতি : উন্নয়নশীল দেশসমূহে কৃষির আধুনিকায়ন করা হয়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ, কৃষির অবকাঠামো উন্নয়ন, উন্নতমানের বীজ, সার ও সেচসুবিধা সরবরাহ ইত্যাদির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ফলে কৃষির উৎপাদনশীলতা বাড়ে। কৃষিতে ক্রমোন্নতির সূচনা হয়।

৫. অবকাঠামো উন্নয়ন : কৃষি ও শিল্পের প্রসার ঘটানোর উদ্যোগ নেওয়া হয় বিধায় উন্নয়নশীল দেশে আর্থ–সামাজিক অবকাঠামোর উন্নয়ন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তাই এসব দেশে উন্নয়ন শুরুর পর্যায়েই অর্থনৈতিক অবকাঠামো, যেমন– পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, মূলধন গঠন ও সরবরাহ এবং সামাজিক অবকাঠামো, যেমন–শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এই উন্নয়ন অর্জনের ধারায় ক্রমশ সামাজিক পরিবেশেরও উন্নতি ঘটে।

৬. জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস ও মানবসম্পদ উন্নয়ন : উন্নয়নশীল দেশে জনসংখ্যাধিক্য রয়েছে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য জাতীয় কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ধীরে হলেও ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। দেশের জনগোষ্ঠীকে জনশক্তি বা মানবসম্পদে পরিণত করার জন্য সাক্ষরতা প্রকল্প গ্রহণ, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের বিস্তার এবং প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষা প্রবর্তনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়। এছাড়া স্বাস্থ্যসুবিধা ও সেবার সম্প্রসারণ ঘটে। এসব কারণে জনগণ মানবসম্পদে রূপান্তরিত হয়। তাদের দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়।

৭. বেকারত্ব হ্রাস ও দারিদ্র্য বিমোচন: উন্নয়নশীল দেশেও ব্যাপক বেকারত্ব বিদ্যমান। তবে কৃষিতে আধুনিক পদ্ধতির প্রয়োগ ও দ্রুত শিল্পায়ন এবং নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্বের হার কমিয়ে আনার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়। সাধারণত উন্নয়ন পরিকল্পনার আওতায় নানারকম প্রকল্পের মাধ্যমে বেকারত্ব হ্রাস করার ও দারিদ্র্য নিরসনের ব্যবস্থা করা হয়।

৮. বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরতা হ্রাস : উন্নয়নশীল দেশসমূহে উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য প্রচুর অর্থ ও মূলধনের প্রয়োজন হয়। অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে পর্যাপ্ত তহবিল সংগ্রহ করা সম্ভব না হওয়ায় এসব দেশ বিদেশি ঋণ, সাহায্য ও অনুদানের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এ নির্ভরশীলতা সাধারণত দীর্ঘদিন চলতে থাকে। তবে উন্নয়ন অর্জনের এক পর্যায়ে এ নির্ভরতা কমে আসে।

৯. জনগণের আর্থিক কল্যাণ নিশ্চিত করা : অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল লক্ষ্য সকল জনগণের সর্বাধিক আর্থিক ও সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করা। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে আয়ের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করতে পারলে আর্থিক ও সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত হয়। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশসমূহে আর্থ–সামাজিক উন্নয়ন সূচিত হলেও বণ্টন ব্যবস্থায় ত্রুটি দীর্ঘসময় থেকে যায়। ফলে আয় বণ্টনে বৈষম্য প্রলম্বিত হয়।

১০. নগরায়ণের হার বৃদ্ধি : উন্নয়নশীল দেশসমূহে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মসূচির মাধ্যমে একটি ক্রমোন্নতির ধারা সৃষ্টি হয়। কোনো কোনো দেশে এ ধারা খুব বেগবান। কোনো কোনো দেশে ততটা নয়। তবে এই উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ফলে ক্রমশ গ্রামীণ অর্থনীতির আধুনিকায়ন ও অবকাঠামোর উন্নয়ন ঘটে। শিল্পায়নের ফলে কাজের সন্ধানে গ্রাম থেকে জনগণ শহরমুখী হয়। এসব কিছুর ফলে দেশে নগরায়ণ ঘটে।

কাজ

একক : কোনো দেশকে ‘উন্নয়নশীল’ বলতে হলে কোন কোন বিষয় বিবেচনা করবে?

১১. সামাজিক পরিবেশের উন্নয়ন : উন্নয়নশীল দেশসমূহে ধীরগতিতে হলেও শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, বিনোদন ব্যবস্থা, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান (যেমন– ব্যাংক ও বিমা), আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ইত্যাদি উন্নত ও সম্প্রসারিত হয়। এর ফলে কুসংস্কার ও গোঁড়ামি দূর হয়। উন্নত জীবনযাত্রার সাথে পরিচিত হওয়ার ফলে মানুষ উন্নয়ন অর্জনে আগ্রহী হয়ে ওঠে।

১২. মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি : উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতি প্রধানত পরিকল্পনার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা থাকলেও তা বাস্তবায়নের ফলে উন্নতির একটি প্রবণতা সৃষ্টি হয়। ফলে এসব দেশের জনগণের মাথাপিছু আয় ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। জীবনযাত্রার মানে উন্নয়ন সূচিত হয়।

উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের সাথে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক

আমরা জেনেছি যে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাত্রা বা স্তর অনুসারে বিশ্বের দেশগুলোকে উন্নত, উন্নয়নশীল এবং অনুন্নত বা স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে ভাগ করা হয়। এ ভাগ অনুসারে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের অন্তর্ভুক্ত। তবে অব্যাহত উন্নয়ন প্রচেষ্টা ও কার্যক্রম এবং আর্থ-সামাজিক কিছু সূচকের (যেমন- শিক্ষায় জেন্ডার সমতা, শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস, প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তির হারে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি প্রভৃতি) উচ্চমানের কারণে বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশের পর্যায়ভুক্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

আমরা জানি যে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং ইউরোপের দেশগুলোর অধিকাংশই উন্নত দেশের শ্রেণিভুক্ত। দক্ষিণ এশিয়া এবং সাব-সাহারান আফ্রিকার দেশগুলো প্রধানত নিম্ন আয়ের দেশ। এছাড়া পূর্ব ও মধ্য এশিয়ার দেশগুলো, ল্যাটিন আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকান দেশগুলো প্রধানত ‘মধ্য আয়ের দেশ’। এসবের মধ্যে ‘নিম্ন মধ্য আয়’ ও ‘উচ্চ মধ্য আয়’ উভয়ই অন্তর্ভুক্ত।

পৃথিবীতে কোনো দেশই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক কারণেও প্রতিটি দেশকে প্রতিবেশী দেশসহ অন্যান্য দেশের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়। আমরা এ পাঠে পৃথিবীর উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের সাথে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পর্কের বিষয়টি আলোচনা করব।

অর্থনৈতিক সম্পর্কের বিষয়টি আমরা দু’টি প্রধান শিরোনামে আলোচনা করতে পারি : ১. বৈদেশিক বাণিজ্যের সম্পর্ক ও ২. ঋণ সহায়তা ও অনুদান দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক।

১. বৈদেশিক বাণিজ্যের সম্পর্ক

বাণিজ্যের দুটি দিক আছে- রপ্তানি ও আমদানি। রপ্তানি হচ্ছে কোনো দেশের আয়ের উৎস আর আমদানি ব্যয়ের খাত। বাংলাদেশের রপ্তানি আয় দীর্ঘ সময় ধরেই আমদানি ব্যয়ের চেয়ে কম। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লেনদেনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সবসময়ই একটি ঘাটতির দেশ। তবে সাম্প্রতিককালে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি, প্রবাসীদের আয়প্রবাহ বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে ঘাটতি হ্রাস পাচ্ছে।

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান রপ্তানি পণ্যের মধ্যে রয়েছে তৈরি পোশাক ও নিটওয়্যার, কাঁচা পাট, পাটজাত পণ্য, চিংড়িমাছ, হিমায়িত খাদ্য, চা, চামড়া, কৃষিজাত পণ্য, সিরামিক ইত্যাদি।

দেশভিত্তিক রপ্তানি বাণিজ্যের পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিগত এক দশক যাবত বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের সবচেয়ে বড় বাজার হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। এর পরের অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে জার্মানি, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, বেলজিয়াম ইত্যাদি দেশ। এছাড়া ইতালি, নেদারল্যান্ডস, কানাডা এসব দেশেও আমাদের পণ্য রপ্তানি হয়। অর্থাৎ বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য প্রধানত উন্নত দেশগুলোতেই বিস্তৃত।

আমাদের রপ্তানির একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো আমরা একটি জনশক্তি রপ্তানিকারক দেশ। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আমরা অদক্ষ ও আধা-দক্ষ শ্রমিক রপ্তানি করি। এসব দেশে নানারকম কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা রয়েছে। যেসব দেশে

বাংলাদেশি শ্রমিকদের কর্মসংস্থান হয়েছে সেগুলোর মধ্যে প্রধান দেশগুলো হচ্ছে সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো, যেমন- সৌদি আরব, আরব আমিরাত, কাতার, ওমান, বাহরাইন ও কুয়েত। এছাড়া আফ্রিকা, পূর্ব ইউরোপ ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশসমূহে বাংলাদেশ থেকে জনশক্তি রপ্তানি করার লক্ষ্যে কূটনৈতিক প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

উন্নত দেশসমূহ ছাড়া সার্ক (SAARC : South Asian Association for Regional Cooperation) দেশসমূহের সাথেও বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য সম্পর্ক রয়েছে।

সার্কভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে ভারতে বাংলাদেশের রপ্তানির পরিমাণ সর্বোচ্চ। ২০১০–২০১১ অর্থবছরে ভারতে বাংলাদেশি পণ্য রপ্তানির পরিমাণ সার্কভুক্ত সকল দেশে রপ্তানির ৭৮ শতাংশ। উল্লেখ্য, সার্কভুক্ত দেশসমূহ থেকে ২০১০–২০১১ অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসে রপ্তানি আয়ের পরিমাণ একই সময়ে বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয়ের মাত্র ৩ শতাংশ। (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১১–২০১২)

ভারত ছাড়াও সার্কভুক্ত অন্যান্য দেশ, যেমন– ভুটান, মালদ্বীপ, নেপাল, শ্রীলংকা, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে আমাদের পণ্য রপ্তানি হয়।

কাজ

দলীয় : উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের সাথে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পর্কের নির্ভরতা নিয়ে একটি বিতর্কমূলক আলোচনা কর।

আমাদের প্রধান আমদানি পণ্যের তালিকায় আছে মূলধনি যন্ত্রপাতি, শিল্পের কাঁচামাল, খাদ্যপণ্য, পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য, তুলা, ভোজ্যতেল, সার, সুতা ইত্যাদি।

দেশভিত্তিক আমদানি পণ্যের পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় যে, ২০১৫–২০১৬ অর্থবছরে জুলাই–ডিসেম্বর সময়কালে দেশের আমদানি ক্ষেত্রে চীনের অবস্থান শীর্ষে। এ সময়ে দেশের মোট আমদানির শতকরা ২৩.৯ ভাগ চীন থেকে এসেছে। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে ভারত (১৩.৬%), সিঙ্গাপুর (৫.৪%) ও জাপান (৩.৯%)। (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৬)

বিগত এক দশকের পরিসংখ্যান পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বাংলাদেশ পণ্য আমদানি করে এমন দেশগুলোর মধ্যে শীর্ষস্থানে রয়েছে কখনো চীন কখনো ভারত। বাংলাদেশে পণ্য রপ্তানিকারক অন্যান্য দেশের মধ্যে রয়েছে সিঙ্গাপুর, জাপান, হংকং, তাইওয়ান, যুক্তরাষ্ট্র ও মালয়েশিয়া।

২. বৈদেশিক ঋণ সহায়তা ও অনুদান

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জনের জন্য এদেশ পরিকল্পিত উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য প্রচুর অর্থ দরকার হয়। এই অর্থের সবটা দেশের অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে জোগান দেওয়া সম্ভব হয় না। উন্নয়ন তহবিল সংগ্রহের জন্য বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যান্য দেশ থেকে ঋণ সহায়তা ও অনুদান গ্রহণ করে। উন্নয়ন কার্যক্রমে ঋণ সহায়তা ও অনুদান দানকারী আন্তর্জাতিক সংস্থা, যেমন– বিশ্ব ব্যাংক, আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (IMF), এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB), ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (EU), জাতিসংঘ সংস্থাসমূহ, ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (IDA) প্রভৃতি থেকেও বাংলাদেশ ঋণ ও অনুদান গ্রহণ করে।

বাংলাদেশ যেসব দেশ থেকে বৈদেশিক সাহায্য পায়, সেগুলোর মধ্যে প্রধান হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস, সুইডেন, নরওয়ে ও ডেনমার্ক। এশীয় দেশগুলোর মধ্যে সাহায্যদাতা দেশ হিসেবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে জাপান। ভারত থেকেও সাহায্য পাওয়া যায়।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. উৎপাদনের উপাদানসমূহের মোট আয় কীভাবে নির্ণয় করা হয়? ব্যাখ্যা কর।

২. মোট জাতীয় উৎপাদন নির্ণয়ের সাংকেতিক সূত্রটি ব্যাখ্যা কর।

৩. কৃষি খাত বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে বিবেচিত কেন? ব্যাখ্যা কর।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন :

১. মাথাপিছু আয় কীভাবে জীবনযাত্রার মান নির্ধারণ করে? বিশ্লেষণ কর।

২. মোট দেশজ উৎপাদনে অর্থনীতির খাতসমূহ কীভাবে অবদান রাখে? ব্যাখ্যা কর।

৩. নিম্ন আয়ের দেশের ক্ষেত্রে জিডিপি, জিএনপি ও মাথাপিছু আয়ের তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. দেশের শ্রমশক্তির মোট কত শতাংশ কৃষি খাতে নিয়োজিত?

ক. ১৭.৩১
খ. ২৪.৭৩
গ. ২৮.৪০
ঘ. ৪৩.৬০

২. মোট জাতীয় আয় পরিমাপের ক্ষেত্রে একটি গার্মেন্টস কারখানার কোন দ্রব্যটির দাম বিবেচনা করা হবে?

ক. তুলা
খ. সুতা
গ. কাপড়
ঘ. শার্ট

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

২০১০ সালে 'X' দেশের মোট জাতীয় আয় ছিল ৯৬০০ কোটি মার্কিন ডলার এবং জনসংখ্যা ছিল ১৬ কোটি।

৩. ২০১০ সালে 'X' দেশের মাথাপিছু আয় কত মার্কিন ডলার ছিল?

ক. ৪০০
খ. ৫০০
গ. ৬০০
ঘ. ৭০০

৪. উক্ত সূচকটি দ্বারা প্রকাশ পায় 'X' দেশের মানুষের–

i. জীবনযাত্রার মান
ii. সঞ্চয়ের হার
iii. শিক্ষার হার

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i

খ. ii

গ. i ও ii

ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন :

১. অণিমা তার পরিবারের সদস্যদের সাথে মাইক্রোবাসে করে কুয়াকাটায় বেড়াতে যাচ্ছিল। যাওয়ার সময় দুটি ফেরি তারা নির্বিঘ্নে পার হলো। কিন্তু মহীপুরের ফেরি পার হতে গিয়ে দেখে যে, ব্যাপক জলোচ্ছ্বাসের কারণে ফেরি সংলগ্ন পন্টুনের তিন–চতুর্থাংশ পানির নিচে ডুবে গেছে। তাদেরকে ফেরি পার হওয়ার জন্য সেখানে চার ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়। অণিমার বাবা সেখানকার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাথে কথা বলে জানতে পারেন, সরকার এ ধরনের অবস্থা মোকাবিলার জন্য একটি বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

ক. অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি কী?

খ. বৈদেশিক বাণিজ্য বলতে কী বুঝায়?

গ. অণিমা ও তার পরিবার কুয়াকাটা যাওয়ার পথে দেশের কোন ধরনের অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. অণিমার বাবার জানা প্রকল্পটি কি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক হবে? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বাংলাদেশ সরকারের অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থা

বাংলাদেশের মানুষের জানমালের নিরাপত্তা বিধান, দেশরক্ষা, প্রশাসন পরিচালনা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও জনকল্যাণমূলক কাজে বাংলাদেশ সরকারের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। সরকার এ ভূমিকা পালনে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে। এ ব্যয় মেটাতে বাংলাদেশ সরকার কখনো কখনো করের হার বৃদ্ধি করে নতুন ক্ষেত্রে কর আরোপ করে এবং কর বহির্ভূত আয়ের ব্যবস্থাও করে। বাংলাদেশ সরকার স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে গড়ে তুলেছে প্রশাসন, অর্থ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ব্যাংকসহ বহু ক্ষেত্রভিত্তিক ব্যবস্থাপনা। অর্থ ব্যবস্থা ও ব্যাংক ব্যবস্থা বাংলাদেশ সরকারের বৃহত্তম দুটি ব্যবস্থাপনা। সময়ের পরিবর্তনের সাথে এ দুটি ব্যবস্থার কার্যাবলি পূর্বের তুলনায় বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। জনসাধারণ তাদের আয় বা উদ্বৃত্ত অর্থ নিরাপদে সঞ্চয়ের জন্য ব্যাংকে জমা রাখে। সময়ের পরিবর্তনে বাংলাদেশ সরকার এ লক্ষ্যে গড়ে তুলেছে কেন্দ্রীয়, বাণিজ্যিক ব্যাংকসহ বিশেষ কতকগুলো আর্থিক প্রতিষ্ঠান। এ অধ্যায়ে আমরা বাংলাদেশ সরকারের আয়ের উৎস, ব্যয়ের খাত ও ব্যাংক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অবগত হব।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা –

- সরকারি অর্থ ব্যবস্থার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশ সরকারের আয়ের উৎসসমূহ চিহ্নিত ও ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের খাতসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থার ধারণা দিতে এবং এর ধরন ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারব;
- বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারব;
- বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন ও স্বকর্ম সংস্থানে বিভিন্ন ব্যাংকের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারব;
- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কার্যাবলি সম্পর্কে সচেতন হব।

সরকারি অর্থ ব্যবস্থার ধারণা

সরকারি অর্থ ব্যবস্থা হলো অর্থনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাখা। সাধারণভাবে সরকারি অর্থ ব্যবস্থা বলতে রাষ্ট্রের আয় ও ব্যয় সংক্রান্ত নীতি ও পদ্ধতিকে বুঝায়। এ সম্পর্কে অধ্যাপক ডালটন বলেন, 'সরকারি অর্থব্যবস্থা সরকারের আয়–ব্যয় এবং এদের একটির সঙ্গে অপরটির সমন্বয় বিধানের কার্যাবলি আলোচনা করে।' অর্থনীতির এ শাখায় রাষ্ট্রের সব ধরনের আয়–ব্যয়, ঋণ ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত সমস্যা ও সেসবের সমাধানের বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে।

বাংলাদেশ সরকারের আয়ের উৎস

বাংলাদেশ সরকার জনকল্যাণ সাধন, প্রশাসন পরিচালনা ও আর্থ–সামাজিক উন্নয়নের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে। এ ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকারকে প্রচুর অর্থ আয় করতে হয়। বাংলাদেশ সরকারের আয়ের উৎসগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়, যথা–: ক. কর রাজস্ব ও খ. কর বহির্ভূত রাজস্ব। নিচে বাংলাদেশ সরকারের আয়ের উৎসগুলোর বিবরণ দেওয়া হলো।

(ক) **কর রাজস্ব** : বাংলাদেশ সরকার দেশের জনগণ, বিভিন্ন ব্যবসায় ও শিল্প কারখানার ওপর যে কর ধার্য করে তা থেকে প্রাপ্ত আয়কে কর রাজস্ব বলে। বাংলাদেশ সরকারের কর রাজস্ব আয়ের উৎসসমূহ নিম্নরূপ :

১. **বাণিজ্য শুল্ক** : বাংলাদেশ সরকারের আয়ের প্রধান উৎস হলো বাণিজ্য শুল্ক। দেশের আমদানি ও রপ্তানিকৃত দ্রব্যের ওপর যে কর ধার্য করা হয় তাকে বাণিজ্য শুল্ক বলা হয়।

২. **আবগারি শুল্ক** : দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত ও ব্যবহৃত দ্রব্যের ওপর যে কর ধার্য করা হয় তাকে আবগারি শুল্ক বলা হয়। রাজস্ব সংগ্রহ ছাড়াও বিভিন্ন ক্ষতিকর দ্রব্যের ভোগ হ্রাস করার উদ্দেশ্যে আবগারি শুল্ক ধার্য করা হয়। বাংলাদেশে প্রধানত চা, সিগারেট, চিনি, তামাক, কেরোসিন, ওষুধ, স্পিরিট, দিয়াশলাই, মদ, গাঁজা, আফিম প্রভৃতি দ্রব্যের ওপর আবগারি শুল্ক ধার্য করা হয়।

৩. **আয়কর** : বাংলাদেশ সরকারের আয়ের এটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস আয়কর। জনসাধারণের ব্যক্তিগত আয়ের ওপর যে কর ধার্য করা হয় তাকে আয়কর বলা হয়। যাদের আয় একটি নির্দিষ্ট সীমার উর্ধ্বে তাদের নিকট থেকে প্রগতিশীল (Progressive) হারে আয়কর আদায় করা হয়।

৪. **মূল্য সংযোজন কর** : মূল্য সংযোজন কর বাংলাদেশে কর ব্যবস্থায় ভ্যাট (Value Added Tax) নামে পরিচিত। বর্তমানে আমাদের দেশে আমদানিকৃত দ্রব্য ও স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত দ্রব্য এবং নির্ধারিত কতকগুলো সেবা খাতের ওপর ভ্যাট আরোপ করা হয়েছে।

৫. **সম্পূরক শুল্ক** : অনেক দ্রব্যসামগ্রীর ওপর আমদানি শুল্ক বা আবগারি শুল্ক বা ভ্যাট আরোপের পরও অতিরিক্ত যে শুল্ক আরোপ করা হয়, তাকে সম্পূরক শুল্ক বলা হয়। এটি বাংলাদেশ সরকারের আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস।

৬. **ভূমি রাজস্ব** : ভূমি ভোগ দখলের জন্য সরকারকে প্রদত্ত খাজনাই ভূমি রাজস্ব নামে পরিচিত। সরকার ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করার ফলে এ খাতে সরকারের আয় কিছুটা কম।

৭. **নন–জুডিসিয়াল স্ট্যাম্প** : বিভিন্ন দলিলপত্র ও মামলা মকদ্দমার আবেদনপত্র ব্যবহারের জন্য স্ট্যাম্প, পাসপোর্ট, বিনিময় বিল ইত্যাদি খাতে সরকার প্রচুর অর্থ উপার্জন করে।

৮. **রেজিস্ট্রেশন** : দলিলপত্র রেজিস্ট্রি বা নিবন্ধন করার জন্য রেজিস্ট্রেশন ফি এবং মামলা মকদ্দমার জন্য কোর্ট ফি প্রদান করতে হয়। এতেও সরকারের যথেষ্ট আয় হয়।

৯. **যানবাহন কর** : বিভিন্ন প্রকার যানবাহন নিবন্ধনের জন্য প্রদত্ত করকে যানবাহন কর বলে।

১০. **মাদক শুল্ক** : সরকার মদ, গাঁজা, আফিম ইত্যাদি মাদক দ্রব্যের ওপর শুল্ক বসিয়ে কিছু আয় করে।

১১. **বিদ্যুৎ শুল্ক** : বিদ্যুতের ওপর আরোপিত শুল্ক থেকেও সরকারের আয় হয়।

১২. **অন্যান্য কর ও শুল্ক** : উপরে বর্ণিত শুল্ক ও কর ছাড়াও আরও কিছু কর ও শুল্ক থেকে সরকার আয় করে। এর মধ্যে রয়েছে – আমোদ প্রমোদ কর, সম্পত্তি কর, পেট্রোল ও গ্যাসের ওপর শুল্ক, বিদেশ ভ্রমণের ওপর শুল্ক, সেচ কাজ ও যন্ত্রপাতির ওপর কর ইত্যাদি প্রধান।

কাজ

একক : বাংলাদেশ সরকারের আয়ের উৎসসমূহ চিহ্নিত কর।

কর রাজস্ব	কর-বহির্ভূত রাজস্ব

একক : সরকারি আয়ের উৎস সম্প্রসারিত করার উপায় উল্লেখ কর।

(খ) **কর-বহির্ভূত রাজস্ব** : বাংলাদেশ সরকার কর ও শুল্ক ছাড়াও আরও অনেক উৎস হতে রাজস্ব সংগ্রহ করে। এ উৎসগুলো থেকে অর্জিত রাজস্বকে কর–বহির্ভূত রাজস্ব বলে। নিম্নে এসব উৎসসমূহ আলোচনা করা হলো।

১. **লভ্যাংশ ও মুনাফা** : সরকার বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যেমন– ব্যাংক, বিমা কোম্পানি, অ–আর্থিক প্রতিষ্ঠান (Non-financial institution), পার্ক, চিড়িয়াখানা প্রভৃতি থেকে বছর শেষে লভ্যাংশ ও মুনাফা পেয়ে থাকে।

২. **সুদ** : সরকার বিভিন্ন আর্থিক ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দিয়ে থাকে। এ বাবদ প্রাপ্ত শুল্ক থেকে কিছু আয় হয়।

৩. **অর্থনৈতিক সেবা** : সরকার জনসাধারণকে কিছু অর্থনৈতিক সুবিধা প্রদানের মাধ্যমেও আয় করে। এগুলোর মধ্যে পর্যটন, ব্যাংকিং, ভ্রমণ ও সেবা উল্লেখযোগ্য। আমদানি–রপ্তানি আইনের আওতায় প্রাপ্ত রেজিস্ট্রেশন স্কিম, বিমা আইনের আওতায় প্রাপ্তি এবং সমবায় সমিতিসমূহের অডিট স্কিম, সমবায় সমিতি রেজিস্ট্রেশন ও নবায়ন স্কিম প্রভৃতিও কর বহির্ভূত রাজস্ব আয়।

৪. **সাধারণ প্রশাসন** : বাংলাদেশ সরকার প্রশাসনিক সেবা প্রদানের জন্য বিভিন্ন প্রকার 'ফি' আদায় করে।

৫. **রেলওয়ে** : রেলওয়ে সরকারি আয়ের একটি উৎস। তবে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত হলে এ খাত থেকে অধিকতর আয় সম্ভব।

৬. **ডাক বিভাগ** : দেশের ডাক বিভাগ সরকার কর্তৃক পরিচালিত হয় বিধায় এটিও সরকারি আয়ের অন্যতম উৎস।

৭. **তার ও টেলিফোন** : তার ও টেলিফোন ব্যবস্থা সরকার কর্তৃক পরিচালিত হয় বিধায় এটি সরকারের আয়ের আরও একটি উৎস।

৮. **বন** : বন থেকেও সরকার প্রচুর অর্থ আয় করে থাকে। বাংলাদেশের বনাঞ্চল থেকে কাঠ, বাঁশ, জ্বালানি, মধু, মোম ইত্যাদি বনজ সম্পদ বিক্রয়ের মাধ্যমে সরকার আয় করে।

৯. **টোল ও লেভি** : টোল ও লেভির মাধ্যমে সরকার উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ আয় করে। টোল হলো– একধরনের রাজস্ব আয় যা আয়ের ওপর নির্ধারিত আয়করের মতো নয়। সরকার জনগণের সেবা বাবদ বিভিন্নভাবে এ কর গ্রহণ করে, যেমন : ব্রিজ, সেতু, কার্লভার্ট, ঘাট, পারাপার, হাট-বাজার প্রভৃতি থেকে সরকার অর্থ আদায় করে যা টোল হিসেবে পরিচিত। লেভি হলো– বিশেষ বিশেষ সময়ে আরোপিত জনগণের নিকট থেকে আদায়কৃত বিশেষ ধরনের রাজস্ব, যেমন : পদ্মা সেতু সংশ্লিষ্ট রাজস্ব।

১০. **ভাড়া ও ইজারা** : সরকারি সম্পত্তি ভাড়া ও ইজারা দেওয়ার মাধ্যমেও সরকার আয় করে।

১১. **জরিমানা, দণ্ড ও বাজেয়াপ্তকরণ** : জরিমানা, দণ্ড, বাজেয়াপ্তকরণ প্রভৃতির মাধ্যমে সরকার প্রতি বছর অর্থ আয় করে থাকে।

বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের খাতসমূহ

বাংলাদেশ সরকার দেশের আর্থ–সামাজিক উন্নয়ন, ভৌত–অবকাঠামো নির্মাণ, মানবসম্পদ উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে বিপুল অর্থ ব্যয় করে থাকে। এছাড়া সরকারকে প্রশাসনিক, সামাজিক ও জনকল্যাণমূলক এবং অন্যান্য সেবাধর্মী কর্মকাণ্ডেও ব্যয় করতে হয়। সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো উৎপাদনশীল খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করা এবং অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় নিয়ন্ত্রণে রাখা। সরকার দেশের বার্ষিক বাজেটে রাজস্ব ও উন্নয়নমূলক–এ দু'রকম ব্যয়ের জন্য অর্থ বরাদ্দ করে থাকে।

বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের প্রধান খাতগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো।

১. **প্রতিরক্ষা** : প্রতিরক্ষা বাংলাদেশের সরকারি ব্যয়ের অন্যতম প্রধান খাত। প্রতিরক্ষা বাহিনীর কর্মকর্তা–কর্মচারীর বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ–সুবিধা প্রদান , যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র ও সাজসরঞ্জাম ক্রয় ইত্যাদি বাবদ বাংলাদেশ সরকার প্রচুর অর্থ ব্যয় করে থাকে।

২. **বেসামরিক প্রশাসন** : সরকার বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও এসবের বিভাগসমূহের পরিচালনা ও উন্নয়ন, কর্মচারীদের বেতন, ভাতা ইত্যাদির জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে।

৩. **শিক্ষা** : বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের গুরুত্বপূর্ণ খাত হলো শিক্ষা। শিক্ষা সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশকে অশিক্ষার অভিশাপ থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে সরকারকে সাম্প্রতিককালে এ খাতে প্রচুর ব্যয় করতে হচ্ছে। সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি বিদ্যালয়, কলেজ, মাদরাসার জন্য অনুদান, উপবৃত্তি, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক প্রদান, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা বিস্তারের নতুন নতুন কার্যক্রমে যথেষ্ট ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ছাড়া উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য সরকার উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে।

৪. **স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ** : হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ স্থাপন, বিভিন্ন সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, শিশুকল্যাণ কর্মসূচি, মাতৃস্বাস্থ্য কর্মসূচি প্রভৃতি খাতে সরকার প্রচুর অর্থ ব্যয় করে।

৫. **ঋণ ও সুদ পরিশোধ** : দেশের উন্নয়নমূলক কাজের জন্য সরকারকে দেশের অভ্যন্তর হতে এবং বিদেশ হতে প্রচুর পরিমাণে ঋণগ্রহণ করতে হয়। এসব ঋণের আসল ও সুদ পরিশোধ বাবদ সরকারকে প্রতিবছর প্রচুর পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়।

কাজ

একক : বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের খাতসমূহ চিহ্নিত কর।

একক : বাংলাদেশ সরকারের অপ্রত্যাশিত ব্যয়সমূহ চিহ্নিত কর।

৬. **কৃষি, মৎস্য ও পশু পালন** : বাংলাদেশ সরকার এই খাতসমূহে প্রতিবছর উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে থাকে।

৭. **পুলিশ, আনসার ও বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ** : দেশের অভ্যন্তরীণ আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও শান্তি বজায় রাখার জন্য পুলিশ ও আনসার বাহিনী অপরিহার্য। আবার সীমান্ত রক্ষা ও চোরাচালান রোধের জন্য বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ গড়ে তোলা হয়েছে। এই তিন বৃহৎ বাহিনীর জন্য বাংলাদেশ সরকার প্রচুর অর্থ ব্যয় করে।

৮. **বিচার বিভাগ ও কারা বিভাগ** : বিচার বিভাগ ও কারা বিভাগের কর্মকর্তা কর্মচারীর বেতন-ভাতা এবং এই দুই বিভাগের ব্যবস্থাপনায় প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়।

৯ . **রাজস্ব আদায়কারী বিভাগসমূহ** : বাংলাদেশ সরকার আয়কর বিভাগ, বাণিজ্য শুল্ক বিভাগ, আবগারি শুল্ক বিভাগ, ভূমি রাজস্ব বিভাগ প্রভৃতির ব্যয়ভার মেটানোর জন্য রাজস্বের এক বিরাট অংশ ব্যয় করে।

১০. **বৈদেশিক বিষয়াবলি** : বিদেশের সাথে সম্পর্ক স্থাপন, বহির্বিশ্বে দেশের ও জনগণের স্বার্থ রক্ষার জন্য দূতাবাস প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জন্য সরকারকে প্রতিবছর প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়।

১১. **অবসর ভাতা ও অন্যান্য সুবিধা** : সরকারকে অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অবসর ভাতা ও অন্যান্য সুবিধা প্রদানের জন্য প্রতিবছর প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়।

১২. **সমাজ কল্যাণমূলক কার্যক্রম** : সরকারকে প্রতি বছর সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের জন্য প্রচুর অর্থ বরাদ্দ রাখতে হয়।

১৩. **অপ্রত্যাশিত ব্যয়** : বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, খরা, জলোচ্ছ্বাস, মহামারি ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও তৎসৃষ্ট জরুরি অবস্থা মোকাবিলার জন্য প্রতিবছর বাংলাদেশ সরকারকে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করতে হয়।

১৪. **অন্যান্য খাত** : উপরের উল্লিখিত খাত ছাড়াও সরকার অন্য যেসব খাতে অর্থ ব্যয় করে থাকে তা হলো–সচিবালয়, হিসাব নিরীক্ষা, জ্বালানি ও শক্তি, খনি, উৎপাদন এবং নির্মাণ প্রভৃতি।

বাংলাদেশ সরকারকে প্রতি বছরই উপরোক্ত খাতে প্রচুর পরিমাণে অর্থ ব্যয় করতে হয়। অনেক নতুন নতুন খাত ও ব্যয়ের পরিমাণ প্রতি বছর ক্রমশই বাড়ছে। তবে দেশের সমষ্টিক উন্নয়নের স্বার্থে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির পরিধি নিয়ন্ত্রণ করা উচিত।

ব্যাংকের ধারণা

ব্যাংক হলো জনসাধারণের অর্থ গচ্ছিত রাখার এবং ঋণ গ্রহীতাদের বিভিন্ন মেয়াদি ঋণ প্রদান করার প্রতিষ্ঠান। অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাংকের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। জনসাধারণ তাদের আয় বা উদ্বৃত্ত অর্থ নিরাপদে সঞ্চয়ের জন্য ব্যাংকে জমা রাখে। কোনো কোনো জমাকৃত অর্থ থেকে জনসাধারণ সুদ হিসেবে আয়ও করে থাকে। ব্যাংক জনসাধারণের এই গচ্ছিত অর্থ উদ্যোক্তা, উৎপাদনকারী, ব্যবসায়ী ও ঋণ গ্রহীতাদের ঋণ হিসেবে প্রদান করে এবং এ ধরনের ঋণের ওপর সুদ আদায় করে। সঞ্চিত অর্থের ওপর ব্যাংক যে সুদ দেয় তা ঋণ গ্রহীতাদের নিকট হতে ব্যাংক যে সুদ নেয় তার চেয়ে কম। সুদের হারের এই পার্থক্যই ব্যাংকের মুনাফা। মূলত এই মুনাফার ওপর ভিত্তি করে ব্যাংক টিকে থাকে। এ কারণে ব্যাংককে ঋণের কারবারি বলা হয়।

ব্যাংকের শ্রেণিবিভাগ

উদ্দেশ্য ও কার্যাবলির ভিত্তিতে ব্যাংকসমূহকে প্রধানত তিন শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। নিচের ছকটি লক্ষ কর।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক : কেন্দ্রীয় ব্যাংক একটি দেশের সর্বোচ্চ আর্থিক প্রতিষ্ঠান। এই ব্যাংক দেশের অর্থ–বাজার, মুদ্রাব্যবস্থা এবং অন্যান্য ব্যাংকসমূহকে তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করে। দেশের সার্বিক ব্যাংক ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে বলেই এর নাম কেন্দ্রীয় ব্যাংক। দেশের কাগজি মুদ্রা প্রচলনের একমাত্র অধিকার রয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের। বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম বাংলাদেশ ব্যাংক। এই ব্যাংক সরকারের প্রতিনিধি ও আর্থিক পরামর্শদাতা হিসেবেও কাজ করে।

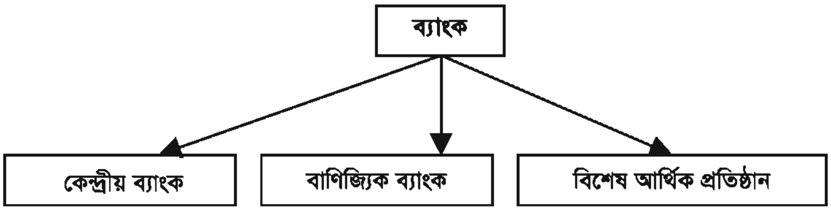

ছক : ব্যাংকের শ্রেণিবিভাগ

বাণিজ্যিক ব্যাংক : বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ বাণিজ্যিক লাভের উদ্দেশ্যে স্বল্পমেয়াদি ঋণ প্রদান করে থাকে। বাংলাদেশে বহু বাণিজ্যিক ব্যাংক রয়েছে, যেমন– সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, জনতা ব্যাংক লিমিটেড, অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড, পূবালী ব্যাংক লিমিটেড, ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড, সিটি ব্যাংক লিমিটেড, ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড প্রভৃতি।

বিশেষ আর্থিক প্রতিষ্ঠান : বিশেষ লক্ষ্য অর্জনে আমাদের দেশে কতিপয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ ব্যাংকসমূহকে বলা হয় বিশেষ আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যেমন–শিল্প উন্নয়নের জন্য শিল্প ব্যাংক, কৃষি উন্নয়নের জন্য কৃষি ব্যাংক, গৃহনির্মাণ ঋণ মঞ্জুরির জন্য গৃহ নির্মাণ ঋণদান সংস্থা, সমবায় কার্যক্রমে ঋণদান ও জনগণকে সমবায়ী মনোভাব সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সমবায় ব্যাংক, দরিদ্র জনসাধারণকে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে গ্রামীণ ব্যাংক প্রভৃতি।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি

অর্থনীতিতে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রাণই হলো এই বাণিজ্যিক ব্যাংক। এই শ্রেণির ব্যাংকসমূহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে অর্থনীতিতে উন্নয়নে সহায়তা করে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন্যতম প্রধান কাজ হলো জনসাধারণের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ করা। ব্যাংকের আমানত সাধারণত তিন প্রকারের–**চলতি, সঞ্চয়ী এবং স্থায়ী আমানত**।

চলতি আমানতের গচ্ছিত অর্থ যে কোনো সময় তোলা যায়। এই আমানতের জন্য ব্যাংক আমানতকারীকে কোনো সুদ প্রদান করে না। সঞ্চয়ী আমানত থেকে সপ্তাহে এক বা দুইবার অর্থ উত্তোলন করা যায়। এজন্য ব্যাংক আমানতকারীকে অল্প সুদ প্রদান করে। আর যে আমানত একটি নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হবার পর তোলা যায় তাকে স্থায়ী আমানত বলে। স্থায়ী আমানতের জন্য আমানতকারীকে উচ্চ হারে সুদ প্রদান করা হয়।

ঋণ প্রদান বাণিজ্যিক ব্যাংকের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। জনসাধারণের কাছ থেকে গৃহীত অর্থের একটি নির্দিষ্ট অংশ গচ্ছিত রেখে অবশিষ্ট অর্থ ব্যাংক ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের ঋণ হিসেবে প্রদান করে থাকে। ব্যাংক ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে সাধারণত মূল্যবান সম্পত্তি বন্ধক রেখে এ কার্যক্রম পরিচালনা করে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো প্রধানত স্বল্পমেয়াদি ঋণদান করে। কিন্তু বর্তমানে চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যমেয়াদি ও ক্ষেত্রবিশেষ দীর্ঘমেয়াদি ঋণও দিয়ে থাকে।

কাজ

দলীয় : বাণিজ্যিক ব্যাংক কার্যাবলির একটি তালিকা তৈরি কর।

বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করা বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন্যতম কাজ। কাগজি নোট প্রচলন করার ক্ষমতা কেবল কেন্দ্রীয় ব্যাংকের থাকলেও বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ চেক, ব্যাংক ড্রাফট, হুন্ডি, ভ্রমণকারীর ঋণপত্র ইত্যাদি বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করে। উন্নত দেশগুলোতে অধিকাংশ লেনদেনই এসব বিনিময়ের মাধ্যমের সাহায্যে সম্পন্ন হয়ে থাকে।

বাট্টা (Discount) ধার্য করে বিনিময় বিল ভাঙ্গিয়ে দেওয়া বাণিজ্যিক ব্যাংকের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বেই টাকার প্রয়োজন হলে বিনিময় বিলের মালিক বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে উক্ত বিল ভাঙ্গিয়ে নগদ টাকা পেতে পারে। এ কাজে ব্যাংক প্রচুর মুনাফা অর্জন করে। বাণিজ্যিক ব্যাংক অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ক্রেতা–বিক্রেতাদের দেনা-পাওনা নিষ্পত্তিতে সাহায্য করে। বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমেই বৈদেশিক বাণিজ্যের অধিকাংশ কাজ পরিচালিত হয়।

বাণিজ্যিক ব্যাংক নিরাপদে এবং দ্রুত টাকা স্থানান্তর করে। এসব ব্যাংক চেক, ব্যাংক ড্রাফট, পে–অর্ডার, ভ্রমণকারীর চেক, টেলিগ্রাফিক ট্রান্সফার (টিটি) প্রভৃতি উপায়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে অর্থ প্রেরণে জনগণকে সহায়তা করে।

বাণিজ্যিক ব্যাংক পূর্বোক্ত কার্যাবলি ছাড়াও এর গ্রাহকের সুবিধার্থে তাদের প্রতিনিধি হিসেবে আরও অনেক কাজ সম্পাদন করে, যেমন– বন্ড, স্টক, শেয়ার, ডিবেঞ্চার ক্রয়–বিক্রয় ইত্যাদি। তাছাড়া গ্রাহকদের বাড়িভাড়া, আয়কর, বিমার প্রিমিয়াম, টেলিফোন ও বিদ্যুৎ বিল প্রভৃতি পরিশোধে সহায়তা করে। মূল্যবান অলংকার, দলিলপত্র প্রভৃতিও নিরাপদে গচ্ছিত রাখে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি

দেশের কাগজি মুদ্রার প্রচলন ও মুদ্রা ব্যবস্থা স্থিতিশীল রাখা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত মুদ্রাই দেশের ‘বিহিত মুদ্রা’। এ মুদ্রার অভ্যন্তরীণ ও বহির্মূল্য যাতে স্থিতিশীল থাকে তার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওপর ন্যস্ত থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক মূলত সরকারের ব্যাংক। সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে এ ব্যাংক বিনা খরচে বিভিন্ন উৎস থেকে সরকারের পাওনা আদায় এবং বিভিন্ন খাতে সরকারের দেনা পরিশোধ করে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণের হিসাব–নিকাশ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে। এ ব্যাংক সুদ ছাড়া সরকারের অর্থ জমা রাখে এবং প্রয়োজনবোধে সরকারকে ঋণ প্রদান ও আর্থিক ব্যাপারে পরামর্শ দান করে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো সকল ব্যাংকের ব্যাংক। অন্যান্য ব্যাংককে তাদের মূলধনের নির্দিষ্ট অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখতে হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই জমার পরিমাণ হ্রাস–বৃদ্ধি করে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণদান ক্ষমতা বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়।

কাজ

দলীয় : কেন্দ্রীয় ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলির তুলনা কর।

ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অন্যতম প্রধান কাজ। বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ দেশের মোট মুদ্রার জোগানের অন্তর্ভুক্ত। অতিরিক্ত ঋণ সৃষ্টির কারণে মোট অর্থের পরিমাণ যদি বেড়ে যায়, তাহলে দেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের মোট মুদ্রার চাহিদা ও জোগানের মধ্যে যথাসম্ভব সমতা বিধান করে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার চেষ্টা করে। মুদ্রা সংকোচন ও মুদ্রাস্ফীতি এড়ানোর লক্ষ্যে এই ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো যখন আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হয় এবং অন্য কোনো উৎস থেকে ঋণ গ্রহণে ব্যর্থ হয়, তখন বাধ্য হয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের শরণাপন্ন হয়। এমতাবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকই বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে ঋণ প্রদান করে আর্থিক সংকটের হাত থেকে রক্ষা করে। এজন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সর্বশেষ পর্যায়ের ঋণদাতা বলা হয়।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন ব্যাংকের পারস্পরিক দেনা-পাওনার ক্লিয়ারিং হাউজ বা নিকাশ ঘর হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। দৈনন্দিন ব্যবসা–বাণিজ্য সংক্রান্ত চেক আদান-প্রদানের ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের মধ্যে দেনা–পাওনার সৃষ্টি হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন ব্যাংকের মধ্যে চেকের মাধ্যমে আন্তঃব্যাংক দেনা–পাওনা মিটিয়ে থাকে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক অন্যান্য দেশের মুদ্রার সাথে দেশের মুদ্রার নির্দিষ্ট বিনিময় হার রক্ষা করে। এ উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়–বিক্রয় করে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য গবেষণা পরিচালনা, প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ, জাতীয় বাজেট প্রণয়নে সাহায্য করা প্রভৃতি বিষয়েও কেন্দ্রীয় ব্যাংক কাজ করে থাকে।

উপর্যুক্ত কাজ ব্যতীত কেন্দ্রীয় ব্যাংক আরও কতকগুলো কাজ সম্পন্ন করে থাকে, যেমন– নিজ দেশে আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডার ও বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করা, স্বর্ণ, রৌপ্য মূল্যবান ধাতু ও উপার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণ করা প্রভৃতি।

দারিদ্র্য বিমোচন ও স্বকর্মসংস্থানে বিভিন্ন ব্যাংকের ভূমিকা

স্বকর্মসংস্থান বলতে বোঝায় স্বাধীনভাবে একজন কর্মক্ষম ও কর্মে ইচ্ছুক মানুষ বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্ত হওয়ার লক্ষ্যে নিজ উদ্যোগে উৎপাদন বা আয় অর্জনের ক্ষেত্রে নিয়োজিত থাকা। বাংলাদেশে প্রতিবছর শ্রমবাজারে প্রায় ২০ থেকে ২৫ লক্ষ নতুন কর্মক্ষম মানুষ প্রবেশ করছে। এসব মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনে বিভিন্ন ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। নিম্নে এসব ব্যাংকের ভূমিকা আলোচনা করা হলো।

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক : স্বাধীনতা লাভের পরপরই বাংলাদেশে অবস্থিত সাবেক কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের সকল দায় ও সম্পদ নিয়ে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক গঠিত হয়। দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এই ব্যাংকের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষকদের স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করে থাকে। হালের বলদ, বীজ, সার, কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়, পানি সেচের জন্য শক্তিচালিত পাম্প, গভীর ও অগভীর নলকূপ স্থাপন প্রভৃতি কাজের জন্য কৃষি ব্যাংক ঋণ প্রদান করে। বর্তমানে কৃষি কার্য ছাড়াও হাঁস–মুরগি ও পশু পালন, মৎস্য উৎপাদন, গুটি পোকার চাষ, ফলের চাষ, ফুলের চাষ ও কুটির শিল্পের জন্যও এই ব্যাংক ঋণ প্রদান করে থাকে।

বাংলাদেশে কৃষি ব্যাংক ছাড়াও সোনালী ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ও রূপালী ব্যাংকসমূহের স্ব স্ব বার্ষিক কৃষি ও পল্লী ঋণ কর্মসূচিতে স্বকর্ম সংস্থান ও আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণদান কর্মসূচি যথাযথ গুরুত্বের সাথে অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে। কৃষি ও পল্লী ঋণ খাতে এসব ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বার্ষিক ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার ন্যূনতম শতকরা ২৫ ভাগ দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য নির্ধারিত রাখতে হয়। বেসরকারি সংস্থাসহ বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে এ ঋণ সরবরাহ করা হয়। এক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহের নিজস্ব কর্মসূচি রয়েছে।

গ্রামীণ ব্যাংক : গ্রামীণ ব্যাংক একটি ব্যতিক্রমধর্মী ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশে আত্মপ্রকাশ করেছে। এটি পল্লীর ভূমিহীন নারী ও পুরুষদের ঋণদানের জন্য একটি বিশেষ অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান। ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী ব্যাংক হিসেবেও এটি পরিচিত।

গ্রামীণ ব্যাংক বাংলাদেশের দরিদ্র পুরুষ ও নারীদের বিনা জামানতে ব্যাংকিং সুবিধা প্রদান করে। গ্রামীণ মহাজনদের শোষণ থেকে গরিব মানুষকে রক্ষা করার মহান ব্রত নিয়েই এ ব্যাংকের অগ্রযাত্রা। এ ব্যাংক গ্রামের বিশাল বেকার জনগোষ্ঠীর জন্য স্বকর্ম-সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখছে।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. সরকারি অর্থব্যবস্থা কী?

২. ক্রয়কৃত মিষ্টির ওপর অতিরিক্ত প্রদানকৃত অর্থ কোন করের আওতাভুক্ত?

৩. চিনির ওপর ধার্যকৃত করকে আবগারিমূলক বলার কারণ কী?

৪. নিকাশঘর হিসেবে দায়িত্ব পালন করে কোন ব্যাংক? ব্যাখ্যা কর।

৫. বাণিজ্যিক ব্যাংকে তার মূলধনের একটি অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে রিজার্ভ রাখতে হয় কেন?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন :

১. সরকারি আয়ের উৎস সম্প্রসারিত করার উপায় বিশ্লেষণ কর।

২. দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে কৃষি ব্যাংকের ভূমিকা মূল্যায়ন কর।

৩. ‘মুদ্রা ব্যবস্থা স্থিতিশীল রাখাই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অন্যতম কাজ।’ – ব্যাখ্যা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. কর-বহির্ভূত রাজস্ব কোনটি?
   ক. বন
   খ. আয়কর
   গ. ভূমি রাজস্ব
   ঘ. যানবাহন কর

২. বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের প্রধান খাত কোনটি?
   ক. শিক্ষা
   খ. প্রতিরক্ষা
   গ. বেসরকারি প্রশাসন
   ঘ. বৈদেশিক বিষয়াবলি

৩. নিচের কোন কাজটি সোনালী ব্যাংকের?
   ক. বৈদেশিক ঋণের হিসাব রাখা
   খ. বিদেশ থেকে গাড়ি আমদানিতে অর্থ দেওয়া
   গ. জমিতে সেচের নলকূপ স্থাপনে অর্থ দেওয়া
   ঘ. বিনা জামানতে ব্যাংকিং সুবিধা প্রদান করা

৪. বাংলাদেশ ব্যাংকের কাজ হলো–
   i. সরকারকে ঋণ প্রদান
   ii. আর্থিক সংকটকালে বাণিজ্যিক ব্যাংককে ঋণ প্রদান
   iii. ব্যবসায় করার জন্য ঋণ প্রদান

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i

খ. i ও ii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

সুন্দরপুর গ্রামের ভূমিহীন নূরজাহান বেগম স্থানীয় একটি সংস্থায় হাঁস–মুরগি পালনের ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। সংস্থাটি নূরজাহান বেগমকে দশ হাজার টাকা ঋণ দেয়। হাঁস–মুরগি পালন করে নূরজাহানের পরিবার এখন সচ্ছল।

৪. নূরজাহান বেগম কোন সংস্থা থেকে ঋণ নিয়েছেন?

ক. কেন্দ্রীয় ব্যাংক

খ. বাণিজ্যিক ব্যাংক

গ. কৃষি ব্যাংক

ঘ. গ্রামীণ ব্যাংক

৫. নূরজাহান বেগমকে ঋণ প্রদানকারী সংস্থার ভূমিকা হলো–

i. জাতীয় বাজেট প্রণয়নে সাহায্য করা

ii. নারীদের বিনা জামানতে ব্যাংকিং সুবিধা প্রদান

iii. গ্রামীণ মহাজনদের শোষণ হতে গরিব মানুষকে রক্ষা করা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i

খ. i ও ii

গ. i ও iii

ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন :

১. সফিপুর গ্রামের দুই বন্ধু মামুন ও নাফিজ বিএ পাস করে গ্রামে বসবাস করেন। মামুন তার পৈতৃক সম্পত্তি চাষাবাদের কাজে একটি গভীর নলকূপ স্থাপনের জন্য বিশেষ আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ৫ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়েছেন। মামুনের নলকূপের পানি দিয়ে গ্রামের কৃষকরা চাষাবাদ করে অধিক ফসল উৎপাদন করতে পারছেন। নাফিজ তার বাড়িটি বন্ধক রেখে ব্যাংক থেকে বিশ লক্ষ টাকা নিয়ে একটি পোশাক তৈরির কারখানা দিয়েছেন। নাফিজের কারখানায় গ্রামের ১০০ শ্রমিক কাজ করছে। নাফিজের কারখানায় উৎপাদিত পোশাক বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। গ্রামের বেকার যুবকরা নাফিজের কারখানায় কাজ করে দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা রাখছে।

ক. ব্যাংকসমূহকে প্রধানত কয়টি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়?

খ. ‘চিহ্নিত মুদ্রা’ কী? ব্যাখ্যা কর।

গ. মামুন যে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছেন, দারিদ্র্য নিরসনে এর কার্যক্রম ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ‘নাফিজ যে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছেন, অর্থনীতিতে উক্ত ব্যাংকটির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।’ –বিশ্লেষণ কর।

২. প্রাপ্তি এবং দীপ্ত ৮ম শ্রেণির শিক্ষার্থী। প্রাপ্তির বাবা বিদেশি গাড়ির আমদানিকারক। প্রাপ্তির বাবা এ বছর সর্বোচ্চ করদাতার পুরস্কার পেয়েছেন। দীপ্তর বাবা একটি ব্যাংকের জি.এম. পদে কর্মরত। দীপ্তর বাবাও প্রতিবছর সরকারকে কর প্রদান করেন।

ক. কৃষি ও পল্লী উন্নয়নের জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বার্ষিক ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রার ন্যূনতম হার কত?

খ. বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের গুরুত্বপূর্ণ খাতটি ব্যাখ্যা কর।

গ. দীপ্তর বাবা সরকারকে কোন ধরনের ট্যাক্স দেন? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. প্রাপ্তির বাবা সরকারকে যে ট্যাক্স দেন তা সরকারের আয়ের প্রধান উৎস– ব্যাখ্যা কর।

৩. জাহিদ নিউমার্কেটে ঈদের শার্ট কিনতে যায়। শার্টের দাম দিতে গিয়ে তাকে শার্টের গায়ে লেখা দামের চেয়ে বেশি দাম দিতে হয়। কারণ জানতে চাইলে বিক্রয়কর্মী তাকে বলেন, ‘বাড়তি দামটি একধরনের কর’। জাহিদের বাবা একজন সরকারি চাকরিজীবী। জাহিদ বাসায় এসে সব ঘটনা বাবাকে বর্ণনা করলে বাবা বলেন, তিনিও সরকারকে কর দেন।

ক. সম্পূরক শুল্ক কাকে বলে?

খ. বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের অন্যতম প্রধান খাতটি বর্ণনা কর।

গ. জাহিদ যে কর দেয় তার স্বরূপ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. জাহিদের বাবা যে কর দেয় তা সরকারের আয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস–বিশ্লেষণ কর।

চতুর্দশ অধ্যায়

বাংলাদেশের পরিবার কাঠামো ও সামাজিকীকরণ

পরিবার সমাজের প্রাথমিক প্রতিষ্ঠান। পরিবার থেকে সমাজের উৎপত্তি। সমাজে যেসব সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে তার মধ্যে পরিবার অন্যতম। মানুষের অকৃত্রিম ও নিবিড় সম্পর্ক এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই গড়ে ওঠে। পারিবারিক জীবনের সূচনা থেকেই প্রতিটি মানুষকে গোষ্ঠী জীবনের প্রথম ধাপ অতিক্রম করতে হয়। পিতা-মাতা, ভাই-বোন অথবা পিতা-মাতা, ভাই-বোন, চাচা-চাচি, দাদা-দাদিসহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের বন্ধন ও কার্যকলাপের সমন্বয়ে আমাদের পারিবারিক কাঠামো গড়ে ওঠে। পরিবারভেদে বাংলাদেশের পরিবার কাঠামোতে এ ধরনের সম্পর্ক লক্ষ করা যায়, যার মধ্য দিয়ে মানুষ বেড়ে ওঠে। ধীরে ধীরে মানুষ সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সংস্পর্শে আসে এবং সামাজিক পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে চলে। এই খাপ খাইয়ে চলার প্রক্রিয়াই সামাজিকীকরণ, যা মানুষের সমগ্র জীবনব্যাপী চলতে থাকে। সমাজ জীবনের ক্ষেত্রে সামাজিকীকরণ গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ সামাজিক ক্ষেত্রে পরিপূর্ণতা অর্জন করে এবং সমাজের একজন দায়িত্বশীল সদস্যে পরিণত হয় সামাজিকীকরণের মাধ্যমে। এ অধ্যায়ে আমরা বাংলাদেশের পরিবার কাঠামো এবং সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত হব।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

- পরিবারের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব,
- বিভিন্ন প্রকার পরিবারের ধারণা ব্যাখা করতে পারব;
- পরিবারের সাধারণ কার্যাবলি ব্যাখ্যা করতে পারব,
- বাংলাদেশের পরিবার ব্যবস্থার (গ্রাম ও শহরে) ধরন ও ভূমিকার পরিবর্তনের কারণ এবং সৃষ্ট সমস্যা বিশ্লেষণ করতে পারব;
- বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর প্রতি পরিবারের ভূমিকা ও মনোভাব ব্যাখ্যা করতে পারব,
- পরিবারের সদস্য হিসেবে নিজ ভূমিকা পালনে সচেতন হব,
- সামাজিকীকরণের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব,
- বাংলাদেশের মানুষের সামাজিক পরিবেশ, সামাজিক জীবন ও মূল্যবোধ গঠনে সামাজিকীকরণের উপাদানসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারব,
- আধুনিক বাংলাদেশে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় পরিবার ও পরিবারের সদস্যদের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশে গ্রামীণ ও শহুরে সমাজে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভূমিকার প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব,
- ব্যক্তিত্ব ও মূল্যবোধ গঠনের মাধ্যমে সমাজে ভূমিকা রাখতে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ হব।

পরিচ্ছেদ ১৩.১ : বাংলাদেশের পরিবার কাঠামো

প্রত্যেকটি মানব শিশু একটি পরিবারে জন্মগ্রহণ করে এবং পরিবারেই বড় হয়। মানুষের জন্ম, সমগ্র কর্মময় জীবন এবং শেষ পরিণতি পারিবারিক বন্ধনের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। পৃথিবীতে এমন কোনো মানব সমাজের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না, যেখানে পরিবার নেই। পরিবার হলো একটি ক্ষুদ্রতম সামাজিক সংগঠন, যেখানে পিতা-মাতা ও তাদের সন্তান-সন্ততি একত্রে বসবাস করে। পিতা-মাতা, ভাই-বোন ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যের স্নেহ- ভালোবাসা, শাসন নিয়ন্ত্রণের মধ্যে দিয়ে পরিবারেই শিশুর সকল সামাজিক গুণের বিকাশ ঘটে।

পরিবারের ধারণা

পরিবার হলো সমাজকাঠামোর মৌল সংগঠন। গোষ্ঠী জীবনের প্রথম ধাপ হচ্ছে পরিবার। পরিবার হচ্ছে মোটামুটিভাবে স্বামী–স্ত্রীর একটি স্থায়ী সংঘ বা প্রতিষ্ঠান, যেখানে সন্তান–সন্ততি থাকতে পারে আবার নাও থাকতে পারে।

বিবাহ পরিবার গঠনের অন্যতম পূর্বশর্ত। একজন পুরুষ সমাজস্বীকৃত উপায়ে একজন নারীকে বিয়ে করে একটি পরিবার গঠন করে। আদিম সমাজেও পরিবারের অস্তিত্ব ছিল। সে সমাজে বিবাহ ব্যতিরেকেই পরিবার গঠিত হতো। কিন্তু আমাদের সমাজে এটা সম্ভব নয়। সুতরাং বলা যায় যে, বিবাহের মাধ্যমেই পরিবার গঠন করা যায়।

পরিবার হচ্ছে মানুষের দলবদ্ধ জীবনযাপনের বিশ্বজনীন প্রতিষ্ঠান। সব সমাজে এবং সমাজ বিকাশের প্রত্যেক স্তরেই পরিবারের অস্তিত্ব রয়েছে। এটি আমাদের দলবদ্ধ জীবনের আবেগময় ভিত্তি। সন্তান উৎপাদন, প্রতিপালন এবং স্নেহ-মায়ামমতার বন্ধন, মূল্যবোধ গঠন, অধিকার সচেতনতা সৃষ্টি প্রভৃতি পরিবারের মধ্যেই ঘটে। প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিবারের রয়েছে বিশেষ নিয়ম-নীতি, আদর্শ, মূল্যবোধ এবং কার্যগত সাংগঠনিক ভিত্তি, যার সামগ্রিকরূপই পরিবার কাঠামো।

আদিম সমাজ হতে শুরু করে আজ পর্যন্ত পরিবারের গঠন, কার্যাবলি ও কাঠামোতে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু এই পরিবর্তন সত্ত্বেও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় মানব সমাজে পরিবারের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা, মানুষের জীবনের শুরু হতে শেষ অবধি আশ্রয়স্থল হচ্ছে পরিবার। পরিবারের সাথে মানুষের সম্পর্ক গভীর ও শৃঙ্খলিত, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত। পরিবারের মাধ্যমেই সামাজিক, অর্থনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং সাংস্কৃতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়।

পরিবারের প্রকারভেদ

সমাজভেদে বা দেশভেদে বিভিন্ন প্রকারের পরিবার রয়েছে। বিভিন্ন মাপকাঠির ভিত্তিতে পরিবারকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। স্বামী–স্ত্রীর সংখ্যা, কর্তৃত্ব, পরিবারের আকার, বংশমর্যাদা, বসবাস এবং পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের মাপকাঠির ভিত্তিতে পরিবার বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে।

১. স্বামী-স্ত্রীর সংখ্যার ভিত্তিতে পরিবার : এ ভিত্তিতে পরিবার তিন ধরনের হয়ে থাকে, যেমন: একপত্নী, বহুপত্নী ও বহুপতি পরিবার। একজন পুরুষের সঙ্গে একজন নারীর বিবাহের মাধ্যমে একপত্নী পরিবার গড়ে ওঠে। বিশ্বে এ ধরনের পরিবার অধিক দেখা যায়। আদর্শ পরিবার বলতে মূলত এ পরিবারকেই বোঝায়। এ ধরনের পরিবার কাঠামোতে স্বামী–স্ত্রীর মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়। আবার একজন পুরুষের সঙ্গে একাধিক নারীর বিবাহের ভিত্তিতে যে পরিবার গঠিত হয়, তাকে বহুপত্নী পরিবার বলে। এ ধরনের পরিবারে মূলত একজন পুরুষের একই সময়ে একাধিক স্ত্রী বর্তমান থাকে। সাধারণত কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ মুসলিম সমাজে এ ধরনের বহুপত্নীক পরিবার দেখা যায়। এস্কিমো

উপজাতি এবং আফ্রিকার নিগ্রোদের সমাজেও এ ধরনের পরিবার প্রথা রয়েছে। একজন নারীর সাথে একাধিক পুরুষের বিবাহের মাধ্যমে যে পরিবার গড়ে ওঠে তাকে বহুপতি পরিবার বলে। এ ধরনের পরিবার আধুনিক সভ্য সমাজে দেখা যায় না। তবে একসময়ে তিব্বতে বহু স্বামী গ্রহণ পদ্ধতির প্রচলন ছিল। তাছাড়া, দক্ষিণ ভারতের মালাগড় অঞ্চলে টোডাদের মধ্যে এ ধরনের পরিবার দেখা যেত।

২. কর্তৃত্বের ভিত্তিতে পরিবার : কর্তৃত্বের ভিত্তিতে পরিবার দুই ধরনের হয়ে থাকে, যেমন–পিতৃপ্রধান বা পিতৃতান্ত্রিক এবং মাতৃপ্রধান বা মাতৃতান্ত্রিক পরিবার। পরিবারের সামগ্রিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের ভার পুরুষ সদস্য অর্থাৎ পিতা, স্বামী কিংবা বয়স্ক ব্যাক্তির ওপর ন্যস্ত থাকলে এ ধরনের পরিবারকে পিতৃপ্রধান পরিবার বলে। এ ধরনের পরিবারের বংশ পরিচয় প্রধানত পুরুষ সূত্র দ্বারা নির্ধারিত হয়। বাংলাদেশের সমাজে এ ধরনের পরিবার রয়েছে। আবার যে পরিবারে সামগ্রিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের ভার মায়ের হাতে থাকে সে পরিবারকে মাতৃপ্রধান পরিবার বলে। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা খাসিয়া এবং গারোদের পরিবার মাতৃতান্ত্রিক বা মাতৃপ্রধান।

৩. আকারের ভিত্তিতে পরিবার : আকারের ভিত্তিতে পরিবার তিন ধরনের হয়ে থাকে, যেমন– একক বা অণু পরিবার, যৌথ পরিবার ও বর্ধিত পরিবার। স্বামী–স্ত্রী ও তাদের অবিবাহিত সন্তান–সন্ততি নিয়ে গঠিত পরিবারকে একক পরিবার বলে। এ পরিবার দুই পুরুষে আবদ্ধ। দুই পুরুষ হলো পিতা এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান–সন্ততি। আমাদের দেশের শহরাঞ্চলের অধিকাংশ পরিবারই একক পরিবার। গ্রামাঞ্চলেও এ ধরনের পরিবার গড়ে ওঠার প্রবণতা লক্ষণীয়। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে এ ধরনের পরিবার প্রথা প্রচলিত। যখন দাদা-দাদি বা পিতা-মাতার কর্তৃত্বাধীনে বিবাহিত পুত্র ও তার সন্তানাদি এক সংসারে বাস করে তখন তাকে যৌথ পরিবার বলে। একক পরিবারের মতো যৌথ পরিবারের বন্ধনও মূলত রক্তের সম্পর্কের মাধ্যমে গড়ে ওঠে। আমাদের দেশে গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ পরিবারই যৌথ পরিবার। এখন এ ধরনের পরিবারের সংখ্যা নানা কারণে হ্রাস পাচ্ছে।

কাজ

দলীয় : বাংলাদেশের পরিবার কাঠামোতে যে ধরনগুলো দেখা যায় তার একটি তালিকা তৈরি কর।

একক : তোমার এলাকায় বসবাসকারী বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী পরিবারের ধরন চিহ্নিত করে একটি ছক তৈরি কর।

তিন পুরুষের পারিবারিক বন্ধনের পরিবার হলো বর্ধিত পরিবার। বর্ধিত পরিবারে পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয় দিকের সদস্য অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। আমাদের দেশের গ্রামীণ সমাজে এ ধরনের পরিবার এখনও দেখা যায়। চীনেও এ ধরনের পরিবার প্রথা রয়েছে।

৪. বংশমর্যাদা এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে পরিবার : এ ভিত্তিতে পরিবার দুই ধরনের হয়ে থাকে, যেমন– পিতৃসূত্রীয় ও মাতৃসূত্রীয় পরিবার। পিতৃসূত্রীয় পরিবারের সন্তান–সন্ততি পিতার বংশমর্যাদার অধিকারী ও সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে। এ ধরনের পরিবার আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় রয়েছে। মাতৃসূত্রীয় পরিবার মায়ের দিক থেকে বংশমর্যাদা ও সম্পত্তির উত্তরাধিকার অর্জন করে। খাসিয়া ও গারোদের মধ্যে মাতৃসূত্রীয় পরিবার ব্যবস্থা এখনও প্রচলিত।

৫. বিবাহোত্তর স্বামী–স্ত্রীর বসবাসের স্থানের ওপর ভিত্তি করে পরিবার : এ ভিত্তিতে পরিবার তিন ধরনের হয়, যেমন–পিতৃবাস, মাতৃবাস এবং নয়াবাস পরিবার। যে পরিবারে বিবাহের পর নবদম্পতি স্বামীর পিতৃগৃহে বসবাস করে তাকে পিতৃবাস পরিবার বলে। আমাদের সমাজে এ ধরনের পরিবার দেখা যায়। বিবাহের পর নবদম্পতি স্ত্রীর পিতৃগৃহে বসবাস করলে তাকে মাতৃবাস পরিবার বলে। গারোদের মধ্যে এ ধরনের পরিবার দেখা যায়। বিবাহিত দম্পতি স্বামী বা স্ত্রী কারও পিতার বাড়িতে বাস না করে পৃথক বাড়িতে বাস করলে নয়াবাস পরিবার বলা হয়। শহরে চাকরিজীবীদের মধ্যে এধরনের পরিবার দেখা যায়।

৬. পাত্র–পাত্রী নির্বাচনের ভিত্তিতে পরিবার : মুসলমান সমাজে গোত্রভিত্তিক বিবাহের প্রচলন না থাকলেও হিন্দু সমাজে তা লক্ষ করা যায়। হিন্দু সমাজে দু'ধরনের গোত্রভিত্তিক পরিবার, যথা– বহির্গোত্র বিবাহভিত্তিক পরিবার এবং অন্তর্গোত্র বিবাহভিত্তিক পরিবার বিদ্যমান রয়েছে। কোনো ব্যক্তি যখন নিজের গোত্রের বাইরে বিবাহ্ করে তখন তাকে বহির্গোত্র বিবাহভিত্তিক পরিবার বলে। এ ধরনের পরিবার আবার দু'ধরনের হয়। উঁচু বর্ণের পাত্রের সাথে নিচু বর্ণের পাত্রীর বিবাহের মাধ্যমে গঠিত পরিবারকে অনুলোম বিবাহভিত্তিক পরিবার বলে। আর নিচু বর্ণের পাত্রের সাথে উঁচু বর্ণের পাত্রীর বিবাহের মাধ্যমে গঠিত পরিবারকে বলে প্রতিলোম বিবাহভিত্তিক পরিবার। এ ধরনের বিবাহের মূল কারণ সামাজিক অনাচার রোধ করা। আবার যখন কোনো ব্যক্তি নিজ গোত্রের মধ্যে যখন বিবাহ্ করে তখন তাকে অন্তর্গোত্র বিবাহ ভিত্তিক পরিবার বলে। অন্তর্গোত্রভিত্তিক বিবাহ হিন্দু সমাজেই অধিক প্রচলিত। এ ধরনের বিবাহের পিছনে যুক্তি ছিল নিজ গোত্রের মধ্যে তথাকথিত রক্তের বন্ধন ও বিশুদ্ধতা রক্ষা করা। বর্তমানে এ ধরনের পরিবার গঠনে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। অধিকাংশ হিন্দু পরিবার এ বর্ণপ্রথাকে কুসংস্কার মনে করে।

পরিবারের সাধারণ কার্যাবলি

মানব সমাজে পরিবারের ভূমিকার পরিধি ব্যাপক এবং এর কার্যাবলি বহুমাত্রিক। সন্তান প্রজনন থেকে শুরু করে লালন-পালন এবং তার সুষ্ঠু বিকাশে পরিবারের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। পৃথিবীর সকল দেশের পরিবার কাঠামোতেই এ ধরনের ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। সামাজিক পরিবর্তনের সাথে পরিবারের ভূমিকারও পরিবর্তন ঘটছে। তবে পরিবারের কতকগুলো মূল কাজ রয়েছে, যা বিশ্বের সব সমাজের পরিবার পালন করে থাকে। নিচে পরিবারের সাধারণ কতকগুলো কাজ আলোচনা করা হলো।

জৈবিক চাহিদা পূরণ

সমাজ স্বীকৃতভাবে জৈবিক চাহিদা পূরণের জন্য মানুষ পরিবার গঠন করে। বিবাহের মাধ্যমে পরিবার নর–নারীর জৈবিক চাহিদা পূরণ করে। পরিবার গঠনের মূল উদ্দেশ্য সন্তান প্রজনন এবং লালন–পালন করা। সন্তানের সুষ্ঠু লালন–পালন সন্তান প্রজননের আনুষঙ্গিক কাজ। সন্তান যতদিন না স্বাবলম্বী হয়, ততদিন পরিবারের এই দায়িত্ব থাকে। এক্ষেত্রে পরিবারের আয়ের ওপর সন্তানের সুষ্ঠু লালন–পালন নির্ভর করে।

সন্তানের ভরণ-পোষণ

সন্তানের ভরণ–পোষণের সাথে তার সামাজিকীকরণের প্রাথমিক দায়িত্ব পিতা–মাতা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যের। এ সময় থেকেই শিশু অপরের দৃষ্টিতে নিজেকে দেখতে শেখে। পারিবারিক মূল্যবোধ শেখে। পছন্দ–অপছন্দ বলতে পারে। পরিবারের বাইরের লোকের সাথে পরিচয় হয় এবং খাপ খাওয়ানোর দক্ষতা অর্জন করে। শিশুকাল থেকে শিশু সমাজের রীতি–নীতি, আচার–ব্যবহার, নিয়ম–কানুন, অভ্যাস প্রভৃতি পরিবার থেকে শিক্ষালাভ করে। পারিবারিক সুন্দর পরিবেশেই শিশুর মধ্যে প্রত্যাশিত আচরণ তৈরি হয়। পরিবার শিশুর দৈহিক প্রয়োজনের প্রতিই যে শুধু দৃষ্টি রাখে তা নয় বরং তার মানসিক নিরাপত্তা এবং স্নেহ–ভালোবাসার দাবিও পূরণ করে। মানসিক নিরাপত্তাবোধ ব্যতিরেকে শিশুর মনে হতাশা, হীনমন্যতা ও আশংকা সৃষ্টি হতে পারে। এ সম্পর্কে আমরা পরবর্তী পরিচ্ছেদে বিস্তারিত অবগত হব।

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড

পরিবার ছিল একসময়ের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের মূল কেন্দ্রস্থল। তখন পরিবারের যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্তুগুলো গৃহেই উৎপাদন হতো। একসময়ে গ্রামীণ যৌথ পরিবারের মধ্যেই এসব অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সম্পাদিত হতো। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবারের অর্থনৈতিক কাজগুলো মিল, কারখানা, দোকান, বাজার, ব্যাংক এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পাদিত হচ্ছে। এখন পরিবারের সদস্যরা অর্থ উপার্জনের জন্য ঘরের বাইরে কাজ করে। এজন্য পরিবারকে আয়ের একক বলা হয়। তাছাড়া আমাদের দেশে গ্রামীণ কৃষি পরিবার কৃষি–অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি। শুধু তা-ই নয়, পরিবারকে কেন্দ্র করে এদেশের কুটির শিল্প গড়ে উঠেছে, যা আমাদের দেশের অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

শিক্ষাদান

পরিবার শিশুর অন্যতম উল্লেখযোগ্য শিক্ষাকেন্দ্র। জন্মের পর শিশু গৃহেই প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করে। মাতাই শিশুর জীবনের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। যদিও বর্তমানে শিক্ষা দেওয়ার যাবতীয় দায়িত্ব গ্রহণ করেছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তবুও আচার-ব্যবহার, নিয়মানুবর্তিতা, নৈতিকতা, ধর্মীয় বিধি-বিধান, আচার-আচরণ সম্পর্কিত বিষয়গুলোর শিক্ষা শিশু পরিবার থেকেই গ্রহণ করে।

স্বাস্থ্যসেবা প্রদান

স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সব দায়-দায়িত্ব পালনে পরিবারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। একসময়ে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ও নিয়ন্ত্রণ পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আধুনিককালে এ দায়িত্ব হাসপাতাল কিংবা ক্লিনিক প্রদান করে থাকে।

বিনোদনের ব্যবস্থা

অতীতে পরিবারের সদস্যদের অবসর, বিনোদন ব্যবস্থা পরিবারের মধ্যেই সম্পন্ন হতো। বর্তমানে যদিও বিনোদন ব্যবস্থায় নানা প্রযুক্তি, যান্ত্রিকতা এসেছে তথাপি মানসিক আনন্দের জন্য আজও পরিবারকেই সবচেয়ে বড় বিনোদন কেন্দ্র ধরা হয়ে থাকে। পারিবারিক আড্ডা একটি অকৃত্রিম বিনোদন ব্যবস্থা, যা পারিবারিক সদস্যদের মধ্যে ঐক্য বজায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

কাজ

দলীয় : ব্যক্তির অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক জীবন গঠনে পরিবারের ভূমিকার একটি তালিকা তৈরি কর।

সম্পদ-সম্পত্তির উত্তরাধিকার সংরক্ষণ

পারিবারিক সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রথা প্রায় সকল সমাজ ব্যবস্থায় রয়েছে। বিষয় সম্পত্তি, জমিজমা থেকে শুরু করে সকল স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে হস্তান্তরিত হয়। আর যেহেতু এই প্রজন্ম সৃষ্টির মূলে থাকে পরিবার, তাই সম্পত্তির সংরক্ষণ ও উত্তরাধিকার নির্ধারণের ক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং, পরিবারের মাধ্যমে শিশু ভবিষ্যৎ পিতা এবং মাতার যাবতীয় দায়িত্ব ও কর্তব্যের গুণাবলি অর্জন করে। একই সাথে ভালোমন্দ বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষমতা লাভ করে। পরিবারের কারণেই আমাদের এই সুন্দর সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছে।

বাংলাদেশে গ্রাম ও শহরের পরিবারের ভূমিকা

বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরে পরিবারের ধরন ও ভূমিকায় পার্থক্য রয়েছে। একসময়ে গ্রামীণ সমাজে যৌথ পরিবারের সংখ্যাই বেশি ছিল। কিন্তু বর্তমানে শিল্পায়ন, নগরায়ণ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, দরিদ্রতা, ভোগবাদী মানসিকতাসহ নানা কারণে যৌথ পরিবার ব্যবস্থা ভেঙ্গে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ের সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার ক্ষুদ্র ঋণদান কর্মসূচির বিভিন্ন সুবিধা গ্রহণও পরিবারের এ পরিবর্তনে ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে গ্রাম ও শহরে একক পরিবারের সংখ্যাই বেশি। গ্রামে বর্ধিত পরিবার দেখা গেলেও শহরে এ ধরনের পরিবার নেই বললেই চলে। পিতৃপ্রধান ও পিতৃবাস পরিবার ব্যবস্থা শহর, গ্রামে উভয় স্থানেই দেখা যায়। তবে নয়াবাস পরিবার শহরে সর্বাধিক। একসময়ে এদেশের মুসলিম সমাজে বহুপত্নী পরিবারের সংখ্যা ছিল অধিক। এখন এ ধরনের পরিবারের সংখ্যা কমে গিয়েছে। গ্রাম ও শহর উভয়েই এখন একপত্নী পরিবারের সংখ্যাই বেশি।

আমাদের দেশের গ্রামীণ ও শহুরে সমাজে পরিবারের ধরনের পরিবর্তনের সাথে সাথে এর ভূমিকারও পরিবর্তন ঘটেছে, যেমন-আমাদের দেশের শহরাঞ্চলে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠায় গ্রামের সাধারণ নারী-পুরুষ কৃষি পেশা ছেড়ে শিল্প শ্রমিকে পরিণত হয়েছে। পরিবারের কর্মক্ষম ব্যক্তি শহরে চলে যাওয়ায় পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা আর্থিক নিরাপত্তাহীনতাসহ নানা সমস্যায় পতিত হচ্ছে। গ্রাম প্রধান আমাদের এদেশে এক সময়ে যৌথ কিংবা বর্ধিত পরিবারেই শিশু বড় হতো। তখন

কাজ

একক : তোমার নিজ এলাকায় পরিবারের ভূমিকার পরিবর্তনের কারণ এবং এর ফলে সৃষ্ট সমস্যার একটি তালিকা তৈরি কর।

দলীয় : শিক্ষা, বিবাহ, চিকিৎসা ও পরিবারের সদস্যদের অধিকারের ক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকায় পরিবর্তনের প্রভাব চিহ্নিত কর।

অল্প বয়স থেকেই পারিবারিক পেশার সাথে এসব শিশু জড়িত হতো। পরিবার এক্ষেত্রে শিশুর পেশা বেছে নেওয়ার ভূমিকা রাখত। পরিবারের এ ভূমিকায় পরিবর্তন হয়েছে। গ্রাম বা শহর সবখানেই শিশুর সুন্দর জীবন গঠন ও তাদের অধিকার বিষয়ে পিতা–মাতা এখন অনেক সচেতন। শিশুশ্রম যে নিষিদ্ধ একথা অনেক অভিভাবকই জানেন।

পরিবার শিশুর আনুষ্ঠানিক এবং নৈতিক শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষালয়। শিশুর নৈতিক শিক্ষার জন্য পিতামাতাকেই অধিক সচেতন হতে হয়। নৈতিকতার বীজ পারিবারিক মূল্যবোধ থেকেই শিশুর আচরণে বিকশিত হয়। আবার পিতা–মাতার মাধ্যমেই শিশু শিক্ষা জগতে প্রবেশ করে থাকে। কিন্তু শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিবারের এ ভূমিকা বর্তমানে প্রাক প্রাথমিক কিন্ডারগার্টেন কিংবা নার্সারি স্কুলগুলো গ্রহণ করছে। শহরে এ সুযোগ তুলনামূলকভাবে বেশি।

সন্তান উৎপাদন এবং প্রজননের ক্ষেত্রে গ্রামের চেয়ে শহরের পিতা–মাতা অধিক সচেতন।শহরের পিতা–মাতা দুইয়ের অধিক সন্তান নিতে চান না। গর্ভবতী মাকে সন্তান প্রসবে অদক্ষ দাইয়ের পরিবর্তে হাসপাতাল কিংবা ক্লিনিকে প্রেরণের ওপর গুরুত্ব দেন। পরিবারের ভূমিকার এ চিত্র গ্রাম ও শহরভেদে প্রায় একই। চিকিৎসা ক্ষেত্রে একসময় গ্রামের পরিবারগুলো কবিরাজ কিংবা হোমিও চিকিৎসকের ওপর নির্ভরশীল ছিল। এখন এসব পরিবার সরকারি হাসপাতাল কিংবা ক্লিনিকের চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করছে। চিকিৎসা সেবার ক্ষেত্রে শহরের সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে আমরা প্রায় সকলেই জানি।

পরিবারই ছিল একসময়ে ধর্ম শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র। ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতা সম্পর্কে পিতা–মাতা, দাদা–দাদি ও অন্যান্য সদস্য বিভিন্নভাবে শিশুকে অবহিত করেন।

একসময়ে আমাদের দেশে আয়োজিত বিবাহ (settled or arranged marriage) প্রথার প্রচলন ছিল। বিয়ের ক্ষেত্রে অভিভাবকের মতের প্রাধান্য দেওয়া হতো। বর্তমানে এ প্রথার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। বিবাহ অনুষ্ঠানেও অনেক পরিবর্তন এসেছে। বিবাহের ক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকার এ পরিবর্তন গ্রাম ও শহরভেদে পার্থক্য বিদ্যমান। বাল্যবিবাহ ও যৌতুক গ্রহণকে ঘৃণ্য প্রথা হিসেবে জানা সত্ত্বেও গ্রাম ও শহরে এ প্রথার প্রচলন এখনও লক্ষ করা যায়। তবে গ্রাম ও শহরের সচেতন পরিবারগুলো এখন বাল্যবিবাহ ও যৌতুক প্রথাকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করতে শিখেছে। এ সংক্রান্ত আইন সম্পর্কেও সচেতন হয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে গ্রামীণ ও শহর উভয়েরই পরিবার কাঠামোতে নারী অধিকারের প্রতি পুরুষের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। নারীরাও আজ নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠায় অনেক সচেতন। বর্তমানে গ্রাম ও শহরে নয়াবাস পরিবার বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিবারের মধ্যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে এসব পরিবারে বৃদ্ধ পিতা–মাতা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে।

চিত্র ১৩.১ : বিদ্যালয় ও বিনোদন কেন্দ্রে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু

একসময় আমাদের দেশে গ্রাম কিংবা শহরে জন্মগ্রহণকারী বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু, যেমন– বুদ্ধি প্রতিবন্ধী, শ্রবণ প্রতিবন্ধী, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, শারীরিক প্রতিবন্ধী, বহুমুখী প্রতিবন্ধী এবং অটিস্টিক শিশুদের পরিবারের বোঝা ভাবা হতো। বর্তমানে পরিবারের এ মনোভাবে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। উপরের চিত্রটির দিকে লক্ষ কর, এসব শিশুর জন্য

গড়ে ওঠা বিদ্যালয়ে তারা পড়ালেখা করছে এবং বিনোদন কেন্দ্রগুলোতে তারা গান, নাচ ও খেলাধুলা করছে। আবার কোনো কোনো শিশু কারিগরি বিদ্যা ও হাতের কাজে পারদর্শিতা অর্জন করছে। যার কারণে আমাদের দেশের অটিস্টিক শিশুরা আজ শিশু অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে শারীরিক ও মানসিক যোগ্যতার প্রমাণ রাখতে সক্ষম হয়েছে। এসব শিশুর অধিকার বিষয়ে পরিবারের সদস্যগণ অধিক সচেতন। আমরাও বিশেষ চাহিদার ধরন ও মাত্রার ওপর নির্ভর করে বিদ্যালয়, পারিবারিক এবং সামাজিক পরিবেশ পরিবর্তন ও উপযোগী করে তুলব। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু যাতে যথাসম্ভব স্বাধীন ও নিরাপদভাবে নিজের কাজ নিজে করার সুযোগ পায় এমন পরিবেশের ব্যবস্থা করব।

পরিচ্ছেদ ১৩.২ : সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া

জন্মের পর মানব শিশু প্রথমে মায়ের এবং পরবর্তী সময়ে অন্যান্য সদস্যের সংস্পর্শে আসে। পরিবারের সকল সদস্যের আচরণ শিশুর আচরণকে প্রভাবিত করে। এভাবে শিশু পরিবারের বাইরের পরিবেশ, যেমন–খেলার সাথি, পাড়া–প্রতিবেশী, বিদ্যালয়, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন করে। শিশু যে সমাজে বড় হচ্ছে সে সমাজের প্রথা, মূল্যবোধ, রীতি–নীতি, আচার–আচরণ প্রভৃতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করে সমাজের সাথে খাপ খাইয়ে চলতে শেখে এবং সামাজিক মানুষে পরিণত হয়। সুতরাং, যে প্রক্রিয়ায় শিশু ক্রমশ সামাজিক মানুষে পরিণত হয় তাকে সামাজিকীকরণ বলে।

সামাজিকীকরণের ধারণা

সামাজিকীকরণ একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। জন্মের পর হতে মৃত্যু পর্যন্ত বিভিন্ন মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জন ও খাপ খাওয়ানোর প্রক্রিয়াই সামাজিকীকরণ। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যক্তি যখন একপর্যায় হতে আরেক পর্যায়ে প্রবেশ করে তখন তাকে নতুন পরিবেশ ও পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে হয়। এই খাপ খাওয়ানো প্রক্রিয়ার ফলে তার আচরণে পরিবর্তন আসে। নতুন নিয়মকানুন রীতিনীতি এবং নতুন পরিবেশ পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে চলার প্রক্রিয়ার নাম সামাজিকীকরণ।

সামাজিকীকরণের উপাদান

তোমার শ্রেণির একজন সহপাঠী বন্ধুর আচরণ মূলত অন্যদের আচরণকে প্রভাবিত করে এবং অন্যদের ব্যবহার দ্বারা তুমি নিজেও প্রভাবিত হও। আচরণগত এই পারস্পরিক প্রভাবের প্রতিক্রিয়াকে বলে মিথস্ক্রিয়া (interaction)। মানুষের সমাজ জীবনের মূল বিষয়ই হলো এই মিথস্ক্রিয়া। অর্থাৎ ব্যক্তির সামাজিকীকরণ সামাজিক পরিবেশ, সমাজ জীবন ও সামাজিক মূল্যবোধের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে ঘটে থাকে। তাই মানুষের ব্যক্তিত্বের গঠন ও বিকাশে এ উপাদান তিনটির প্রভাব লক্ষ করা যায়।

কাজ

দলীয় : সামাজিক পরিবেশের সাংস্কৃতিক উপাদান চিহ্নিত কর এবং ব্যক্তিজীবনে এর প্রভাবসমূহের একটি ছক তৈরি কর।

একক : ব্যক্তিজীবনে সামাজিকীকরণের উপাদানসমূহের প্রভাব চিহ্নিত কর।

সামাজিক পরিবেশ : যে বিশেষ সমাজব্যবস্থার মধ্যে মানুষ বাস করে তাকে সামাজিক পরিবেশ বলে। সামাজিক পরিবেশের মধ্যেই মানুষ বিকশিত হয়। মানুষের অর্থনৈতিক, মানসিক ও নৈতিক জীবনের উপরও সামাজিক পরিবেশের প্রভাব রয়েছে। সামাজিক পরিবেশের মধ্যে রয়েছে সমাজের প্রচলিত রীতি–নীতি, প্রথা–প্রতিষ্ঠান, বিধি–ব্যবস্থা, সকল প্রকার প্রবণতা, সমস্যা প্রভৃতি। অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, মনস্তাত্ত্বিক ও প্রযুক্তিগত পরিবেশ নিয়েই আমাদের সামাজিক পরিবেশ গঠিত। অর্থনৈতিক পরিবেশ সামাজিক পরিবেশের অংশ। প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ নানাবিধ সেবা ও দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করছে। এর মূলে রয়েছে মানুষের নিজের সুখ–স্বাচ্ছন্দ্য। বাজার, জমিজমা, বাগান, গৃহপালিত পশু, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি অর্থনৈতিক

২০১৫

পরিবেশের উপাদান। তাছাড়া সামাজিক পরিবেশে গড়ে উঠেছে পরিবার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গড়ে ওঠা সংস্কৃতি মানুষের আচরণকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। এগুলো সাংস্কৃতিক পরিবেশের অংশ।

মানুষের সৃষ্টি করা উপাদানসমূহ নিয়ে সাংস্কৃতিক পরিবেশ গঠিত। ঘর-বাড়ি, রাস্তা-ঘাট, আচার-আচরণ, জ্ঞান-বিজ্ঞান সবই সাংস্কৃতিক পরিবেশের অন্তর্গত। মানুষের সামাজিকীকরণে সাংস্কৃতিক পরিবেশের প্রভাবও গভীর। উন্নত সাংস্কৃতিক পরিবেশে মানুষের মানবিক গুণাবলি বিকশিত হয় এবং মনের প্রসারতা বাড়ে।

ঐক্যবদ্ধ জীবন যাপনের কারণে মানুষ সামাজিক জীব হিসেবে স্বীকৃত। ঐক্যবদ্ধ জীবন যাপনের পিছনে রয়েছে মনস্তাত্ত্বিক কারণ। যান্ত্রিক সভ্যতা বিকাশের পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে বলা হয় প্রযুক্তিগত পরিবেশ। এ পরিবেশও সামাজিক পরিবেশকে প্রভাবিত করে। প্রযুক্তিগত আবিষ্কার, যেমন– কম্পিউটার, টেলিভিশন, ইন্টারনেট প্রভৃতি মানুষের আচার-আচরণকে প্রভাবিত করে। তাছাড়া প্রকৃতির উপাদানসমূহও মানুষের জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে।

সমাজ জীবন : সমাজ জীবন সামাজিকীকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। মানুষের সমাজ জীবন মূলত কতকগুলো আচার–আচরণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মানুষ যে সমাজে বসবাস করে, সে সমাজের জীবনধারা অর্থাৎ আচার–আচরণের সমষ্টিই হলো সমাজ জীবন। মানুষ সমাজের নানা কর্মকাণ্ড ও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। এসব কর্মকাণ্ড ও অনুষ্ঠান সংশ্লিষ্ট আচরণের সাথে মানুষ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে মানুষ অন্যের আচরণ অনুকরণ করে কাজ সম্পাদনের চেষ্টা করে। অর্থাৎ অনুকরণ প্রবণতা থেকে মানুষ ভাষা, উচ্চারণ, কথা বলার ধরনসহ নানা বিষয় আয়ত্ত করে থাকে। সমাজ– সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয় ভাষার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। জন্মদিন, বিয়ে, ঈদ, পূজা, বড়দিন, বুদ্ধের জন্মদিন, বিবাহবার্ষিকী প্রভৃতি অনুষ্ঠান সমাজ জীবনে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। সমাজ জীবনের এসব অনুষ্ঠান ব্যক্তির সামাজিকীকরণে প্রভাব ফেলে।

সামাজিক মূল্যবোধ : মূল্যবোধ আমাদের সমাজবদ্ধ জীবনের বৈশিষ্ট্য। মানুষের জীবনধারার মান পরিমাপ করা যায় মূল্যবোধের মাধ্যমে। কেননা, মূল্যবোধ অনুশীলনের মাধ্যমেই সামাজিক বিধি–ব্যবস্থা, আচার–ব্যবহার ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ব্যক্তি আচরণে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সামাজিক মূল্যবোধ হলো সাধারণ সাংস্কৃতিক আদর্শ। এই আদর্শের দ্বারা সমাজের মানুষের মনোভাব, প্রয়োজন ও ভালোমন্দের নীতিগত দিক যাচাই করা যায়।

মানুষ বড় হওয়ার সাথে সাথে সামাজিক মূল্যবোধগুলো শিখে থাকে। সমাজের সকলের সমান সুযোগ-সুবিধা, বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, ছোটদের প্রতি স্নেহ-ভালোবাসা, সত্যবাদিতা, ন্যায়বোধ প্রভৃতি মূল্যবোধগুলো সকল সমাজেই রয়েছে। মানুষ সমাজ থেকে এ মূল্যবোধগুলো অর্জন করে থাকে। গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের সামাজিক মূল্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায় তাদের জীবনধারার মাধ্যমে, যেমন– একজন বাংলাদেশি কিংবা ভারতীয় নাগরিকের মূল্যবোধ চীনাদের মূল্যবোধ থেকে পৃথক। বাংলাদেশি এবং ভারতীয়রা তাদের জীবনধারায় আত্মিক উন্নতি, আধ্যাত্মিকতা, অপরের জন্য স্বার্থত্যাগ প্রভৃতি বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করে। অপরদিকে বৈষয়িক উন্নতি বা সমৃদ্ধিলাভই চীনাদের জীবনধারার মৌলিক বৈশিষ্ট্য। সামাজিক মূল্যবোধ ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে প্রভাবিত করে, যা ব্যক্তির চিন্তা–চেতনা ও আচার–ব্যবহারের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়।

সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা

মানব জীবনে সামাজিকীকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শিশু সামাজিকীকরণের মাধ্যমেই সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পূর্ণতা অর্জন করে।

সমাজের একজন দায়িত্বশীল সদস্যে পরিণত হয়। সমাজ জীবনে আমরা প্রতিনিয়তই কর্তৃত্ববান ব্যক্তিবর্গ, যেমন- বাবা-মা, বড় ভাই-বোন, শিক্ষক দ্বারা প্রভাবিত হই। আবার সমপর্যায়ের বন্ধু-বান্ধব, সহপাঠী ও খেলার সাথি দ্বারাও প্রভাবিত হই। এক্ষেত্রে লক্ষ করলে দেখতে পাব বয়োজ্যেষ্ঠদের সাথে আমাদের সম্পর্ক বাধ্যবাধকতার আর বন্ধুদের সাথে এ সম্পর্ক সহযোগিতার। এই দুই ধরনের সম্পর্কের মাধ্যমেই আমরা শিক্ষা লাভ করি। এভাবে আমরা ছকে উপস্থাপিত পরিবার, প্রতিবেশী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় সমাজ, স্থানীয় গোষ্ঠী, গণমাধ্যম এবং বিনোদনমূলক প্রতিষ্ঠানের সংস্পর্শে আসি। এসব প্রতিষ্ঠান আমাদের সামাজিকীকরণে প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

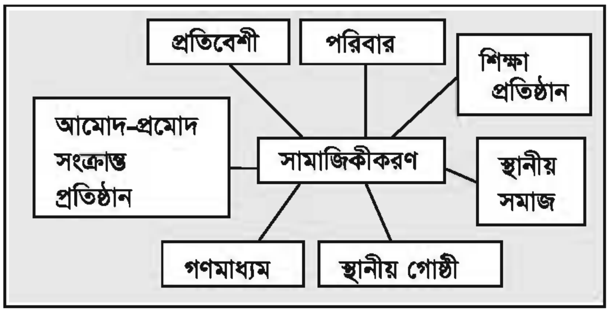

ছক: সামাজিকীকরণের প্রতিষ্ঠান

পরিবার ও পরিবারের সদস্যদের ভূমিকা : পরিবার সামাজিকীকরণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। পরিবারের মধ্যেই সামাজিকীকরণের ক্ষেত্র প্রস্তুত থাকে শিশুর জন্মের আগে থেকেই। বাংলাদেশের পরিবার কাঠামোতে বিভিন্ন ধরনের পরিবার রয়েছে। এ বিষয় আমরা পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে জেনেছি। যে ধরনের পরিবারেই আমরা বেড়ে উঠি না কেন, পারিবারিক জীবনের মধ্যেই আমাদের শৈশব কাটে। স্বাভাবিকভাবেই পারিবারিক জীবনের ভালো দিক এবং মন্দ দিক সবই আমাদের আচরণকে প্রভাবিত করছে। পরিবারের মধ্যেই সামাজিক নীতিবোধ ও নাগরিক চেতনার সূচনা হয়। আমরা সহযোগিতা, সহিষ্ণুতা, সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্ববোধ, ত্যাগ, ভালোবাসা প্রভৃতি গুণগুলো পরিবার থেকেই অর্জন করি। পরিবারের মধ্যে প্রধান যে বিষয়টি শিশুর সামাজিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে তা হলো মা–বাবার মধ্যকার সম্পর্ক। মা–বাবার মধ্যে সুসম্পর্ক শিশুর ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু বিকাশের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। আবার মা–বাবার মধ্যকার দ্বন্দ্ব তাদের মধ্যেও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে।

কাজ

একক : দীপা শহরের মেয়ে। তার সামাজিকীকরণে বিভিন্ন উপাদানের পারস্পরিক প্রভাব চিহ্নিত কর।

দলীয় : গ্রামের পরিবেশে বেড়ে উঠা আসমা। পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান। তার সামাজিকীকরণে বিভিন্ন উপাদানের পারস্পরিক প্রভাব চিহ্নিত কর।

শিশুর সবচেয়ে কাছের মানুষ মা–বাবা। আবার মা–বাবা এ দুজনার মধ্যে অধিকতর কাছের হলেন 'মা'। স্বভাবতই সামাজিকীকরণের সূত্রপাত ঘটে মা হতেই। মা শিশুর খাদ্যাভ্যাস গঠন ও ভাষা শিক্ষার প্রথম মাধ্যম। মা শৈশবে শিশুকে যেসব খাদ্যের প্রতি ঝোঁক সৃষ্টি করবেন, শিশুর পরবর্তী জীবনের আচরণে এর প্রভাব লক্ষ করা যাবে। মায়ের ঘুমপাড়ানি গান, বর্ণ শিক্ষার কৌশল, ছড়া শিক্ষা অনেক বিষয়ই আমরা অতীত অভিজ্ঞতা ও শিখনের ফলথেকে নিজ পরিবারে প্রয়োগ করে থাকি।

আমাদের সমাজের কোনো কোনো পরিবারে বাবা উপার্জন করেন। আবার মা-বাবা উভয়েই উপার্জন করেন। সংসার পরিচালনায় তাদের অনেক নিয়ম-নীতি প্রয়োগ করতে হয়। মা-বাবার আচরণ ও মূল্যবোধ শিশুর সামাজিকীকরণে প্রভাব ফেলে। শিশুর আত্মপ্রত্যয়ী মনোভাব মা-বাবার আত্মপ্রত্যয়ী ব্যক্তিত্বেরই ফল। এভাবে পরিবারের অন্যান্য সদস্য, নিকট আত্মীয়-স্বজনের আচরণও শিশুর আচরণে প্রভাব ফেলে। এসব বিষয় শিশুর মানসিক বিকাশ ও ব্যক্তিত্ব গঠনে সাহায্য করে।

কাজ

একক : শহর সমাজে সর্বত্র প্রতিবেশী দল গড়ে না উঠার কারণ চিহ্নিত কর।

দলীয় : 'শিশুর সামাজিকীকরণে প্রতিবেশী ও প্রতিবেশী দলের প্রভাবই সবচেয়ে বেশি।'–যুক্তি দাও।

জ্ঞাতি-গোষ্ঠী ও প্রতিবেশী : নিজ পরিবার ব্যতীত যাদের সাথে রক্তের সম্পর্ক রয়েছে তারাই আমাদের জ্ঞাতি-গোষ্ঠী। যারা বাড়ির আশপাশে বসবাস করেন তারা হলো আমাদের প্রতিবেশী। শৈশব থেকেই ব্যক্তি জ্ঞাতি-গোষ্ঠী ও প্রতিবেশীদের সংস্পর্শে বড় হতে থাকে। পরিবারের পরেই জ্ঞাতি-গোষ্ঠী ও প্রতিবেশীর অবস্থান। শিশুর জীবনের সুষ্ঠু বিকাশে জ্ঞাতি-গোষ্ঠী ও প্রতিবেশীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের পাশাপাশি বাড়িগুলোতে সমবয়সী শিশুদের মধ্যে প্রতিবেশী দল গড়ে ওঠে। প্রতিবেশী দল থেকে শিশু সহযোগিতা, সহমর্মিতা, ঐক্য, নেতৃত্ব প্রভৃতি গুণাবলি অর্জন করে। প্রতিবেশীদের বিভিন্ন অনুষ্ঠান, যেমন– বিয়ে, জন্মদিন, ঈদ, পূজা, বড়দিন প্রভৃতি অনুষ্ঠানে শিশুরা অংশগ্রহণ করে আনন্দ ফূর্তিতে মেতে ওঠে এবং সহিষ্ণুতা, সহনশীলতা, সম্প্রীতি প্রভৃতি গুণাবলি অর্জন করে। প্রতিবেশীর যে কোনো অনুষ্ঠানে পরিবারের সকল সদস্য অংশগ্রহণ করে, যেমন– জন্মদিন, বিয়ে, বিবাহবার্ষিকী প্রভৃতি। আবার কেউ অসুস্থ হলে নিকট আত্মীয়ের চেয়ে প্রতিবেশীই বেশি ভূমিকা পালন করে। প্রতিবেশীই সুখ-দুঃখের প্রথম অংশীদার।

গ্রাম ও শহরভেদে প্রতিবেশীর সম্পর্ক ভিন্ন হয়। গ্রামীণ সমাজে প্রতিবেশীর সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়। এ সম্পর্কে তেমন কৃত্রিমতা থাকে না। শহরে প্রতিবেশীর সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ নয়। তবে আনন্দ–উৎসবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে অনেকটা আপন হয়ে যায়। প্রতিবেশীরাই প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে সমাজ স্বীকৃত আচরণ মেনে চলার শিক্ষা দিয়ে থাকে। এজন্য প্রয়োজন ভালো প্রতিবেশী।

বিদ্যালয় ও সহপাঠী : পরিবারের পর শিশুর সামাজিকীকরণে বিদ্যালয় ও সহপাঠীর প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যালয় শিশুর সামাজিকীকরণের আনুষ্ঠানিক মাধ্যম। জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি শিশুরা কতকগুলো সামাজিক আদর্শ বিদ্যালয় থেকে শিখে থাকে। এই আদর্শগুলোর মধ্যে রয়েছে–শৃঙ্খলাবোধ, নিয়মানুবর্তিতা, শ্রদ্ধাবোধ, সহযোগিতা, পারস্পরিক ভালোবাসা প্রভৃতি। শিশু বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষক, সহপাঠী, কর্মচারী, বিদ্যালয়ের পরিবেশ, প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যবোধ প্রভৃতির সংস্পর্শে আসে। এসব উপাদান শিশুর আচরণকে প্রভাবিত করে। শিশুমনে নেতৃত্ব, অন্যের মতের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, ঐক্য, দেশপ্রেমবোধ, সহমর্মিতা, সহিষ্ণুতা, সম্প্রীতিবোধ প্রভৃতি জাগ্রত হয়। বিদ্যালয় শিক্ষার্থীকে পরবর্তী স্তরের শিক্ষাগ্রহণ কিংবা কর্মজগতের জন্য উপযোগী করে তোলে। সমাজের অনুমোদিত আদব-কায়দা, আচার-আচরণ, মূল্যবোধ প্রভৃতি শিশু বিদ্যালয় থেকেই শেখে। পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তুও শিক্ষার্থীর আচরণকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। সততা, ন্যায়পরায়ণতা, ভালো-মন্দের বিচারবোধ প্রভৃতিও শিশু বিদ্যালয় হতে শেখে। সুতরাং শিশুর সুষ্ঠু সামাজিকীকরণে বিদ্যালয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। বিদ্যালয়ের পরিবেশ, শিক্ষকের মূল্যবোধ ও আচরণ শিক্ষার্থীর সুষ্ঠু সামাজিকীকরণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

কাজ

দলীয় : তোমাদের জীবনে অন্তরঙ্গ বন্ধুদলের প্রভাব চিহ্নিত কর।

একক : শিক্ষার্থীর সুষ্ঠু সামাজিকীকরণে বিদ্যালয়ের প্রভাব চিহ্নিত কর।

শিশুর সুষ্ঠু সামাজিকীকরণে খেলা ও পড়ার সঙ্গী সাথির ভূমিকা রয়েছে। এদের মাধ্যমেই সহযোগিতা, সহনশীলতা, সহমর্মিতা, নেতৃত্ব প্রভৃতি গুণাবলি বিকশিত হয়। এই সঙ্গী–সাথির মধ্যে কখনো কখনো সমস্যা বা দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এর মধ্য দিয়ে শিশুরা সমস্যার সমাধান ও দ্বন্দ্ব নিরসন কৌশল আয়ত্ত করে। খেলা ও পড়ার সঙ্গী সাথিদের মাধ্যমে শিশু নিজের আচরণের ভালো-মন্দ দিকের প্রশংসা বা সমালোচনা শুনতে পায়। এ ধরনের সমালোচনা থেকে শিশু সমাজের কাঙ্ক্ষিত আচরণ করতে শিক্ষা গ্রহণ করে। সমবয়সী শিশুদের আচার–আচরণ প্রায় একই প্রকৃতির। এদের রয়েছে বিশেষ মূল্যবোধ, শৃঙ্খলা ও রীতি-নীতি। এ কারণে সমবয়সী বন্ধুদলকে বলে 'অন্তরঙ্গ বন্ধুদল' (Peer Group)। শৈশব ও কৈশোরে এই সঙ্গী সাথি দলের পারস্পরিক আচরণিক প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ। এ দলের প্রভাবে শিশু সমাজস্বীকৃত মূল্যবোধ গ্রহণ করতে পারে। আবার সমাজের খারাপ দিকগুলোও গ্রহণ করতে পারে। তবে এক্ষেত্রে পরিবারের সদস্য, শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে সচেতন হতে হবে।

স্থানীয় সমাজ বা সম্প্রদায় : স্থানীয় সমাজ বা সম্প্রদায় সামাজিকীকরণের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। সমাজের মধ্যে শিশু ধীরে ধীরে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়। স্থানীয় সমাজ নির্দিষ্ট অঞ্চল ও স্থানীয়ভাবে গড়ে ওঠে। এ সমাজের রয়েছে বিশেষ মূল্যবোধ, যা স্থানীয়ভাবে গড়ে ওঠা মূল্যবোধের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে। এ সমাজের মানবগোষ্ঠী, সামাজিক পরিবেশ, প্রতিষ্ঠান শিশুর আচরণকে প্রভাবিত করে। এছাড়া স্থানীয় সমাজের মূল্যবোধ ব্যক্তি জীবনকে প্রভাবিত করে। কোনো কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের ভাষা, আচরণ ব্যক্তির আচরণে প্রতিভাত হতে দেখা যায়। এই সমাজের মানবগোষ্ঠীর মধ্যে স্বজাত্যবোধের প্রকাশ ঘটে।

স্থানীয় গোষ্ঠী : গোষ্ঠী বা দল হলো অনেক ব্যক্তির সমষ্টি, যাদের মধ্যে এক বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। একটা সাংগঠনিক কাঠামোতে পরস্পরের মধ্যে সম্পর্কযুক্ত মানবগোষ্ঠীই হলো সামাজিক গোষ্ঠী। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে রাজনৈতিক দল, শ্রমিক সংঘ, সাংস্কৃতিক ক্লাব, সাহিত্য ক্লাব প্রভৃতি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। যেকোনো সামাজিক গোষ্ঠীর শিশু পরিবার থেকে প্রতিবেশী দলে এবং পরবর্তী সময়ে বিদ্যালয় পেরিয়ে স্থানীয় গোষ্ঠীর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে। স্থানীয়ভাবে গড়ে ওঠা গোষ্ঠী বা সংঘ ব্যক্তির সামাজিকীকরণে প্রভাব বিস্তার করে। গোষ্ঠীগুলো স্থানীয়ভাবে ক্রীড়া, সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান প্রভৃতি ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। শৈশব হতেই শিশু এসব গোষ্ঠীভুক্ত সংগঠনের সদস্যদের সাথে আমোদ-প্রমোদ, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে মেতে ওঠে; যা তাদের সুষ্ঠু সামাজিকীকরণে প্রভাব ফেলে। শিশু হয়ে ওঠে সংস্কৃতিমনা, সাহিত্যপ্রেমী, ক্রীড়ামোদী ও বিজ্ঞানমনস্ক।

কাজ

দলীয় : 'সম্প্রীতির শিক্ষা আমরা অর্জন করি জাতি–ধর্ম–বর্ণের সর্বজনীন ধর্মোৎসবে অংশগ্রহণেরই মাধ্যমে।'–যুক্তি উপস্থাপন কর।

একক : তোমার সামাজিকীকরণে নিজ ধর্মের ধর্মানুষ্ঠানের প্রভাব চিহ্নিত কর।

একক : তোমার সামাজিকীকরণে যে কোনো স্থানীয় গোষ্ঠীর প্রভাব চিহ্নিত কর।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান : শিশুর সামাজিকীকরণে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ। শিশু তার পিতা–মাতা ও অন্যান্য আত্মীয়–স্বজনকে মসজিদ, মন্দির, গির্জা ও প্যাগোডাতে ধর্মীয় আচার–অনুষ্ঠান সম্পাদন করতে দেখে। শিশু-কিশোরেরা পরিবারে অন্যদের ধর্মীয় আচরণ যেমন– কোরান শরিফ, শ্রীমদ্‌ভগবদগীতা, বাইবেল এবং ত্রিপিটক পাঠ করতে দেখে ও শোনে। এসব বিষয় শিশুর ভবিষ্যৎ ধর্মীয় জীবনকে প্রভাবিত করে। ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা– ইসলাম ধর্মের দুটি প্রধান ধর্মীয় উৎসব। এসব উৎসবের নানা কার্যক্রম শিশুমনে ধর্মানুভূতির পাশাপাশি ঐক্য, সংহতি ও সম্প্রীতির শিক্ষা দেয়। মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ কমিয়ে দেয়। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিশু-কিশোরদের সামাজিক মূল্যবোধ ও ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয়। বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগে অনুপ্রাণিত করে।

হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টধর্মের রয়েছে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। এসব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কার্যক্রমে শিশু-কিশোরেরা অংশগ্রহণ করে। এসব প্রতিষ্ঠানের ধর্মীয় অনুষ্ঠান শিশু মনে গভীর রেখাপাত করে। তাদের বাহ্যিক আচার–ব্যবহারকে সংযত করে এবং নৈতিক উন্নতি সাধন করে। এসব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ব্যক্তির বিবেকবোধ ও চেতনাকে জাগ্রত করে। পারস্পরিক বন্ধন সুদৃঢ় করে। সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বাড়িয়ে তোলে। শিশু–কিশোরদের নৈতিকতা বিকাশে সহায়তা করে। সম্প্রীতির শিক্ষা মনের সংকীর্ণতাকে দূরীভূত করে।

গণমাধ্যম : বৃহৎ জনগোষ্ঠীর নিকট সংবাদ, দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতির বিষয়বস্তু, বিশেষ ধ্যান–ধারণা, বিনোদন প্রভৃতি পরিবেশন করার মাধ্যমই গণমাধ্যম। আধুনিক যুগের সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে গণমাধ্যমকে কেন্দ্র করে। গণমাধ্যমগুলোর মধ্যে রয়েছে সংবাদপত্র, বেতার, চলচ্চিত্র, টেলিভিশন প্রভৃতি। সংবাদপত্রে দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, অর্থনীতিসহ বিভিন্ন বিষয়বস্তুর ওপর সংবাদ প্রকাশিত হয়। শিশু–কিশোরেরা এসব পাঠ করে মনের খোরাক

পূরণ করে। নিজেকে সমাজ–সংস্কৃতির সাথে খাপ খাইয়ে চলতে শেখে। জীবন–জগৎ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ধ্যান–ধারণায় অনুপ্রাণিত হয়। বেতার আমাদের শিক্ষা ও আনন্দ দান করে। বেতারের মাধ্যমে আমরা সংবাদ, গান–বাজনা, নাটক–নাটিকা, শিক্ষামূলক আলোচনা, কথিকা, খেলাধুলা, আবহাওয়া সম্পর্কে অবহিত হই। সুতরাং বেতার ব্যক্তি জীবন ও সামাজিক জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। টেলিভিশনে প্রচারিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান ব্যক্তির জীবনে প্রভাব ফেলে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যক্তির সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। সে বিজ্ঞানমনস্ক হয়ে ওঠে। তার মানসিক স্বাস্থ্য বিকশিত হয়। সামাজিক ও জীবনঘনিষ্ঠ চলচ্চিত্র ব্যক্তির ব্যক্তিত্বে গভীর প্রভাব ফেলে। সামাজিক চলচ্চিত্রের অনেক চরিত্র ব্যক্তির আচরণকে প্রভাবিত করে। বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শিক্ষা দেয়। সামাজিক অনেক ক্ষেত্রে আমাদের সচেতন করে।

কাজ

একক : টেলিভিশনে প্রচারিত যে কোনো একটি অনুষ্ঠানের (যেমন– কৃষি সমাচার) প্রভাব চিহ্নিত কর।

একক : শিশুর সামাজিকীকরণে শিশু–কিশোরদের উপর প্রচারিত একটি সংবাদের প্রভাব লেখ।

বাংলাদেশের গ্রাম ও শহর সমাজে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া

গ্রাম ও শহর সমাজ মিলেই বাংলাদেশের বৃহত্তর সমাজ কাঠামো গড়ে উঠেছে। গ্রাম প্রধান দেশের অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বাস করে। এদেশের অধিকাংশ মানুষের সামাজিকীকরণ ঘটে গ্রামীণ পরিবেশে। গ্রামীণ পরিবেশে শিশুর সামাজিকীকরণ ও শহরে পরিবেশের বেড়ে ওঠা শিশুর সামাজিকীকরণে পার্থক্য রয়েছে।

বাংলাদেশের গ্রাম সমাজ কাঠামোর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো– একক ও যৌথ পরিবার কাঠামো, কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি, পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা, সহজ–সরল জীবন যাপন, জীবনযাত্রায় সামাজিক প্রথা ও লোকাচারের প্রভাব প্রভৃতি। তাছাড়া এ সমাজ কাঠামোতে দেখা যায় প্রতিবেশীসুলভ আচরণ, ধর্মীয় আচার–আচরণের প্রতি গভীর মনোযোগ। দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও রক্ষণশীলতা এ সমাজ কাঠামোর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। গ্রামের শিশু–কিশোরেরা এ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পরিবেশেই বড় হতে থাকে। ক্রিয়া–প্রতিক্রিয়া করে এ সমাজ জীবনের বিভিন্ন উপাদানের সাথে। এসব ব্যক্তির সামাজিকীকরণকে প্রভাবিত করে।

বাংলাদেশের শহর সমাজ কাঠামোর বৈশিষ্ট্য হলো: একক পরিবার কাঠামো, শিল্পভিত্তিক অর্থনীতি, জটিল সমাজ জীবন, শহরের সংস্কৃতি ও মানুষের মধ্যে সামাজিক সম্পর্কের দূরত্ব প্রভৃতি। পরিবেশের এরূপ বিভিন্ন উপাদানের সাথে ব্যক্তির আচরণিক ক্রিয়া–প্রতিক্রিয়া ঘটে। এসব কিছু ব্যক্তির সামাজিকীকরণকে প্রভাবিত করে।

গ্রাম ও শহর সমাজে ব্যক্তির সামাজিকীকরণের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য

বাংলাদেশের গ্রাম ও শহর উভয় সমাজে ব্যক্তির সামাজিকীকরণে কতকগুলো সাদৃশ্যপূর্ণ উপাদান প্রভাব বিস্তার করে। এ উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে– পরিবার, প্রতিবেশী, অন্তরঙ্গগোষ্ঠী, আত্মীয়–স্বজন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, বিনোদন ও খেলাধুলার সংঘ প্রভৃতি।

গ্রাম ও শহর উভয় সমাজেই শিশু লালিত–পালিত হয় পরিবারে। পরিবারেই শিশুর শৈশব কাটে। স্বভাবতই পারিবারিক জীবনের যাবতীয় কার্যকলাপের প্রভাব শিশুর পরবর্তী জীবনে ব্যাপকভাবে প্রতিফলিত হয়। উভয় সমাজ ব্যবস্থার প্রতি পরিবারের যে সাধারণ মনোভাব থাকে তা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত শিশুর মনের ওপর গভীর রেখাপাত করে। শিশু পরিবারের মধ্যে কথা ও ভাষা শেখে, অনুকরণ করে পরিবারের সদস্যদের আচার–আচরণ, অঙ্গীভূত করে পরিবারের বিভিন্ন উপাদান। পরিবারের মাধ্যমেই সে নীতিবোধ, নাগরিক চেতনা, সহিষ্ণুতা, সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্ববোধ, আত্মত্যাগ, ভালোবাসা প্রভৃতি শিক্ষা নিয়ে সামাজিক হয়ে গড়ে ওঠে।

বাংলাদেশের গ্রাম ও শহর উভয় পরিবেশেই প্রতিবেশী এবং প্রতিবেশী দল রয়েছে। গ্রামের শিশু–কিশোর বয়োজ্যেষ্ঠ প্রতিবেশীদের সাথে ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবন্ধ থাকে, যা সামাজিকীকরণে বিশেষ প্রভাব ফেলে। তবে শহরের পরিবেশে প্রতিবেশীর সাথে এরূপ সম্পর্ক দেখা যায় না। আত্মীয়–স্বজনের সাথে সম্পর্ক শহরের তুলনায় গ্রামে বেশি। সহপাঠী এবং অন্তরঙ্গা বন্ধুদের সাথে সম্পর্ক শহরের তুলনায় গ্রামে স্বতঃস্ফূর্ত ও আন্তরিক। এ অন্তরঙ্গা বন্ধু দলের মাধ্যমে শিশু সহযোগিতা, মানসিক দ্বন্দ্ব নিরসন কৌশল ও নীতিজ্ঞান লাভ করে থাকে। তাছাড়া সাংস্কৃতিক জীবনের বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান শিশু–কিশোরেরা অন্তরঙ্গা বন্ধু দলের মধ্য থেকে অর্জন করে।

বিদ্যালয়ের পরিবেশ, পাঠ্যবই এবং বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে শিক্ষার্থীর সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। পরিবারের গণ্ডি অতিক্রম করে শিশু এক সময় বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে, স্বভাবতই তখন তার ভূমিকার বিস্তৃতি ঘটে। এ বৃহত্তর পরিমণ্ডলে তার ভূমিকা ও নেতৃত্ব নিয়ন্ত্রিত হয়। এ পরিবেশে বিকশিত হয় শিক্ষার্থীর নিজস্ব গুণাগুণ, যোগ্যতা ও ক্ষমতা। শিক্ষার্থীর ওপর বিদ্যালয় পরিবেশ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন উপাদানের প্রভাব শহর ও গ্রামভেদে পার্থক্য সূচিত হয়।

কাজ

দলীয় : শিশুর জীবনে গ্রাম ও শহরভেদে বিদ্যালয়ের প্রভাবের তুলনা কর।

শহর জীবনে শিশুর সামাজিকীকরণের প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করে সমাধানের পদক্ষেপ সমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

বাংলাদেশে শহরে কিন্ডারগার্টেন, আন্তর্জাতিক স্কুল, প্রি–ক্যাডেটসহ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের স্কুল রয়েছে। এসব স্কুলের অধিকাংশেই সহশিক্ষামূলক কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয় না। নেই খেলার মাঠ, বাগান, পুকুরসহ অন্যান্য অনেক উপাদান। উদ্‌যাপিত হয় না বিদ্যালয় বিতর্ক এবং বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস। এসব কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে না পারায় শিক্ষার্থীর আচরণিক পরিবর্তন ব্যাহত হয়। তবে গ্রামের স্কুলগুলোতে সহশিক্ষা কার্যক্রমের উপাদানের ঘাটতি কম।

ব্যক্তির কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ ও অভিজ্ঞতা সামাজিকীকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। ব্যক্তিমাত্রই শিক্ষা অর্জন শেষে কোনো না কোনো পেশা বেছে নেয়। শহরের পেশাগত ক্ষেত্র গ্রাম থেকে আলাদা। ব্যক্তির সামাজিকীকরণে এই উভয় পরিবেশে পার্থক্য সূচিত হয়। তাছাড়া গ্রামীণ ও শহুরে সমাজে রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক আদর্শ, সংস্কার, বিশ্বাস, মূল্যবোধ, খাদ্যাভ্যাস, প্রথা–প্রতিষ্ঠান ও সমাজ কাঠামো। এসব কিছুই ব্যক্তির সামাজিকীকরণে প্রভাব ফেলে।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. ‘পরিবার’ ধারণাটি ব্যাখ্যা কর।

২. আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় পিতৃবাস পরিবার অধিক থাকার কারণ চিহ্নিত কর।

৩. অন্তর্গোত্র পরিবার ব্যবস্থার পরিবর্তনের কারণ কী? ব্যাখ্যা কর।

৪. তোমার সামাজিকীকরণে বিদ্যালয়ের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন :

১. পরিবারের অর্থনৈতিক কাজ উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

২. তোমার পরিবারের কার্যাবলির মধ্যে কোন কাজগুলো অর্থনৈতিক কাজ ব্যাখ্যা কর।

৩. তোমার গ্রামে যে ধরনের পরিবার দেখা যায় তা ব্যাখ্যা কর।

৪. ‘ব্যক্তির সামাজিকীকরণে খেলার সাথির ভূমিকা অধিক তাৎপর্যপূর্ণ।’– বিশ্লেষণ কর।

৫. গ্রাম ও শহরে বসবাসকারী দুই ছাত্রের সামাজিকীকরণের বৈসাদৃশ্য তুলে ধর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. স্বামী–স্ত্রীর সংখ্যার ভিত্তিতে পরিবারের ধরন কয়টি?

ক. ২

খ. ৩

গ. ৬

ঘ. ৭

২. বাংলাদেশে যৌথ পরিবার ব্যবস্থা ভেঙে যাওয়ার কারণ হলো–

i. দারিদ্র্য ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি

ii. শিল্পায়ন ও নগরায়ণ

iii. নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

৩. কর্তৃত্বের ভিত্তিতে পরিবারের ধরন নিচের কোনটি?

একক, যৌথ বর্ধিত	পিতৃপ্রধান মাতৃপ্রধান	পিতৃসূত্রীয় মাতৃসূত্রীয়	এক পত্নীক বহু পত্নীক
১	২	৩	৪

ক. ১ খ. ২ গ. ২ ও ৩ ঘ. ৩ ও ৪

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

রোকসানা ও রহিমদের পরিবারে পাঁচজন সদস্য। রহিমই তার পরিবারের সকল কাজের সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণ ও মতামত প্রদান করেন। অন্যদিকে ইদংপ্রু ও মংপ্রুর পরিবারেও পাঁচজন সদস্য। ইদংপ্রুই তার পরিবারের সকল সিদ্ধান্ত নেন।

৪. রোকসানা ও রহিমদের পরিবারটি কোন ধরনের পরিবার?

ক. মাতৃপ্রধান

খ. পিতৃপ্রধান

গ. একক

ঘ. বর্ধিত

৫. রোকসানার পরিবারের সাথে ইদংপ্রু ও মংপ্রুর পরিবারের ধরনের বৈশিষ্ট্যগত মিল কোথায়?

ক. আকারগত

খ. বংশমর্যাদাগত

গ. ক্ষমতা ও কর্তৃত্বে

ঘ. উত্তরাধিকার সম্পর্কিত

সৃজনশীল প্রশ্ন :

১. রিপা বিদিতার পাশের ফ্ল্যাটে থাকে। সে বিদিতার বাসায় আত্মীয়-স্বজনসহ বেড়াতে এলে বিদিতা তাদের যত্নসহকারে আপ্যায়ন করে। একদিন রিপা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে। রিপার বাবা-মা তখন বাসায় ছিলেন না। বিদিতার বাবা-মা রিপাকে হাসপাতালে নিয়ে যান। রিকশা দুর্ঘটনায় বিদিতার পা ভেঙ্গে গেলে রিপা হাসপাতালে এক সপ্তাহ অবস্থান করে তাকে সেবা দিয়ে সুস্থ করে তোলে। বিদিতার জন্মদিনে রিপার পরিবার উপহারসহ বিদিতার বাসায় আসে।

ক. কর্তৃত্বের ভিত্তিতে পরিবার কয় ধরনের?

খ. পরিবারকে আয়ের একক বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।

গ. বিদিতার আচরণে সামাজিকীকরণের কোন উপাদানের প্রভাব লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. শহুরে জীবনে প্রতিবেশীরাই ঘনিষ্ঠজন-তুমি কি এ বক্তব্যের সাথে একমত? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

২. তাহসান ও মাহি একটি বেসরকারি ব্যাংকে কর্মরত। বিয়ে করে তারা একসাথে একটি ফ্ল্যাটে বসবাস করছেন। তাহসান ও মাহির একমাত্র সন্তান মুনা গৃহপরিচারিকার সাথেই সময় কাটায়। মাহি ও তাহসান কাজ শেষে যখন বাসায় ফেরেন, মুনা তখন ঘুমিয়ে থাকে। আবার তারা যখন কর্মস্থলে যান মুনা তখনও ঘুমিয়ে থাকে। বাবা-মা কেউ মুনাকে সময় দিতে পারেন না। কিছুদিন পর তাহসান ও মাহি লক্ষ করেন মুনার কথা ও আচরণ অনেকটা গৃহপরিচারিকার মতো। এই নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রায়ই দ্বন্দ্ব হয়। একে অপরকে দোষারোপ করেন। তাহসান বলেন,'মা-ই সকল শিশুর জীবনাদর্শ।' উত্তরে মাহি বলেন, 'সন্তানের ক্ষেত্রে পিতা-মাতা উভয়েরই দায়িত্ব সমান।'

ক. গণমাধ্যম কী?

খ. 'সামাজিকীকরণ একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া।'- ব্যাখ্যা কর।

গ. মুনার আচরণ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ঘটনায় বর্ণিত পরিবারটির প্রভাব ব্যাখ্যা কর।

ঘ. মাহির উক্তিটি অনুচ্ছেদের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

পঞ্চদশ অধ্যায়

বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তন

সমাজ পরিবর্তনশীল। বাংলাদেশের সমাজও এ বৈশিষ্ট্যের ব্যতিক্রম নয়। স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে এদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। শিক্ষা, প্রযুক্তি ও যোগাযোগের পরিবর্তন এদেশের সমাজ ও অর্থনীতিকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়েছে। ব্যাপক শিল্পায়ন ও নগরায়ণ নারীর ভূমিকায় পরিবর্তন এনে দিয়েছে। সমাজ জীবনের এ পরিবর্তনে একদিকে যেমন পুরাতন সমস্যাগুলো জটিল রূপ ধারণ করছে, অন্যদিকে তেমনি নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব ঘটেছে। এ অধ্যায়ে আমরা সামাজিক পরিবর্তনের ধারণা, বাংলাদেশের সমাজ পরিবর্তনের কারণ, গ্রাম ও শহরভেদে এ পরিবর্তনের প্রভাব এবং নারীর ভূমিকার পরিবর্তন সম্পর্কে জানব।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা –

- সামাজিক পরিবর্তনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশের সমাজ পরিবর্তনের উপাদানসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশের গ্রামীণ ও শহুরে সমাজে সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব,
- বাংলাদেশের সমাজ পরিবর্তনের উপাদান হিসেবে শিল্পায়ন, নগরায়ণ, শিক্ষা, প্রযুক্তি ও যোগাযোগের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব,
- সামাজিক পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বাংলাদেশে নারীর ভূমিকার পরিবর্তন ব্যাখ্যা করতে পারব,
- সামাজিক পরিবর্তনজনিত অবস্থার নিজেকে খাপ খাওয়াতে সক্ষম হব;
- সামাজিক পরিবর্তনজনিত বিষয়ে সচেতন হব।

সামাজিক পরিবর্তনের ধারণা

সামাজিক পরিবর্তন বলতে সমাজ কাঠামো ও এর কার্যাবলির পরিবর্তনকে বোঝায়। প্রতিটি সমাজের মৌল কাঠামো গড়ে উঠে সে সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থা এবং উক্ত ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন পেশার মানুষের সম্পর্কের মাধ্যমে। আবার এই কাঠামোর সাথে গড়ে ওঠে কতকগুলো উপরি কাঠামো, যেমন– আইন–কানুন, রাজনীতি, সংস্কৃতি প্রভৃতি। সুতরাং সমাজের মৌল ও উপরি কাঠামোর পরিবর্তনই সামাজিক পরিবর্তন।

সামাজিক পরিবর্তনের ধারণা সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানী কিংসলে ডেভিস বলেন, 'সামাজিক পরিবর্তন হচ্ছে সামাজিক সংগঠনের মধ্যকার পরিবর্তন'। ম্যাকাইভার বলেন, 'মানবীয় সম্পর্কের পরিবর্তন হচ্ছে সামাজিক পরিবর্তন'। অর্থাৎ সামাজিক পরিবর্তন হলো সমাজে বসবাসকারী ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠানের আচার–আচরণের পরিবর্তন। সমাজের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পরিবর্তন। মোটকথা, সামাজিক পরিবর্তন হচ্ছে কোনো জাতির জীবন ব্যবস্থায় সামগ্রিক পরিবর্তন।

সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত হয় কখনো মন্থর গতিতে আবার কখনো দ্রুতগতিতে। এই পরিবর্তনের প্রভাব অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মীয় মূল্যবোধ এমনকি সনাতন জীবন ব্যবস্থাকেও গভীরভাবে স্পর্শ করে। সমাজের সৃজনশীল কর্মকাণ্ড লাভ করে নতুন গতি। উন্মুক্ত হয় জ্ঞান–বিজ্ঞানের নতুন নতুন শাখা ও কলাকৌশল। সৃষ্টি হয় নতুন সৃষ্টির উন্মাদনা এবং শুরু হয় নতুন সমাজ গঠনের প্রক্রিয়া।

বাংলাদেশের সমাজ পরিবর্তনের উপাদান এবং এর প্রভাব

বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তন দেশের আর্থ–সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা, ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রভৃতি উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হয়। সমাজের এ ক্ষেত্রসমূহে পরিবর্তনের মূলে রয়েছে সুনির্দিষ্ট কতকগুলো উপাদান। নিম্নে এ উপাদানগুলো আলোচনা করা হলো।

১. প্রাকৃতিক উপাদান : বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতিগত অবস্থান সামাজিক পরিবর্তনের একটি উল্লেখযোগ্য কারণ। ধীর এবং আকস্মিক ভৌগোলিক পরিবর্তন, জলবায়ু সংক্রান্ত পরিবর্তন, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন প্রভৃতি বাংলাদেশের মানুষের জীবনযাত্রার ওপর প্রভাব ফেলে এবং সমাজের ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করে। এদেশে নদীভাঙন, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, টর্নেডো, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেন প্রতিদিনের ঘটনা। এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করে। তখন পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধানের জন্য নতুন পদ্ধতি অবলম্বনের প্রয়োজন দেখা দেয়। এর ফলে মানুষের মধ্যে সামাজিক সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটে থাকে, যেমন– নদীভাঙন এ দেশের শহরাঞ্চলে বস্তি সৃষ্টির একটি অন্যতম কারণ। শহরাঞ্চলে বস্তি সমস্যা নানামুখী সমস্যার জন্ম দিয়েছে। এ সমস্যা সমাধানে সরকারি ও বেসরকারি বহু কার্যক্রম গ্রহণ করায় শহুরে সমাজে নানা পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এভাবে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয় নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি করে। মানুষ এসব সমস্যা মোকাবিলায় নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণ করে সমাজের পরিবর্তন সাধন করে।

২. জৈবিক উপাদান : জৈবিক উপাদান সামাজিক পরিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। জন্ম ও মৃত্যুহার, গড় আয়ু, জনসংখ্যার ঘনত্ব, জনসংখ্যার প্রকৃতি ও জীবনযাত্রার মান নিয়েই জৈবিক উপাদান। মানুষের জৈবিক অবস্থার পরিবর্তন, যেমন– জনসংখ্যা বৃদ্ধি বা হ্রাস, স্থানান্তর অথবা ঘনত্বের পরিবর্তন সামাজিক পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমাদের দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রতিরোধে জন্মনিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হচ্ছে। জন্ম ও মৃত্যুহার হ্রাস সমাজকাঠামো পরিবর্তনে অবদান রাখছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বেকারত্ব, শিশুশ্রম ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে তীব্র প্রতিযোগিতার মতো নানামুখী সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

কাজ

দলীয় : দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রার ওপর প্রাকৃতিক উপাদানের প্রভাব ও পরিবর্তনসমূহ চিহ্নিত কর।

একক : যে কোনো একটি জৈবিক উপাদান চিহ্নিত কর এবং সমাজে এর প্রভাব বিশ্লেষণ কর।

৩. সাংস্কৃতিক উপাদান : সংস্কৃতি সামাজিক পরিবর্তন সূচনা করে। যে কোনো সমাজের দিকে তাকালেই দেখা যাবে বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতি, মানুষের মূল্যবোধের পার্থক্য, উদ্দেশ্য ও আদর্শের ভিন্নতা প্রভৃতি। এরই ফলে সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন সংস্কৃতি লালিত প্রতিষ্ঠান। এসব সমাজের মধ্যে নানা রকমের পরিবর্তন সৃষ্টি করে, যেমন– ব্রিটিশ রাজত্বের সময় বাংলার সমাজব্যবস্থার উপরে বিদেশি সংস্কৃতির প্রভাব বিশেষভাবে পরিদৃষ্ট হয়। তাছাড়া ভ্রমণকাহিনী পাঠ, বিদেশ ভ্রমণ, অন্যান্য দেশের জনগণের সঙ্গে সাক্ষাৎকার এসবই সামাজিক পরিবর্তন নিয়ে আসে। হযরত মুহম্মদ (সা.), গৌতমবুদ্ধ, যীশুখ্রিস্ট প্রমুখ মহামানব মানুষের সামনে তুলে ধরেছিলেন নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, নতুন মূল্যবোধ, নতুন আদর্শ, যা সে সময়ে সমাজে নানামুখী পরিবর্তন সূচনা করেছিল। বাংলাদেশের শহরগুলোর দিকে তাকালেও বোঝা যায় একাধিক সংস্কৃতির মিশ্ররূপ।

৪. শিক্ষা : সামাজিক পরিবর্তনের একটি বিশেষ উপাদান হলো শিক্ষা। শিক্ষা হলো একধরনের সংস্কার সাধন ও বিরামহীন প্রক্রিয়া। সমাজের সদস্যদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার আত্মবিশ্বাস ও বিচার–বিবেচনার ক্ষমতা জাগ্রত করে। শিক্ষা যাবতীয় অন্ধত্ব, অজ্ঞতা, কুসংস্কার প্রভৃতি থেকে মুক্তি দেয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে বাংলাদেশের সমাজে নারী শিক্ষার প্রসার জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করেছে যা তাদের বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলন পরিচালনায় উদ্বুদ্ধ করেছে। এর ফলে দেশে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় সৃষ্টি হয়েছে বহু সামাজিক নীতি ও আইন। যৌতুক আইন, পারিবারিক আইন, নারী উন্নয়ন নীতি প্রভৃতি সামাজিক সচেতনতার ফসল। নারী শিক্ষা নারীকে কর্মমুখী করেছে। এতে নারীর ক্ষমতায়ন ঘটেছে। এভাবে বিজ্ঞান শিক্ষা, বাণিজ্য শিক্ষা প্রভৃতি সমাজে পরিবর্তন এনেছে।

৫. প্রযুক্তি : প্রযুক্তি হলো বিজ্ঞানের প্রায়োগিক দিক। প্রযুক্তির প্রচলন ও প্রসারের মাধ্যমে সমাজ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গের মানসিক গঠন এবং সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন সাধিত হয়। দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যায় যে বেতারের আবিষ্কার সামাজিক জীবনে আমোদ–প্রমোদের ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা, রাজনীতি এবং অন্যান্য আরও বহু ধরনের সামাজিক কাজকে প্রভাবিত করেছে। মোটর গাড়ি আজ সামাজিক সম্পর্কের পরিধিকে বিস্তৃত করেছে। প্রযুক্তির ক্রমোন্নতিতে আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় দু'ধরনের ফলাফল দেখতে পাই। একটি প্রত্যক্ষ এবং অপরটি পরোক্ষ। কতকগুলো সামাজিক পরিবর্তন প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম, যেমন–শ্রমিকের নতুন নতুন সংগঠন, সামাজিক যোগাযোগ পরিধির বিস্তৃতি, বিশেষ কাজে বিশেষ দক্ষতা অর্জন, গ্রামীণ জীবনের ওপর নাগরিক জীবনের প্রভাব প্রভৃতি। এগুলো প্রযুক্তির প্রত্যক্ষ প্রভাব। আর বেকারত্ব বৃদ্ধি, শ্রমিক–মালিকের মধ্যে ব্যবধান, প্রতিযোগিতার তীব্রতা বৃদ্ধি প্রভৃতি প্রযুক্তি পরিবর্তনের পরোক্ষ প্রভাব। কৃষিক্ষেত্রে প্রযুক্তিবিদ্যার কল্যাণে উন্নত জাতের বীজ, সেচ, সার প্রয়োগের ফলে কৃষি উৎপাদন বহুগুণে বেড়ে গেছে। তাছাড়া আমাদের দেশে এখন মৎস্য চাষে নতুন নতুন পদ্ধতির প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। চিংড়ি চাষে অভাবনীয় পরিবর্তন, সমন্বিত মাছ চাষ, গবাদিপশুর প্রজনন, গরু মোটাতাজাকরণ প্রভৃতি প্রযুক্তির প্রত্যক্ষ ফসল। প্রযুক্তি কৃষি খামার অর্থনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন এনে দিয়েছে। কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন পল্লী উন্নয়ন সংস্থা। এসব সংস্থা গ্রামীণ কৃষির পরিবর্তনের পাশাপাশি মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কেরও পরিবর্তন সাধন করেছে।

কাজ

একক : সাংস্কৃতিক উপাদানের প্রভাবে সৃষ্ট পরিবর্তনগুলোর একটি ছক তৈরি কর।

দলীয় : সামাজিক পরিবর্তনে কৃষি প্রযুক্তির ভূমিকা চিহ্নিত কর।

৬. যোগাযোগ : যে দেশের যোগাযোগ মাধ্যম যত উন্নত সে দেশের অর্থনীতিও তত উন্নত। যোগাযোগ সামাজিক পরিবর্তনের একটি অন্যতম উপাদান। জল, স্থল ও আকাশপথে যোগাযোগ, টেলিফোন, ফ্যাক্স, ইন্টারনেট, ই–মেইল, ডিশ অ্যান্টেনা, মোবাইল ফোন, রেডিও, টেলিভিশন, বিভিন্ন ধরনের পত্র–পত্রিকা প্রভৃতি সামাজিক পরিবর্তনে ভূমিকা রাখে। আজকাল ঘরে বসে বিশ্বের সকল দেশের সাথে যোগাযোগ করা যায়। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ পাঠাগার ঘরে বসে ব্যবহার করা যায়। প্রয়োজনীয় গ্রন্থ নির্বাচন করে পড়াশুনা করা যায়। যোগাযোগের এ অভাবনীয় পরিবর্তনের ফলে ঘরে বসে শিক্ষার্থীরা বিশ্বের উন্নত বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগাযোগ করছে। পড়াশোনার জন্য বিদেশে যাচ্ছে।

সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক, জৈবিক, সংস্কৃতিগত উপাদানের প্রভাব পরিবর্তনের ধারাকে গতিশীল করে। তাছাড়া শিক্ষা, প্রযুক্তি ও নতুন নতুন যোগাযোগের মাধ্যম সামাজিক পরিবর্তনে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। বাংলাদেশের গ্রামীণ ও শহুরে জীবনে এ উপাদানসমূহের প্রভাব লক্ষণীয়।

বহুবিধ উপাদানের দ্বারা সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হলেও কখনো কখনো কোনো বিশেষ উপাদান, যেমন–শিল্পায়ন ও নগরায়ণ সামাজিক পরিবর্তনে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। গোটা সমাজ ব্যবস্থা, যেমন–সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, পারিবারিক ও ধর্মীয় জীবনে এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে সমাজের ওপর শিল্পায়ন ও নগরায়ণের প্রভাব তাৎপর্যপূর্ণ। তাছাড়াও নগরায়ণের প্রভাবে পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে নারীর ভূমিকারও পরিবর্তন এনে দিয়েছে।

৭. শিল্পায়ন ও নগরায়ণ : শিল্পায়ন হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থা শিল্পভিত্তিক ও উৎপাদনমুখী অর্থনীতি ও সমাজে রূপান্তারিত হয়। শিল্পায়নের ফলে নগরায়ণ ঘটে। ব্যাপক শিল্পায়নের ফলে গ্রামীণ জীবন ছেড়ে নগর জীবন পদ্ধতি গ্রহণের প্রক্রিয়াই নগরায়ণ। বাংলাদেশে স্বাধীনতাউত্তরকাল থেকে সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত বিভিন্ন শিল্পের প্রসার ঘটেছে। এর মধ্যে পোশাক, ঔষধ, চা, চিনি, সুতা, কাগজ, তামাক, বিস্কুট, প্রসাধনী ও সাবান শিল্প প্রধান। শিল্প প্রসারের ফলে বেকারত্ব ঘুচাতে গ্রামের অনেক দক্ষ–অদক্ষ শ্রমিক নগরমুখী হচ্ছে এবং নগর জীবন গ্রহণ করছে।

শিল্পায়নের ফলে আমাদের সমাজ জীবনে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব হয়েছে। এদেশের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, অধিকহারে উৎপাদন বৃদ্ধি, মাথাপিছু আয় ও জাতীয় আয় বৃদ্ধির মূলে রয়েছে শিল্পায়ন। শিল্পায়নের ফলে শিল্পের স্থানীয়করণ প্রক্রিয়া সূচিত হয়ে নগরায়ণের সৃষ্টি হয়েছে। এভাবে খুলনার খালিশপুর, চট্টগ্রামের বাড়বকুণ্ড, সিলেটের ছাতক প্রভৃতি আজ শিল্পনগরী হিসেবে পরিচিত।

শিল্পায়ন ও নগরায়ণের ফলে যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটেছে। এতে ভৌগোলিক দূরত্ব কমে গেলেও সামাজিক দূরত্বকে বাড়িয়ে দিয়েছে। পুরুষ, নারী এক সাথে কাজ করছে। শিল্প শ্রমিকেরা অধিকাংশ সময় কাটায় সহকর্মীদের সাথে। কর্মক্ষেত্রে প্রাত্যহিক জীবনের প্রভাব ব্যক্তির সমগ্র জীবনধারাকে প্রভাবিত করে। ব্যক্তির জীবনদর্শন, আচার–আচরণ, মানসিকতা, মূল্যবোধ প্রভৃতির পরিবর্তন ঘটেছে। শিল্পনগরীর বাসস্থান স্বল্পতা, স্বল্প মজুরি ইত্যাদি কারণে পরিবারের সব সদস্যদের নিয়ে একসাথে বসবাস করা সম্ভব হয় না। ফলে যৌথ পরিবার ভেঙে একক পরিবারের সৃষ্টি হয়েছে। আবার পারিবারিক সংগঠনে বিবাহবিচ্ছেদ, শিশু–কিশোরদের সুষ্ঠু সামাজিকীকরণে সমস্যা, প্রবীণদের নিরাপত্তাহীনতা, অপরাধ প্রবণতাসহ বিভিন্ন সমস্যার জন্ম দিয়েছে। আমাদের দেশের শহরে বস্তির উদ্ভব এ শিল্পায়নের ফসল। যেসব স্থানে পোশাক শিল্প, চামড়া শিল্প, চুড়ি শিল্প, তামাক–বিড়ি শিল্প গড়ে উঠেছে সেসব স্থানে বস্তির উদ্ভব হয়েছে। বস্তিগুলো সামাজিক জীবনে দ্বন্দ্ব–সংঘাত, অপরাধ, কিশোর অপরাধের মতো বহু সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করে। এসব সমস্যা আবার অন্যান্য সমস্যার সৃষ্টি করেছে, যা নগর জীবনকে বিষিয়ে তুলেছে। শিল্পায়ন শহর অর্থনীতিতে একদিকে যেমন আশীর্বাদ অন্যদিকে অভিশাপও। তবে সমন্বিত প্রচেষ্টায় অভিশাপ দূর করা সম্ভব।

সামাজিক পরিবর্তন এবং নারীর ভূমিকা

বাংলাদেশে শিল্পের ক্রমোন্নতি নারীর সামাজিক জীবন ও মর্যাদার ক্ষেত্রকে প্রভূত পরিবর্তন সাধন করেছে। শিল্পের প্রসার আজ নারীকে গৃহের সীমিত পরিবেশ থেকে বাইরের কর্মমুখর জগতে টেনে এনেছে। তাছাড়া নারী সমাজের চাকরি পরিবারে বাড়তি অর্থোপার্জনের সুযোগ সম্প্রসারিত করেছে। শিক্ষাক্ষেত্রে নারী আগের তুলনায় অনেক অগ্রসর হয়েছে। নারীরা এখন শুধু প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গন্ডিতে আবদ্ধ নয়। তারা এখন উচ্চশিক্ষার জন্য মেডিকেল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়সহ মাদ্রাসার উচ্চতর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করছে। চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন, বেইজিং–১৯৯৫ এ বাংলাদেশ প্রণীত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে নারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা মোট শিক্ষার্থীর শতকরা ২৩ ভাগ। মেডিকেল কলেজসমূহে এবং প্রকৌশল ২০১৫

চিত্র ১৪.১ : নারী শিক্ষার অগ্রগতি

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে যথাক্রমে শতকরা ২৯ এবং শতকরা ৯ ভাগ নারী শিক্ষার্থী। নারী শিক্ষা অবৈতনিক হওয়ায় গ্রামীণ মেয়েরা আগের চেয়ে পড়াশোনার সুযোগ বেশি পাচ্ছে। তাছাড়া নারী শিক্ষার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সরকার উপবৃত্তি প্রকল্প চালু করেছে, যা গ্রামীণ নারী শিক্ষাকে আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়েছে। এখন গ্রামীণ সমাজের মানুষ ছেলে শিক্ষার্থীর পাশাপাশি কন্যা শিশুর শিক্ষাকে সমানভাবে গুরুত্ব দিচ্ছে। এর ফলস্বরূপ বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষা ও এইচএসসি পরীক্ষার নারী শিক্ষার্থীরা ফলাফলে অনেক এগিয়ে রয়েছে।

কাজ

দলীয় : শহর ও গ্রামাঞ্চলের নারীর ভূমিকার পরিবর্তনের কারণসমূহ চিহ্নিত কর।

একক : শিক্ষাক্ষেত্রে গ্রামীণ নারীর ভূমিকার পরিবর্তনের চিত্র তুলে ধর।

নারী এখন শিক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত হচ্ছে। এক সময় নারী শুধু গৃহস্থালি কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আজ তারা বাংলাদেশের শহর এলাকার পোশাক শিল্প, ঔষধ তৈরির কারখানা, টেলিফোন ও টেলিযোগাযোগ শিল্প, পাট, চা, কাগজ শিল্প, স্থাপত্য শিল্প, মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রভৃতি শিল্প ও কল–কারখানায় চাকরি করছে। তাছাড়া শিক্ষিত নারীরা বিভিন্ন পেশা, যেমন – চিকিৎসা, আইন, শিক্ষকতা, পুলিশ, বিচার বিভাগসহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করছে। সরকারি চাকরিতে প্রশাসন, পুলিশ, ডাক, সমবায়, আনসারসহ প্রায় সবগুলো ক্যাডারে নারীদের বিরাট একটা অংশ চাকরি করছে। সেনাবাহিনীতেও নারীদের অংশগ্রহণ প্রশংসনীয়। আমাদের গ্রাম পর্যায়ে নারীরা সরকারি সংস্থা কিংবা বেসরকারি সংস্থা থেকে ঋণ নিয়ে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে। এ কর্মসংস্থানগুলোর মধ্যে রয়েছে বৃক্ষরোপণ, নার্সারি, গরু মোটাতাজাকরণ, ছাগল পালন, মৎস্য চাষ, মধু চাষ, হাঁস-মুরগি পালন, টেইলারিং, ফল-মূলের ব্যবসা প্রভৃতি। তাদের আয়ে সংসার চলছে, সন্তান পড়াশোনা করছে, পরিবারের সদস্যরা স্বাস্থ্য সেবা পাচ্ছে। আবার এসব নারী পুরুষের পাশাপাশি বহু সামাজিক দায়িত্বও পালন করছে। সামাজিক পরিবর্তনের সাথে সাথে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকায়ও পরিবর্তন ঘটেছে। নারীর ভূমিকার এই পরিবর্তন নারীর ক্ষমতায়নের পথকে সুগম করেছে। নারীকে করেছে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত।

চিত্র ১৪.২ : আত্ম–কর্মসংস্থানে নারী

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. শিল্পায়ন কী?

২. নারীর ক্ষমতায়নকে কীভাবে ব্যাখ্যা করবে?

৩. সামাজিক পরিবর্তন কী?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন :

১. সামাজিক পরিবর্তন কীভাবে নারীকে ক্ষমতায়ন ও মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে–ব্যাখ্যা কর।

২. গ্রামীণ কৃষির পরিবর্তনে প্রযুক্তিবিদ্যার ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।

৩. বাংলাদেশের গ্রামীণ ও শহুরে সমাজে সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাব বিশ্লেষণ কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. নিচের কোনটি সমাজ পরিবর্তনের সাংস্কৃতিক উপাদান?

ক. বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রভাব

খ. জনসংখ্যার ঘনত্ব বৃদ্ধি

গ. সমবায় আন্দোলন

ঘ. পোশাক শিল্পের সম্প্রসারণ

২. নগরায়ণ কী?

ক. গ্রামীণ জীবন ছেড়ে নগর জীবন গ্রহণ প্রক্রিয়া

খ. শিল্প সম্প্রসারণের ধারাবাহিক উপায়

গ. নগর সভ্যতা গড়ে তোলার পদ্ধতি

ঘ. অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া

৩. বাংলাদেশের নারী শিক্ষায় সাম্প্রতিক পরিবর্তনের কারণ হলো–

i. বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ

ii. মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা

iii. উপবৃত্তি কার্যক্রমের প্রভাব

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

চন্দননগর একসময় নারী শিক্ষায় অনেক পিছিয়ে ছিল। মাদ্রাসাগুলোতে মেয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছেলে শিক্ষার্থীর অর্ধেকেরও কম ছিল। সাম্প্রতিক সময়ে এ অঞ্চলে মাদ্রাসায় উপস্থিতি, পরীক্ষায় কৃতিত্ব ও অন্যান্য ক্ষেত্রে মেয়ে শিক্ষার্থীরা অনেক এগিয়ে।

৪. চন্দননগরে নারী শিক্ষার পরিবর্তনের কারণ–

i. পিতা-মাতার সচেতনতা বৃদ্ধি

ii. সরকারি-বেসরকারি পদক্ষেপ

iii. প্রযুক্তির উন্নয়ন

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

৫. চন্দননগরে নারী শিক্ষার পশ্চাৎপদতার কারণ–

i. অজ্ঞতা ও অশিক্ষা

ii. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অপ্রতুলতা

iii. আর্থ–সামাজিক ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন :

১. মহাত্মা গান্ধীর ‘সর্বদয়া’ আন্দোলন এক সময়ে ভারতের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে জীবনমুখী করেছিল। বাংলাদেশের বেসরকারি সংস্থা সিডিএম উক্ত কর্মসূচির অনুরূপ ‘শ্রমদানা’ কার্যক্রম গ্রহণ করে বগুড়ার অবহেলিত জনগোষ্ঠীর সমস্যা সমাধানে কাজ করছে, যা বগুড়ার বিভিন্ন গ্রামে নানামুখী পরিবর্তন সাধন করেছে। এ অঞ্চলে এখন যৌতুক ও বাল্যবিবাহ নেই বললেই চলে। এখানে বহু নারী উন্নয়ন সংঘ এখন জনসংখ্যারোধ ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্পে কাজ করে সমাজ জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে।

ক. সামাজিক পরিবর্তন কী ?

খ. বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তনের একটি কারণ ব্যাখ্যা কর।

গ. ‘সর্বদয়া’ ও ‘শ্রমদানা’ কার্যক্রমের প্রভাবে সৃষ্ট সামাজিক পরিবর্তনের কোন উপাদানের প্রভাবের সাথে মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প নারীর ভূমিকার পরিবর্তনে সমাজ জীবনে কী প্রভাব ফেলেছে? বিশ্লেষণ কর।

২.

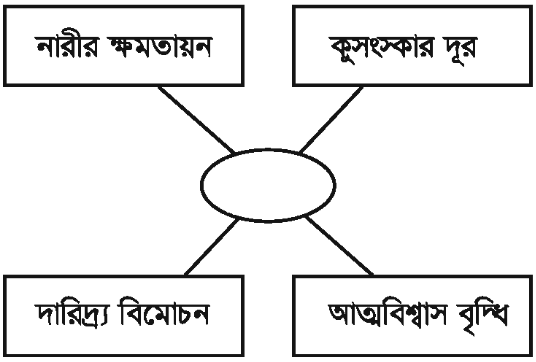

ছক : ক

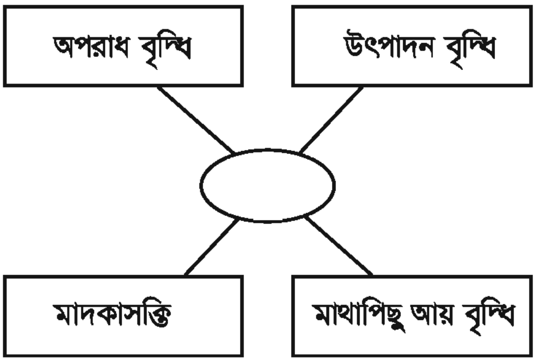

ছক : খ

ক. ‘মানবীয় সম্পর্কের পরিবর্তন হচ্ছে সামাজিক পরিবর্তন।’ – উক্তিটি কার?

খ. ‘শিক্ষা সামাজিক পরিবর্তনের অন্যতম উপাদান।’–ব্যাখ্যা কর।

গ. ছক ‘ক’ এ নির্দেশকসমূহে যে উপাদানটির প্রভাব রয়েছে সমাজে এর ইতিবাচক দিকটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ছক ‘খ’ এ নির্দেশকসমূহের উপাদানটির একদিকে আশীর্বাদ অন্যদিকে অভিশাপ–তুমি কি এ বক্তব্যের সাথে একমত? যুক্তি দাও।

ষোড়শ অধ্যায়

বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা ও এর প্রতিকার

সমাজ ও সামাজিক সমস্যা ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। সমাজ সৃষ্টির লগ্ন থেকেই সামাজিক সমস্যা ছিল, এখনও রয়েছে। শুধু সমস্যার প্রকৃতি ও ধরনের পার্থক্য ঘটেছে। সামাজিক সমস্যা হলো সমাজের এমন একটা অস্বাভাবিক অবস্থা যা অধিকাংশ লোককে প্রভাবিত করে এবং এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য সকলকে একযোগে কাজ করতে হয়। আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কে জেনেছি। সামাজিক পরিবর্তনের সাথে সামাজিক সমস্যা সৃষ্টির গভীর সম্পর্ক রয়েছে। অপরিকল্পিত সামাজিক পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা কিংবা ভূমিকা পালনের ব্যর্থতাই সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করে। সমাজভেদে সামাজিক সমস্যার রূপ পরিবর্তিত হয়। বাংলাদেশে বহু সামাজিক সমস্যা রয়েছে। এ অধ্যায়ে আমরা সামাজিক নৈরাজ্য, মূল্যবোধের অবক্ষয়, নারীর প্রতি সহিংসতা, এইচআইভি এইডস, সড়ক দুর্ঘটনা, জঙ্গিবাদ এবং দুর্নীতি সম্পর্কে অবহিত হব।

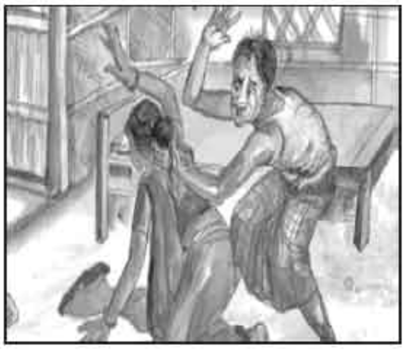

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

- সামাজিক সমস্যার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- সামাজিক নৈরাজ্য ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশে সামাজিক নৈরাজ্য ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণ ও প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- সামাজিক নৈরাজ্য ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় প্রতিরোধের পদক্ষেপ চিহ্নিত করতে পারব;
- 'নারীর প্রতি সহিংসতা'– ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতার ধরন ও কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতার প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব;
- নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে আইনের বিষয়বস্তু ও শাস্তি ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার উপায় ব্যাখ্যা করতে পারব;
- শিশুশ্রম ও কিশোর অপরাধের ধারণা, ধরন ও আইনি প্রতিকার ব্যাখ্যা করতে পারব;
- মাতৃকল্যাণ ধারণা ও মাতৃত্বকালীন সুবিধা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- এইচআইভি/এইডসের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- এইচআইভি/এইডসের পরিস্থিতি ও কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- এইচআইভি/এইডসের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব এবং প্রতিরোধ কার্যক্রম ব্যাখ্যা করতে পারব;
- সড়ক দুর্ঘটনার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশে সড়ক দুর্ঘটনার পরিস্থিতি বর্ণনা করতে পারব;
- সড়ক দুর্ঘটনার প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- দুর্ঘটনা মুক্ত বা নিরাপদ সড়ক করার উপায় এবং দুর্ঘটনা হ্রাসের পদক্ষেপ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- জঙ্গিবাদের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- জঙ্গিবাদের কারণ ও প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- জঙ্গিবাদ প্রতিরোধের পদক্ষেপ চিহ্নিত করতে পারব;
- দুর্নীতির ধারণা, কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধের পদক্ষেপ ব্যাখ্যা করতে পারব এবং আদর্শ জীবন গঠনে উদ্বুদ্ধ হব;
- নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হব এবং নারী নির্যাতন প্রতিরোধে সচেতন হব;
- এইচআইভি/এইডস সম্পর্কে সচেতন হব এবং আক্রান্ত রোগীর সেবায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসব;
- দুর্নীতি প্রতিরোধ ও দুর্ঘটনা বিষয়ে সচেতন হব;
- ধর্মীয় আদর্শ জীবন গঠনে উদ্বুদ্ধ হব।

পরিচ্ছেদ ১৫.১ : সামাজিক নৈরাজ্য ও মূল্যবোধের অবক্ষয়

সাধারণভাবে সমাজের জন্য ক্ষতিকর ও অসুবিধাজনক অবস্থা বা পরিস্থিতিকেই সামাজিক সমস্যা বলে। সামাজিক সমস্যা সাময়িক সময়ের জন্য সৃষ্টি হয় না। এটি কমবেশি স্থায়ী হয় এবং এর সমাধানের লক্ষ্যে যৌথ উদ্যোগের প্রয়োজন অনুভূত হয়। সুতরাং সামাজিক সমস্যা হলো সমাজ জীবনের এমন এক অবস্থা, যা সমাজবাসীর বৃহৎ অংশকে প্রভাবিত করে, যা অবাঞ্ছিত এবং এর প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য সমাজবাসী ঐক্যবদ্ধ প্রচেস্টা চালাতে উদ্যোগী হয়।

সামাজিক বিশৃঙ্খলা হতে সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। সমাজের প্রচলিত আচার–আচরণ, রীতি–নীতি, প্রথা প্রভৃতির নিয়ন্ত্রণের ব্যতিক্রমই সামাজিক বিশৃঙ্খলা। সামাজিক বিশৃঙ্খলা তখনই দেখা দিবে যখন ব্যক্তির উপর সামাজিক রীতিনীতির প্রভাব হ্রাস পাবে। সামাজিক রীতিনীতি যখন ব্যক্তির আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয় তখন মানুষের নৈতিক অবনতি শুরু হয়। নৈতিক অবনতি ব্যাপক আকার ধারণ করলে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ভাঙন শুরু হয়। সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ভাঙনের ফলে সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য দেখা দেয়। এসব পরিস্থিতিতে সমাজে নানা ধরনের সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হতে থাকে।

সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের উল্লেখযোগ্য লক্ষণ হলো– অপরাধ, কিশোর অপরাধ, মাদকাসক্তি, অপহরণ, আত্মহত্যা, নারী নির্যাতন, বিবাহ বিচ্ছেদ, আইনশৃঙ্খলার অবনতি, ঘুষ, ছিনতাই, সন্ত্রাস, রাহাজানি, চাঁদাবাজি, স্বজনপ্রীতি, ব্যাভিচার, যৌনব্যাধির প্রাদুর্ভাব, স্বেচ্ছাচার, শিশুশ্রম, শিশুদের প্রতি অবহেলা, হত্যা প্রভৃতি।

সামাজিক নৈরাজ্যের ধারণা

সামাজিক বিশৃঙ্খলার চরম রূপ হচ্ছে সামাজিক নৈরাজ্য। রাস্ট্রের শাসনযন্ত্র যখন আর কাজ করে না এবং শাসনযন্ত্র ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না তখন সমাজে নৈরাজ্য দেখা দেয়। উদাহরণস্বরূপ ঘুষ, নারী নির্যাতন, অপহরণ, ব্যাভিচার ইত্যাদির কথা উল্লেখ করা যায়।

সামাজিক নৈরাজ্যের কারণ

সমাজে নৈরাজ্য সৃষ্টির পিছনে বহু কারণ দায়ী। সামাজিক মূল্যবোধের যথাযথ অনুশীলন সুন্দর সমাজের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে সমাজে নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়। সমাজে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ও শিথিলতা ঘটলে নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়। তাছাড়া আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সাহায্যপ্রার্থী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ ও অবহেলা সমাজে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে। সমাজের সংস্কৃতি পরিপন্থি কর্মকান্ড, অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, দুর্নীতি প্রভৃতির কারণে সমাজে নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়।

সামাজিক মূল্যবোধ অবক্ষয়ের ধারণা

যে কোনো সমাজের রীতিনীতি, মনোভাব এবং সমাজের অন্যান্য অনুমোদিত আচার-আচরণের সমন্বয়ে সামাজিক মূল্যবোধের সৃষ্টি হয়। বস্তুত যেসব ধ্যানধারণা, বিশ্বাস, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, সংকল্প মানুষের আচার-আচরণ এবং কার্যাবলিকে পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে, সেগুলোর সমস্টিই হলো মূল্যবোধ। বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানো, অতিথির প্রতি সম্মান প্রদর্শন, ছোটদের প্রতি স্নেহ, মায়া-মমতা প্রভৃতি সামাজিক মূল্যবোধের উদাহরণ। এসব মূল্যবোধের অবনতিই সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়। এর ফলে সৃষ্টি হয় সামাজিক অসঙ্গতি।

সামাজিক মূল্যবোধ অবক্ষয়ের কারণ

সমাজ পরিবর্তনের সাথে মূল্যবোধ পরিবর্তনের সম্পর্ক রয়েছে। সমাজে যখন শিক্ষা উন্নয়ন, শিল্পায়ন, নগরায়ণ ও প্রযুক্তির বিকাশ ঘটে তখন মূল্যবোধেরও পরিবর্তন ঘটে। মূল্যবোধের এই পরিবর্তন ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয়ই হতে পারে। মূল্যবোধের ইতিবাচক পরিবর্তন সমাজ অনুমোদিত। মূল্যবোধের নেতিবাচক পরিবর্তন সমাজ অনুমোদিত নয়। এটি মূল্যবোধের অবক্ষয়।

সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার অভাব দেখা দিলেও সামাজিক বিশৃঙ্খলা বা অসঙ্গতি বেড়ে যায়। ফলে সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটবে। তাছাড়া সমাজে আইনের শাসনের দুর্বলতা ও অভাব, মানুষের সহনশীলতার অভাব এবং বিশৃঙ্খল পরিবেশের কারণেও মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটে। ধর্মীয় অপব্যাখ্যাও মানুষকে মূল্যবোধহীন পথে পরিচালিত করতে পারে, যেমন- কোনো বিষয়ে মনগড়া ফতোয়াজারির মাধ্যমে দোররা মারা মূল্যবোধ পরিপন্থি কাজ।

সামাজিক নৈরাজ্য ও মূল্যবোধ অবক্ষয়ের প্রভাব

সমাজ জীবনে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে নৈরাজ্য ও মূল্যবোধ অবক্ষয়ের প্রভাব সুদূরপ্রসারী। সমাজে মূল্যবোধের অবক্ষয় ও নৈরাজ্যপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে মানুষের অধিকারের বঞ্চনা বেড়ে যায়। ঘুষ, দুর্নীতিতে গোটা সমাজ অচল হয়ে পড়ে। অপরাধীদের দৌরাত্ম্য বেড়ে যায়। এমন পরিস্থিতিতে বেশিরভাগ অপরাধী শাস্তি পায় না। সমাজ জীবনে ভীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। দেশের সকল সেবা খাতের মান নিম্নগামী হয়। সমাজে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা বেড়ে যায়।

কাজ

দলীয় : সমাজে মূল্যবোধের কয়েকটি অবক্ষয় চিহ্নিত কর এবং এর প্রতিরোধ পদক্ষেপ লেখ।

একক : সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ও সামাজিক নৈরাজ্যের পার্থক্য উদাহরণের মাধ্যমে দেখাও।

সামাজিক নৈরাজ্য ও মূল্যবোধের অবক্ষয় প্রতিরোধে গৃহীত পদক্ষেপ

সামাজিক নৈরাজ্য ও মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে-

- ব্যাপক সামাজিক আন্দোলন ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ;
- আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা আনয়ন;
- অপসংস্কৃতি রোধে ব্যাপক সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ;
- দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি রোধে কর্মক্ষেত্রে জবাবদিহিতা ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ;
- ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা আনয়ন;
- সমাজের হিংসাত্মক কার্যক্রম রোধে সচেতনতা সৃষ্টি;
- আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি।

পরিচ্ছেদ ১৫.২ : নারীর প্রতি সহিংসতা

নারীর প্রতি সহিংসতার ধারণা

পুরুষ বা নারী কর্তৃক যে কোনো বয়সের নারীর প্রতি শুধু নারী হওয়ার কারণে যে সহিংস আচরণ করা হয় তাই নারীর প্রতি সহিংসতা। কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টি নানা অজুহাতে নারীর আর্থ-সামাজিক, শারীরিক কিংবা মানসিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে নারীর প্রতি সহিংসতা ঘটিয়ে থাকে। নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে শারীরিক বা মানসিকভাবে

এই নির্যাতন চালানো হয়। এ সহিংস আচরণ বাড়ি-ঘর, রাস্তা-ঘাট, স্কুল-কলেজ, কর্মক্ষেত্র, হাট-বাজার থেকে শুরু করে যে কোনো স্থানে ঘটতে পারে।

নারীর প্রতি সহিংসতার প্রকৃতি

বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতা নারীর স্বাধীনতার ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধক। নারীর প্রতি সহিংসতার নানা প্রকৃতি রয়েছে। নারীরা বাড়িতে শারীরিক ও মানসিক যেসব নির্যাতনের শিকার হয় তাকে বলে পারিবারিক সহিংসতা। সাধারণত স্বামী, শাশুড়ি, ননদ এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্য দ্বারা নারী এ ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়। এসব সহিংসতার মধ্যে রয়েছে প্রহার, যৌতুক সম্পর্কিত নির্যাতন, শিক্ষা ও সম্পত্তির অধিকারের বঞ্চনা, অত্যধিক কাজের বোঝা চাপানো, কন্যা শিশুকে মারধর , যৌনপীড়ন প্রভৃতি।

যৌন হয়রানি, নির্যাতন ও ধর্ষণ, ফিকাহ্‌শাস্ত্র বিরোধী মনগড়া ফতোয়া, এসিড নিক্ষেপ, নারী ও শিশু পাচার প্রভৃতি হলো বর্বর, নির্মম ও পৈশাচিক সহিংসতা।

যৌন হয়রানি : সাম্প্রতিক সময়ে যৌন হয়রানি বাংলাদেশের অন্যতম সামাজিক সমস্যা। এটি নৈতিকতার চরম অবক্ষয়, একটি সামাজিক বিপর্যয়। অন্যান্য দেশের মতো এটি বাংলাদেশকেও গ্রাস করেছে। আমাদের দেশে নারীরা বিভিন্নভাবে যৌন হয়রানির শিকার হচ্ছে। বর্তমানে কিশোরী, তরুণী এমনকি বিবাহিত নারীও জঘন্য যৌন হয়রানির শিকার হচ্ছে। যৌন হয়রানিকে ইভটিজিংও (Eveteasing) বলা হয়। ইভটিজিং শব্দটি যৌন হয়রানির ইংরেজি প্রতিশব্দ। ইভটিজিং হচ্ছে লোকসমাগমপূর্ণ স্থানে পুরুষ কর্তৃক নারীদের নিগ্রহ বা উত্ত্যক্ত করা। গৃহঅভ্যন্তরে, কর্মক্ষেত্রে অথবা যাতায়াতের পথে, কখনোবা নিরিবিলি স্থানে অসৎ উদ্দেশ্যে অনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য পুরুষ কর্তৃক নারীরা যৌন হয়রানির শিকার হয়। অনেক সময় শিশুরাও যৌন হয়রানি ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছে।

ফতোয়া : গ্রামীণ এলাকায় ফিকাহ্‌শাস্ত্র বিরোধী মনগড়া ফতোয়ার মাধ্যমে নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনা ঘটানো হয়। কখনো কখনো গ্রামের প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ মনগড়া আইনের মাধ্যমে বিচারকার্য পরিচালনা করে। এসব দেশের প্রচলিত আইনের পরিপন্থী।

এসিড নিক্ষেপ : এসিড নিক্ষেপ নারীর প্রতি একটি ভয়াবহ সহিংসতা। বর্তমানে বাংলাদেশে এসিড নিক্ষেপের ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে। সাধারণত নারীদের উপরই এসিড নিক্ষেপের ঘটনা অধিক ঘটে থাকে। প্রেম ও অনৈতিক প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান, সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ, পারিবারিক কলহসহ নানা কারণে এসিড নিক্ষেপের মতো জঘন্য ঘটনা ঘটে।

নারী ও শিশু পাচার : নারী ও শিশুরা পাচার হয়ে নানাভাবে সহিংসতার শিকার হয়। দক্ষিণ এশিয়ায় নারী ও শিশু পাচারের পরিস্থিতি ভয়াবহ। প্রতি বছর বাংলাদেশ থেকেও প্রচুর নারী ও শিশু পাচার হয়ে যায়। এদের বলপূর্বক বিভিন্ন অবমাননাকর এবং অমানবিক কাজ, যেমন- দেহ ব্যবসায়, উটের জকি ইত্যাদিতে ব্যবহার করা হয়। অনেক সময় এসব পাচারকৃত নারী ও শিশুদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গও বিক্রি করা হয়।

নারীর প্রতি সহিংসতার কারণ

সমাজে নারীর প্রতি সহিংসতার বহু কারণ রয়েছে। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় বিভিন্ন কাজে নারী সর্বদা অপারদর্শী অদক্ষ হিসেবে পরিগণিত হয়। বাইরের বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান থেকে বঞ্চিত রাখা, যৌতুক, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, ক্রমাগত কন্যা সন্তানের জন্ম ও এর ফলে পুত্রসন্তানের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠা প্রভৃতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি নারীর প্রতি সহিংসতা বৃদ্ধিতে প্রভাব ফেলছে।

অর্থনৈতিক দুরবস্থা আমাদের দেশে যৌতুক প্রথাকে প্রতিষ্ঠা করতে উৎসাহিত করেছে। ক্রমে যৌতুকপ্রথা পরিণত হয়েছে সহিংসতার হাতিয়ার রূপে। তাছাড়া নারীকে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রাখা, মতলবি ফতোয়া, বিভিন্ন সামাজিক কুপ্রথা প্রভৃতি নারীর প্রতি সহিংসতার গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

এখনও আমাদের সমাজে অনেক পুরুষ নারীকে দুর্বল ও অবলা হিসেবে মনে করে। গ্রামীণ ও শহুরে সমাজের কতিপয় পরিবারে পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি হলো নারীর কাজ গৃহে রান্না-বান্না, সন্তান জন্মদান, লালন-পালন, সবজি বাগান করা, গবাদিপশু পালন, শিশুকে পাঠদান, শারীরিক শুশ্রুষা করা প্রভৃতি। পুরুষতান্ত্রিক অন্যান্য দৃষ্টিভঙ্গি, যেমন- পুরুষ নারীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ, নারীরা স্বামীর সেবাদাসী, স্বামীর পদতলে স্ত্রীর বেহেস্ত প্রভৃতি মনোভাব থেকেই নারীর প্রতি সহিংসতার সৃষ্টি হয়। আবার শৈশবে নিজ পরিবারে নারীর প্রতি সহিংসতা ও বঞ্চনার অভিজ্ঞতা পরবর্তীতে একজন পুরুষকে সহিংস করে তুলতে পারে। কন্যা সন্তানকে শিক্ষা দানের প্রতি গুরুত্ব না দেওয়া, কন্যা সন্তানের প্রতি মা-বাবার উদাসীনতা, পুত্র সন্তানকে প্রাধান্য দেওয়া, বিবাহে কন্যার ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে উপেক্ষা করার মনোভাব প্রভৃতি নারীর প্রতি সহিংসতাকে আরও একধাপ বাড়িয়ে দেয়।

কাজ

একক : গ্রামীণ দরিদ্র পরিবারে নারীর প্রতি সহিংসতার ধরনগুলো লেখ।

দলীয় : নারীর প্রতি সহিংসতার কারণগুলোর একটি ছক তৈরি কর।

নারীর প্রতি সহিংসতার গুরুত্বপূর্ণ কারণ দারিদ্র্য। দারিদ্র্য ঘোচাতে কাজের খোঁজে এসে অনেক নারী সহিংসতার শিকার হয়। বাংলাদেশে নারী শ্রমিকের একটা বিরাট অংশ পোশাক শিল্পে কাজ করে। এসব নারী শ্রমিক রাতে কর্মস্থল থেকে ফেরার পথে বা শয়নকক্ষ সংকটের কারণে একই ঘরে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বসবাস করার কারণে অনেকেই যৌন নির্যাতনের শিকার হয়। এছাড়াও বাসাবাড়িতে কাজ করে এমন গৃহকর্মী নারী বা শিশু অনেকেই যৌন নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে।

লোকলজ্জা, পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদার ভয়সহ নানা কারণে বাংলাদেশের নারী সমাজ অনেক সময় নির্যাতনের বিষয় বাইরে প্রকাশ করতে বা প্রতিবাদ করতে পারে না। ফলে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংস ঘটনা আরও বেড়ে যাচ্ছে। তবে নারী ও শিশুর এ নীরবতা ভাঙতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বিভিন্ন সাহায্যকারী সংস্থা, যেমন- আইন সালিশ কেন্দ্র, ব্রেকিং দ্যা সাইলেন্স বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

নারীর প্রতি সহিংসতার প্রভাব

নারীর জীবনে সহিংসতার প্রভাব জটিল ও ভয়াবহ। নারীর প্রতি শারীরিক নির্যাতন কখনো কখনো নারীর অঙ্গাহানি ঘটায়। সহিংস ঘটনায় নারীর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষতবিক্ষত হয়। অনেক ক্ষেত্রে নারী আত্মহত্যা পর্যন্ত করে থাকে। সহিংসতার শিকার নারীরা সমাজে স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে না। নারীর প্রতি এই সহিংসতা আমাদের দেশের অর্থনীতিকেও ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

কাজ

একক : নারীর প্রতি সহিংসতা আমাদের দেশের অর্থনীতিতে কীভাবে প্রভাব ফেলে তা পোশাক শিল্পের নারী শ্রমিকদের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে আইনি প্রতিকার

নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে কতিপয় আইনি প্রতিকার হলো:

১. নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-২০০০ : নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-২০০০ (২০০৩ সালে সংশোধিত) যৌন হয়রানিকে শাস্তিমূলক অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করে বলা হয়েছে-'যদি কোনো পুরুষ অযাচিতভাবে তার যৌন লালসা চরিতার্থ করার জন্য নারীর শালীনতা অবমাননা কিংবা অশ্লীল অঙ্গাভঙ্গি বা ইঙ্গিতের মাধ্যমে যৌন হয়রানিমূলক আচরণ ঘটায় তবে উক্ত ব্যক্তি অনূর্ধ্ব সাত বছর এবং সর্বনিম্ন দুই বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন এবং অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত হবেন।'

২. এসিড অপরাধ দমন আইন–২০০২ : এসিড অপরাধ দমন আইনে এসিড দ্বারা মৃত্যু ঘটানো, এসিড দ্বারা আহত করা, এসিড নিক্ষেপ করা বা নিক্ষেপের চেষ্টা করা এবং এ অপরাধে সহায়তা করা প্রভৃতির শাস্তি, বিচার পদ্ধতি ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

এসিড দ্বারা মৃত্যু ঘটানোর শাস্তি : যদি কোনো ব্যক্তি এসিড দ্বারা অন্য কোনো ব্যক্তির মৃত্যু ঘটান তাহলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন এবং এর অতিরিক্ত অনূর্ধ্ব এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হবেন।

এসিড দ্বারা আহত করার শাস্তি : এই আইনে আরও বলা হয়েছে, যদি কোনো ব্যক্তি এসিড দ্বারা কাউকে এমনভাবে আহত করেন যে– **ক.** তার দৃষ্টিশক্তি বা শ্রবণশক্তি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে নষ্ট হয় বা মুখমণ্ডল বিকৃত বা নষ্ট হয় তাহলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন এবং এর অতিরিক্ত অনূর্ধ্ব এক লক্ষ টাকার অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হবেন। **খ.** শরীরের অন্য কোনো অঙ্গ, গ্রন্থি বা অংশ বিকৃত বা নষ্ট হয় বা শরীরের কোনো স্থান আঘাতপ্রাপ্ত হয় তাহলে উক্ত ব্যক্তি অনধিক চৌদ্দ বছর কিন্তু অন্যূন সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন এবং অতিরিক্ত অনূর্ধ্ব পঞ্চাশ হাজার টাকার অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হবেন। এছাড়া এসিড নিক্ষেপ করা বা নিক্ষেপের চেষ্টা বা অপরাধে সহায়তা করার জন্যও শাস্তির বিধান রয়েছে। এসিড নিয়ন্ত্রণ আইনে সরকার এসিডের মজুদ, বহন, আনা–নেওয়া ব্যবস্থা ইত্যাদির ওপর যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। ২০১০ সালে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কর্তৃক এসিড নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন–২০১০ পাস হয়।

৩. নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধে বাংলাদেশের আইন : নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন–২০০০ এ বলা হয়েছে যে, যদি কোনো ব্যক্তি পতিতাবৃত্তি বা বেআইনি বা নীতিগর্হিত কোনো কাজে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে কোনো নারী বা শিশুকে বিদেশ থেকে আনয়ন করেন বা বিদেশে পাচার বা প্রেরণ করেন অথবা ক্রয় বা বিক্রয় করেন বা অনুরূপ কোনো উদ্দেশ্যে কোনো নারী ও শিশুকে তার দখলে বা হেফাজতে রাখেন তাহলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা অনধিক ২০ বছর কিন্তু অন্যূন ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত হবেন। এছাড়াও নারী ও শিশু অপহরণ, মুক্তিপণ আদায়, ধর্ষণ, ধর্ষণজনিত কারণে মৃত্যু, যৌনপীড়ন, যৌতুকের জন্য মৃত্যু ঘটানো ইত্যাদির ক্ষেত্রে আইনে শাস্তির বিধান রয়েছে।

কাজ

দলীয় : নিম্নোক্ত ছকে প্রদত্ত আইনের বিধানে শাস্তি উল্লেখ করে নাগরিক হিসেবে দায়িত্ব চিহ্নিত কর ।

আইন	বিধানাবলি	শাস্তি	দায়িত্ব ও কর্তব্য
যৌন হয়রানি			
এসিড নিক্ষেপ			
নারী ও শিশু পাচার			

মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন–২০১১–এ মানব পাচারের জন্য দায়ী অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডসহ পাঁচ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করার বিধান রয়েছে।

নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সমাজের করণীয়

নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। এক্ষেত্রে সমাজের করণীয় কী তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১. নারী শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ, বিধবা ভাতা প্রদান এবং নারীর জন্য ঋণদান কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি ;

২. নির্যাতন, সহিংসতার ধরন ও প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে আইন প্রণয়ন এবং এর যথাযথ প্রয়োগ;

৩. পরিবারে ছেলেমেয়ে উভয়কেই পারিবারিক জীবনে নৈতিক মূল্যবোধ গঠন সম্পর্কিত শিক্ষা প্রদান;

৪. নারী অধিকার এবং অধিকার সংশ্লিষ্ট আইন বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি;

৫. নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মতৎপরতার সম্প্রসারণ;

৬. নারী নির্যাতনকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা;

৭. নারী নির্যাতন প্রতিরোধে প্রবর্তিত আইন, যেমন–এসিড অপরাধ দমন আইন, এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন, যৌতুক প্রতিরোধ আইন, পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, বাল্যবিবাহ অধ্যাদেশ, সন্ত্রাস দমন অধ্যাদেশ ইত্যাদির যথাযথ প্রয়োগ;

৮. সামাজিক চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ করা;

৯. নারীর বিরুদ্ধে সহিংস ঘটনার প্রভাব ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচার করে জনমনে সচেতনতা সৃষ্টি;

১০. নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সংশ্লিষ্ট আইনের বিষয়বস্তু সহজভাবে জনসমক্ষে উপস্থাপন ও প্রচার।

কাজ
দলীয় : যৌন হয়রানি বন্ধে তুমি কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পার? উল্লেখ কর।

নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে আরও কতকগুলো বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। এক্ষেত্রে সমাজে মূল্যবোধের অবক্ষয়রোধ, অপসংস্কৃতিরোধ, নারী ও পুরুষের শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা, সুস্থ পরিবার গঠন, শিক্ষা, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও আদর্শ অনুশীলন করা, নারীর ভূমিকা ও মর্যাদার যথাযথ মূল্যায়ন করা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও সামাজিক চাপ প্রয়োগকারী প্রতিষ্ঠান, যেমন– গ্রাম আদালত, ইউনিয়ন পরিষদ প্রভৃতিকে অধিক সক্রিয় করতে হবে। নারীর প্রতি সহিংস ঘটনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অপরাধী কিংবা অপরাধীর পরিবারের তরফ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়, অপরাধীকে সামাজিকভাবে বয়কট করে এক ঘরে করে রাখা প্রভৃতি সামাজিক চাপসংক্রান্ত পদক্ষেপের মাধ্যমে সহিংস ঘটনা প্রতিরোধ করা যেতে পারে। অপরাধীকে খুঁজে বের করার ক্ষেত্রেও অপরাধ প্রতিরোধে সামাজিক চাপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

শিশু শ্রম

দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশের মতো বাংলাদেশেও শিশু শ্রম আছে। যে বয়সে একটি শিশু স্কুলে যাওয়া আসা করবে, সমবয়সীদের সাথে খেলাধুলা করবে ঐ বয়সে দরিদ্র শিশুদের জীবিকার জন্য কাজ করতে হয়। বাংলাদেশে শিশু শ্রমের প্রথম এবং প্রধান কারণ হলো–অর্থনৈতিক দুরবস্থা। দরিদ্র পরিবারের পক্ষে ভরণ–পোষণ মিটিয়ে সন্তানের লেখাপড়ার খরচ যোগানো বাবা–মার পক্ষে সম্ভব হয় না। ফলে তাদের স্কুলে পাঠাতে অভিভাবকেরা উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। এ অবস্থায় পিতা বা মাতা মনে করেন, সন্তান কোনো পেশায় নিয়োজিত হয়ে আয় রোজগার করলে পরিবারের উপকার হবে। শিশুদের অল্প

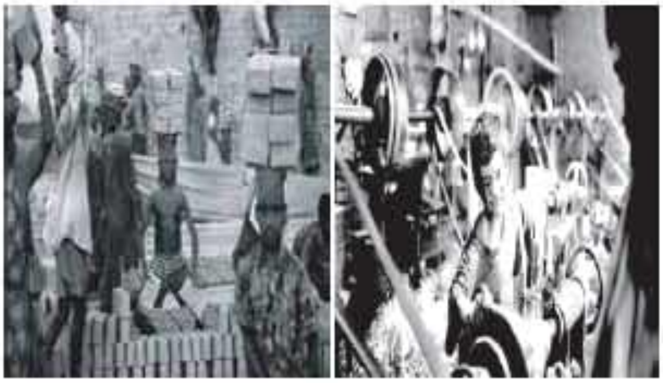

চিত্র ১৫.১ : শিশুশ্রম

পারিশ্রমিকে দীর্ঘক্ষণ কাজে খাটানো যায় বলে নিয়োগ কর্তারাও তাদেরকে কাজে লাগানোর জন্য উৎসাহী হয়। দরিদ্র পিতা–মাতা শিক্ষাকে একটি অলাভজনক কর্মকাণ্ড মনে করে। সন্তানদের ১৫–১৬ বছর ধরে লেখাপড়ার খরচ চালিয়ে যাওয়ার মতো ধৈর্য ও অর্থ তাদের থাকে না। শিশু শ্রমের কুফল সম্পর্কে অভিভাবকদের উদাসীনতায় শিশু শ্রম বৃদ্ধি পাচ্ছে। শহরজীবনে গৃহস্থালি কাজে গৃহকর্মীর ওপর অতি মাত্রায় নির্ভরশীলতাও শিশু শ্রমকে উৎসাহিত করছে।

শিশু শ্রম প্রতিরোধে বাংলাদেশের আইন ও বাংলাদেশ অনুসমর্থিত আন্তর্জাতিক সনদসমূহ

বাংলাদেশের সংবিধানে শিশুদের অধিকার : বাংলাদেশের সংবিধানে শিশুসহ সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি অংশে শিশুদের জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাসহ শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশের শ্রম আইন ২০০৬–এ শিশু ও কিশোরদের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে শিশুর ন্যূনতম বয়স ১৪ বছর এবং কিশোরের ন্যূনতম বয়স ১৪ থেকে ১৮ বছর নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া আইনে উল্লেখ করা হয়েছে যে ১৪ বছরের কম বয়সী কোনো শিশুকে কাজে নিয়োগ করা যাবে না এবং শিশুর পিতামাতা কিংবা অভিভাবক শিশুকে দিয়ে কাজ করানোর জন্য কারও সাথে কোনো প্রকার চুক্তি করতে পারবে না। কিশোর শ্রমিক নিয়োগ করতে হলে রেজিস্টার্ড ডাক্তারের কাছ থেকে মালিকের খরচে ফিটনেস সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে হবে। কিশোর শ্রমিকদের স্বাভাবিক কাজের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে দৈনিক ৫ ঘণ্টা। তবে সন্ধ্যা ৭টা থেকে ভোর ৭টা পর্যন্ত কোনো কিশোর শ্রমিককে দিয়ে কাজ করানো যাবে না। কিশোর শ্রমিককে দিয়ে কোনো ঝুঁকিপূর্ণ বা বিপজ্জনক কাজ করানো যাবে না। পাশাপাশি এ আইনে আরও বলা হয়েছে যে, ১২ বছর বয়সী শিশু–কিশোরদের কেবল সে ধরনের হালকা কাজই করানো যাবে যে কাজে কোনো ক্ষতি হবে না এবং যা তাদের শিক্ষা গ্রহণের অধিকারকে বিঘ্নিত করবে না।

জাতীয় শিশু শ্রম নিরসন নীতি ২০১০–এ শিশু শ্রম বিলোপ সাধনে কতকগুলো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। শিশু শ্রম প্রতিরোধ ও নির্মূলে কৌশলগত ব্যবস্থা গ্রহণ, প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত হতে ঝুঁকিপূর্ণ শিশু শ্রম নিরসনে সুনির্দিষ্ট সময়ভিত্তিক স্বল্পমেয়াদি পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সব ধরনের শিশু শ্রম বিলোপে দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

কাজ

দলীয় : শিশু শ্রম বন্ধে তোমাদের কী করণীয় উল্লেখ কর ।

জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ : ১৯৮৯ সালের জাতিসংঘ কর্তৃক প্রণীত জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদে শিশু শ্রম বিষয়ে সুস্পষ্ট অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। এই সনদে বলা হয়েছে, স্থানীয় পরিস্থিতি বিবেচনা করে সদস্য রাষ্ট্রগুলো শিশু শ্রমের জন্য বয়স, বিশেষ কর্মঘণ্টা ও কর্মে নিয়োগের যথার্থ শর্তাবলি নির্ধারণ করবে। এছাড়া এ সনদে শিশুর সুরক্ষা, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে যা পরোক্ষভাবে শিশুশ্রম নিরসনে সহায়তা করবে। বাংলাদেশ ১৯৯০ সালে এ সনদ অনুসমর্থন করেছে।

কিশোর অপরাধ

কিশোর অপরাধ প্রতিটি সমাজের জন্য একটি উদ্বেগজনক সামাজিক সমস্যা। আমাদের সমাজে এবং পৃথিবীব্যাপী উল্লেখযোগ্য হারে সমস্যাটি বিদ্যমান রয়েছে। সামাজিক সুষ্ঠু পরিবেশ ও মৌলিক চাহিদা থেকে বঞ্চিত হয়ে খারাপ সঙ্গ এবং পাচারকারী ও বিভিন্ন ধরনের অনৈতিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ব্যক্তির সাথে জড়িত হয়ে শিশু–কিশোররা অপরাধী হয়ে ওঠে।

শিশুরা জাতির মূল্যবান সম্পদ। সুতরাং তাদের উন্নয়নের জন্য এবং সমসুযোগ-সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে সব ধরনের পদক্ষেপ নিতে হবে, যাতে তারা শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকে। কর্মক্ষম ও নৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে এবং সমাজের প্রয়োজনে উপযুক্ত দক্ষতা ও কর্মক্ষমতা অর্জন করতে পারে। বঞ্চিত ও অবহেলিত শিশু-কিশোররা সহজেই অপরাধ জগতে জড়িয়ে পড়ে। কাউকে পরোয়া না করা, বিচক্ষণতার অভাব, উদ্যম, শারীরিক শক্তি এবং টিকে থাকার ক্ষমতা, দুঃসাহসিক প্রকৃতি প্রভৃতি কারণে কিশোররা অপরাধ ও বিভিন্ন রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। পারিবারিক অভাব-অনটন, শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়া এবং বাবা-মায়ের দায়িত্বহীন আচরণ ও নিয়ন্ত্রণের অভাবে শহরের বস্তিতে বসবাসকারী কিশোররা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে বেশি জড়িয়ে পড়ে। এছাড়া শহর জীবনের একাকিত্ব, বাবা-মায়ের কর্মব্যস্ততা, আকাশ সংস্কৃতির প্রভাবসহ নানা কারণে কিশোররা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়। গঠনমূলক পারিবারিক পরিবেশ সৃষ্টি, পরিবার ও বিদ্যালয়ে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা, চিত্তবিনোদনমূলক কার্যক্রম, অপসংস্কৃতিরোধ প্রভৃতি পদক্ষেপের মাধ্যমে কিশোর অপরাধ মোকাবিলা করা যেতে পারে। আবার যেসব শিশু ও কিশোর ইতোমধ্যেই অপরাধের সাথে জড়িত হয়ে পড়েছে তাদের চরিত্র সংশোধনের জন্য কিশোর আদালত, কিশোর হাজত, সংশোধনী প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির মাধ্যমে তাদেরকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনা যেতে পারে।

কিশোর অপরাধ দমন আইন এবং বিচার ব্যবস্থা : কিশোর অপরাধের বিচার ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের সাজা দেওয়া নয় বরং তারা যেন তাদের ভুলগুলো উপলব্ধি করে সংশোধন হওয়ার সুযোগ পায়।

কিশোর অপরাধী : জাতিসংঘ শিশু অধিকার কনভেনশন অনুযায়ী ১৮ বছরের কম বয়সী সকলেই শিশু বলে বিবেচিত। বাংলাদেশ ১৯৮৯ সালে এ সনদ অনুমোদন করে। বাংলাদেশে শিশুদের সংজ্ঞায়নে বিভিন্ন ধরনের আইন রয়েছে। বাংলাদেশ শিশু আইন-১৯৭৪-এর সংজ্ঞা অনুযায়ী ১৬ বছরের কম বয়সী প্রত্যেকেই শিশু।

কিশোর অপরাধ আইন : সাধারণত সাত থেকে ষোলো বছর বয়সী শিশুরাই কিশোর-কিশোরী হিসেবে বিবেচিত। বাংলাদেশ শিশু আইন-১৯৭৪-ই কিশোর অপরাধ দমন ও বিচারের মূল আইন হিসেবে ধরা হয়। এ আইনে কিশোর অপরাধের বিচার সংক্রান্ত কিশোর আদালত গঠন, আলাদা হাজত বা আটক স্থান এবং কিশোর সংশোধনের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বলা হয়।

কাজ

দলীয় : কিশোর অপরাধীকে সুপথে আনার জন্যে করণীয় পদক্ষেপ চিহ্নিত কর ।

এছাড়া এ আইন অনুযায়ী, প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের নিয়ে শিশু আদালত গঠিত হবে। এ আদালত প্রতিমাসে অন্তত ২ থেকে ৩ বার কিংবা তার অধিক সংখ্যক বার বসবে।

আইনে বলা হয়, কিশোর হাজত সাধারণ হাজত থেকে ভিন্নতর হবে। কিছু কিছু অপরাধ খতিয়ে দেখতে বিচারের শুনানি এবং নিষ্পত্তির জন্য কিশোরদের প্রায়শই আটক রাখার প্রয়োজন হয়। এ সময় তদন্তে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আটক শিশুকে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং শিশুর চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে অপরাধ সংঘটনের কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা করবেন। তদন্ত কর্মকর্তারা বিচার, বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণের ওপর ভিত্তি করে এবং অভিভাবকদের তথ্য অনুযায়ী আদালতে রিপোর্ট পেশ করবেন। কিশোর হাজতে আটক অবস্থায় শিশু-কিশোরদের বিভিন্নভাবে সংশোধনমূলক কর্মকাণ্ডে এবং খেলাধুলায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়।

কিশোর সংশোধন : আইনে কিশোরদের সংশোধনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আইন অনুযায়ী অভিযুক্ত ও দোষী শিশু এবং আনুষ্ঠানিক সংশোধন প্রয়োজন এমন কিশোরদের সংশোধন কেন্দ্রে প্রেরণ করতে হবে।

মাতৃকল্যাণ

স্বাস্থ্য একটি মানবাধিকার। সকল জনগণের সুস্বাস্থ্য অর্জনের লক্ষ্যে সেবা প্রাপ্তিতে সাম্য, নারী–পুরুষ সমতা এবং সমগ্র জনগোষ্ঠীর সেবার নিশ্চয়তা বিধান করা প্রয়োজন। স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে মায়েদের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এককথায়, মাতৃকল্যাণ বলতে মায়ের স্বাস্থ্য, সুরক্ষা এবং ভালো থাকার জন্য সমাজ এবং সামাজিক সংগঠন কর্তৃক সংঘবন্ধ প্রচেষ্টাসমূহকে বোঝায়। সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্য সেবা, প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণ, নিরাপদ প্রসুতি সেবা, সন্তান ভুমিষ্ঠ হওয়ার সময় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রীর উপস্থিতি ও পরিচর্যা, প্রজননকালীন রুগ্নতা, মাতৃত্বজনিত মৃত্যুহার রোধ প্রভৃতি মাতৃকল্যাণের অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ দিক।

মানবাধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে মাতৃত্বজনিত মৃত্যু নারীদের বাঁচার ও স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার অধিকারকে মারাত্মকভাবে আঘাত হানে। বাংলাদেশে সার্বিক মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্য পরিস্থিতি উন্নতির পথে। তবে মাতৃত্বজনিত কারণে এখনও অনেক প্রসুতি মা মারা যাচ্ছেন।

বাংলাদেশের জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির অন্যতম লক্ষ্য শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস করা; বিশেষ করে স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে আগামী ২০২১ সালের মধ্যে এ হারকে যুক্তিসংগত পর্যায়ে নামিয়ে আনা। এ লক্ষ্যে সরকার মা ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য সন্তোষজনক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। যথাসম্ভব প্রতিটি গ্রামে নিরাপদ প্রসুতি সেবা নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গৃহীত হচ্ছে। মা ও শিশু মৃত্যুর হার হ্রাসের মাধ্যমে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রশংসা অর্জন করছে।

বাংলাদেশ সরকার ১১ জানুয়ারি ২০১১ গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে সরকারি চাকরিতে নিয়োজিত নারী কর্মীদের জন্য ৬ মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটি ঘোষণা করে, যা ৯ জানুয়ারি ২০১১ সাল থেকে কার্যকর হয়। মাতৃত্বজনিত ছুটি বৃদ্ধির ফলে মায়েরা তাদের সন্তানদের বুকের দুধ পান করাতে সমর্থ হবেন এবং এর ফলে নবজাতক শিশুদের অপুষ্টিজনিত সমস্যা দূর হবে।

পরিচ্ছেদ ১৫.৩ : এইচআইভি (HIV)/এইডস (AIDS)

এইচআইভির ধারণা

এইচআইভি (HIV) হলো অতি ক্ষুদ্র এক বিশেষ ধরনের অ্যান্টিভাইরাস। এ ভাইরাস এর পুরো নাম হিউম্যান ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস (Human Immuno Deficiency Virus) সংক্ষেপে এইচআইভি (HIV)। এটি মানব দেহে প্রবেশ করে দেহের নিজস্ব রোগ–প্রতিরোধ ক্ষমতাকে ধীরে ধীরে ধ্বংস করে দেয়। এইচআইভি ভাইরাস অনেকদিন পর্যন্ত শরীরে সুপ্ত অবস্থায় থাকে। সাধারণত এর সুপ্তিকাল ৬–৭ মাস।

এ ভাইরাসের অবস্থান আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত, বীর্য, যোনিরস, থুতু, চোখের পানি, মূত্র এবং স্তনের দুধের মধ্যে। তবে চোখের পানি, মূত্র ও থুতুর মধ্যে এ ভাইরাসের ঘনত্ব অত্যন্ত কম থাকার ফলে এগুলোর মাধ্যমে কোনো ব্যক্তির সংক্রমিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে না বলে বিশেষজ্ঞরা মতপ্রকাশ করেন।

এইডসের ধারণা

এইডস (AIDS) এর পূর্ণাঙ্গ ইংরেজি রূপ হলো Acquired Immune Deficiency Syndrome। এইচআইভি কয়েকটি নির্দিষ্ট উপায়ে মানব দেহে প্রবেশ করে আক্রান্ত ব্যক্তির রোগ–প্রতিরোধ ক্ষমতা এক পর্যায়ে অতিরিক্ত পরিমাণে ধ্বংস করে দেয়। এইচআইভি সংক্রমণের সর্বশেষ পর্যায় হলো এইডস। শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়ার কারণে এইডস আক্রান্ত ব্যক্তি অতি সহজেই অন্য যে কোনো রোগে আক্রান্ত হয়। এইডসের কোনো

কার্যকর প্রতিষেধক এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। সে কারণে এইডস–আক্রান্ত ব্যক্তির অনিবার্য পরিণতি অকাল মৃত্যু।

কাজ

একক : এইডস সংক্রমণের কারণ চিহ্নিত কর।

একক : এইডস ছোঁয়াচে নয় কেন? তোমার যুক্তি উপস্থাপন কর।

এইডস কোনো ছোঁয়াচে রোগ নয়। এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে দৈনন্দিন কাজকর্ম করলে এইডস হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। যাদের দেহে এইচআইভি আছে, তারাই শেষ পর্যন্ত এইডসে আক্রান্ত হন। যদি রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে কারও দেহে ভাইরাসটি শনাক্ত করা যায় তবেই তাকে এইচআইভি পজেটিভ বলা হয়।

এইডসের কারণ

এইডস একটি ধ্বংসাত্মক ব্যাধি। এইচআইভি সংক্রমণের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তির দেহে এটি প্রবেশ করে। এইচআইভি সংক্রমিত পুরুষ বা নারীর সাথে অনৈতিক মিলন কিংবা এইচআইভি বহনকারীর রক্ত অন্যের শরীরে সঞ্চালনের ফলে এইডস হয়। তাছাড়া এ ভাইরাসযুক্ত সিরিঞ্জ, সুচ, অপারেশনের যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্ত না করে ব্যবহার করলে, সমকামিতার মাধ্যমে, আক্রান্ত মায়ের গর্ভে সন্তান জন্ম নিলে অথবা আক্রান্ত মায়ের দুধের মাধ্যমে এটি ছড়াতে পারে। এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তির রক্তের সঙ্গে সুস্থ ব্যক্তির রক্তের সংস্পর্শ ঘটলে, যেমন–উভয়ের কাটা, ফোড়া, ঘা, ক্ষত ইত্যাদির মাধ্যমে এবং আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও কান–নাক ফোঁড়ার সুচ ইত্যাদি জীবাণুমুক্ত না করে ব্যবহারের ফলে এ ভাইরাস ছড়াতে পারে। এইচআইভি সংক্রমিত ব্যক্তির অঙ্গ, যেমন–কর্নিয়া, হৃৎপিণ্ড, কিডনি, লিভার প্রভৃতি বা কোষসমষ্টি কোনো ব্যক্তির দেহে প্রতিস্থাপন করলে এইডস ছড়াতে পারে। এ ভাইরাস আক্রান্ত ব্যক্তির ওজন ২ মাসের মধ্যে শতকরা ১১ ভাগের বেশি কমে যায়। সার্বক্ষণিক জ্বর ও ডায়রিয়া লেগে থাকে। এক মাসের বেশি সময় ধরে তার ক্রমাগত কাশি হতে থাকে। শ্বাসতন্ত্রে সংক্রমণ হয়। শুকনা কাশি লেগে থাকে। ঘাড় ও বগলে অসহ্য ব্যথা হয়। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে ছত্রাকজনিত সংক্রমণ দেখা দেয়। অতিরিক্ত অবসাদ অনুভব করে। এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত থালা-বাসন, কাপ, গ্লাস, জামা-কাপড় ইত্যাদি ব্যবহার করলে এইডস ছড়ায় না। তাছাড়া আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে করমর্দন, কোলাকুলি, খেলাধুলা, লেখাপড়া এবং সেবা–শুশ্রুষা করলেও এ রোগ ছড়ায় না।

বাংলাদেশ ও বিশ্বে এইচআইভি/এইডস পরিস্থিতি

১৯৮১ সালে বিশ্বে প্রথম এইচআইভি সংক্রমিত ব্যক্তি শনাক্ত হয়। আমাদের দেশে এইচআইভি সংক্রমণ ধরা পড়ে ১৯৮৯ সালে। ১৯৯৫ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক পরিসংখ্যান রিপোর্টে এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির সংখ্যা দেখা যায়–মিয়ানমার ৪৭৫, ভিয়েতনাম ২২৮, ভারত ১০৩৬, মালয়েশিয়া ২০০, পাকিস্তান ৪৬, ফিলিপাইন ১৯৮, থাইল্যান্ড-১৯০৯৫ এবং বাংলাদেশে ৯ জন। তবে সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের চারপাশে ব্যাপকভাবে এইডস ছড়িয়ে পড়েছে। ১লা ডিসেম্বর ২০০২ বিশ্ব এইডস দিবসে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় AIDS/STD (Sexually Transmitted Disease) কার্যক্রমের এক পরিসংখ্যান উপস্থাপন করে। এ পরিসংখ্যানে বলা হয়, ২০০১ সালে বাংলাদেশে HIV ভাইরাস বহনকারীর সংখ্যা ছিল ১৮৮ জন, যা ৩০ ডিসেম্বর ২০০২ এ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ২৪৮ জনে। National AIDS and STD Program- ২০১০ অনুযায়ী বাংলাদেশে এইচআইভি সংক্রমিত চিহ্নিত ব্যক্তির সংখ্যা ২০৮৮, এইডস আক্রান্তের সংখ্যা ৮৫০ এবং মৃত্যুবরণ করেছিল ২৪১ জন। একই কর্মসূচি ২০১৬ এর হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে এইচআইভি সংক্রমিত চিহ্নিত ব্যক্তির সংখ্যা ৫৭৮ জন। এ হিসাবে ১৯৮৯-২০১৬ পর্যন্ত এইচআইভি আক্রান্তের সংখ্যা ৪,৭২১ জন এবং মৃত্যুবরণ করেছে ৭৯৯ জন। দেশে ৩ কোটির ঊর্ধ্বে ১৫-২৪ বছর বয়সী জনগোষ্ঠী রয়েছে যাদের এইচআইভি সংক্রমণ এবং এইডস প্রতিরোধ সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোনো ধারণা নেই।

বাংলাদেশে এইডস বা এইচআইভি বিস্তারের বহুবিধ কারণ রয়েছে। দেশটির পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে এইডসের বিস্তার ভয়াবহ। বিভিন্ন ব্যবসায়িক কাজকর্ম ও অন্যান্য কারণে প্রতিদিন দেশের হাজার হাজার লোক বিভিন্ন দেশে যাতায়াত করছে। বর্তমানে বাংলাদেশে আশংকাজনকভাবে যৌনকর্মীর সংখ্যা বেড়ে চলেছে। ইতোমধ্যে ৬% যৌনকর্মী এইচআইভি ভাইরাসে সংক্রমিত এবং ৫২% এই ভাইরাসে আক্রান্ত হবার মারাত্মক ঝুঁকিতে রয়েছে। তাছাড়া দেশে পেশাদার রক্তদাতার সংখ্যাও

বেড়েছে। এসব রক্তদাতার সিংহভাগ মাদকাসক্ত। আমাদের দেশে এইডস সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা ও সচেতনতার অভাব এইডস সংক্রমণের প্রধান কারণ বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। আমাদের দেশের প্রায় ৯৯% মোটর শ্রমিক ও রিকশাচালক এইডস সম্পর্কে কিছু জানে না অথচ এরা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ যৌন আচরণে লিপ্ত রয়েছে। প্রতিবছর প্রায় ৮০,০০০ লোক বাংলাদেশ থেকে বিদেশে গমন করেন। তাদের কেউ কেউ নানাভাবে এ রোগের ভাইরাস বহন করে দেশে ফিরে আসে। তাছাড়া একই সিরিঞ্জ ব্যবহার করে শিরায় মাদকদ্রব্য গ্রহণকারীর সংখ্যা দেশে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে প্রথম এইডস সংক্রমিত ব্যক্তি দুবাইতে কর্মরত ছিল।

এইডস– এর প্রভাব

এইডস বা এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তি ও পরিবারকে সামাজিকভাবে নিগৃহীত হতে হয়। পৃথিবীর প্রায় সকল সমাজে এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে অবজ্ঞার চোখে দেখা হয়। তাদের প্রতি কোনো প্রকার সহযোগিতা ও সহানুভূতি দেখানো হয় না বরং সর্বক্ষেত্রে তার প্রতি নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করা হয়। ফলে এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির শারীরিক মৃত্যুর পূর্বেই মানসিক মৃত্যু ঘটে।

এইডস আক্রান্ত ব্যক্তি ধীরে ধীরে কর্মহীন হয়ে পড়ে, যা তার পরিবারের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে দুর্বল করে ফেলে। তাছাড়া পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তির অকাল মৃত্যুতে গোটা পরিবারের মধ্যে অসঙ্গতি ও বিপর্যয় নেমে আসে। এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির পরিবারে স্বামী–স্ত্রীর মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে পারস্পরিক বিশ্বাস ও সম্পর্কের অবনতি ঘটে।

কাজ

একক : বাংলাদেশে এইডস বা এইচআইভি কেন অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ, তোমার যুক্তি উপস্থাপন কর।

দলীয় : ব্যক্তি, পরিবার, সামাজিক ও জাতীয় পর্যায়ে এইচআইভি বা এইডস-এর প্রভাব চিহ্নিত কর।

একক : বাংলাদেশ ও বিশ্ব প্রেক্ষাপটে এইডস বা এইচআইভিএর ওপর একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত কর।

এইডস বা এইচআইভির কারণে আমাদের দেশে নিরাপদ রক্তের প্রাপ্যতা ঝুঁকিপূর্ণ। দরিদ্র দেশগুলোর পাশাপাশি উন্নত দেশগুলোর অব্যাহত উন্নয়ন এবং সেবা ব্যবস্থাও হুমকির সম্মুখীন হয়েছে। বিশ্বে এইডস–এর কারণে একদিকে অকাল মৃত্যুর হার বাড়ছে এবং গড় আয়ু কমছে। আর অন্যদিকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এছাড়াও এইডস–এর কারণে প্রজনন হার হ্রাস পাচ্ছে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ওপর চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। উৎপাদনশীলতা কমে যাচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র।

বাংলাদেশে এইডস প্রতিরোধের উপায়

এইডসের কোনো প্রতিষেধক নেই। মৃত্যুই এর একমাত্র পরিণাম। তাই বাঁচার একমাত্র উপায় হচ্ছে এর প্রতিরোধ। এইডস প্রতিরোধে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

- ধর্মীয় অনুশাসন অনুসরণ করা এবং স্বভাব ও আচরণে সমাজ নির্ধারিত আদর্শ মেনে চলা ;
- একমাত্র জীবনসঙ্গীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকা ;
- রক্তের এইচআইভি পরীক্ষা করে রক্ত গ্রহণ করা ;
- অন্যের ব্যবহৃত সুচ, ব্লেড, সিরিঞ্জ ব্যবহার না করা ;
- কিশোর-কিশোরী এবং সকল মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা ;
- নাক, কান ছিদ্র এবং ছেলেদের সুন্নতে খাৎনা করার সময় জীবাণুমুক্ত সুচ, কাঁচি ব্যবহার করা ;

- শরীরে অঙ্গ প্রতিস্থাপনে সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা ;
- বিদেশযাত্রা ও প্রবাসীদের জন্য বিশেষ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা ;
- যুবসমাজকে এইডস প্রতিরোধে গণসচেতনতা কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা ।

এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির প্রতি আমাদের করণীয়

এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য সামাজিক ও মানসিক সমর্থনের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় চিকিৎসা জরুরি। আক্রান্তের জ্বর, ডায়রিয়া এবং ব্যথা থাকলে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যেতে হবে। নিয়মিত পুষ্টিকর খাবার ও পর্যাপ্ত বিশ্রামের ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া এইডস আক্রান্তের প্রতি পরিবার ও সমাজের অন্যান্যের মানসিক ও সামাজিক সমর্থন জরুরি। আক্রান্ত ব্যক্তিকে ঘৃণা নয়, রোগকে ঘৃণা করার নীতি মেনে চলতে হবে। আক্রান্তের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা, স্নেহ–ভালোবাসা দিয়ে তার মনকে প্রফুল্ল রাখতে হবে। এইডস আক্রান্ত ব্যক্তিকে সবার কাছ থেকে আলাদা করা উচিত নয়। তাকে সাবধানে রাখতে হবে, যাতে সে অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত না হয়। আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত গ্রহণ করা যাবে না এবং তার সাথে যৌনসম্পর্ক স্থাপন থেকে অন্যকে বিরত রাখতে হবে।

পরিচ্ছেদ ১৫.৪ : সড়ক দুর্ঘটনা

সড়ক দুর্ঘটনা পরিস্থিতি

সড়ক দুর্ঘটনা পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই ঘটে থাকে। তবে বাংলাদেশে সড়ক দুর্ঘটনার পরিস্থিতি ভয়াবহ। বাংলাদেশের সমাজ জীবনে এ সমস্যা নানামুখী আর্থ–সামাজিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। এটি মানসিক সমস্যাকেও প্রভাবিত করছে। চালক, মালিক, ট্রাফিক পুলিশ এবং রাস্তার ত্রুটি ও দুর্বলতাজনিত সড়ককেন্দ্রিক যে দুর্ঘটনা তা-ই সড়ক দুর্ঘটনা। বাংলাদেশে রাস্তাঘাট ও যানবাহন বৃদ্ধির সাথে সাথে দুর্ঘটনার হার অপ্রতিরোধ্য গতিতে বেড়ে চলেছে। সেই সাথে বৃদ্ধি পাচ্ছে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ও আহতের সংখ্যা।

বাংলাদেশ হাইওয়ে পুলিশের প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, ২০০১ সালে মোট সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে ৪,০৯১টি এবং ২০০২ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৪,৯১৮টিতে। তাছাড়া ২০০২ সাল থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত যানবাহন দুর্ঘটনায় কবলিতদের মধ্যে মারা যায় ৫০.৫৮%, গুরুতর আহত হয় ৩৮.১০%, এবং সামান্য আহত হয় ১১.৩২% জন। গুরুতর আহতদের মধ্যে অনেকেই আবার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায়, যার কোনো পরিসংখ্যান নেই। প্রকৃতপক্ষে সড়ক দুর্ঘটনা পরিস্থিতি এরচেয়েও ভয়াবহ। দৈনিক খবরের কাগজে চোখ রাখলেই সড়ক দুর্ঘটনার ভয়াবহতা সম্পর্কে আমরা অবহিত হতে পারব এবং জানতে পারব এ সমস্যার পেছনে রয়েছে বহু কারণ, যার প্রভাবও বহুমুখী।

সড়ক দুর্ঘটনার কারণ

বাংলাদেশের শহরে গাড়ির সংখ্যা যে হারে বেড়েছে সে হারে দক্ষ চালক তৈরি হয়নি। অদক্ষ ও প্রশিক্ষণবিহীন চালককে দিয়ে গাড়ি চালানোর কারণে অধিকাংশ দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। গাড়ি চালানোর জন্য যে সকল আইন ও নিয়মনীতি রয়েছে তাও অধিকাংশ গাড়ি চালকরা জানেন না। এ কারণে তারা কখনো কখনো মাত্রাতিরিক্ত গতিতে গাড়ি চালিয়ে থাকেন। বাংলাদেশে অনেকেই কম বেতনে সনদবিহীন চালক নিয়োগ দিয়ে থাকেন। এসব চালক অধিকাংশই তরুণ যারা রাস্তায় ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় অন্য গাড়িকে ওভারটেক করে এবং বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালিয়ে থাকে। এ কারণেও প্রতিদিন সড়ক দুর্ঘটনা বাড়ছে।

আমাদের দেশে অধিকাংশ ট্রাক চালক গাড়িতে পরিবহনসীমার অতিরিক্ত মাল বোঝাই করেন। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে খালি ট্রাকে যাত্রী বোঝাই করে গন্তব্যে পৌছান। শোভাযাত্রা, মিছিল এবং শিক্ষার্থীরা দলেবলে যাওয়ার জন্য ট্রাক ব্যবহার করে, যা অনেক সময় দুর্ঘটনায় পতিত হয়। আমাদের দেশে ট্রাক চালকদের একটি অংশ নেশা আসক্ত। দূরপাল্লার পরিবহনে এসব চালকরা অনেক সময় নেশাগ্রস্ত হয়ে গাড়ি চালান। এ কারণেও দুর্ঘটনা ঘটে। অনেক সময় দেখা যায় যাত্রী পরিবহনে আসন সংখ্যার চেয়ে অতিরিক্ত যাত্রী, এমনকি গাড়ির ছাদেও যাত্রী বহন করা হয়। এর ফলে অনেক গাড়ি দুর্ঘটনায় পতিত হয়।

কাজ

দলীয় : সড়ক দুর্ঘটনার ক্ষেত্রভিত্তিক কারণের একটি ছক তৈরি কর।

চালক	মালিক	সড়ক	অন্যান্য

অনেক সময় স্বল্পশিক্ষিত গাড়ির মালিকগণ অতিরিক্ত লাভের প্রত্যাশায় চালকদের হাতে চলাচলের অযোগ্য ও ত্রুটিপূর্ণ গাড়ি তুলে দেন। তাছাড়া হালকা বডির গাড়ি অনেক ক্ষেত্রে মহাসড়কে চলতে দেখা যায়। এ কারণেও দুর্ঘটনা বেড়ে যায়।

আমরা অনেকেই সড়ক ব্যবহার করার নিয়মনীতি জানি না। রাস্তার কোন পাশ দিয়ে চলতে হবে, কখন পারাপার হতে হবে প্রভৃতি বিষয়ে অজ্ঞতার কারণে অনেক দুর্ঘটনা ঘটে। উদাসীন ব্যক্তি, শিশু, বৃদ্ধ, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষ অনেক সময় অসতর্কভাবে রাস্তায় চলাচল করেন। কেউ কেউ মোবাইল ফোনে কথা বলতে বলতে পথ চলেন। এরূপ নানাবিধ অন্যমনস্কতা ও অসতর্কতা অনেক সময় দুর্ঘটনা ঘটায়।

রাস্তার উপর হাট-বাজার স্থাপন, নির্মাণসামগ্রী রাস্তায় রাখা, মহাসড়কে ধান, পাট, মরিচ শুকানো, গরু-ছাগল বেঁধে রাখা, একই রাস্তায় গাড়ি, অযান্ত্রিক যান এবং পথচারী চলাচল করার কারণেও দুর্ঘটনা ঘটে। অনেক পথচারীর জেব্রাক্রসিং এবং ওভারব্রিজ দিয়ে রাস্তা পারাপার না হওয়ার কারণে দুর্ঘটনা ঘটে।

চলন্ত অবস্থায় গাড়ি চালকের সাথে কথা বলা, প্রতিযোগিতা করে গাড়ি চালানো, রাস্তায় গাড়ি বের করার পূর্বে যান্ত্রিক ত্রুটি পরীক্ষা না করা, সিটবেল্ট ও হেলমেট ব্যবহার না করা, অধিক রাতে গাড়ি চালানো এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কারও কারও দায়িত্ব পালনে অবহেলার কারণেও দুর্ঘটনা ঘটে।

আমাদের দেশে কোনো কোনো সড়কের নক্সা এবং নির্মাণে ত্রুটি রয়েছে। ইঞ্জিনিয়ার এবং কন্ট্রাক্টরের কাজে উদাসীনতা এবং নানা প্রতিকূল পরিস্থিতি এ সমস্যার জন্য দায়ী। ত্রুটিপূর্ণ সড়কের কারণেও দুর্ঘটনা ঘটে থাকে।

সড়ক দুর্ঘটনার প্রভাব

সড়ক দুর্ঘটনার প্রভাব পারিবারিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনে খুবই মারাত্মক, যা আবার বহু সমস্যার জন্ম দেয়। হাইওয়ে পুলিশ বিভাগের প্রকাশিত প্রতিবেদনের এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, দুর্ঘটনায় পতিত ব্যক্তিদের ২৪% লোকের বয়স ১৫ বছরের নিচে এবং ৩৯% লোকের বয়স ১৬–৫০ বছরের মধ্যে। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্ঘটনা গবেষণা কেন্দ্রের গবেষণা ফলাফলে দেখা যায় যে, বিভিন্ন সড়ক দুর্ঘটনার প্রধান শিকার হচ্ছে উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। উপার্জনক্ষম ব্যক্তি দুর্ঘটনায় আহত কিংবা নিহত হওয়ার কারণে এসব পরিবারের সদস্যদের দুর্বিষহ জীবনযাপন করতে হয় এবং আর্থিকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এ পরিবারের শিশুদের শিক্ষা ব্যাহত হয়।

কাজ

একক : একটি শিশুর জীবনে সড়ক দুর্ঘটনা পারিবারিক জীবনকে কীভাবে প্রভাবিত করে?

দলীয় : 'সড়ক দুর্ঘটনা শুধু পারিবারিক জীবনকেই বিপর্যস্ত করে না আর্থ–সামাজিক ও মানসিক জীবনকেও দুর্বিষহ করে তোলে।' –ব্যাখ্যা কর।

অনেক সময় দুর্ঘটনাকবলিত ব্যক্তি শারীরিকভাবে পঙ্গু হলে কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, যা তার ব্যক্তি জীবনকে ভারসাম্যহীন করে তোলে। মানসিক ভারসাম্যহীনতা ব্যক্তি জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। এ সমস্যা কোনো কোনো ক্ষেত্রে আত্মহত্যায় রূপ নেয়। আবার দেখা যায় পঙ্গু ব্যক্তিটিকে ভিক্ষাবৃত্তির মতো পেশা গ্রহণ করতে। কেউ কেউ জীবন নির্বাহের জন্য অপরাধ জগতে প্রবেশ করে। চরম হতাশা লাঘবে অনেকে আবার মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং, সড়ক দুর্ঘটনা শুধু ব্যক্তির পারিবারিক জীবনকেই বিপর্যস্ত করে না, আর্থ–সামাজিক ও মানসিক জীবনকেও দুর্বিষহ করে তোলে।

সড়ক দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে অনেক ক্ষেত্রে ব্যাপক ভাংচুর, সড়ক অবরোধসহ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। অনেক সময় যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্র ক্ষতির সম্মুখীন হয়। চাকরিজীবীর কর্মঘণ্টা অপচয় হয়। পরিবহনের অভাবে কাঁচামাল নষ্ট হয়। গন্তব্যে মালপত্র পরিবহন বিলম্বিত হলে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি ঘটে। চিকিৎসাসহ জরুরি প্রয়োজন বাধাগ্রস্ত হয়। এ বিষয়ে আমরা প্রতিদিন দৈনিক পত্রিকায় চোখ রাখলে আরও ব্যাপক তথ্য সংগ্রহ করতে পারব।

সড়ক দুর্ঘটনামুক্ত রাখার উপায় এবং দুর্ঘটনা হ্রাসের পদক্ষেপ

বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল দেশেই কমবেশি সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে। নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারলে আমরা সড়ককে নিরাপদ ও দুর্ঘটনামুক্ত রাখতে পারব।

- চালক নিয়োগের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণসহ যোগ্যতা নির্ধারণপূর্বক নিয়োগ দেওয়া ;
- গাড়ির চালককে ট্রাফিক আইন–কানুন ও নিয়মশৃঙ্খলা মেনে গাড়ি চালাতে উদ্বুদ্ধ করা এবং সাইড, সিগন্যাল, গতি মেনে সতর্কভাবে গাড়ি চালাতে গাড়ি চালককে উৎসাহিত করা ;
- বেপরোয়া ও নেশাগ্রস্ত অবস্থায় গাড়ি না চালানো, গাড়িতে অতিরিক্ত যাত্রী ও মাল পরিবহন না করা, অন্য গাড়িকে ওভারটেকিং না করার বিষয়ে চালকদের সচেতন এবং আইন মানতে উদ্বুদ্ধ করা ;
- ভারী যানবাহন চলাচলের জন্য আলাদা লেনের ব্যবস্থা করা ;
- সকল সিগন্যাল পয়েন্টে বৈদ্যুতিক সিগন্যাল স্থাপন করা ;
- আধুনিক ও মানসম্মত ড্রাইভিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট স্থাপন করা ;
- ঝুঁকিপূর্ণ রাস্তা, কালভার্ট, ব্রিজ সংস্কার ও পুনর্নির্মাণ করে সড়ক নিরাপদ করার পদক্ষেপ গ্রহণ ;
- গাড়ির ছাদে যাত্রী এবং মালপত্র বহন না করা;
- প্রতিযোগিতা করে গাড়ি না চালানো;
- রাস্তায় গাড়ি বের করার পূর্বে যান্ত্রিক ত্রুটি পরীক্ষা করে এ বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ;
- আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে দায়িত্ব পালনে সচেতন করা;
- জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রচার মাধ্যমকে ভূমিকা পালনে উৎসাহিত করা ;
- দূরপাল্লার সড়কের পাশে বাড়ি-ঘর তৈরি এবং হাট-বাজার স্থাপন না করা। তাছাড়া সড়কে ধান, পাট, মরিচ শুকাতে না দেওয়া এবং গরু-ছাগল না বাঁধা ;
- ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে দায়িত্বশীল হওয়া ; ভুয়া লাইসেন্সধারী কেউ যাতে রাস্তায় গাড়ি চালাতে না পারে সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে দায়িত্বশীল করা ;
- রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে অ্যালকোহল বা মাদক গ্রহণকারী গাড়ি চালকদের শনাক্ত করা এবং তাদের ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রত্যাহার করা।

কাজ

একক : শিশু–কিশোরদের দুর্ঘটনা প্রতিরোধের পদক্ষেপ চিহ্নিত কর।

একক : তোমার এলাকার সড়ক নিরাপদ রাখার পদক্ষেপগুলো চিহ্নিত কর।

নিরাপদ চলাচলের জন্য করণীয়–

- ফুটপাত দিয়ে চলাচল করা, দৌড়ে রাস্তা পার না হওয়া, চলন্ত গাড়িতে ওঠা-নামা না করা, চলন্ত অবস্থায় গাড়ি চালকের সঙ্গে কথা না বলা এবং জেব্রাক্রসিং, ওভারব্রিজ ও মাটির নিচের সংযোগ পথ তথা আন্ডার পাস দিয়ে রাস্তা পারাপার হওয়া;
- শিশু-কিশোরদের দুর্ঘটনা প্রতিরোধে তাদের মহাসড়ক, সংযোগ সড়ক ও আধাপাকা সড়ক সম্পর্কে পরিচিত করানো। তাছাড়া চলাচলের জেব্রাক্রসিং, পারাপার সেতু, ট্রাফিক পুলিশ, ফুটপাত, ট্রাফিক বাতি ও চিহ্নাবলি, বিপজ্জনক স্থান প্রভৃতি সম্পর্কে পরিচিত করানো;
- ছোট ভাইবোনদের নিরাপদ চলাচল বিষয়ে আমরা সচেতন করব। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু ও প্রবীণদের নিরাপদ চলাচলে সহযোগিতা করা আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। সড়ক দুর্ঘটনার শিকার এমন পরিবারের প্রতি আমাদের সহানুভূতিশীল হওয়া উচিত এবং সাহায্য ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া কর্তব্য।

পরিচ্ছেদ ১৫.৫ : জঙ্গিবাদ

জঙ্গি এবং জঙ্গিবাদের ধারণা

জঙ্গি শব্দটি ইংরেজি 'Militant' এবং ল্যাটিন শব্দ 'মিলিট্যার' (Militare) থেকে এসেছে। 'মিলিট্যার' শব্দের অর্থ হলো সৈনিক হিসেবে কাজ করা। আচরণিক দৃষ্টিকোণ থেকে জঙ্গি বলতে তাদের বোঝায় যারা যুদ্ধবাজ, আক্রমণাত্মক, হিংসাত্মক এবং ধ্বংসকারী। জঙ্গিরা আক্রমণাত্মক ও হিংসাত্মক উপায়ে রাষ্ট্র বা সমাজ অননুমোদিত সংস্কারের সমর্থনে সমবেতভাবে কাজ করে। জঙ্গিরা চরম ও হিংসাত্মক পন্থার আশ্রয় নেয়। শুধু ধ্বংসাত্মক কাজে অংশগ্রহণকারীই নয়, এ কাজে চাঁদা প্রদান ও সংগ্রহ এবং পরিকল্পনা গ্রহণসহ সকল সহায়তাকারীও জঙ্গি হিসেবে পরিচিত। জঙ্গি কার্যক্রম এককভাবে কিংবা দলীয়ভাবেও পরিচালিত হতে পারে। জঙ্গিরা বিশেষ উদ্দেশ্য পূরণে তাদের সংগঠন প্রণীত ধর্মীয় বা রাজনৈতিক ধারণা বা দর্শন সমাজ বা রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রবর্তন করতে চায়। তাদের ধারণা প্রচারের জন্য লিফলেট, পোস্টার, পুস্তিকা প্রচারসহ বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করে। তথ্যপ্রযুক্তির আধুনিক প্রচার মাধ্যম, যেমন- ইমেইল, ফেসবুক, টুইটার প্রভৃতি ব্যবহার করে তারা তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। তারা সবসময়ই প্রকাশ করতে চায় তাদের ধারণাই সঠিক, তা রাষ্ট্র এবং সমাজ অনুমোদনপ্রাপ্ত হোক বা না হোক। রাষ্ট্রে বিদ্যমান আদর্শ, মূল্যবোধ, নিয়ম-নীতি, বিধি-বিধান তারা মানতে চায় না। জঙ্গি কর্মকাণ্ডে তারা বোমা, স্থলমাইন, সামরিক অস্ত্র এবং অনেক ক্ষেত্রে আধুনিক মারণাস্ত্র পর্যন্ত ব্যবহার করে থাকে। আত্মঘাতের মাধ্যমেও জঙ্গি কার্যক্রম পরিচালিত হয়। কখনোবা তারা বিমান ছিনতাই করে ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হয়। জঙ্গিদের প্রস্তুত করার জন্য ব্যাপক গোপন সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে। বিশ্বজুড়ে তাদের রয়েছে গোপন আস্তানা ও যোগাযোগ। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কার্যক্রম সম্পর্কিত অননুমোদিত নীতিই জঙ্গি নীতি। জঙ্গি দ্বারা রচিত, প্রচারকৃত ও অনুসৃত ধ্যানধারণাই জঙ্গিবাদ নামে পরিচিত।

জঙ্গিবাদের কারণ

বিশেষ কোনো গোষ্ঠীর চরম রাজনৈতিক কিংবা উগ্র ধর্মীয় অধিকার বা স্বার্থের কারণে গোষ্ঠী চেতনা থেকে জঙ্গি উন্মাদনার জন্ম নিতে পারে। দেশের মধ্যে নৈরাজ্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যেও জঙ্গি কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতে পারে। নৈরাজ্য সৃষ্টির

পিছনে কখনো কখনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও লুক্কায়িত থাকতে পারে। জীবন–জগৎ সম্পর্কে ত্রুটিপূর্ণ ধারণা কিংবা ধর্মীয় অজ্ঞতার কারণেও অনেক সময় ব্যক্তি জঙ্গিতে পরিণত হতে পারে। আন্তঃগোষ্ঠী কিংবা গোষ্ঠীভিন্নতায় স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ের দ্বন্দ্ব থেকেও জঙ্গি কর্মতৎপরতা সৃষ্টি হতে পারে।

জঙ্গিবাদের প্রভাব ও প্রতিরোধ

রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে জঙ্গি কর্মতৎপরতার প্রভাব ভয়াবহ ও মারাত্মক। জঙ্গি তৎপরতার কারণে একটি দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ব্যাহত হতে পারে। তাছাড়া জঙ্গি কার্যক্রম আর্থ–সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানা প্রতিকূলতা সৃষ্টি করতে পারে। মানুষের জীবনযাত্রা অচল হয়ে যেতে পারে। আমরা বিশ্বের বহু দেশের জঙ্গিদের দ্বারা সংঘটিত অনেক অপরাধকর্ম সম্পর্কে কমবেশি জানি। আমেরিকার টুইন–টাওয়ার ধ্বংসের কারণ এই জঙ্গিবাদ। হাজার হাজার মানুষকে হত্যাসহ বহু সম্পদ ধ্বংস হয়েছে এই জঙ্গি কর্মকাণ্ডে। মুম্বাইয়ের হোটেল তাজের হামলাও জঙ্গিদের কর্মকাণ্ড। আমাদের দেশে যশোর জেলায় উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর অনুষ্ঠানে এবং পহেলা বৈশাখে রমনা বটমূলে বোমা বিস্ফোরণের মাধ্যমে নিরীহ শান্তিপ্রিয় মানুষকে হত্যা জঙ্গিদের কাজ। সম্প্রতি ঢাকার গুলশানের হলি আর্টিজান বেকারিতে জঙ্গিরা হামলা চালিয়ে বেশ কিছু দেশি বিদেশি নারী ও পুরুষকে হত্যা করে। অনেক ক্ষেত্রে জঙ্গিরা এসব কাজে আত্মাহুতি দিয়ে থাকে। একটি দেশে অব্যাহতভাবে জঙ্গি কার্যক্রম সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার জন্য হুমকিস্বরূপ। জঙ্গি কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিজের পরিবারের জন্যও হুমকিস্বরূপ। অনেক ক্ষেত্রে জঙ্গিদের রক্ষিত বোমা বিস্ফোরণে একই সাথে বসবাসকারী মানুষ, আবাসস্থল ও প্রতিবেশীদের ব্যাপক ক্ষতি হয়ে থাকে। মূলত জঙ্গিদের কোনো সুস্থ পারিবারিক জীবন থাকে না। সমাজ এবং রাষ্ট্র এদেরকে অপরাধীর দৃষ্টিতে দেখে। অনেক সময় নিজ পরিবারও জঙ্গিদের ঘৃণার চোখে দেখে। এক্ষেত্রে পরিবারের সকলকে সন্তানের আচরণ ও কার্যক্রম সম্পর্কে অত্যন্ত সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। জঙ্গি কর্মতৎপরতার প্রতিরোধে ব্যাপক সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন। শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকবৃন্দ সতর্ক থাকলে জঙ্গি তৎপরতা প্রতিরোধ সহজতর হবে। সামাজিক আন্দোলনের অংশ হিসেবে রাজনৈতিক কিংবা ধর্মীয় ধারণার সঠিক ব্যাখ্যা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে প্রচারপত্র, পোস্টার, লিফলেট প্রভৃতি ব্যবহার করা যেতে পারে। তাছাড়া ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে আলোচনা সভার মাধ্যমে উগ্র বিভ্রান্ত ধর্মদর্শনের বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টি করা যেতে পারে। এককথায় সুস্থ পারিবারিক এবং সামাজিক জীবন জঙ্গি প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

কাজ

একক : জঙ্গির বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত কর।

দলীয় : রাষ্ট্রীয় ও সমাজ জীবনে জঙ্গি কর্মকাণ্ডের প্রভাবগুলো চিহ্নিত করে প্রতিরোধ পদক্ষেপ লেখ।

পরিচ্ছেদ ১৫.৬ : দুর্নীতি

দুর্নীতির ধারণা

ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কর্তৃক অবৈধ পন্থায় নীতি-বহির্ভূত বা জনস্বার্থবিরোধী কাজই দুর্নীতি। রাজনৈতিক এবং সরকারি ও বেসরকারি প্রশাসনে দুর্নীতি বলতে ব্যক্তিগত স্বার্থ বা লাভের জন্য কার্যালয়ের দায়িত্বের অপব্যবহারকে বুঝায়। সাধারণত ঘুষ, স্বজনপ্রীতি, বলপ্রয়োগ বা ভয় প্রদর্শন, প্রভাব খাটানো এবং ব্যক্তি বিশেষকে বিশেষ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে প্রশাসনের ক্ষমতা অপব্যবহার করে ব্যক্তিগত স্বার্থ অর্জনকে দুর্নীতি বলে। অবৈধ সুযোগ– সুবিধা লাভের জন্য কোনো ব্যক্তির সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনে ইচ্ছাকৃত অবহেলাও দুর্নীতি। দুর্নীতির সাথে যুক্ত থাকে পেশা, ক্ষমতা, পদবি, স্বার্থ, নগদ অর্থ, বস্তুসামগ্রী প্রভৃতি। দুর্নীতির মাধ্যমে কাউকে না কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। এ অপরাধের প্রকৃতি ও কলাকৌশল আলাদা। এ কাজে দৈহিক শ্রমের চেয়ে ধূর্ত বুদ্ধির প্রয়োজন বেশি।

দুর্নীতির কারণ

বাংলাদেশে দুর্নীতির কারণ বহুবিধ। মূলত লোভ ও উচ্চাভিলাষী মনোভাব ব্যক্তিকে দুর্নীতিপরায়ণ করে তোলে। অনেক চাকরিজীবী দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে অতিরিক্ত আয়ের চেষ্টা করে। তারা ফাইলের কাজের বিনিময়ে ঘুষ, বকশিশ, কমিশন, চা–নাস্তা বাবদ খরচ, দ্রব্যসামগ্রী প্রভৃতি আদায় করে থাকে। কখনো এসব দুর্নীতিবাজরা দাপ্তরিক ফাইল আটকিয়ে ঘুষ গ্রহণ করে। আবার অনেক সময় অফিসের প্রধান কর্তার টেবিলে দীর্ঘদিন নানা কারণে ফাইলবন্দি হওয়ার কারণে অধস্তন কর্মচারী এ সুযোগ গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে ফাইলবন্দি করাও দুর্নীতি। অফিসের প্রধান বা শাখাপ্রধান দুর্নীতিবাজ হলে এর প্রভাব সংশ্লিষ্ট সকল শাখায় সংক্রমিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে কর্মকর্তা এবং কর্মচারীকে বিলাসী জীবন বা উচ্চাকাঙ্ক্ষার নেশা ও স্বল্পসময়ে অধিক সম্পদের মালিক হওয়ার প্রত্যাশা দুর্নীতিবাজে পরিণত করে। এদের বৈধ উপার্জনের সাথে জীবনযাত্রার মানের মিল থাকে না। এসব পরিবারের সদস্যদের চিন্তা–চেতনা ও মূল্যবোধে দুর্নীতি মিশে থাকে। পরবর্তী জীবনে এরাও দুর্নীতিবাজে পরিণত হয়। এদের অনেকের চাকরি জীবন শুরু হয় অন্য এক দুর্নীতিবাজের মাধ্যমে। পরিবারের সদস্যদের অধিক চাহিদাও অনেক সময় উপার্জনকারীকে দুর্নীতি করতে বাধ্য করে।

দেশে একদিকে কর্মসংস্থানের অপ্রতুলতা এবং অন্যদিকে ব্যাপক বেকারত্ব– এ পরিস্থিতিতে যুব সমাজ যে কোনো চাকরির প্রত্যাশায় বিপুল পরিমাণ ঘুষ দিতে বাধ্য হয়। দুঃখজনক হলেও সত্য যে সমাজব্যবস্থায় যার অর্থ–সম্পদ বেশি সেই মর্যাদার মাপকাঠিতে উঁচু স্তরের বলে অনেকের ধারণা। তাই মর্যাদা ও প্রতিপত্তি লাভে ধন–সম্পদ সংগ্রহ ও অধিক ধনী হবার আশায় অনেকে দুর্নীতির আশ্রয় নেয়।

কাজ

একক : একটি অফিস বেছে নাও এবং উক্ত অফিসে কতভাবে দুর্নীতি হতে পারে তার একটি চিত্র তুলে ধর।

একক : দুর্নীতি প্রতিরোধে গড়ে ওঠা একটি প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত কর এবং এ প্রতিষ্ঠানের সম্ভাব্য দুর্নীতির চিত্র তুলে ধর।

দলীয় : পারিবারিক জীবনে দুর্নীতির প্রভাব চিহ্নিত কর এবং প্রতিরোধ পদক্ষেপ লেখ।

রাজনীতিতে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ চর্চার অভাব, অগণতান্ত্রিক পন্থায় রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল এবং রাজনৈতিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা দুর্নীতি বিস্তারের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। রাজনীতিতে দেশপ্রেমিক, যোগ্য এবং দক্ষ নেতৃত্বের অভাবও দুর্নীতির অনুকূল পরিবেশের সহায়ক। দুর্নীতিবাজদের কোনো মানবিকতা এবং দেশপ্রেম থাকে না। অনেক সময় দেখা যায় দেশে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার প্রভাব সমাজ জীবনকে অস্থির করে তোলে। এ সামাজিক অস্থিরতাই আবার দুর্নীতির জন্ম দিয়ে থাকে। ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতাও অনেক ক্ষেত্রে সমাজে দুর্নীতি বাড়িয়ে তোলে। দুর্নীতিবাজ, নকলবাজ, ভেজাল মিশ্রণকারী ব্যবসায়ীরা অধিক মুনাফা অর্জনের আশায় ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতায় নেমে দুর্নীতি করে।

সাধারণত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এবং মুদ্রাস্ফীতির কারণে অনেক সময় ব্যবসায়ী, আড়তদার, মওজুদদার, মুনাফাখোর, মধ্যস্বত্বভোগী, ফটকা কারবারীরা দুর্নীতির স্বর্গরাজ্য গড়ে তোলে। তারা প্রতারণা ও দুর্নীতির মাধ্যমে অধিক মুনাফা অর্জন করে। এর ফলে স্বল্প আয়ের লোকেরা অর্থকষ্টের কারণে বাঁচার তাগিদে দুর্নীতির আশ্রয়গ্রহণ করে।

দুর্নীতি প্রতিরোধে গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠান যখন দুর্নীতি প্রতিরোধে ব্যর্থ হয় কিংবা এসব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা এবং কর্মচারীরা দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ে তখন সমাজ ব্যাপকভাবে দুর্নীতিতে ছেয়ে যায়। ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ও সমাজে দুর্নীতি বাড়িয়ে তুলতে পারে।

দুর্নীতির প্রভাব ও প্রতিরোধ

সমাজ জীবনে দুর্নীতির ক্ষতিকর প্রভাব সুদূরপ্রসারী। যে সমাজ দুর্নীতিতে ছেয়ে গেছে সে সমাজে একে অন্যের দ্বারা প্রতারিত হয়। দুর্নীতিবাজও অন্যের দুর্নীতির শিকারে পরিণত হয়। ন্যায্য অধিকারের বঞ্চনা দুর্নীতিপ্রবণ সমাজের চিত্র। চাকরিজীবনে স্বজনপ্রীতি বা ঘুষের বিনিময়ে যদি অযোগ্যরা নিয়োগ এবং পদোন্নতি পায় তাহলে সমাজের যোগ্যরা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। দুর্নীতির কারণে সমাজে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা বাধাগ্রস্ত হয়। মানুষের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি করে, ফলে যোগ্যদের প্রতিভা বিকশিত হয় না। সৃজনশীলতা ক্রমশ হ্রাস পায়। দুর্নীতিপ্রবণ সমাজে আইন-শৃঙ্খলা, নিয়ম–কানুন প্রভৃতির প্রতি মানুষ শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলে। আর্থ–সামাজিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়। দুর্নীতি অফিসের কর্মকর্তা, কর্মচারীর মধ্যে দায়িত্ব–কর্তব্যে অনীহা এবং সম্পদের অপব্যবহার করার মানসিকতা সৃষ্টি করে। দুর্নীতির কারণে দারিদ্র্যের হার বেড়ে যায়। সততা, আদর্শ এবং মূল্যবোধ লোপ পেতে থাকে। সামগ্রিকভাবে দুর্নীতি জাতীয় বিপর্যয়ের মূল কারণ। এটি দেশের উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির প্রতিবন্ধক।

দুর্নীতি প্রতিরোধে প্রয়োজন ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি ও সামাজিক আন্দোলন। গণসচেতনতা গড়ে তোলার কার্যকর হাতিয়ার হলো গণমাধ্যম। গণমাধ্যমে দুর্নীতি সম্পর্কে তথ্য প্রচার করে গণসচেতনতা গড়ে তোলা সম্ভব। সমাজের সর্বস্তরে জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা হলে দুর্নীতি নির্মূল করা যায়। উপার্জন, ব্যয়, সম্পদের হিসাব প্রদান ইত্যাদির মাধ্যমেও অনেক দুর্নীতিবাজদের মুখোশ খোলা সম্ভব। দুর্নীতিবাজ, নকলবাজ, প্রতারক ও মুখোশধারীদের চিহ্নিত করে বিচারের আওতায় আনলে দুর্নীতি উচ্ছেদ সহজতর হবে। ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, দারিদ্র্য বিমোচন, সামাজিক আন্দোলন কর্মসূচি প্রভৃতির মাধ্যমেও দুর্নীতি প্রতিরোধ সম্ভব। তাছাড়া পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটলে সমাজ থেকে দুর্নীতির অবসান ঘটবে।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১. এইডস আক্রান্ত হওয়ার কারণ কী?

২. কীভাবে সমাজে নৈরাজ্য সৃষ্টি হতে পারে?

৩. 'সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়' ধারণাটি ব্যাখ্যা কর।

৪. পাচারকৃত নারী ও শিশু কীভাবে সহিংসতার শিকার হয়ে থাকে?

৫. ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক সেবাগ্রহীতার দাপ্তরিক ফাইল আটকানোকে দুর্নীতি বলা হয় কেন?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন :

১. ‘সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য সৃষ্টির মূল কারণ সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ভাঙন।’–কথাটি উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

২. ‘সামাজিক নৈরাজ্য ও মূল্যবোধের অবক্ষয় পরস্পর সম্পর্কিত ধারণা।’– দৃষ্টান্তসহ ব্যাখ্যা কর।

৩. ‘যৌন হয়রানি ও ফিকাহ্‌শাস্ত্র বিরোধী মনগড়া ফতোয়া’ নারীর প্রতি বর্বর ও পৈশাচিক সহিংসতা কেন? ব্যাখ্যা কর।

৪. ‘উপার্জনক্ষম ব্যক্তিই সড়ক দুর্ঘটনার অধিক শিকার।’– কথাটি যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা কর।

৫. ‘পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে জঙ্গিরা অপরাধী।’– কথাটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে লেখ।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন–২০১১ অনুযায়ী মানব পাচারের জন্য দায়ী অভিযুক্ত ব্যক্তির সর্বোচ্চ শাস্তি নিচের কোনটি?

ক. সশ্রম কারাদণ্ডসহ দুইলক্ষ টাকা অর্থদণ্ড

খ. মৃত্যুদন্ডসহ পাঁচ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড

গ. বিনাশ্রম কারাদণ্ডসহ পাঁচ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড

ঘ. মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

২. শৈশবে নারীর প্রতি বঞ্চনার অভিজ্ঞতা একজন পুরুষকে সহিংস করে তোলে, এর মূল কারণ হলো–

ক. ত্রুটিপূর্ণ সামাজিকীকরণ

খ. মূল্যবোধের অবক্ষয়

গ. গোঁড়ামি

ঘ. আধিপত্য

৩. সমাজে নারীর প্রতি সহিংসতার কারণ হলো–

i. দারিদ্র্য

ii. সামাজিক কুপ্রথা

iii. সামাজিক বিশৃঙ্খলা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

৪. এইডস কেন হয়?

ক. সংক্রমিত ব্যক্তির চোখের পানির সংস্পর্শে

খ. এইচআইভি ভাইরাস আক্রমণ করলে

গ. সংক্রমিত ব্যক্তির থালা বাসন ব্যবহার করলে

ঘ. আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে আলিঙ্গান করলে

নিচের ঘটনাটি পড় এবং ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

পিতা–মাতার পারিবারিক দ্বন্দ্ব, ঝগড়া–বিবাদ, মারামারির মধ্যে লিমনের বয়ঃপ্রাপ্তি ঘটেছে। একপর্যায়ে পিতা–মাতার বিবাহ বিচ্ছেদের পর সে একাই বড় হয়েছে। পাড়া–প্রতিবেশীর মধ্যেও সে একই আচরণ লক্ষ করেছে। নিজের বিয়ের পরে তার সংসারেও প্রতিদিন একই ঘটনা ঘটছে। লিমনের পরিবার এ সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে সমাজকর্মীর শরণাপন্ন হয়েছে।

৫. স্ত্রীর প্রতি লিমনের সহিংস আচরণের মূল কারণ কী?

ক. যৌতুক প্রাপ্তির বাসনা

খ. চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বড় হওয়া

গ. পাড়া–প্রতিবেশীর প্রভাব

ঘ. শৈশবে বঞ্চনার অভিজ্ঞতা

৬. লিমনের পরিবারের জন্য সমাজকর্মী যে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন, তা হলো–

i. সুস্থ পরিবার গঠন বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ

ii. প্রচলিত আইন সম্পর্কে সচেতন করা

iii. আইনরক্ষাকারী বাহিনীর হাতে সোপর্দ করা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন :

১. রিমির বাবা চাকরির উদ্দেশ্যে সিঙ্গাপুরে গিয়েছিলেন। চাকরিরত অবস্থায় সেখানে তিনি শারীরিকভাবে অসুস্থবোধ করলে দেশে ফিরে আসেন এবং দুই সপ্তাহের মধ্যে মৃত্যুবরণ করেন। পিতার মৃত্যুর ছয় মাস পর তার মাও অসুস্থ হয়ে পড়েন। 'নির্মল হাসি' নামক উন্নয়ন সংস্থার সহায়তায় চিকিৎসা শুরু করলে পরীক্ষা–নিরীক্ষার পর ডাক্তার তাকে এইডস রোগে আক্রান্ত বলে নিশ্চিত করেন। বিষয়টি এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। পরিবারটি এখন বহুমুখী সমস্যা মোকাবিলা করছে। এ সমস্যা প্রতিরোধে 'নির্মল হাসি' রিমির পরিবারের পাশে এসে দাঁড়ায়।

ক. এইচআইভি কী?

খ. এইডস রোগ ছড়ানোর একটি উপায় ব্যাখ্যা কর।

গ. ডাক্তার কীভাবে নিশ্চিত হলেন যে, রিমির মা এইডস দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. রিমির পরিবারের সমস্যা মোকাবিলায় নির্মল হাসি সংস্থার গৃহীত পদক্ষেপ বিশ্লেষণ কর।

২. ১৯৯৭ সালে সড়ক ও জনপদ বিভাগের এক তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশে প্রতি ১০,০০০ গাড়ি প্রায় ১২৫টি দুর্ঘটনায় পতিত হয়। দুর্ঘটনার এই হার এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ; নরওয়ে ও সুইডেনের তুলনায় ১০০ গুণ বেশি। বাংলাদেশের সড়ক দুর্ঘটনায় প্রতিবছর শুধু শিশু মারা যায় ৩,৪১২ জন। ইনজুরিজনিত সমস্যায় বছরে পঙ্গুত্ববরণ করে ১,২০০ শিশু। এ হিসেব মতে প্রতিদিন গড়ে ৩.৫ জন শিশু পঙ্গুত্বের শিকার হয়। বাংলাদেশ হাইওয়ে পুলিশের এক প্রতিবেদনে দেখা যায় ২০০০–২০০৪ সাল পর্যন্ত সড়ক দুর্ঘটনায় আহতদের ২৪% লোকের বয়স ১৫ বছরের নিচে এবং ৩০% লোকের বয়স ১৬–৫০ বছরের মধ্যে। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্ঘটনা কেন্দ্রের পরিসংখ্যানে দেখা যায় ২০–৪৪ বছরের কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী অধিক দুর্ঘটনার শিকার।

ক. বাংলাদেশ হাইওয়ে পুলিশের প্রতিবেদন অনুসারে ২০০১ সালে বাংলাদেশে কয়টি সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে?

খ. সড়ক দুর্ঘটনার কারণ ব্যাখ্যা কর।

গ. সমাজ জীবনে শিশু ও কর্মক্ষম ব্যক্তির পঙ্গুত্ববরণ ও মৃত্যুর অর্থনৈতিক ও মানসিক প্রভাব ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উপরোক্ত তথ্যের আলোকে সড়ক দুর্ঘটনারোধের পদক্ষেপগুলো বিশ্লেষণ কর।

সমাপ্ত

২০১৯

শিক্ষাবর্ষ

দাখিল

৯ম-১০ম বা বি

শিক্ষাই দেশকে দারিদ্র্যমুক্ত করতে পারে
– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

পরিশ্রম উন্নতির চাবিকাঠি

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য